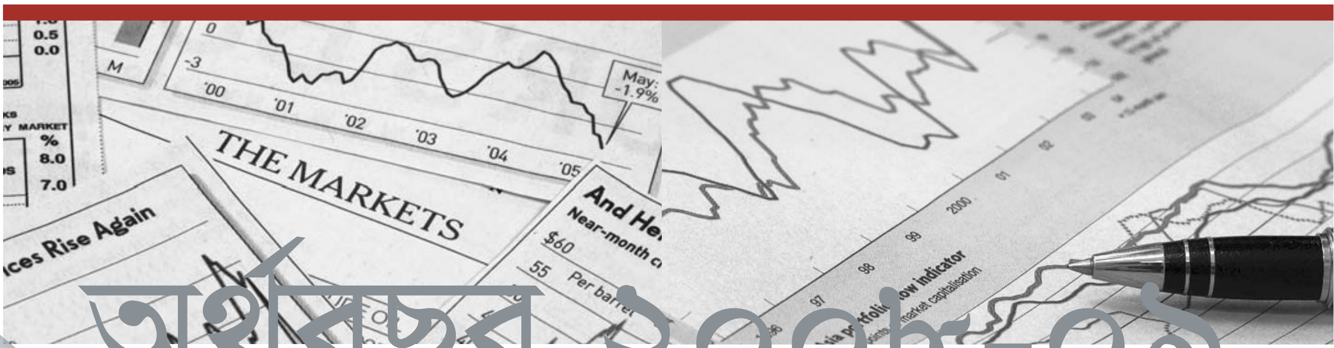

অর্থবছর ২০০৮-০৯

বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনা ২০০৮-০৯

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

বাংলাদেশের অর্থনীতি
পর্যালোচনা ২০০৮-০৯

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০সি, সড়ক ১১, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮ ০২) ৮১২৪৭৭০, ৯১৪১৭০৩, ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪৫০৯০
ফ্যাক্স: (৮৮ ০২) ৮১৩০৯৫১ ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd
http://www.cpd.org.bd/Blog/

প্রথম প্রকাশ
মে ২০১০

স্বত্ব
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

প্রচ্ছদ
অভ্র ভট্টাচার্য

অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাস
ফজলে রাব্বি সাকিল
মোঃ সাইফুল হাসান

ISBN 978-984-8946-04-6

মূল্য
২৮০ টাকা
USD 20

মুদ্রক
এনরিচ প্রিন্টার্স
৪১/৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

C12010_3BAN_MPA

গবেষকবৃন্দ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বর্তমান গ্রন্থের প্রতিবেদনগুলো প্রস্তুত করা হয়।

সিপিডির ডিষ্টিংগুইস্‌ড্ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এই গ্রন্থে উলেখযোগ্য পথনির্দেশনা দিয়েছেন এবং বিভিন্ন অধ্যায়ে উলেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

সিপিডির যে সকল সহকর্মীবৃন্দ আইআরবিডি ২০০৮০৯ অর্থ বছরের প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছেন, তারা হলেন ড. উত্তম দেব, প্রধান, গবেষণা বিভাগ; ড. ফাহমিদা খাতুন, অতিরিক্ত পরিচালক, গবেষণা বিভাগ; ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো; কাজী মাহমুদুর রহমান, সিনিয়র গবেষণা সহযোগী; সৈয়দ সাইফুদ্দিন হোসেন, সিনিয়র গবেষণা সহযোগী; মোঃ আশিক ইকবাল, সিনিয়র গবেষণা সহযোগী; তৌফিকুল ইসলাম খান, সিনিয়র গবেষণা সহযোগী; এবং আসিফ আনোয়ার, সিনিয়র গবেষণা সহযোগী।

গবেষণাকার্যের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহায়তা প্রদান করেছেন, তারা হলেন নাফিসা খালেদ, সিনিয়র গবেষণা সহযোগী; সুপর্ণা হাসান, সিনিয়র গবেষণা সহযোগী; হাসানুজ্জামান, সিনিয়র গবেষণা সহযোগী; জিসান রহমান, সিনিয়র গবেষণা সহযোগী; সুবীর কান্তি বৈরাগী, গবেষণা সহযোগী; মোঃ তারিকুর রহমান, গবেষণা সহযোগী; তাপস কুমার পাল, গবেষণা সহযোগী; মোহাম্মদ আল আমীন, গবেষণা সহযোগী; আশিকুন নবী, গবেষণা সহযোগী; শারমীন চৌধুরী, গবেষণা সহযোগী; নূসরাত জাহান, গবেষণা সহযোগী; কিশোর কুমার বসাক, গবেষণা সহযোগী; মেজবাহুল গোলাম আহমদ, প্রোগ্রাম সহযোগী; আফরিন ইসলাম, প্রোগ্রাম সহযোগী; কানিজ তাসনিমা, প্রোগ্রাম সহযোগী; রোমানা ইসলাম, প্রোগ্রাম সহযোগী; নাহিতা নিশমিন, প্রোগ্রাম সহযোগী; সৌর দাশগুপ্ত, রিসার্চ ইন্টার্ন; বাসটিয়ান টরনেস, রিসার্চ ইন্টার্ন; এবং লরা জেপসন, রিসার্চ ইন্টার্ন।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় অধ্যাপক রেহমান সোবহানের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিডি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অংশীদারিত্ব ও জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্য পূরণে সিপিডি গবেষণা, বিশেষণ ও সংলাপ আয়োজন সহ বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে আসছে।

সিপিডি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে নিয়মিত সংলাপ পরিচালনা করে থাকে যার মাধ্যমে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে মুক্ত আলোচনার সপক্ষে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সিপিডি সবসময় সচেষ্ট। সিপিডির লক্ষ্য হলো এ ধরনের সংলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেসব নীতিমালার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেগুলোর পক্ষে ব্যাপক জনমত ও সমর্থন গড়ে তোলা। বিগত সময়ে এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সিপিডি একটি নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে ও সুশীল সমাজের ব্যাপক আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সংলাপ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব ও তথ্যগত ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সিপিডি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। সিপিডির প্রধান গবেষণা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: সামষ্টিক অর্থনীতি পর্যালোচনা; দারিদ্র্য, অসমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার; কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন; বাণিজ্য, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিশ্বায়ন; বিনিয়োগের প্রসার এবং শিল্প কারখানা ও অবকাঠামোর উন্নয়ন; জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ; মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা; এবং উন্নয়নের জন্য সুশাসন, নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠান।

উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থসংশিষ্ট বিষয়সমূহ নিয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামের আলোচনায় সিপিডি নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া এসব বিষয়ে কর্মরত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সিপিডি যৌথভাবে সংলাপ আয়োজনও করে থাকে। সিপিডি প্রকাশিত বই, মনোগ্রাফ, সাময়িক পত্র (অকেশনাল পেপার), সংলাপ প্রতিবেদন এবং সংক্ষিপ্ত নীতি পরামর্শপত্রের সংখ্যা ইতিমধ্যে ৩৬০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এসব প্রকাশনা সিপিডির নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র এবং বাংলাদেশের নির্বাচিত কিছু বইয়ের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। সিপিডির প্রকাশনা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি নিয়মিতভাবে সিপিডির ওয়েবসাইটে (www.cpd.org.bd) প্রকাশ করা হয়।

আইআরবিডি পরিচিতি

বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা (আইআরবিডি) প্রকল্পটি সিপিডির কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আইআরবিডি কর্মসূচির আওতায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব নীতিমালা গৃহীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতি পর্যায়ে তার ফলাফল কী দাঁড়াচ্ছে, সিপিডি তা সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। সরকারি বার্ষিক মূল্যায়ন ও দাতা সংস্থার বাৎসরিক প্রতিবেদনের পাশাপাশি সুশীল সমাজ কর্তৃক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীন মূল্যায়ন হিসেবে আইআরবিডি ইতিমধ্যে ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে। অর্থনীতির মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন, বাজেটের বিশেষণ, প্রধান প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি আইআরবিডি প্রকল্পের অধীনে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের কৌশল নির্ধারণের জন্যও গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিও আইআরবিডি প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণাকর্মের ভিত্তিতে প্রণীত।

মুখবন্ধ

“বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনা ২০০৮০৯ ” শীর্ষক বর্তমান গ্রন্থটি সিপিডির ব্যাপক পরিচিত অন্যতম গবেষণা প্রকল্প *বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনার* অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে, যে কার্যক্রমটি আইআরবিডি নামে সমধিক পরিচিত। সিপিডির গবেষণা কর্মকাণ্ডের সাথে যারা ওয়াকিবহাল, তারা হয়তো জানবেন ১৯৯৫ সাল থেকে এ প্রকাশনার মাধ্যমে সিপিডি প্রতি বছর বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান নির্দেশকসমূহের গতি-প্রকৃতি ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করে থাকে। এ হিসেবে বর্তমান প্রকাশনাটি আইআরবিডি কর্মসূচির অধীনে উনিশতম প্রকশনা।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের সার্বিক নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় ভাবনাচিন্তার খোরাক যোগানো এবং নীতি ও সংস্কার কার্যক্রমের গঠনমূলক সমালোচনাকে উৎসাহিত করার প্রত্যাশাকে সামনে রেখে সিপিডির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান আইআরবিডি গবেষণা কর্মসূচি শুরু করেন। বর্তমান প্রকাশনাটিতে জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০০৯ সময়কালে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং সিপিডি আয়োজিত এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সংলাপসমূহে প্রদত্ত স্বার্থ সংশিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ২০০৮০৯ অর্থবছরের সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকসমূহের গতিপ্রকৃতি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে এবং এই চলমান ধারার কার্যকারণসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০০৮০৯ অর্থবছরের একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে এ অর্থবছরে আর্থিক ব্যবস্থাপনা দায়ভার তত্ত্বাবধায়ক এবং নবনির্বাচিত উভয় সরকারের ওপরেই বর্তেছিল। তাছাড়া এ বছর বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধমান হারে সংশেষিত বাংলাদেশ অর্থনীতির ওপর জোরালো প্রভাব ফেলেছিল। এ অধ্যায়ের আলোচনায় অর্থনীতির ওপর উলেখিত বিভিন্ন প্রক্রিয়াসমূহের অভিঘাত আলোচিত হয়েছে এবং এর প্রভাবে দেশের অর্থনীতিতে যে রূপান্তর ঘটেছে তার ফলাফলসমূহ নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। পরবর্তী ২০০৯১০ অর্থবছরে নবনির্বাচিত সরকারের সামনে সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্ভুত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহও এ অধ্যায়ে বিশেষিত হয়েছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ২০০৯১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট বিশেষণ। পূর্বেকার বছরগুলোর মতো এবারও সিপিডি বাজেটে প্রস্তাবিত বিভিন্ন দিক, যেমন সম্পদের ব্যবহার, শুল্ক কাঠামো পুনর্বিন্যাস, বিনিয়োগ সুবিধা, খাতভিত্তিক বরাদ্দ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশদ বিশেষণ করেছে। এ পর্যালোচনায় বাজেটে পরবর্তী অর্থবছরের সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন প্রণোদনা ও আর্থিক বরাদ্দের বিষয়ে মন্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০০৯১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট উপস্থাপনের পূর্বে সিপিডি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট সংক্রান্ত কিছু প্রস্তাব প্রস্তুত করে। এ সুপারিশগুলোর মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন, শিল্প খাতের উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো, সামাজিক খাত, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) ইত্যাদি বিষয়ে সিপিডি তার মতামত উপস্থাপিত করেছিল। বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে এই প্রস্তাবগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।

২০০৯১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামষ্টিক অর্থনীতি পরিচালনার দিক থেকে সরকারকে সম্ভাব্য যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে সেগুলোকে তুলে ধরতে সিপিডি আগস্ট ২০০৯এ একটি গবেষণা পরিচালনা করে। গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত "২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন: গুরুত্বপূর্ণ করণীয়সমূহ" শীর্ষক প্রতিবেদনটিতে সেগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে – প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা, বাজেট বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, অভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যবহার, আন্তর্জাতিক সম্পদের অন্তর্মুখী প্রবাহ, এডিপি বাস্তবায়ন, পিপিপি এবং বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন।

"মুদ্রানীতি সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবৃতি (জুলাই ২০০৯): একটি বিশেষণ" শীর্ষক লেখাটি এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে জুলাই ২০০৯এ ঘোষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিশদভাবে বিশেষণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ সহ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান আইআরবিডি গ্রন্থে মূল অধ্যায়ের সাথে আরও চারটি সংযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দুটি হলো ঢাকা ও চট্টগ্রামে যথাক্রমে ২০ এবং ১৬ জুন, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত সংলাপের ওপর প্রতিবেদন। ১২ আগস্ট ২০০৯ তারিখে আয়োজিত "২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ" শীর্ষক সংলাপ প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তৃতীয় সংযুক্তিতে। তিনটি সংলাপে আলোচিত বিষয়সমূহ ও মতামতের প্রতিফলন রয়েছে এ সংযুক্তিগুলোতে। সবশেষে চতুর্থ সংযুক্তিতে পাঠকদের সুবিধার্থে ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত অর্থনৈতিক নীতিমালা ও ঘটনাপ্রবাহ সম্বলিত অর্থনীতি বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন তাদের সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত প্রয়াসের জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে সিপিডির ডিষ্টিংগুইস্ড্ ফেলো এবং সিপিডিতে আমার পূর্বসুরী নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের অবদানের কথা বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত তার ও তার সহকর্মীদের প্রণীত দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের কথা এখানে উলেখ করতে চাই।

সিপিডি আইআরবিডি গবেষকবৃন্দের প্রত্যেকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নিরলসভাবে কাজ করেছেন; বিভিন্ন অধ্যায়ের উচ্চ গুণগতমান এর প্রমাণ বহন করে। পূর্বের মতো এই গ্রন্থটিতেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষক, শিক্ষক, নেতৃস্থানীয় নীতিনির্ধারক, রাজনৈতিক নেতা এবং সংসদ সদস্য, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্যবসায়ী নেতা এবং তৃণমূল ও সুশীল সমাজ সংশিষ্ট প্রতিনিধিগণ তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ, মতামত ও পরামর্শ এবং সমালোচনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তাদের সকলকে সিপিডির পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সিপিডি তার গবেষণাকার্যে ব্যবহৃত তথ্যউপাত্তের জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থা, যেমন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, পরিকল্পনা কমিশন, ট্যারিফ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং পেট্রোবাংলার সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে অব্যাহতভাবে আন্তরিক সহায়তা পেয়েছে। সিপিডি পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ সুযোগে সিপিডির কার্যক্রমে অব্যাহত সমর্থন ও সহায়তা দেওয়ার জন্য দেশের সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যমকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আইআরবিডি কার্যক্রমের আওতায় আয়োজিত সকল সংলাপ, কর্মশালা ও মতবিনিময় সভা সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সিপিডির ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ এবং তার সকল সহকর্মীবৃন্দকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ প্রসঙ্গে গবেষণা ও সংলাপ কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় প্রদান সহায়তা দানের জন্য আমি প্রশাসন ও হিসাবরক্ষণ বিভাগে আমার সকল সহকর্মীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলা ভাষায় বইটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ ও সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্য সিপিডির গবেষণা বিভাগের প্রধান ড. উত্তম দেবের অবদান আমি বিশেষভাবে উলেখ করতে চাই। এক্ষেত্রে তাকে সুযোগ্য সহায়তা দিয়েছেন সুবীর কান্তি বৈরাগী এবং কানিজ তাসনিমা। বাংলায় গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুবাদে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য আইআরবিডি টিম যাদের নাম সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে, তারা হলেন – হাসান ইমাম, সিনিয়র রিপোর্টার, প্রথম আলো; এ টি এম ইসহাক, সিনিয়র সাব এডিটর, প্রথম আলো; আসজাদুল কিবরিয়া, ডেপুটি বিজনেস এডিটর, প্রথম আলো; শওকত হোসেন মাসুম, বিজনেস এডিটর, প্রথম আলো; জাকির হোসেন, স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, দৈনিক যুগান্তর; এবং দেলোয়ার হোসেন, সিনিয়র সহকারী প্রধান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও বিন্যাস পরিকল্পনা করেছেন অভ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশনার ক্ষেত্রে অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাসের দায়িত্বে ছিলেন ফজলে রাব্বি সাকিল এবং মোঃ সাইফুল হাসান। হামিদুল হক মন্ডল এবং এ এইচ এম আশরাফুজ্জামান অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ওয়ার্ড প্রসেসিং এবং টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সবশেষে আইআরবিডি টিমের পক্ষ থেকে আমি সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে তার সার্বিক দিকনির্দেশনার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অধ্যাপক সোবহান এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত গবেষণাকর্মের পেছনে সবসময়ই একটি বড় প্রেরণা হিসেবে কাজ করেন। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, অধ্যাপক রেহমান সোবহান দেড় দশক আগে নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় সুশীল সমাজকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত করতে যে উদ্যোগের সূচনা করেছিলেন, এই প্রকাশনার মাধ্যমে সে পথে আরও একটি মাইলফলক যুক্ত করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

মোস্তাফিজুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

মে ২০১০

সূচি

মুখবন্ধ *পাঁচ*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার *ছয়*

অধ্যায় ১

২০০৮০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশেষণ ১

অধ্যায় ২

২০০৯১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট বিশেষণ ৮৫

অধ্যায় ৩

২০০৯১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট: সিপিডির সুপারিশমালা ১৩০

অধ্যায় ৪

২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন: গুরুত্বপূর্ণ করণীয়সমূহ ১৫৬

অধ্যায় ৫

মুদ্রানীতি সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবৃতি (জুলাই ২০০৯): একটি বিশেষণ ১৯৪

সংযুক্তি ১

বাজেট সংলাপ ২০০৯: ঢাকা ২১০

সংযুক্তি ২

বাজেট সংলাপ ২০০৯: চট্টগ্রাম ২৩৬

সংযুক্তি ৩

২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ২৫৪

সংযুক্তি ৪

২০০৯ সালের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ২৭২

সারণি, চিত্র এবং বক্স সূত্র

সারণি সূত্র

সারণি ১.১	:	আমদানি পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি	৯
সারণি ১.২	:	স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব বোর্ডের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	১০
সারণি ১.৩	:	এনবিআরবহির্ভূত কর এবং করবহির্ভূত রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি	১১
সারণি ১.৪	:	২০০৮০৯ অর্থবছরে শীর্ষ পাঁচ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন কার্যক্রম	১৩
সারণি ১.৫	:	বাজেট ঘাটতি এবং অর্থায়নের উৎসসমূহ	১৪
সারণি ১.৬	:	সরকারি দীর্ঘমেয়াদি ট্রেজারি বিল/বন্ডের ভারিত গড় সুদের হার এবং মূল্যস্ফীতি	২১
সারণি ১.৭	:	আর্থিক খাতের বিভিন্ন নির্দেশকসমূহের পরিবর্তন	২২
সারণি ১.৮	:	২০০৮০৯ অর্থবছরে বোরো উৎপাদন খরচ এবং আয়	২৭
সারণি ১.৯	:	বাংলাদেশে সার সরবরাহ	২৮
সারণি ১.১০	:	ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে উৎপাদনের ওঠানামা	৩২
সারণি ১.১১	:	সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ	৩৩
সারণি ১.১২	:	স্থিরমূল্যে সামষ্টিক জাতীয় উৎপাদন	৩৪
সারণি ১.১৩	:	ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে ঋণের পরিস্থিতি	৩৬
সারণি ১.১৪	:	অপ্রচলিত খাতের যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তির হারের পরিবর্তন	৩৮
সারণি ১.১৫	:	বৈশ্বিক মন্দা ঘনীভূত হলে সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের মতামত	৪১
সারণি ১.১৬	:	রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগ	৪২
সারণি ১.১৭	:	বিনিয়োগ বোর্ডে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বিনিয়োগ নিবন্ধন	৪৩
সারণি ১.১৮	:	বিদেশি বিনিয়োগ আসা ও বিনিয়োগকারীদের আয় প্রেরণ পরিস্থিতি	৪৩
সারণি ১.১৯	:	খাতওয়ারি বিদেশি বিনিয়োগ আগমন পরিস্থিতি	৪৪
সারণি ১.২০	:	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে গণপ্রস্তাবের অবস্থা	৪৭
সারণি ১.২১	:	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া	৫০
সারণি ১.২২	:	বিভিন্ন বছরে গ্যাস উৎপাদন	৫৩
সারণি ১.২৩	:	বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের ত্রৈমাসিক প্রবৃদ্ধি	৫৬
সারণি ১.২৪	:	বাণিজ্যের সাধারণ শর্ত এবং বাণিজ্য শর্ত: বস্ত্র খাত বিবেচনায়	৫৯
সারণি ১.২৫	:	রপ্তানিমূল্যের ক্রয়ক্ষমতার অবনতি	৬০
সারণি ১.২৬	:	ঋণপত্র খোলা এবং নিষ্পত্তি: অর্থবছর ২০০৭০৮ বনাম অর্থবছর ২০০৮০৯	৬৪
সারণি ১.২৭	:	অভিবাসী শ্রমিকদের শ্রেণীবিন্যাস	৬৬
সারণি ১.২৮	:	বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য	৬৭
সারণি ১.২৯	:	বৈদেশিক উৎস থেকে সরকারের ঋণ ও অনুদান সাহায্য গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি	৬৯
সারণি ১.৩০	:	২০০৮০৯ অর্থবছরে খাতওয়ারি পরিকল্পিত বরাদ্দ এবং ব্যয়	৭০
সারণি ১.৩১	:	কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর অবস্থা (জুন ২০০৯ পর্যন্ত)	৭১
সারণি ১.৩২	:	২০০৮০৯ অর্থবছরে শিক্ষা খাতের প্রধান প্রকল্পসমূহের অবস্থা	৭২
সারণি ১.৩৩	:	২০০৮০৯ অর্থবছরে চ্যানেলওয়ারি খাদ্যশস্য বিতরণ	৭৩
সারণি ১.৩৪	:	খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণসমূহ	৭৫
সারণি ১.৩৫	:	২০০৯১০ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধিবিনিয়োগ কাঠামো	৭৬
সারণি ১.৩৬	:	বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাস: অর্থবছর ২০০৯১০ থেকে অর্থবছর ২০১১১২	৭৭

সারণি ১.৩৭	:	বাংলাদেশের শ্রমবাজার ও কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রক্ষেপণ	৭৯
সারণি ১.৩৮	:	বিভিন্ন খাতে উননিয়োজন এবং সাপ্তাহিক শ্রমঘণ্টা	৭৯
সারণি ২.১	:	গত দুই দশকে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি	৮৮
সারণি ২.২	:	সরকারি ব্যয়ের খাতভিত্তিক বরাদ্দ	৯১
সারণি ২.৩	:	২০০৯১০ অর্থবছরে রাজস্ব ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা	৯২
সারণি ২.৪	:	রাজস্ব ব্যয় প্রবৃদ্ধিতে উৎসসমূহের অবদান: অর্থবছর ২০০৮০৯ ও অর্থবছর ২০০৯১০	৯২
সারণি ২.৫	:	২০০৯১০ অর্থবছরের এডিপিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমূহ	৯৪
সারণি ২.৬	:	২০০৮০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেটের ঘাটতি অর্থায়ন	৯৫
সারণি ২.৭	:	বিভিন্ন অর্থবছরে আয়কর স্তরের বিন্যাস	৯৭
সারণি ২.৮	:	শুল্ক কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	১০০
সারণি ২.৯	:	২০০৮০৯ এবং ২০০৯১০ অর্থবছরে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ	১১০
সারণি ২.১০	:	কুটির শিল্পের জন্য ভ্যাট অব্যাহতি	১১২
সারণি ২.১১	:	ডিএসই ভিশন ২০১৩ (৫বছর মেয়াদি পরিকল্পনা)	১১৪
সারণি ২.১২	:	বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহের অবস্থা: ২০১০২০১২	১১৮
সারণি ২.১৩	:	জেন্ডার সমতা ও ক্ষমতায়নের আওতায় গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	১২১
সারণি ২.১৪	:	২০০৯১০ অর্থবছরে জেন্ডার বিষয়ক নতুন উদ্যোগসমূহ	১২২
সারণি ২.১৫	:	নারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থান সুবিধা	১২৫
সারণি ৩.১	:	বাজেটের রাজস্ব কাঠামো: অর্থবছর ২০০৭০৮ থেকে অর্থবছর ২০০৯১০	১৩১
সারণি ৪.১	:	খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার প্রক্ষেপণ	১৫৮
সারণি ৪.২	:	২০০৯১০ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধিবিনি য়োগ কাঠামো	১৫৯
সারণি ৪.৩	:	বাংলাদেশে রাজস্ব সংগ্রহের নির্ধারকসমূহ	১৬০
সারণি ৪.৪	:	রাজস্ব আদায়ে গত দুই দশকের গতিধারা	১৬২
সারণি ৪.৫	:	আয়কর প্রবৃদ্ধিতে গত দশকের গতিধারা	১৬৫
সারণি ৪.৬	:	ভ্যাট আদায়ে প্রবৃদ্ধির প্রবণতা: অর্থবছর ১৯৯২৯৩ থেকে অর্থবছর ২০০৯১০	১৬৬
সারণি ৪.৭	:	আমদানি শুল্ক আদায়ে প্রবৃদ্ধির প্রবণতা: অর্থবছর ১৯৯২৯৩ থেকে অর্থবছর ২০০৯১০	১৬৭
সারণি ৪.৮	:	সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য বর্তমান ও প্রস্তাবিত (মূল) বেতন কাঠামো	১৭৩
সারণি ৪.৯	:	মোট রাজস্ব ব্যয়ে সুদ পরিশোধের অংশ: অর্থবছর ১৯৯৬৯৭ থেকে অর্থবছর ২০০৯১০	১৭৬
সারণি ৪.১০	:	ঋণ পরিশোধ দায় প্রবণতা: অর্থবছর ১৯৯৯০০ থেকে অর্থবছর ২০০৭০৮	১৭৬
সারণি ৪.১১	:	এডিপি বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমস্যাগুলোর শ্রেণীবিন্যাস	১৮০
সারণি ৪.১২	:	বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের প্রবণতা: অর্থবছর ১৯৯১৯২ থেকে অর্থবছর ২০০৯১০	১৮৮
সারণি ৪.১৩	:	২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেট ফলাফলের রূপরেখা	১৯০
সারণি ৫.১	:	মুদ্রানীতি সংক্রান্ত কৌশলসমূহের অবস্থা	২০১
সারণি ৫.২	:	মুদ্রানীতির সূচকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	২০২
সারণি ৫.৩	:	ব্যাপক মুদ্রা এবং এর উপাদানগুলোর অস্থিতিশীলতা	২০৪
সারণি ৫.৪	:	বাংলাদেশে মেয়াদি ঋণের অবস্থা	২০৬

চিত্র সূত্র

চিত্র ১.১	:	এশীয় দেশসমূহের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	৩
চিত্র ১.২	:	বর্ধিত প্রবৃদ্ধির উৎসসমূহ	৫
চিত্র ১.৩	:	জিডিপির অংশ হিসেবে সঞ্চয় হার	৬
চিত্র ১.৪	:	জিডিপির অংশ হিসেবে বিনিয়োগ	৭
চিত্র ১.৫	:	রাজস্ব ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি: অর্থবছর ২০০৭০৮ ও অর্থ বছর ২০০৮০৯	১১
চিত্র ১.৬	:	এডিপি বাস্তবায়নের গতিপ্রকৃতি	১২
চিত্র ১.৭	:	ঘাটতি অর্থায়নের কাঠামো: অর্থবছর ২০০৭০৮ ও অর্থ বছর ২০০৮০৯	১৫
চিত্র ১.৮	:	মুদ্রাস্ফীতির হার	১৬
চিত্র ১.৯	:	সরকারি ঋণ	১৭
চিত্র ১.১০	:	অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৭
চিত্র ১.১১	:	কৃষি ঋণ	১৮
চিত্র ১.১২	:	শিল্প ঋণ	১৮
চিত্র ১.১৩	:	অতিরিক্ত তারল্যের প্রবণতা	১৯
চিত্র ১.১৪	:	ঋণ ও আমানতের সুদ হারের প্রবণতা	২০
চিত্র ১.১৫	:	প্রকৃত সুদের হার	২১
চিত্র ১.১৬	:	বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার: জুলাই ২০০৬ – জুন ২০০৯	২৩
চিত্র ১.১৭	:	ডলারের বিপরীতে কয়েকটি আঞ্চলিক মুদ্রার গতিপ্রকৃতি	২৪
চিত্র ১.১৮	:	প্রকৃত ও নমনীয় কার্যকর বিনিময় হার	২৪
চিত্র ১.১৯	:	২০০৮০৯ অর্থ বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রাক্কলন	২৬
চিত্র ১.২০	:	আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম: জুলাই ২০০৫ – জুন ২০০৯	২৮
চিত্র ১.২১	:	আন্তর্জাতিক বাজারে গুঁড়ো দুধের দাম: জুলাই ২০০৬ – জুন ২০০৯	২৯
চিত্র ১.২২	:	বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের কোয়ান্টাম সূচক (কিউআইপি)	৩১
চিত্র ১.২৩	:	কিউআইপি অনুসারে ২০০৭০৮ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৮০৯ অর্থ বছরে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পোৎপাদনের পরিবর্তন	৩৩
চিত্র ১.২৪	:	শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণের নীট বিতরণ	৩৫
চিত্র ১.২৫	:	কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলা ও নিস্পত্তির হারের পরিবর্তন: অর্থবছর ২০০৭০৮ ও অর্থ বছর ২০০৮০৯	৩৭
চিত্র ১.২৬	:	মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলা ও নিস্পত্তির হারের পরিবর্তন: অর্থবছর ২০০৭০৮ ও অর্থ বছর ২০০৮০৯	৩৮
চিত্র ১.২৭	:	বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাত সম্পর্কে সংশিষ্ট খাতের উদ্যোক্তাদের অভিমত	৩৯
চিত্র ১.২৮	:	২০০৭০৮ অর্থ বছর এবং ২০০৮০৯ অর্থ বছরে নিজ নিজ উৎপাদন সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অভিমত	৪০
চিত্র ১.২৯	:	২০০৭০৮ অর্থ বছর এবং ২০০৮০৯ অর্থ বছরে বিনিয়োগ সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অভিমত	৪০
চিত্র ১.৩০	:	বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং পোর্টফোলিও বিনিয়োগের মাসিক গতিপ্রকৃতি	৪১
চিত্র ১.৩১	:	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার মূল্য সূচকের গতিপ্রকৃতি	৪৫
চিত্র ১.৩২	:	পুঁজিবাজারে পোর্টফোলিও বিনিয়োগের মাসিক গতিপ্রকৃতি	৪৫
চিত্র ১.৩৩	:	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে বাজার মূলধনের গতিধারা	৪৬
চিত্র ১.৩৪	:	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মূল্যআয় অনুপা তের মাসিক গতিধারা	৪৬
চিত্র ১.৩৫	:	স্থাপিত ক্ষমতা, উৎপাদন ক্ষমতা, বিদ্যুৎ চাহিদা ও চাহিদাসরবরাহ পার্থক্য	৫২
চিত্র ১.৩৬	:	বিভিন্ন খাতে গ্যাসের ব্যবহার	৫৪
চিত্র ১.৩৭	:	সরকারি ও বেসরকারি খাতে গ্যাসের উৎপাদন	৫৪
চিত্র ১.৩৮	:	বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পণ্যের রপ্তানি: অর্থবছর ২০০৭০৮ ও অর্থ বছর ২০০৮০৯	৫৫
চিত্র ১.৩৯	:	কতিপয় বৈশ্বিক খুচরা বিপণি বিতানের শেয়ার দর	৫৭

চিত্র ১.৪০	:	বিশ্ব এবং উলেখযোগ্য কতিপয় দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানি: অর্থবছর ২০০৭০৮ ও অর্থ বছর ২০০৮০৯	৫৭
চিত্র ১.৪১	:	নির্বাচিত কিছু পণ্যের আমদানি: অর্থবছর ২০০৭০৮ ও অর্থ বছর ২০০৮০৯	৬২
চিত্র ১.৪২	:	দেশভিত্তিক প্রবাসী আয়ের প্রবাহ	৬৫
চিত্র ১.৪৩	:	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং সমতুল্য মাসের আমদানি	৬৮
চিত্র ২.১	:	দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের করজিডিপি এবং রাজ স্বজিডিপি অনুপাত: অর্থবছর ২০০৮০৯	৮৭
চিত্র ২.২	:	রাজস্ব প্রবৃদ্ধিতে উৎসসমূহের বর্ধিত অবদান: অর্থবছর ২০০৯১০	৮৮
চিত্র ২.৩	:	অতিরিক্ত এনবিআর রাজস্বে বিভিন্ন উৎসের অবদান: অর্থবছর ২০০৯১০	৮৯
চিত্র ২.৪	:	ঘাটতি অর্থায়নের উৎসসমূহ	৯৬
চিত্র ২.৫	:	স্থানীয় অর্থায়নের উৎসসমূহ	৯৬
চিত্র ২.৬	:	কৃষি ও সংশিষ্ট খাতে মোট বাজেট বরাদ্দ (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	১০৫
চিত্র ২.৭	:	আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দর: জুলাই ২০০৬ – এপ্রিল ২০০৯	১০৫
চিত্র ২.৮	:	বিভিন্ন অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণের গতিধারা	১০৭
চিত্র ২.৯	:	নির্ধারিত কিছু শিল্পে উৎপাদনের পরিবর্তন: অর্থবছর ২০০৭০৮ ও অর্থবছর ২০০৮০৯	১০৮
চিত্র ২.১০	:	কয়েকটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ঋণ স্থিতি এবং শ্রেণীকৃত ঋণের অবস্থা	১১৫
চিত্র ২.১১	:	২০০৯ সালের মধ্যে সমাপ্য বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্পগুলোতে বিনিয়োগ	১১৭
চিত্র ৪.১	:	বিনিয়োগপ্রবৃদ্ধিসরকারি অর্থায়ন চক্র	১৬১
চিত্র ৪.২	:	উৎসভিত্তিক রাজস্ব আদায়ে বর্ধিত অবদান: অর্থবছর ২০০৮০৯ ও অর্থবছর ২০০৯১০	১৬২
চিত্র ৪.৩	:	দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের করজিডিপি এবং রাজ স্বজিডিপি: অর্থ বছর ২০০৮০৯	১৬৩
চিত্র ৪.৪	:	আমদানি শুল্ক আদায়ে ধীর গতি: অর্থবছর ২০০৮০৯	১৬৭
চিত্র ৪.৫	:	মোট বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প সহায়তার অংশ: অর্থবছর ১৯৯৯০০ থেকে ২০০৮০৯	১৭১
চিত্র ৪.৬	:	বৈদেশিক সহায়তার অংশ হিসেবে অনুদান প্রবাহ: অর্থবছর ১৯৯৭৯৮ থেকে অর্থবছর ২০০৭০৮	১৭২
চিত্র ৪.৭	:	জিডিপির অংশ হিসেবে ঋণ পরিস্থিতি: অর্থবছর ১৯৯৯০০ থেকে অর্থবছর ২০০৮০৯	১৭৫
চিত্র ৪.৮	:	জিডিপির অংশ হিসেবে মূল এবং প্রকৃত এডিপি: অর্থবছর ১৯৯৯০০ থেকে অর্থবছর ২০০৮০৯	১৭৮
চিত্র ৪.৯	:	প্রকৃত এডিপি এবং রাজস্ব আদায়ে পরিবর্তন প্রবণতা: অর্থবছর ২০০০০১ থেকে অর্থবছর ২০০৮০৯	১৭৯
চিত্র ৪.১০	:	ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ উৎসের অংশ	১৮৯
চিত্র ৫.১	:	সাধারণ, খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির গতিপ্রকৃতি: জুলাই ২০০৬ – মে ২০০৯	১৯৮
চিত্র ৫.২	:	বিশ্ব বাজারে পণ্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি	১৯৮
চিত্র ৫.৩	:	আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি	১৯৯
চিত্র ৫.৪	:	সুদ হার বিস্তার	২০৭

বক্স সূত্র

বক্স ১.১: হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি হ্রাস ৫৮

বক্স ৪.১: বহুপক্ষীয় এবং দ্বিপক্ষীয় দাতাদের সাম্প্রতিক কিছু বক্তব্য ১৭২

অধ্যায় ১

২০০৮০৯ অর্থ বছরে
বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশেষণ

১.১ সূচনা

যেকোন বিচারেই ২০০৮০৯ অর্থ বছর বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের জন্য ছিল বেশ কঠিন একটি বছর। অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল সদ্য নির্বাচিত সরকারের (বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার)। ২০০৮ সালে ঘটে যাওয়া বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট, সংকটের বিভিন্ন দিক এবং অন্যান্য খাতে তার সংশিষ্টতা বিভিন্নভাবে অর্থনীতির গতিকে প্রভাবিত করেছে। ২০০৮০৯ অর্থবছরের প্রথম দিকে দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি ছিল, সংকট প্রকট হওয়ার সাথে সাথে তা কমতে থাকে। এটা বলা যেতে পারে যে, সার্বিকভাবে মোটামুটি অনুকূল পরিবেশে বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির চাপ ছিল তুলনামূলকভাবে কম, প্রবাসী আয় এবং রপ্তানি আয়ও ছিল সন্তোষজনক পর্যায়ে। তারপরও অর্থবছরের বাকি অর্ধেক সময়ে অর্থনীতিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সরকারকে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। একদিকে বিনিয়োগের শথগতি, রপ্তানি আয়ে ভাটা, বিদেশগামী শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া, বোরোর বাম্পার ফলন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার মতো জরুরি বিষয়গুলোকে সামাল দিতে সরকারকে মনোযোগ দিতে হয়েছে। বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং অর্থনীতিতে তার কী প্রভাব পড়তে পারে সে সম্পর্কে নীতিপরামর্শ দেওয়ার জন্য 'গোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়েছিল। টাস্কফোর্সের সুপারিশ অনুযায়ী ২০০৯ সালের মার্চ মাসে প্রণোদনা তহবিল ঘোষণা করা হয়। ২০০৯১০ অর্থ বছরের জন্য প্রণীত বাজেটেও অর্থনৈতিক সংকটের সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবেলা করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অর্থনৈতিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাব থেকে দেশীয় অর্থনীতিকে রক্ষা করা ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জের কাজ। প্রথমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং পরে বর্তমান সরকারকে এ জন্য অনেক চড়াইউৎরাই পার হ তে হয়েছে। অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছে, অর্থনীতি কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, এবং অর্থনীতি যখন ২০০৯১০ অর্থ বছরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তখন কোন কোন বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে তা অধ্যায়ের পরবর্তী অংশগুলোতে আলোচনা করা হলো।

১.২ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনীতির প্রারম্ভিক পরিস্থিতি

ক্রমাগত প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ২০০৭০৮ অর্থ বছরের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে বেশ জটিল করে তুলেছিল। সিডরের মতো বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় এবং পর পর দুটি বড়

ধরনের বন্যার কারণে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে। বিষয়টি আরও শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছায়, যখন বাংলাদেশের তিনটি আমদানি দ্রব্য – খাদ্য, জ্বালানি তেল ও সারের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে খুব বেড়ে যায়। বিশ্ববাজারে দ্রব্যসামগ্রীর উচ্চমূল্য স্থানীয় বাজারে প্রভাব ফেলায় তা উদ্বেগের বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে খাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়ায় খাদ্যমূল্য আগেই বেড়ে গিয়েছিল। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ২০০৭ সালের জুন মাসের ৭.৪৯ শতাংশ থেকে ২০০৮ সালের জুন মাসে ৯.৯৪ শতাংশে পৌঁছায়।

এতসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতি যথেষ্ট সহনক্ষমতা প্রদর্শন করে। তাই ২০০৭৷০৮ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.১৯ শতাংশ। বোরোর বাম্পার ফলনের (খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.০৬ শতাংশ) কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বছরেও এ ধরনের আশাব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। ২০০৭৷০৮ অর্থবছরে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯ শতাংশ, ২০০৬৷০৭ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির তুলনায় যা ছিল ৩.১ শতাংশীয় পয়েন্ট কম। দেশজ সঞ্চয়ে শ্লথগতি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা ২০০৭৷০৮ অর্থবছরে ২০০৬৷০৭ অর্থবছরের মতো জিডিপির ২০.৩৫ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। অন্যদিকে জিডিপিতে মোট বিনিয়োগের হার টানা দ্বিতীয় বছর কমে যায়। ২০০৬৷০৭ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ জিডিপির ২৪.৫ শতাংশের তুলনায় ২০০৭৷০৮ অর্থবছরে কমে দাঁড়ায় ২৪.২ শতাংশে। ক্রমবর্ধমান মূলধন-উৎপাদন অনুপাত (আইসিওআর বা আইকর) ২০০৬৷০৭ সালের ৩.৮ শতাংশের তুলনায় সামান্য বেড়ে ২০০৭৷০৮ অর্থবছরে দাঁড়ায় ৩.৯ শতাংশে, অর্থাৎ পুঁজির উৎপাদনশীলতা কিছুটা কমে যায়। স্থানীয় বিনিয়োগ চাহিদাও কম ছিল, আবার সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগও ১৮ শতাংশ কমে যায়।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপি বাস্তবায়নের হার ধীর হওয়ার কারণে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এডিপি বাস্তবায়নে অবনতি পরিলক্ষিত হয় এবং ২০০৭৷০৮ অর্থবছর ছিল এদিক থেকে সবচেয়ে খারাপ বছর। ২০০৭৷০৮ অর্থবছরে প্রকৃত এডিপি বাস্তবায়নের হার ছিল জিডিপির ৩.৪ শতাংশ। একই সময়ে অপর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহ দেশের বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে অগ্রগতির পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

অন্যদিকে, ২০০৭৷০৮ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সফলতা দেখা গেছে। ২০০৬৷০৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৭৷০৮ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় ২৪.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ২০০৭৷০৮ অর্থবছরে প্রকৃত রাজস্ব আয় ছিল লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১.৬ শতাংশ বেশি। ভর্তুকি বাবদ খরচ বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব ব্যয় বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছিল অন্যান্য ব্যয়ও। ফলে অর্থবছর শেষে প্রকৃত ঘাটতি জিডিপির ৪.৯ শতাংশে দাঁড়ায়, যা ১৯৯৯৷০০ সালের পর সর্বোচ্চ।

২০০৭৷০৮ অর্থবছরে অর্থনীতির বহির্খাতগুলো খুব ভালো সফলতা দেখিয়েছে। ২০০৭৷০৮ অর্থবছরে দেশে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৬৷০৭ অর্থবছরের তুলনায় ১৫.৯ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, ২০০৭৷০৮ অর্থবছরে প্রবাসী আয়ের পরিমাণ ছিল ৭.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা কিনা ২০০৬৷০৭ অর্থবছরের তুলনায় ১.৯ বিলিয়ন ডলার (৩২ শতাংশ) বেশি। ২০০৭৷০৮ অর্থবছরে বিদেশগামী শ্রমিকের সংখ্যাও ছিল অনেক বেশি, যা অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারের ওপর চাপ কিছুটা হ্রাস করেছিল। দুর্যোগ পুনর্বাসন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে অধিক পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য আসার কারণে ২০০৭৷০৮ অর্থবছরে এর পরিমাণও ছিল সন্তোষজনক (২৫.২ শতাংশ)।

সামষ্টিক অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিধারার সাথে তুলনা করলে ব্যতিক্রমী রাজস্ব (সরকারের আয় ও ব্যয়) পরিস্থিতি এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতিজনিত কারণে ২০০৭৷০৮ অর্থবছরটি অনেক দিক থেকেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

২০০৮০৯ অর্থ বছরের মূল্যায়ন করার সময় অবশ্যই ২০০৭০৮ অর্থ বছরের সময়কার উলেখিত স্বাতন্ত্র্যকে মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

১.৩ প্রবৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

১.৩.১ জিডিপি প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাথমিক হিসাব মতে, ২০০৮০৯ অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫.৮৮ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির এই হার যদি শেষ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয়, তাহলে গত পাঁচ বছরের মধ্যে ২০০৮০৯ অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার হবে সর্বনিম্ন এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার (৬.৫ শতাংশ) চেয়ে তা হবে কিছুটা নিচে। কিন্তু বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, ২০০৮০৯ অর্থ বছরের প্রথম দিকে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে স্থানীয় অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ২০০৯ সালের সরকার পরিবর্তন এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থায় নিম্নগতির প্রেক্ষাপটে প্রবৃদ্ধির এই হার মোটামোটি সন্তোষজনক ধরা যায়। ২০০৮০৯ অর্থ বছরে সামষ্টিক অর্থনৈতিক উপাদানগুলোর প্রতিকূল অবস্থার কারণে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে হার প্রাক্কলন করেছে তা ছিল ৫ শতাংশ বা তার চেয়ে কম।

তবে বোরোর বাম্পার ফলন, সেবা খাতের ঘুরে দাঁড়ানো, রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার কমে যাওয়াকে প্রতিহত করার ক্ষমতা এবং প্রবাসী আয়ের উচ্চতর প্রবাহ প্রায় ৬ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনে সাহায্য করেছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হলেও প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। এটা সুবিদিত যে, বৈশ্বিক মন্দা এশিয়ার উদীয়মান, উন্নয়নশীল ও উন্নত সব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তারপরও এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি খুব কম হারে হ্রাস পেয়েছে (নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায়)। ভারত ও ভিয়েতনামে আগের বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১.৯ শতাংশীয় পয়েন্ট ও ২.৩ শতাংশীয় পয়েন্ট বেশি হারে হ্রাস পেয়েছে (চিত্র ১.১)।

চিত্র ১.১: এশীয় দেশসমূহের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার

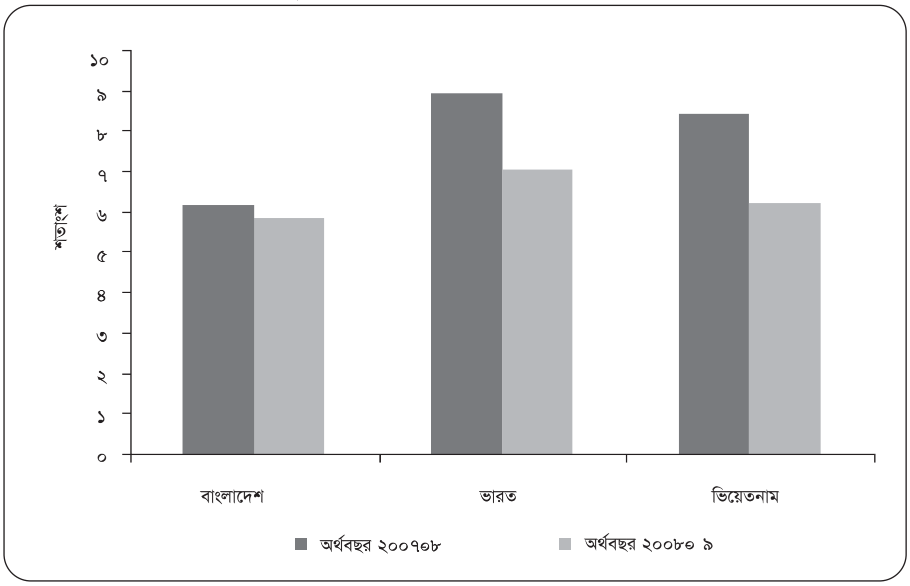

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; অর্থ মন্ত্রণালয়, ভারত; অর্থ মন্ত্রণালয়, ভিয়েতনাম।

এ কথা স্বীকার করতে হয় যে প্রবৃদ্ধির নিম্নগতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে, বিশেষ করে সম্পদ আহরণ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অন্যান্য সব দিক ঠিক থাকলেও প্রবৃদ্ধির এই নিম্নগতি যেসব মানুষ দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসছে, তাদের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে (পিআরএসপি) বর্ণিত প্রবৃদ্ধির নমনীয়তা বা স্থিতিস্থাপকতা বিবেচনা করলে ২০০৮০৯ অর্থ বছরে জিডিপির ৫.৮৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধির ফলে ১৭ লাখ ৬০ হাজার মানুষের দারিদ্র্যসীমা থেকে বের হয়ে আসার কথা। কিন্তু এই কৌশলপত্রে সাম্প্রতিক সময়ের উচ্চ মূল্যস্ফীতিজনিত কারণে দারিদ্র্যের হার যে বেড়েছে, তা দেখানো হয়নি। বরং একাধিক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, হয় দারিদ্র্য হ্রাসের হার কমেছে (বিশ্বব্যাংক), অথবা দারিদ্র্য বিমোচনের গতি উল্টো হয়েছে অর্থাৎ বেড়েছে (সিপিডির প্রাক্কলন)। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) পদ্ধতি অনুযায়ী, প্রাক্কলিত ৫.৮৮ শতাংশ হারে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হলে ২০০৮০৯ অর্থ বছরে ২০ লাখ মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার কথা। দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র অনুসারে, ২০০৯১১ সময়কা লে প্রতিবছর ১৮ লাখ নতুন শ্রমশক্তি বিদ্যমান শ্রমবাজারের সাথে যুক্ত হবে। কৃষি খাতের তুলনামূলক উচ্চ প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশে শ্রমশক্তির বড় অংশের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি যদি প্রাক্কলিত হারের চেয়ে কম হয়, তাহলে তা শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। তবে এখানে যে বিষয়টি সতর্কতার সাথে বিবেচনায় নেওয়া দরকার তা হলো, এ ধরনের অনুমান নিবিড় গবেষণা ও খানাভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে যাচাই করা উচিত।

মনে রাখা প্রয়োজন যে ২০০৭০৮ অর্থ বছরে প্রাক্কলিত আপৎকালীন জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.২১ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬.১৯ শতাংশ করা হয়েছিল। লক্ষণীয় বিষয় হলো, ২০০৭০৮ অর্থ বছরে কৃষি উৎপাদনসহ সেবা খাতেও প্রবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে কম ধরা হয়েছিল। তবে আমদানি শুল্ক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারের নিম্নগতিকে কিছুটা শথ করে দেয়। অন্যথায় জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার আরও ০.২ শতাংশ কম হতে পারত। তবে আমদানি শুল্ক জিডিপির একমাত্র উপাদান, যা কর্মসংস্থানের ওপর সরাসরি কোনো প্রভাব ফেলে না। তাই জিডিপির প্রবৃদ্ধির হিসাব ২০০৭০৮ অর্থ বছর থেকে খুব বেশি পরিবর্তন না হলেও উপাদানগত পরিবর্তনের কারণে ১ লাখ কম কর্মসংস্থান হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১.৩.২ প্রবৃদ্ধির উৎস

দেশের কৃষি খাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও অর্থনীতির দৃশ্যমান খাত[১] মোটামুটি ৫.৩৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, এবং অদৃশ্যমান (ননট্যান্জিবল) খাত তুলনামূলকভাবে বেশি (৬.২ শতাংশ) হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা বাংলাদেশের সেবা খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলার কারণে সেবা খাত তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ২০০৮০৯ অর্থ বছরের বর্ধিত জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ছিল ২৮.৮ শতাংশ এবং ৫০.৭ শতাংশ অবদান নিয়ে প্রথম স্থানে ছিল সেবা খাত। সরকারের ইতিবাচক নীতি সহায়তার কারণে কৃষি খাতও ভালো করেছে। মোট জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৫.৯৬ শতাংশ (চিত্র ১.২)। দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে উলেখিত হারের চেয়েও কৃষি খাত ১ শতাংশ বেশি হারে, অর্থাৎ ৪.৬৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। কৃষি খাতের ভেতরে শস্য খাত উৎসাহব্যঞ্জক ৫.৯৩ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা সাম্প্রতিক সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতিজনিত চাপের কারণে যে সংকট তৈরি হয়েছিল তা নিরসনে ভূমিকা রেখেছে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো ২০০৮০৯ অর্থ বছরে শিল্প খাতের ১১.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ২০০৭০৮ অর্থ বছরের প্রকৃত ৬.৭৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি ছিল। শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি

[১]দৃশ্যমান খাত বলতে কৃষি খাত (শস্য, বনজ সম্পদ ও মৎস্য), খনিজ ও খনন এবং শিল্পোৎপাদন (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতগুলোকে বোঝানো হয়। বাকিগুলো অদৃশ্যমান খাত।

চিত্র ১.২: বর্ধিত প্রবৃদ্ধির উৎসসমূহ

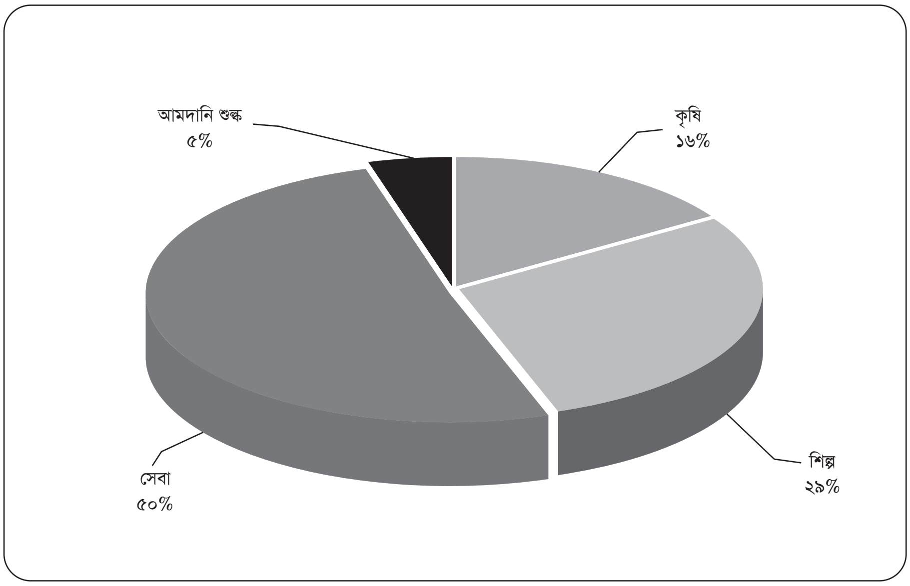

উৎস: সিপিডিআইআরবিডি হিসাব।

স্থানীয় অনিশ্চয়তা এবং চলমান অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ব্যাহত হয়েছে। ২০০৮০৯ অর্থবছরে শিল্প খাত সামগ্রিকভাবে ৫.৯৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। শিল্প খাতের মধ্যে উৎপাদন উপখাতসমূহে (বর্ধিত জিডিপির ১৭.২৪ শতাংশ অবদান রাখছে) প্রবৃদ্ধি কমে যায়, যা ২০০৭০৮ অর্থবছরের ৬.৭৮ শতাংশের বিপরীতে ২০০৮০৯ অর্থবছরে ৫.৯২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। তবে রপ্তানি খাতের সাফল্য শিল্প খাতের এই সংকট অনেকটা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে এবং খাতটির সামগ্রিক সফলতায় অবদান রাখে।

ঐতিহাসিকভাবে সেবা খাত ক্রমাগত ভালো করছে এবং বাংলাদেশের বর্ধিত জিডিপিতে অবদান রাখছে। ২০০৮০৯ অর্থবছরে সেবা খাত দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে নির্ধারিত ৬.৮৭ শতাংশের বিপরীতে ৬.২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। সেবা খাতের নয়টি উপখাতের মধ্যে তিনটি উপখাত (পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ, এবং আর্থিক) হ্রাসকৃত হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে; বাকি উপখাতগুলো ২০০৭০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৮০৯ অর্থবছরে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে।

১.৩.৩ মাথাপিছু আয়

২০০৮০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি হিসাব করা হয়েছে ৬২০ মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ৬৯০ মার্কিন ডলার। টাকার অঙ্কে হিসাব করলে (১৯৯৫৯৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে) ২০০৮০৯ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি আগের বছরের তুলনায় ৪.৫ শতাংশ এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় প্রবাসী আয়ের ওপর নির্ভর করে ৬.৭ শতাংশ বেশি হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে বলা যায় যে এসব গড় হিসাব বাংলাদেশে আয় বণ্টনের নেতিবাচক চিত্রকে অনেকটাই অপ্রকাশিত রেখেছে। তবে জিডিপিতে কৃষি খাতের ক্রমবর্ধমান অংশ বিগত বছরগুলোর মতো আয়

বৈষম্যকে দমিয়ে রাখতে কিছুটা সহায়তা করেছে। আঞ্চলিক বৈষম্যসহ ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের উদ্বেগের কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।[২]

১.৩.৪ সঞ্চয়

২০০৮০৯ অর্থ বছরেও জিডিপিতে স্থানীয় সঞ্চয় হারের স্থবিরতায় ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। জিডিপির শতকরা হারে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার ২০০৭০৮ অর্থ বছরের ২০.৩ শতাংশ থেকে সামান্য কমে ২০০৮০৯ অর্থ বছরে ২০.০২ শতাংশে দাঁড়ায় (চিত্র ১.৩)। খাদ্যের উচ্চমূল্য এর অন্যতম কারণ। বিপরীতভাবে প্রবাসী আয় প্রবাহও জাতীয় সঞ্চয় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভালো প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। জিডিপির শতকরা হার হিসেবে জাতীয় আয়ের অংশ ২০০৮০৯ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপির ৩২.৩৬ শতাংশে পৌঁছেছে, ২০০৭০৮ অর্থ বছরে যা জিডিপির ৩০.২১ শতাংশ ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতীয় ও দেশজ সঞ্চয়ের মধ্যে পার্থক্য ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে। বিনিয়োগ চাহিদার অভাব এবং প্রবাসী আয়কে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে না পারার কারণে এই পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।[৩] এই ধারা অব্যাহত থাকলে আয় বণ্টন পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে, কারণ প্রবাসী আয়ও দারিদ্র্য বিমোচনে অসমভাবে প্রভাব ফেলছে।

চিত্র ১.৩: জিডিপির অংশ হিসেবে সঞ্চয় হার

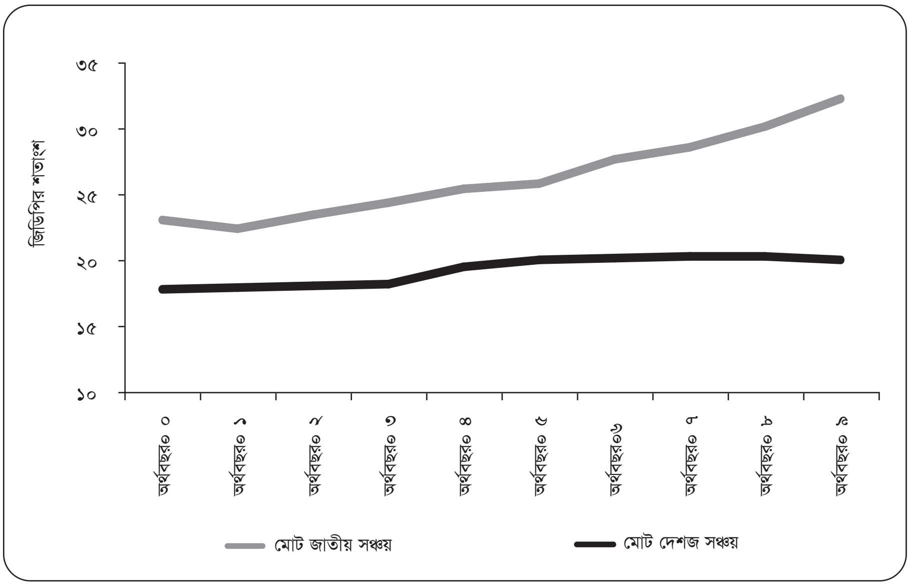

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

[২]আয় বণ্টনের গিনি সহগ ২০০০ থেকে ২০০৫ সময়কালে অবনতি হয়ে ০.৪৫ থেকে ০.৪৭ হয়েছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায় যে আঞ্চলিক বৈষম্য একটা প্রকট সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

[৩]এ দুইয়ের প্রকৃত ব্যবধান নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মনে করেন, প্রবাসী আয়ের পুরোটাই সঞ্চয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক নয়। কারণ, এই আয়ের একটি অংশ ভোগ ব্যয়ে চলে যায়। সেক্ষেত্রে জাতীয় সঞ্চয় যা দেখানো হয়, তার চেয়ে কম হওয়ার কথা।

১.৩.৫ বিনিয়োগ

চূড়ান্ত হিসাবে, ২০০৮০৯ অর্থ´বছরের মোট মূলধন গঠনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৪৮,৮৪০ কোটি টাকা (স্থিরমূল্যে ৯২,০০২ কোটি টাকা)। এ অর্থবছরে মোট মূলধন গঠনের প্রবৃদ্ধি বেড়ে দাঁড়ায় ৫.৭২ শতাংশ, যা ২০০৭০৮ অর্থ´বছরে ছিল মাত্র ১.৮ শতাংশ। সাধারণত এই প্রবৃদ্ধির হার ৮৯ শতাং শের মধ্যে থাকে।

সাম্প্রতিক সময়ে নীতি বাস্তবায়নে শথতা ও দুর্বলতা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অবকাঠামোগত দুর্বলতা ইত্যাদির কারণে বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। চলমান অর্থনৈতিক মন্দাও বিনিয়োগকারীদের আস্থার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। চূড়ান্ত অর্থে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও গত তিন বছর জিডিপির শতকরা হিসাবে গড় বিনিয়োগ কমেছে। ২০০৭০৮ অর্থ´বছরে জিডিপির ২৪.২১ শতাংশ বিনিয়োগ হয়েছিল। ২০০৮০৯ অর্থবছরে তা ২৪.১৮ শতাংশে নেমে আসে (চিত্র ১.৪)। এটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে (এমটিএমএফ) নির্ধারিত জিডিপির ২৪.৪০ শতাংশের চেয়ে কম।[৪]

চিত্র ১.৪: জিডিপির অংশ হিসেবে বিনিয়োগ

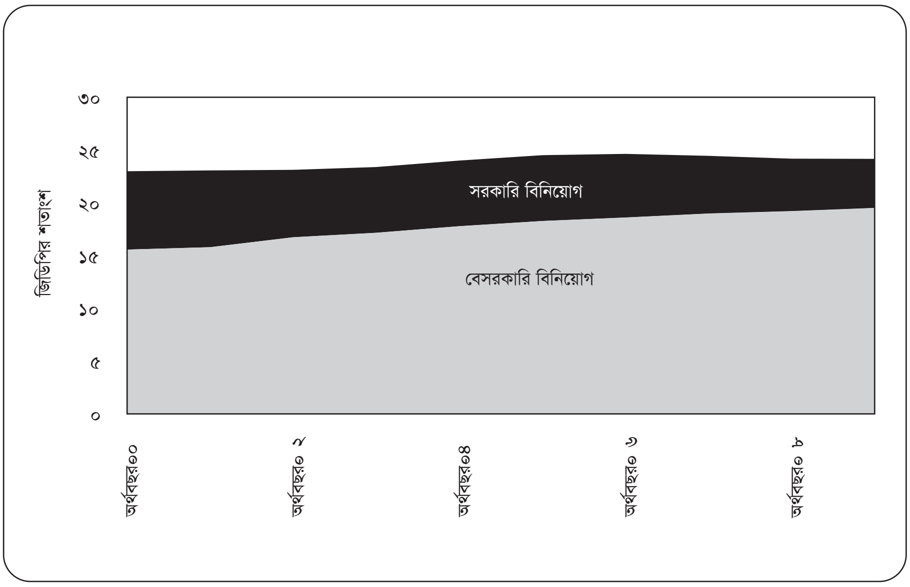

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সরকারি বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়া এডিপি বাস্তবায়নের গতি কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। ২০০৮০৯ অর্থবছরে সরকারি বিনিয়োগ কমে জিডিপির ৪.৬৩ শতাংশে নেমে এসেছে, যা এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বনিম্ন। এমনকি এটি ২০০৭০৮ অর্থ´বছরের ৪.৯৫ শতাংশের চেয়েও কম। জিডিপিতে বেসরকারি বিনিয়োগের অবদান (যা দেশের মোট বিনিয়োগের চারপ ঞ্চমাংশ) ২০০৭০৮ অর্থ´বছরের ১৯.২৫ শতাংশ থেকে সামান্য বেড়ে ২০০৮০৯ অর্থ´বছরের ১৯.৫৫ শতাংশ হয়েছে।

[৪]বিনিয়োগের উপাত্তের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রেক্ষিতে এটা বলা কঠিন যে, পার্থক্যগুলোর পরিসংখ্যানিক যথার্থতা রয়েছে কিনা। প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত বিশেষণ ও তা থেকে কোনো উপসংহারে আসার ক্ষেত্রে তাই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

জাতীয় সঞ্চয়ের হার (৩২.৩৬ শতাংশ) গড় বিনিয়োগ হারের (২৪.১৮ শতাংশ) চেয়ে বেশিই রয়েছে। এটা বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্তের পর্যাপ্ততা নির্দেশ করে। এর প্রাক্কলিত পরিমাণ প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপির ৮ শতাংশের বেশি)। ভারত ও ভিয়েতনামের তুলনায় বাংলাদেশ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। এই দেশ দুটি তাদের জাতীয় আয়ের ৪০ শতাংশ বিনিয়োগ করে থাকে। ২০০৭০৮ ও ২০০৮০৯ অর্থ বছরের মধ্যে বর্ধিত মূলধনউৎপাদন অনুপাত ৩.৯১ থেকে বেড়ে ৪.১১ হয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় যে মূলধনের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে।

এই ধারা অব্যাহত থাকলে, হয় একই প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের জন্য আরও বেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়তো, অথবা যদি বিনিয়োগের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকতো, তবে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেতো। আসলে, উচ্চ হারে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য আরও বেশি বিনিয়োগ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা এবং মূলধনের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। এটা বড় আকারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে সরকারের আরও অধিক বরাদ্দ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে যার ফলশ্রুতিতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।

বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি যে ঋণের সুদ হার কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে তা একটি ভালো পদক্ষেপ। অবশ্য এর ফলে আমানতের সুদের হার কমে যাওয়ার শঙ্কাও রয়েছে যা আবার অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। নীতিগত দিক থেকে ঋণ ও আমানতের সুদের হারের মধ্যে একটি বাস্তবসম্মত ব্যবধান রক্ষা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।[৫]

তাই, ২০০৮০৯ অর্থ বছরের প্রায় ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনকে যেকোন বিচারেই, বিশেষত এই উচ্চ বৈশ্বিক উত্তেজনা এবং অভ্যন্তরীণ অনিশ্চয়তার পরিস্থিতিতে, একটি সম্মানজনক কৃতিত্ব হিসেবে বিবেচনায় নিতে হবে। যাই হোক, এই কৃতিত্বের মধ্যেও অন্তরায় হিসেবে রয়েছে নিম্নমুখী দেশজ সঞ্চয়, উদ্বৃত্ত সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, ক্রমহ্রাসমান মোট বিনিয়োগ (সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ) এবং অবনতিশীল মূলধনের উৎপাদনশীলতা। এসব নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান প্রবৃদ্ধির হারকে আরও এক ধাপ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশকে যেসব চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করতে হবে সেগুলোকেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হারকে বেগবান করার সাথে আরও দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য বিমোচনের সক্ষমতা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

১.৪ সরকারি অর্থায়ন

২০০৭০৮ অর্থ বছর ছিল উন্নয়নের একটি ব্যতিক্রমী বছর। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উচ্চমূল্য, উচ্চ রাজস্ব ও উচ্চ ব্যয়, এবং এর ফলে সৃষ্ট উচ্চ ঘাটতির কারণে ২০০৮০৯ অর্থ বছর আরেকটি ব্যতিক্রমী বছর হিসেবে হাজির করেছে, যা আগের বছরের বিপরীত। তবে অর্থবছরের শেষার্ধে বড় ধরনের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য নাটকীয়ভাবে কমে যাওয়া ব্যয়ের চাপ কমাতে ভূমিকা রেখেছে। ফলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিক থেকে বছরটি ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে আমদানি পণ্যের দাম কমে যাওয়ায় সরকারের রাজস্ব আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, এবং ঘাটতি সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে, যদিও বছর শেষে বাজেট ঘাটতি কমই ছিল। এডিপির কম বাস্তবায়নই এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে, যা কিনা বাংলাদেশের রাজস্ব কাঠামোর এটি একটি গতানুগতিক সাধারণ চিত্র।

[৫]ঋণ ও আমানতের হারে বড় ধরনের পার্থক্যের বিবেচনায় এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

১.৪.১ রাজস্ব আয়

২০০৮০৯ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৯,৩৩৮ কোটি টাকা। ২০০৭০৮ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের প্রকৃত পরিমাণের চেয়ে ১৭.৩ শতাংশ বেশি প্রবৃদ্ধি হিসাব করে এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। ওই সময় আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় অর্থবছরের প্রথম কয়েক মাসে আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আহরণ বেড়েছে। তারপর থেকে পণ্যের দাম কমতে শুরু করলেও ২০০৭০৮ অর্থবছরের শেষ ভাগে এসেও তা উচ্চপর্যায়েই ছিল। তবে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকটের কারণে পণ্যমূল্য উলেখযোগ্য হারে কমে যাওয়ায় ২০০৮০৯ অর্থবছরের পরের মাসগুলোতে দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টাতে থাকে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হতে পারে জ্বালানি তেলের মূল্য। ২০০৭০৮ অর্থবছরের শুরুতে জ্বালানি তেলের মূল্য ছিল ব্যারেল প্রতি ৭০ মার্কিন ডলার। ২০০৮ সালের মধ্য জুলাইয়ে এই মূল্য সর্বোচ্চ ১৪৪ ডলারে গিয়ে ঠেকে। এর পর থেকেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তেলের দাম কমতে শুরু করে এবং ২০০৮০৯ অর্থবছরের মাঝামাঝি (২০০৮ সালের ডিসেম্বর) সময়ে তা ৩৫ ডলারে নেমে আসে। অর্থবছরের শেষে মূল্য আবার কিছুটা বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৭০ ডলারে বিক্রি হয়। ২০০৭০৮ অর্থবছরে গড়ে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ছিল ৯৫ ডলার। ২০০৮০৯ অর্থবছরে যা ছিল ৭১ ডলার করে (আগের বছরের তুলনায় ৩৪ শতাংশ কম)। আন্তর্জাতিক বাজারের এই অবস্থার কারণে আমদানি পর্যায়ে বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ প্রত্যাশার চেয়ে কম হয়েছে।

আমদানি পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) রাজস্ব আয়

উপরের আলোচনা এটাই নির্দেশ করে যে আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আহরণ কমে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে আমদানি শুল্ক কমে যাওয়া। ২০০৮০৯ অর্থবছরে ১০,৮৬২ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯,৩৫১ কোটি ৯০ লাখ টাকার আমদানি শুল্ক আদায় হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১,৬৬৬ কোটি টাকা কম। এ অর্থবছরের বাজেটে ১৩.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে আমদানি শুল্ক আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির হার ছিল নেতিবাচক (২.৬ শতাংশ)। অবশ্য পণ্যমূল্য কমার কারণে আমদানি শুল্কের চেয়ে আমদানি পর্যায়ে মূল্য সংযোজনী কর (ভ্যাট) আদায় তুলনামূলক কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.২ শতাংশ, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২.৬ শতাংশ (সারণি ১.১)। আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩৭৫ কোটি ১০ লাখ টাকা কম হয়েছে। অন্যদিকে, আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩২.৯ শতাংশ, লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে যা ২১৯ কোটি ৪০ লাখ টাকা বেশি।

সারণি ১.১: আমদানি পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(শতাংশ)

শুল্কের ধরন	২০০৭০৮ অর্থবছরে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি	২০০৮০৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮০৯ অর্থবছরে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি
মোট আমদানি	২৬.৭	১৩.৫	৫.২
আমদানি শুল্ক	১৭.৭	১৩.১	২.৬
ভ্যাট আমদানি	৩৪.৫	১২.৬	৮.২
সম্পূরক শুল্ক	৪৬.৬	২০.৪	৩২.৯

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

স্থানীয় পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আদায়ের উলেখযোগ্য উপাদানগুলোর মধ্যে সম্পূরক শুল্ক আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১,২৪২ কোটি ৬০ লাখ টাকা কম হয়েছে। ২০০৭০৮ অর্থবছরের চেয়ে এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ২.৯ শতাংশ। কিন্তু ওই বছরের চেয়ে ২৩.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল

(সারণি ১.২)। তবে স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাট আদায় হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৮৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা বেশি। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯.৫ শতাংশ, কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬.৪ শতাংশ। আর আয়কর আদায়ের পরিমাণ (৮০৪ কোটি ১০ লাখ টাকা) পর পর দুই বছর লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়েছে। ২০০৮০৯ অর্থবছরের ১১.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে ১৮ শতাংশ। ২০০৮০৯ অর্থবছরে আগের বছরের চেয়ে ৩০ হাজারেরও বেশি ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতা আয়কর বিবরণী জমা দিয়েছেন। এ সময় মোট বিবরণী জমা পড়ে ৬ লাখ ৭০ হাজারের মতো।[৬]

সারণি ১.২: স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব বোর্ডের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

(শতাংশ)

শুল্কের ধরন	২০০৭০৮ অর্থ বছরে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি	২০০৮০৯ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮০৯ অর্থ বছরে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি
স্থানীয় মোট	২৬.২	১৭.০	১৪.১
এক্সাইজ ডিউটি	১৬.৮	১৭.১	১১.২
স্থানীয় ভ্যাট	২২.৯	১৬.৪	১৯.৫
স্থানীয় সম্পূরক শুল্ক	২৩.৮	২৩.৬	২.৯
টার্নওভার শুল্ক	১৪.৭	১৭.২	৩.১
আয়কর	৩৪.৭	১১.১	১৮.০
ভ্রমণ কর	৩৫.৬	২৪.৯	৬.৪
মোট আমদানি	২৬.৭	১৩.৫	৫.২
এনবিআরের মোট আদায়	২৭.৪	১৪.৯	১০.৭

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

এনবিআর-বহির্ভূত কর এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব

২০০৮০৯ অর্থ বছরে (-) ০.১ শতাংশ ল ক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এনবিআরবহির্ভূত কর আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪.৭ শতাংশ (সারণি ১.৩)। আদায় হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩৬৪ কোটি টাকা বেশি। অন্যদিকে, করবহির্ভূত রাজস্বের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১,৫৬০ কোটি টাকা কম আদায় হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি কমেছে ০.১ শতাংশ। তবে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪.১ শতাংশ। সুদের হিসাব, ফি, টোল ও অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে আদায় কম হওয়া করবহির্ভূত রাজস্ব কমার মূল কারণ। এক্ষেত্রে মোট ঘাটতি হিসাব করা হয়েছে ৯৮৭ কোটি টাকা।

সারণি ১.৩: এনবিআরবহির্ভূত কর এবং করবহির্ভূত রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(শতাংশ)

রাজস্বের উৎস	২০০৭০৮ অর্থ বছরে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি	২০০৮০৯ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা	২০০৮০৯ অর্থ বছরে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি
এনবিআরবহির্ভূত	২৪.৮	১.০	১৪.৭
মাদক ও মদ	১৫.৯	২.০	৭.৮
গাড়ি	২৪.০	৬.৪	২৬.৭
জমি	১৯.৩	২০.৫	৪.৩
স্ট্যাম্প	২৬.৯	৯.২	১৫.৩
করবহির্ভূত রাজস্ব	৫.৪	১৪.১	০.১
লভ্যাংশ ও মুনাফা	২৪.৪	৬২.২	৪৬.৪
ডাক ও রেলওয়ে	২৪.৩	৭৯.৯	২৪.৪
টি অ্যান্ড টি	৮.১	১০০.০	৯৯.৭
সুদ, ফি, টোল ও অন্যান্য	৬.৪	১৯.৬	৫.৪

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়।

[৬] ৩ কোটি ১০ লাখ পরিবারের এই দেশে এটা খুবই হতাশাজনক চিত্র। ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে -এটি বি বেচনায় নিলেও আয়কর দাতা বা আয়কর বিবরণী দাখিলকারীর সংখ্যা আরও বেশি হওয়া উচিত।

২০০৮০৯ অর্থবছরে সামগ্রিক রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩,১৭০ কোটি ৪০ লাখ টাকা বা ৪.৬ শতাংশ কম হয়েছে। তবে এডিপি বাস্তবায়নে দুর্বলতার কারণে খরচের চাপ কম থাকায় তা বড় ধরনের কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনি।

রাজস্ব ব্যয়

সুদ প্রদান ছাড়া অন্যান্য খাতে ২০০৮০৯ অর্থবছরের রাজস্ব ব্যয় প্রাক্কলিত হিসাবের চেয়ে কম হয়েছে। ২১.৬ শতাংশ প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বেতনভাতার ব য়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.২ শতাংশ (চিত্র ১.৫)। ভর্তুকি ও চলতি স্থানান্তরের ব্যয়ও লক্ষ্যমাত্রার (৩০.২ শতাংশ) চেয়ে কম হয়েছে (৬.৮ শতাংশ)। ২০০৭০৮ অর্থবছরের শেষ মাসগুলোর পণ্যমূল্যের ওপর ভিত্তি করে ২০০৮০৯ অর্থবছরের বাজেটে ভর্তুকির চাহিদা নির্ণয় করা হয়েছিল। বাজেটে ১,০৯৮ কোটি ১০ লাখ টাকা থোক বরাদ্দ রাখা হলেও খরচ হয়েছে মাত্র ২১৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা। পণ্য ও সেবা খাতে ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.৫ শতাংশ। যদিও লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১৬.৫ শতাংশ।

চিত্র ১.৫: রাজস্ব ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি: অর্থবছর ২০০৭-০৮ ও অর্থবছর ২০০৮-০৯

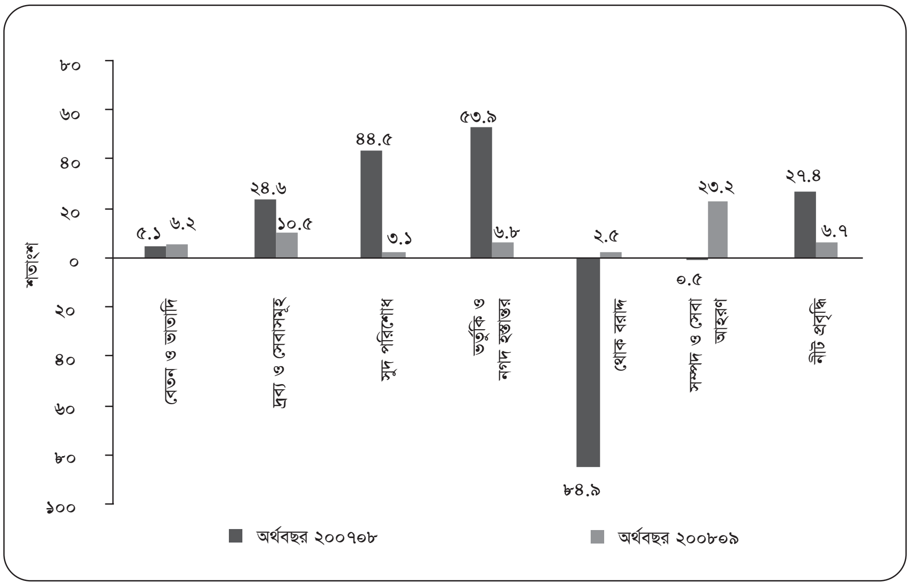

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো যে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সুদ প্রদান ছিল অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে, বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০০৭০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৮০৯ অর্থবছরে সুদ প্রদান ৭.৫ শতাংশ কমিয়ে ধরা হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ধরনের সুদ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ২০০৮০৯ অর্থবছরের বাজেটে (৭.৫ শতাংশ ও ৭.৭ শতাংশ) কম করে প্রাক্কলন করা হয়। এ সময় বৈদেশিক সুদ প্রদান ৪.১ শতাংশ কমলেও অভ্যন্তরীণ সুদ প্রদান বেড়েছে ৪ শতাংশ। সম্ভবত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও ভর্তুকির ব্যয় মেটাতে ২০০৭০৮ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে বেশি ঋণ নেওয়ার কারণেই এমনটি ঘটেছে। ২০০৬০৭ অর্থবছরের চেয়ে ওই বছর অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নেওয়া ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৭৮.৬ শতাংশ।

২০০৮০৯ অর্থ বছরে সার্বিক রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫৭,৪৩১ কোটি ৩০ লাখ টাকা। আগের বছরের চেয়ে এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৭ শতাংশ। তবে এ খাতে বাজেটে প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ২০.৮ শতাংশ। উলেখ্য, গত পাঁচ বছরের রাজস্ব ব্যয়ের গড় প্রবৃদ্ধির (১৬.৭ শতাংশ) চেয়ে ২০০৮০৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ছিল অনেক কম।

১.৪.২ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

জিডিপির তুলনায় এডিপির ব্যয় ক্রমাগতভাবে কমে যাওয়া এবং বছরের পর বছর এডিপি বাস্তবায়নের সাফল্য একটি যৌক্তিক পর্যায়ে আসতে ব্যর্থ হওয়ায় এডিপির আকারের লক্ষ্যমাত্রা ঐচ্ছিক রাখা উচিত বলে বিতর্ক উঠেছে। বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অর্থনীতি থেকে উৎসরিত হয় এবং সরকারের বাস্তবায়নের দক্ষতাও এক্ষেত্রে একটি বাধা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এডিপির লক্ষ্যমাত্রার ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অনুয়ায়ী ২০০৮০৯ অর্থ বছরে তা ২৮,০০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা উচিত বলে মনে করা হচ্ছিল, কিন্তু ওই বছরে ২৫,০০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়, যা ছিল আগের অর্থবছরের প্রকৃত এডিপির (২৬,৫০০ কোটি টাকা) চেয়েও কম। ২০০৮০৯ অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয় ২০০৭০৮ অর্থ বছরের চেয়ে চূড়ান্ত প্রবৃদ্ধি অর্জনে কিছুটা অগ্রগতি হলেও, তা প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হিসাব করার জন্য যথেষ্ট নয় (যদি মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করা হয়)। ফলশ্রুতিতে, এডিপি বাস্তবায়ন জিডিপির ৩.২ শতাংশে নেমে আসে। এটি এ যাবৎকালের সর্বনিম্ন বাস্তবায়নের হার। এর আগে ২০০৭০৮ অর্থ বছরে এটি ছিল ৩.৪ শতাংশ (চিত্র ১.৬)।

চিত্র ১.৬: এডিপি বাস্তবায়নের গতি-প্রকৃতি

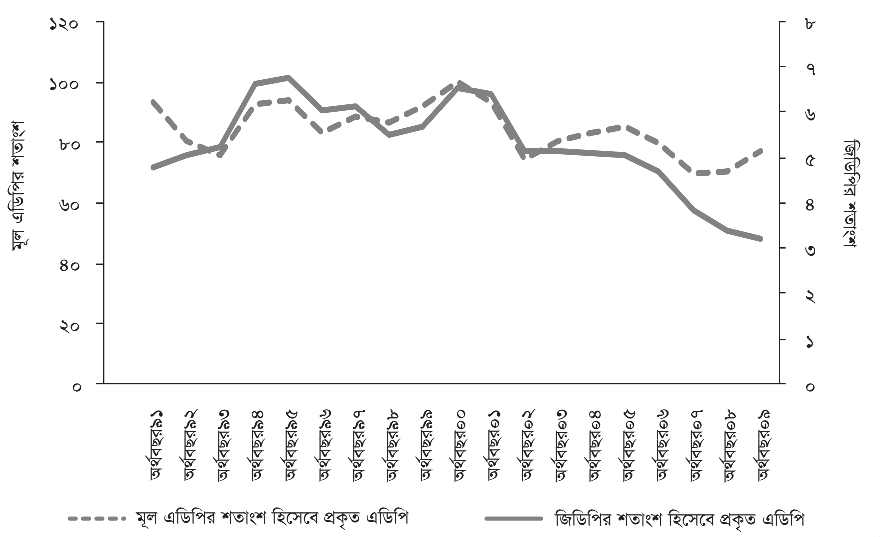

উৎস: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)।

২০০০০১ অর্থ বছর থেকে ২০০৭০৮ অর্থ বছরের মধ্যে প্রকৃত এডিপির ব্যয় প্রতিবছর গড়ে ২.৬ শতাংশ হারে বেড়েছে। তবে ২০০৮০৯ অর্থ বছরে ৬.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে (এটি ২০০৮০৯

অর্থবছরের গড় মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম)। বাস্তবায়নের হারেও কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। এ সময় বরাদ্দকৃত তহবিলের ৭৬.৮ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছে (২০০৬০৭ ও ২০০৭০৮ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত তহবিল ব্যবহারের হার ছিল যথাক্রমে ৬৮.৯ শতাংশ ও ৬৯.৬ শতাংশ)। বাস্তবায়িত এডিপির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯,৬৬৮ কোটি টাকা (২০০৭০৮ অর্থ বছরে এর পরিমাণ ছিল ১৮,৪৫৫ কোটি টাকা)। উলেখ্য, অর্থবছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে এডিপি বাস্তবায়ন কম হয়েছে। এ কারণে শেষ দিকে এডিপির আকার সংশোধন করে ২৩,০০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় (এক্ষেত্রে মূল এডিপি থেকে ১০.২ শতাংশ কমানো হয়)।

শীর্ষ পাঁচ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

এডিপি বরাদ্দের দিক থেকে শীর্ষ পাঁচ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ছিল – স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোকে সম্মিলিতভাবে ২০০৮০৯ অর্থ বছরের মোট প্রকৃত এডিপির দুইতৃতীয়াংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল (৬৪.২ শতাংশ)। এর মধ্যে তিনটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ গড় হারের তুলনায় বেশি টাকা খরচ করতে সমর্থ হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৬.৩ শতাংশ খরচ করেছে (সারণি ১.৪)। এ ছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের খরচের হার ছিল যথাক্রমে ৮৬.৭ শতাংশ ও ৮৩.০ শতাংশ।

সারণি ১.৪: ২০০৮-০৯ অর্থবছরে শীর্ষ পাঁচ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন কার্যক্রম

(শতাংশ)

খাত	প্রকৃত এডিপি থেকে বরাদ্দের হার	সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়ের হার	প্রকৃত বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়ের হার
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২০.৩	৯৬.১	৯৬.৩
বিদ্যুৎ বিভাগ	১৩.৬	৮২.৪	৬৩.৪
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১১.৬	৭৭.১	৫৯.৪
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৯.৪	৭৬.৭	৮৩.০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	৯.৩	৯৭.২	৮৬.৭

উৎস: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ।

অন্যদিকে, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় তার অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ব্যয় করেছে মাত্র ৫৯.৪ শতাংশ। কিন্তু বিশেষভাবে উলেখ্য যে দেশিবি দেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে বিদ্যুতের সংকট যখন বড় বাধা হিসেবে সামনে আসছে, তখন বিদ্যুৎ বিভাগ খরচ করেছে বরাদ্দের মাত্র ৬৩.৪ শতাংশ।

প্রকল্প সাহায্য ব্যবহার

২০০৮০৯ অর্থ বছরের প্রকৃত এডিপির ৪৬.৯ শতাংশ (১,২০০ কোটি টাকা) প্রকল্প সাহায্য থেকে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রথম কয়েক মাস প্রকল্প সাহায্যের অগ্রগতি কম হওয়ায় সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প সাহায্যের লক্ষ্যমাত্রা ১০,২০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়। আর বছর শেষে প্রকল্প সাহায্য ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র ৭,৯১৩ কোটি টাকা (প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রার ৬৫.৯ শতাংশ)। এটা মনে রাখতে হবে যে বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনার ওপরই প্রকল্প সাহায্য নির্ভর করবে।

সার্বিকভাবে বলা যায় যে, অর্থনীতির জন্য ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য যখন বড় সরকারি ব্যয় দরকার, এমন একটি সময়ে ২০০৮০৯ অর্থ বছরের প্রকৃত এডিপির পরিমাণ

গ্রহণযোগ্য ছিল না। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, মোট এডিপি ব্যয়ের ৪০ শতাংশই হয়েছে অর্থবছরের শেষ দুই মাসে। অর্থবছরের শেষ সময়ে তড়িঘড়ি করে এডিপি বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য একটি সাধারণ ঘটনা এবং ২০০৮০৯ অর্থ বছরেও এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এটা বাংলাদেশে মানসম্পন্নভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের উদ্বেগের কারণ।[৭]

১.৪.৩ বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন

আগেই বলা হয়েছে যে ২০০৮০৯ অর্থ বছরের বাজেট যখন প্রণয়ন করা হচ্ছিল, তখন বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্য ছিল বেশ চড়া। পণ্যমূল্যের এই বিষয়টি মাথায় রেখেই ২০০৮০৯ অর্থ বছরের বাজেটে ৩০,৫৮০ কোটি টাকা বা জিডিপির ৫ শতাংশ ঘাটতি ধরা হয়েছিল। সংশোধিত বাজেটে এই ঘাটতির পরিমাণ নামিয়ে আনা হয় ২৪,৯৬০ কোটি টাকায় যা জিডিপির ৪ শতাংশ। অর্থবছর শেষে দেখা যায়, প্রকৃত অর্থে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০,০০০ কোটি টাকা বা জিডিপির ৩.৩ শতাংশ (সারণি ১.৫)।

সারণি ১.৫: বাজেট ঘাটতি এবং অর্থায়নের উৎসসমূহ

অর্থায়নের উৎস	অর্থবছর ২০০৭	অর্থবছর ২০০৮	বাজেট ২০০৯	অর্থবছর ২০০৯
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন	৩৩৩৬.৯	৮৬৩৯.৯	১৩৫৮২.০	২৭৫৭.৯
অনুদান	১০৮৫.৮	২৪১৩.১	৬৩৪৬.০	১২৭৩.৫
ঋণ	৬২৮৮.৬	১০৫৯৯.৩	১১৪৫৬.৭	৬১৪৯.৭
অ্যামোরটাইজেশন	৪০৩৭.৫	৪৩৭২.৫	৪২২০.৮	৪৬৬৫.৪
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	১৫৪০০.৪	১২৮৫৪.৩	১৭০৪১.১	১৭২৪২.৬
ব্যাংকবহির্ভূত ঋণ	৪২৮১.২	২৫০০.০	৩৫০০.০	৩৫০৪.৪
ব্যাংক ঋণ	১১০৪৮.৬	১০৩২৯.৫	১৩৪৯৮.০	১৩৬০৬.৪
সম্পদ বিক্রয়	৭০.৭	২৪.৮	৪৩.১	১৩১.৮
মোট অর্থায়ন	১৮৭৩৭.৩	২১৪৯৪.২	৩০৬২৩.০	২০০০০.৪
জিডিপির শতকরা হিসাবে মোট অর্থায়ন	৪.০	৪.০	৫.০	৩.৩

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়।

ঘাটতি বাজেটের পাশাপাশি একই অর্থবছরে (২০০৮০৯) রাজ স্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪.৬ শতাংশ কম হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির কাঙ্ক্ষিত বাস্তবায়ন ছিল লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম। সেই সঙ্গে রাজস্ব ব্যয়ের যে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল, তাও পূরণ হয়নি।

এখানে উলেখ করা প্রয়োজন যে, ২০০৮০৯ অর্থ বছরের বাজেটে যে ঘাটতি ধরা হয়, তা ছিল ২০০৭০৮ অর্থ বছরের প্রকৃত বাজেট ঘাটতির তুলনায় ৪২.৫ শতাংশ বেশি। কিন্তু বাস্তবে প্রকৃত ঘাটতি ২০০৭০৮ অর্থ বছরের তুলনায় ৬.৯ শতাংশ কম ছিল।

ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের জন্য সরকারকে বৈদেশিক সাহায্যের পরিবর্তে দেশীয় উৎসগুলোর ওপরই বেশি মাত্রায় নির্ভর করতে হয়েছে। কারণ এই বছর বৈদেশিক সাহায্য পর্যাপ্ত ছিল না। অনুদান ও ঋণ মিলিয়ে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১৭,৮০৩ কোটি টাকা। তার বিপরীতে পাওয়া যায় মাত্র ৭,৪২৩ কোটি ২০ লাখ টাকা। ৪,৬৬৫ কোটি টাকা ঋণ সমন্বয়ের পর বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ

[৭]সাধারণত মার্চ মাসে পর্যালোচনা সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্পের জন্য অর্থ ছাড় করার গতি বৃদ্ধি পায়। অভিজ্ঞতা বলে যে অর্থবছরের ছয় মাস পরেই জানুয়ারিতে পর্যালোচনার কাজ করা নীতিনির্ধারকদের জন্য সহায়ক হবে।

আরও কমে দাঁড়িয়েছে ২,৭৫৮ কোটি টাকায়। এ সময়ে প্রকৃত বৈদেশিক সাহায্য ছিল লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২০.৩ শতাংশ এবং তা আগের বছরের তুলনায় ৬৮.১ শতাংশ কম।

বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি প্রত্যাশার চেয়ে কম হওয়ায় সরকারকে দেশীয় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বেশি ঋণ নিতে হয়েছে, যদিও তা সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল না। দেশীয় উৎসের ওপর সরকারকে অতিমাত্রায় নির্ভর করতে হলেও বছর শেষে এ উৎস থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছিই ছিল। দেশীয় উৎসের অর্থায়নের পরিমাণ ছিল মোট অর্থায়নের ৮৬.২ শতাংশ। ২০০৮০৯ অর্থ বছরে বিদেশি অর্থায়ন কমে হয়েছে ১৩.৮ শতাংশ, যা ২০০৭০৮ অর্থ বছরে ছিল ৪০.২ শতাংশ (চিত্র ১.৭)।

চিত্র ১.৭: ঘাটতি অর্থায়নের কাঠামো: অর্থবছর ২০০৭-০৮ ও অর্থবছর ২০০৮-০৯

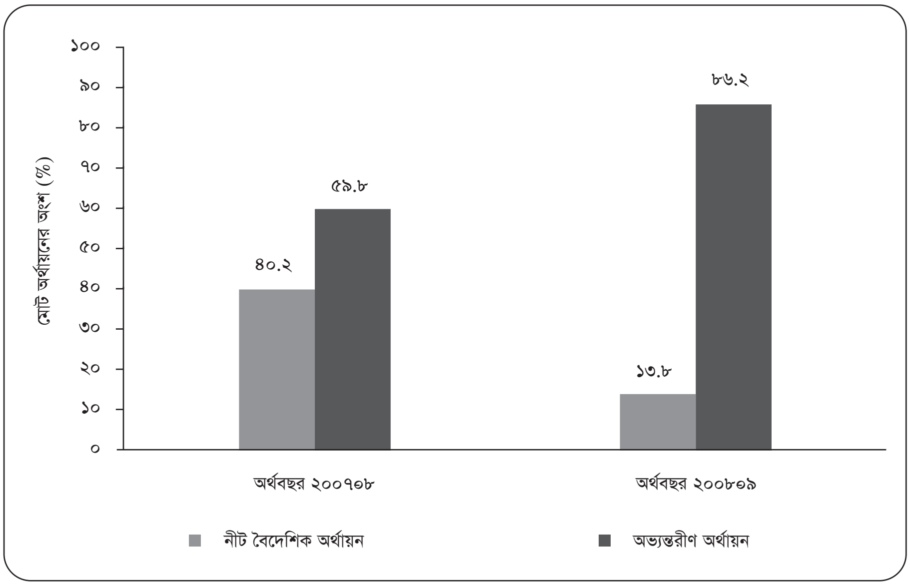

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়।

গত কয়েক বছর ধরে বৈদেশিক ঋণ প্রবাহের ক্ষেত্রে (জিডিপির অংশ হিসেবে) যে ধারাবাহিক নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তার সাথে সঙ্গতি রেখে ২০০৮০৯ অর্থ বছরেও বৈদেশিক অর্থায়নের অংশ কমবে বলে মনে করা হয়েছিল। প্রকৃত তথ্য হলো, বৈদেশিক সাহায্যের একটি উলেখযোগ্য অংশই নিম্ন বাস্তবায়ন হারের কারণে অব্যবহৃত থেকে যায়। আগেই বলা হয়েছে, এ প্রবণতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপট থেকে খুবই উদ্বেগজনক। বিশেষ করে, এমন একটি সময়ে যখন চলমান অর্থনৈতিক মন্দার বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিকে অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

১.৫ মুদ্রা খাত

বিশ্বমন্দার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে নিত্যপণ্যের দাম কমে যাওয়ায় (চিত্র ১.৮) দেশে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও জাতীয় প্রবৃদ্ধি ধরে রাখাটা নীতিনির্ধারকদের জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। এটি

চিত্র ১.৮: মুদ্রাস্ফীতির হার

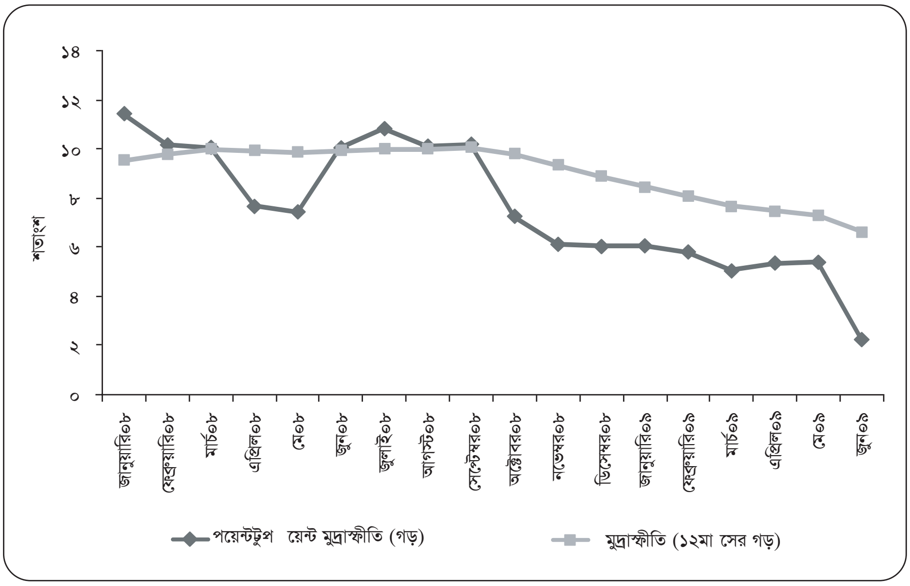

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

করতে গিয়ে মুদ্রানীতিতে তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়। এগুলো হচ্ছে – উৎপাদনশীল খাতে সর্বোচ্চ ঋণের ব্যবস্থা, ব্যাংক ঋণের সুদের হার ঋণদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্যই সহনশীল পর্যায়ে রাখা, এবং মুদ্রা বিনিময়ের হার স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে রপ্তানিকারক ও আমদানিকারক উভয়ের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা। এর বাইরেও সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয়ের সংকোচনকে রোধ করার জন্য দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। প্রবৃদ্ধির হার দ্রুত করার লক্ষ্যে মুদ্রানীতির সাথে সংশিষ্ট বিভিন্ন পদক্ষেপ, যেমন – রেপো, রিভার্স রেপো, নগদ জমার হার, তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয় হার ইত্যাদি গ্রহণ করা উচিত।

নিচে ২০০৮০৯ অর্থ বছরের মুদ্রা খাতের কয়েকটি উলেখযোগ্য প্রবণতার প্রতি আলোকপাত করা হলো।

১.৫.১ নিম্ন ঋণ প্রবাহ বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে পারে

বিশ্বমন্দা ও বৈশ্বিক আর্থিক দুরবস্থার কারণে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রবাহ কমে যায়। ২০০৮০৯ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহ বেড়েছে প্রায় ১৬ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ২১ শতাংশ কম (চিত্র ১.৯)। বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ মন্দার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। ২০০৮০৯ অর্থ বছরে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৪.৬২ শতাংশ, অথচ আগের বছর এর পরিমাণ ছিল প্রায় ২৫ শতাংশ। ২০০৮০৯ অর্থ বছরে সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহেও ২০০৭০৮ অর্থ বছরের তুলনায় কম হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে (চিত্র ১.১০ এবং সারণি ১.৭)।

খাতওয়ারি অর্থ বরাদ্দের দিক থেকে কৃষি খাতের বরাদ্দ ইতিবাচক হলেও তা ছিল আগের বছরের তুলনায় কম (২০০৭০৮ অর্থ বছরের ৬২.১ শতাংশের বিপরীতে ২০০৮০৯ অর্থ বছরে ৮.২ শতাংশ) (চিত্র ১.১১)। এ খাতে ঋণের প্রবাহ বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কৃষি ঋণের

চিত্র ১.৯: সরকারি ঋণ

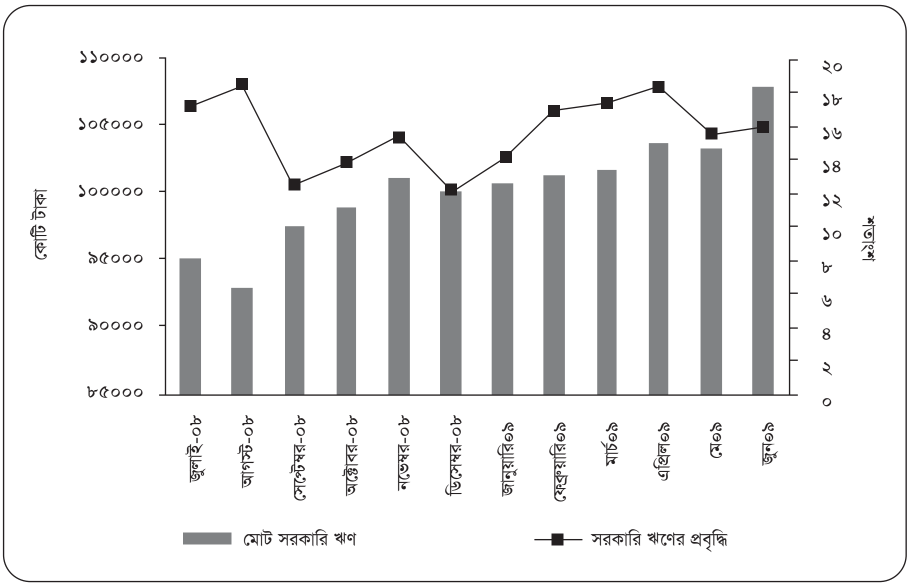

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

চিত্র ১.১০: অভ্যন্তরীণ ঋণ

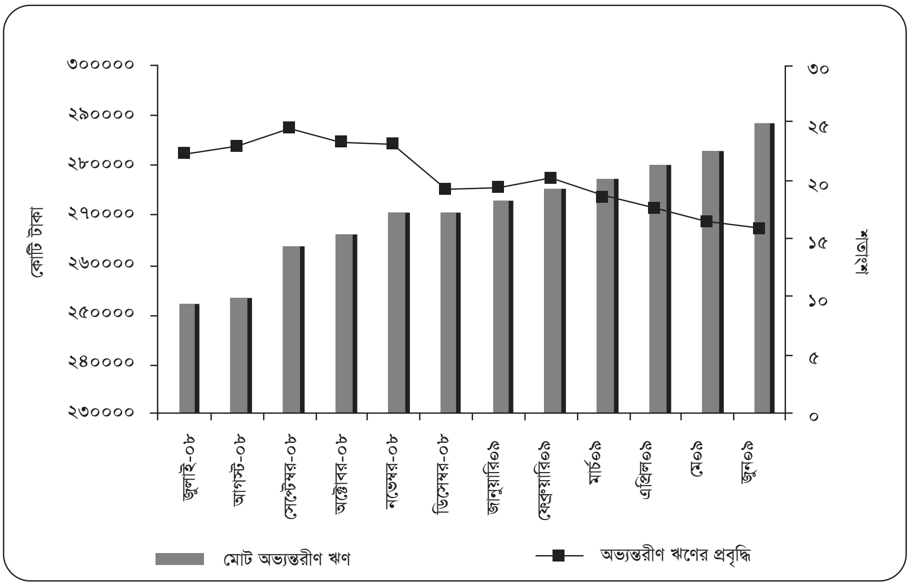

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

চিত্র ১.১১: কৃষি ঋণ

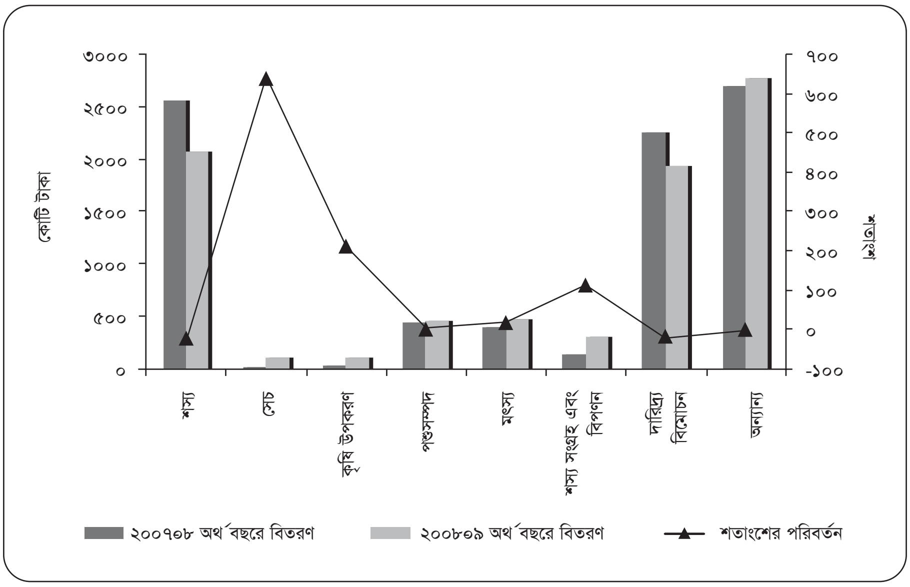

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

চিত্র ১.১২: শিল্প ঋণ

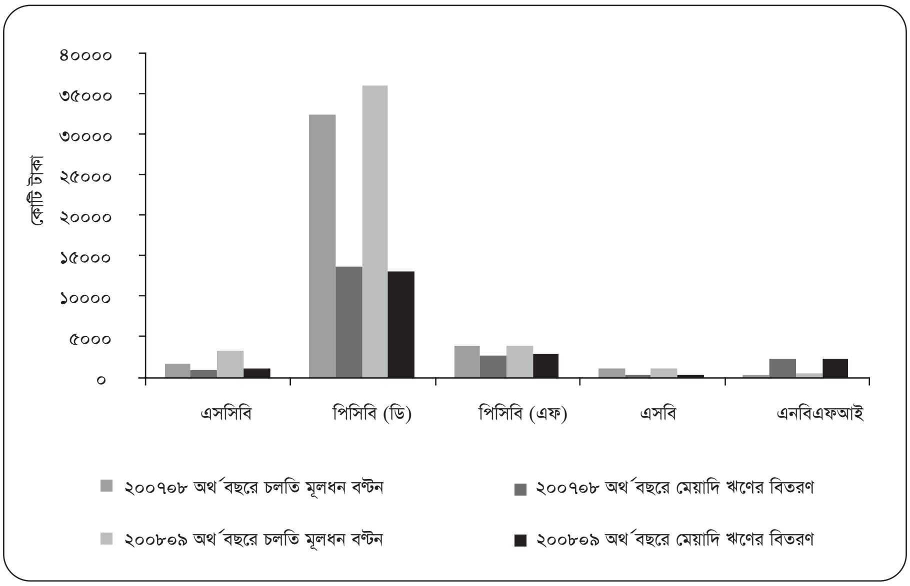

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

দ্রষ্টব্য: এসসিবি: রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক; পিসিবি: বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (ডি এবং এফ: দেশীয় এবং বৈদেশিক); এসবি: বিশেষায়িত ব্যাংক; এনবিএফআই: ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

পরিমাণ বাড়াতে বিশেষ নির্দেশ দেয়। এ কারণে চলতি অর্থবছরে (২০০৯১০) কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ বাড়বে বলে আশা করা যায়। ২০০৮০৯ অর্থবছরে শিল্প খাতের মেয়াদি ঋণের বিতরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি (০.৮৮ শতাংশ) থাকায় এ খাতের অগ্রগতির ওপর বেশ বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ২০০৭০৮ অর্থবছরে মেয়াদি ঋণের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬২.৫৮ শতাংশ। ২০০৭০৮ অর্থবছরে চলতি মূলধন বিতরণের হার কমে ১২.৬৭ শতাংশ হয়, যা ২০০৮০৯ অর্থবছরে হয় ২৬.৯৬ শতাংশ (চিত্র ১.১২)। শিল্প খাতের মেয়াদি ঋণের এই স্তিমিত চাহিদা বর্তমান অর্থবছরে দেশের শিল্পোন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করবে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার ফলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আস্থাহীনতার সৃষ্টি হয়েছে তার পাশাপাশি অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধার অভাব, বিশেষ করে বিদ্যুৎ সরবরাহের অপ্রতুলতা শিল্পের মেয়াদি ঋণ হ্রাসের কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

অভ্যন্তরীণ ঋণের স্বল্প চাহিদার কারণে তফসিলি ব্যাংকগুলোতে ব্যাপক উদ্বৃত্ত তারল্য তৈরি হয়, যা ২০০৯ সালের জুন মাসের শেষে ছিল ৩৪,৭৬২ কোটি ৮ লাখ টাকা (চিত্র ১.১৩)। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এটি ১৬৭.৬৪ শতাংশ বেশি। ২০০৬০৭ অর্থবছরের উদ্বৃত্ত তারল্যের তুলনায় ২০০৭০৮ অর্থবছরের উদ্বৃত্ত তারল্য বৃদ্ধির হার ছিল ৯.০৪ শতাংশ। ব্যাংকিং চ্যানেলে নগদ টাকার চাহিদার অভাব স্মরণকালের সর্বনিম্ন আন্তঃব্যাংক সুদ হারের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের কোন এক সময়ে ০.২৫ শতাংশ নেমে এসেছিল। ২০০৮ সালের জুনে তলবী অর্থের সুদের ভারিত গড় হার ছিল ৯.৭৪ শতাংশ। ২০০৯ সালের জুনে ভারিত গড় সুদের হার নেমে আসে ১.৭১ শতাংশে। চলমান বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার মুখে বেশ কিছু বিষয়ের সম্মিলিত প্রভাবে এই উদ্বৃত্ত তারল্য পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।

চিত্র ১.১৩: অতিরিক্ত তারল্যের প্রবণতা

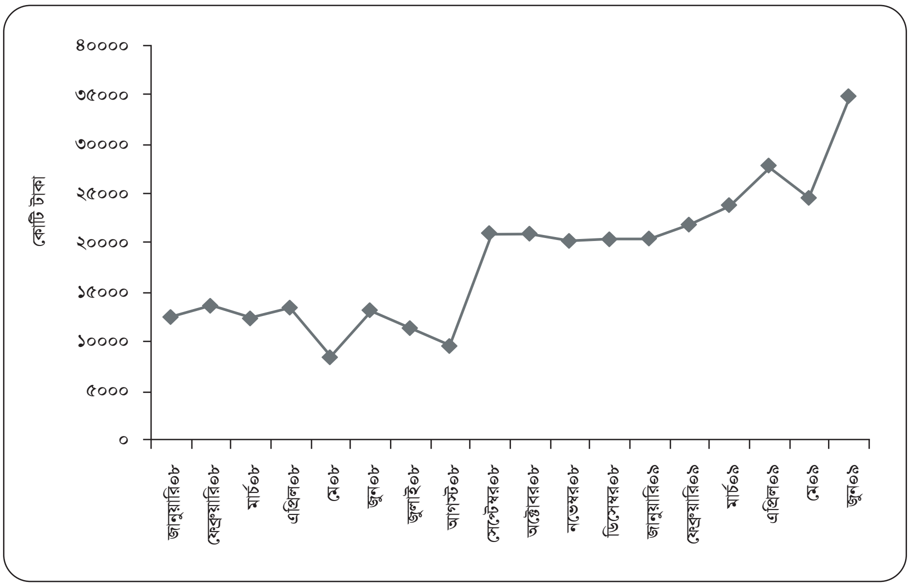

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রথমত, বাংলাদেশে ব্যাংক ঋণের একটা বড় অংশ ঋণপত্র (এল/সি) খোলার দিকে যায়। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্ববাজারে বেশির ভাগ পণ্যের মূল্য ক্রমাগত নিচের দিকে যেতে থাকায় একই পরিমাণ

পণ্য আমদানির জন্য অনেক কম অর্থের প্রয়োজন পড়ে। এটি পণ্য আমদানিতে ঋণের চাহিদা হ্রাস করে। দ্বিতীয়ত, আর্থিক মন্দার কারণে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল অবস্থান নেয়। মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য খোলা ঋণপত্রের নিম্নগামিতা থেকে এর প্রমাণ মেলে। তৃতীয়ত, ২০০৮০৯ অর্থবছরে সরকারি ব্যয়ও কম ছিল।

১.৫.২ বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুদ হার হ্রাস

উৎপাদনমুখী খাতে পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯ সালের মার্চে রেপো ও রিভার্স রেপোর সুদের হার ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে যথাক্রমে ৮.৫ শতাংশ ও ৬.৫ শতাংশে নামিয়ে আনে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে এই হার ছিল যথাক্রমে ৮.৭৫ শতাংশ ও ৬.৭৫ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি সব বাণিজ্যিক ব্যাংককে ভোক্তা ঋণ ও ক্রেডিট কার্ড ঋণ ছাড়া সব ধরনের ঋণের গড় সুদের হার ১৫.৫ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশে নামিয়ে আনার নির্দেশ দেয়। তবে এই নির্দেশনার পরও ব্যাংকগুলোর আমানত ও ঋণের সুদ হারের ব্যবধান কাঙ্ক্ষিত হারে নাও কমতে পারে। কারণ, মুনাফা হ্রাসের আশঙ্কায় ব্যাংকগুলো ভবিষ্যতে আমানতের সুদের হার কমানোর উদ্যোগ নিতে পারে, যা সুদের হারের ব্যবধানকে আগের অবস্থায় রেখে দিতে পারে। ঋণের সুদ হার কমাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ সত্ত্বেও ২০০৮০৯ অর্থবছরে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গড় সুদের হার ছিল ১৩.৪৬ শতাংশ। এই সময়ে আমানত ও ঋণের সুদ হারের ব্যবধান দাঁড়ায় ৫.২ শতাংশ, যা ২০০৭০৮ অর্থবছরের চেয়ে বেশি (৪.৩৬ শতাংশ)। ঋণ ও আমানতের সুদ হারের মাসিক প্রবণতা চিত্র ১.১৪এ দেখানো হলো। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি এবং সুদের হার কমানোর কারণে বিভিন্ন ধরনের আমানত বৃদ্ধির হার ছিল সীমিত (চিত্র ১.১৫ এবং সারণি ১.৬)।

চিত্র ১.১৪: ঋণ ও আমানতের সুদ হারের প্রবণতা

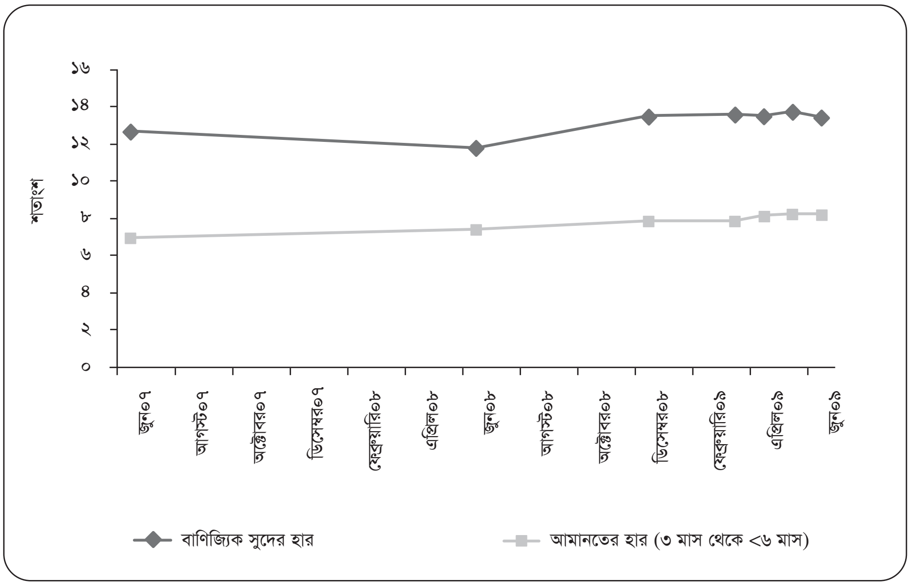

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

চিত্র ১.১৫: প্রকৃত সুদের হার

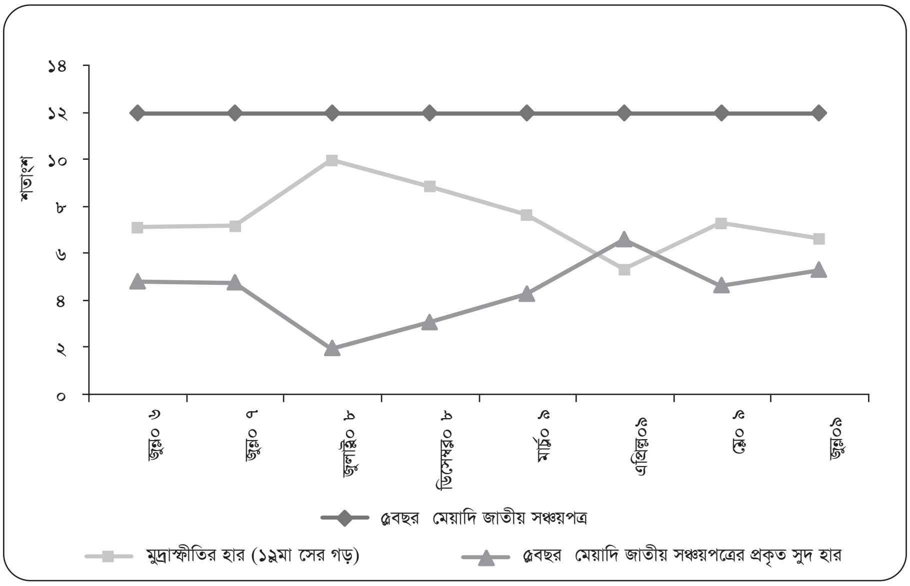

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১.৬: সরকারি দীর্ঘমেয়াদি ট্রেজারি বিল/বন্ডের ভারিত গড় সুদের হার এবং মূল্যস্ফীতি

(শতাংশ)

সময়কাল	বিজিটিবি*		জাতীয় সঞ্চয়পত্র		মূল্যস্ফীতির হার (১২মা সের গড়)	বিজিটিবিতে প্রকৃত সুদের হার		জাতীয় সঞ্চয়পত্রের প্রকৃত সুদ হার	
	৫বছর	১০বছর	৩বছর	৫বছর		৫বছর	১০বছর	৩বছর	৫বছর
জুন ২০০৬	১০.৬০	১২.০৯	১০.০০	১২.০০	৭.১৬	৩.৪৪	৪.৯৩	২.৮৪	৪.৮৪
জুন ২০০৭	১০.৬০	১২.১৪	১১.৫০	১২.০০	৭.২০		৪.৯৪	৪.৩০	৪.৮০
জুলাই ২০০৮	১০.৬০	১১.৭২	১১.৫০	১২.০০	১০.০০	০.৬০	১.৭২	১.৫০	২.০০
ডিসেম্বর ২০০৮	১০.৬০	১১.৭২	১১.৫০	১২.০০	৮.৯০	১.৭০	২.৮২	২.৬০	৩.১০
মার্চ ২০০৯	১০.৬০	১১.৭২	১১.৫০	১২.০০	৭.৬৯	২.৯১	৪.০৩	৩.৮১	৪.৩১
এপ্রিল ২০০৯	৯.৯৭	১১.৬৮	১১.৫০	১২.০০	৫.৩৬	৪.৬১	৬.৩২	৬.১৪	৬.৬৪
মে ২০০৯	১০.৬০	১১.৭০	১১.৫০	১২.০০	৭.৩২	৩.২৮	৪.৩৮	৪.১৮	৪.৬৮
জুন ২০০৯	১০.৬০	১১.৭০	১১.৫০	১২.০০	৬.৬৬	৩.৯৪	৫.০৪	৪.৮৪	৫.৩৪

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

দ্রষ্টব্য: *বিজিটিবি: বাংলাদেশ সরকারের ট্রেজারি বিল।

ঋণের উচ্চ সুদ হারের কারণগুলো হচ্ছে আর্থিক ব্যবস্থার অদক্ষতা, বাজার বিভাজন এবং প্রতিযোগিতার অভাব। সরবরাহজনিত এসব সমস্যার পাশাপাশি উচ্চ সুদের বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উচ্চ চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যদি নীতিমালার মাধ্যমে সমমূলধন অর্থায়নকে উৎসাহিত করা যায়, যা পুঁজিবাজারকে উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত করবে, তাহলে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা হ্রাস পাবে এবং ঋণের সুদ হারের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ঋণের উচ্চ সুদ হারের পেছনে আর যে কারণগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে, মূল্যস্ফীতিজনিত চাপ এবং ঋণখেলাপি হওয়ার ঝুঁকি। বাংলাদেশের মতো দেশে খেলাপি ঋণের পেছনে অর্থনীতিবহির্ভূত কারণগুলোও বড় ভূমিকা রাখে। যদিও ২০০৮-০৯ অর্থবছরে শ্রেণীকৃত ঋণের প্রবৃদ্ধি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা কম ছিল (১০.৫০ শতাংশ), তবু ২০০৯ সালের

জুনে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল মোট ঋণ স্থিতির ১৩.০২ শতাংশ, যা ২০০৮ সালের জুনে ছিল ১৩.৯৬ শতাংশ (সারণি ১.৭)।

সারণি ১.৭: আর্থিক খাতের বিভিন্ন নির্দেশকসমূহের পরিবর্তন

(শতকরা হার)

নির্দেশকসমূহ	অর্থবছর ২০০৭-০৮	অর্থবছর ২০০৮-০৯
মুদ্রাস্ফীতি (জুন)		
পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট	১০.০৪	২.২৫
১২মাসের গড়	৯.৯৪	৬.৬৬
মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি (জুলাই-জুন)		
ব্যাপক মুদ্রা	১৭.৪৮	১৯.১৭
মুদ্রার মজুদ	১৯.৭৮	৩১.৪৫
চাহিদা আমানত	১৫.৪৬	১৪.১০
মেয়াদি আমানত	১৭.১১	২১.৪২
অতিরিক্ত তারল্য	-৯.৯০	১৬৭.৬৪
ঋণের প্রবৃদ্ধি (জুলাই-জুন)		
– অভ্যন্তরীণ ঋণ	২০.৯১	১৬.০৩
– সরকারি খাতের ঋণ গ্রহণ	৩০.১৬	২৪.০৪
– বেসরকারি খাতের ঋণ গ্রহণ	২৪.৯৪	১৪.৬২
কৃষি ঋণের প্রবৃদ্ধি (জুলাই-জুন)		
বিতরণ	৬২.১৩	৮.২০
পরিশোধ	২৮.৩৯	৩৯.৫৪
শিল্প ঋণের প্রবৃদ্ধি (জুলাই-জুন)		
মেয়াদি ঋণ	৬২.৫৮	-০.৮৮
চলতি মূলধন	২৬.৩০	১২.৬৭
সকল ব্যাংকে শ্রেণীকৃত ঋণের অংশ (জুন)	১৩.০২	১০.৫০
সুদের হার (জুন)		
– ঋণের সুদ হার	১১.৮২	১৩.৪৬
– আমানত সুদ হার	৭.৪৬	৮.২৬
– আমানত ও ঋণের সুদ হারের ব্যবধান	৪.৩৬	৫.২০
– আন্তঃব্যাংক সুদ হার (জুন মাসের গড়)	৯.৭৪	১.৭১
বিনিময় হার (জুন মাসের গড়)		
বাংলাদেশি টাকা / মার্কিন ডলার	৬৮.৫২	৬৯.০৫
বাংলাদেশি টাকা / ইউরো	১০৬.৭০	৯৬.৭৮
বাংলাদেশি টাকা / ভারতীয় রুপি	১৬.০০	১৯.৫০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, বিনিয়োগ বাড়াতে মুদ্রানীতির বিভিন্ন হাতিয়ারের মধ্যে সুদের হার একটি হাতিয়ার। সহায়ক আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা ছাড়া এসব নীতি অনুষঙ্গ সফল হতে পারে না। দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর কর ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ; এবং এর সাথে আরও আছে ব্যবসাসহায়ক পরিবেশ, যার মধ্যে রয়েছে সহায়ক অবকাঠামো ও স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ। সিপিডির এক প্রতিবেদনে (CPD ২০০৭) দেখানো হয়েছে, সুদের হার ও বিনিয়োগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ঋণের সুদ হার কমানোর পাশাপাশি ঋণ ও আমানতের সুদ হারের ব্যবধান কমিয়ে আনার বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে; এর হার এখনও ৫ শতাংশ, যা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। আমানতের সুদ হারের সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণের কাজটি সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে, যাতে ক্ষুদ্র আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি বড় আমানতকারীদেরকে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট

করা যায়। তা নাহলে আমানতকারীরা পুঁজিবাজার ও আবাসন সহ লাভজনক অন্যান্য খাতের দিকে চলে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো ঋণজনিত সংকটে পড়তে পারে।

১.৫.৩ বিনিময় হারের কারসাজি কার্যকরী বিকল্প নয়

২০০৬ সালের জুন থেকে মার্কিন ডলারের সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একটি অংশ, বিশেষ করে রপ্তানিকারকদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে (চিত্র ১.১৬)। তাদের যুক্তি, মার্কিন ডলারের বিপরীতে অন্যান্য মুদ্রার উল্লেখযোগ্য হারে দর পতনের কারণে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি পণ্যের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমে গেছে। বস্তুত, সাম্প্রতিককালে ভারতীয় রুপি, শ্রীলঙ্কান রুপি, কম্বোডীয় রিয়েল এবং ভিয়েতনামী ডং সহ বিভিন্ন মুদ্রার তুলনায় বাংলাদেশি টাকা অতিমূল্যায়িত হয়েছে (চিত্র ১.১৭)। তবে বাংলাদেশি টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারও দীর্ঘদিন ধরে স্থিতিশীল আছে (চিত্র ১.১৮)।

রপ্তানি ও আমদানির স্থিতিস্থাপকতা বিবেচনায় টাকার অবমূল্যায়নের বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং টাকার দর পতন প্রকৃত অর্থেই সার্বিক বাণিজ্য ও চলতি হিসাবের ভারসাম্যে কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা তা দেখতে হবে। গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে রপ্তানির চেয়ে আমদানির স্থিতিস্থাপকতা বেশি (Razzaque ২০০৪)। এ অবস্থায় মুদ্রার মান কমানো হলে, আমদানির পরিমাণ কমবে, কিন্তু আনুপাতিক হারে রপ্তানি নাও বাড়তে পারে। তাই বাংলাদেশি টাকার অবমূল্যায়ন নীতির পরিবর্তে রাজস্ব ও মুদ্রানীতি ব্যবস্থাতে নীতিনির্ধারকদের এমন বিষয়গুলোর দিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে, যা রপ্তানিমুখী কার্যক্রমকে গতিশীল করবে এবং তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়াবে। ২০০৯ সালের এপ্রিলে সরকার ৩,৪২৪ কোটি টাকার যে প্রণোদনাগুচ্ছ ঘোষণা করে, তার বাইরে এ ধরনের পদক্ষেপ প্রয়োজন রয়েছে। প্রণোদনাগুচ্ছে রপ্তানিকারকদের ব্যাংক ঋণ পরিশোধের সময় ৯০ থেকে ১২০ দিন পর্যন্ত বাড়ানো হয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল থেকে ঋণের পরিমাণ ১ মিলিয়ন মার্কিন

চিত্র ১.১৬: বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার: জুলাই ২০০৬ – জুন ২০০৯

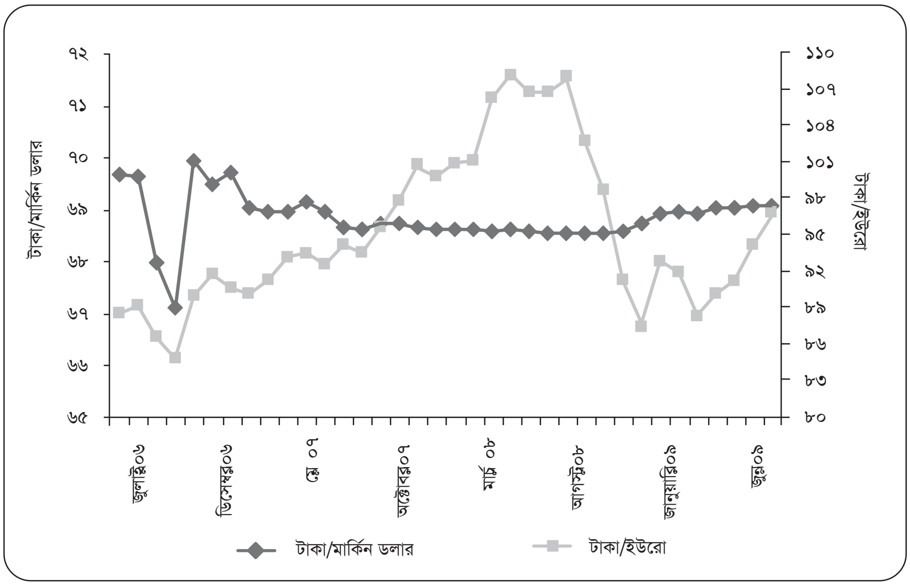

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

চিত্র ১.১৭: ডলারের বিপরীতে কয়েকটি আঞ্চলিক মুদ্রার গতি-প্রকৃতি

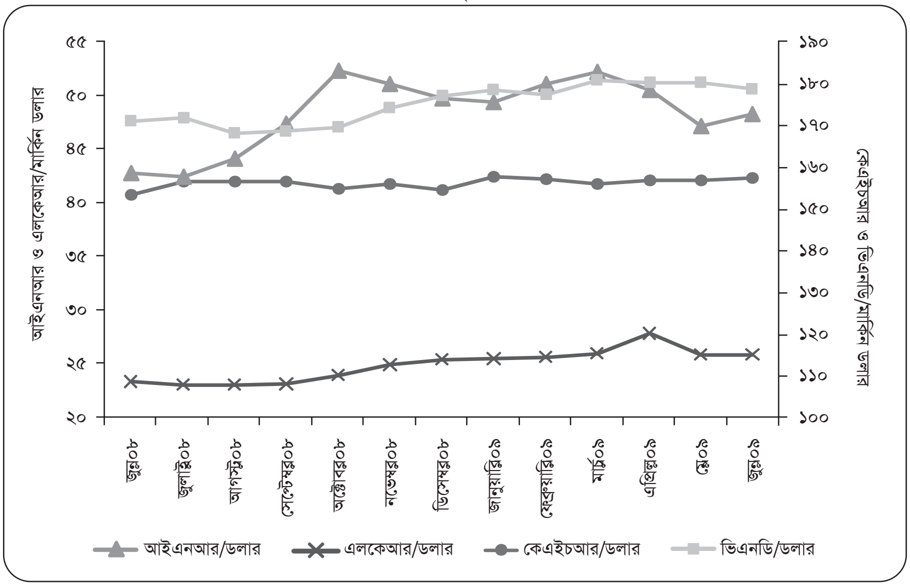

উৎস: www.oanda.com

দ্রষ্টব্য: আইএনআর: ভারতীয় রুপি; এলকেআর: শ্রীলঙ্কান রুপি; কেএইচআর: কম্বোডীয় রিয়েল; ভিএনডি: ভিয়েতনামী ডং।

চিত্র ১.১৮: প্রকৃত ও নমনীয় কার্যকর বিনিময় হার

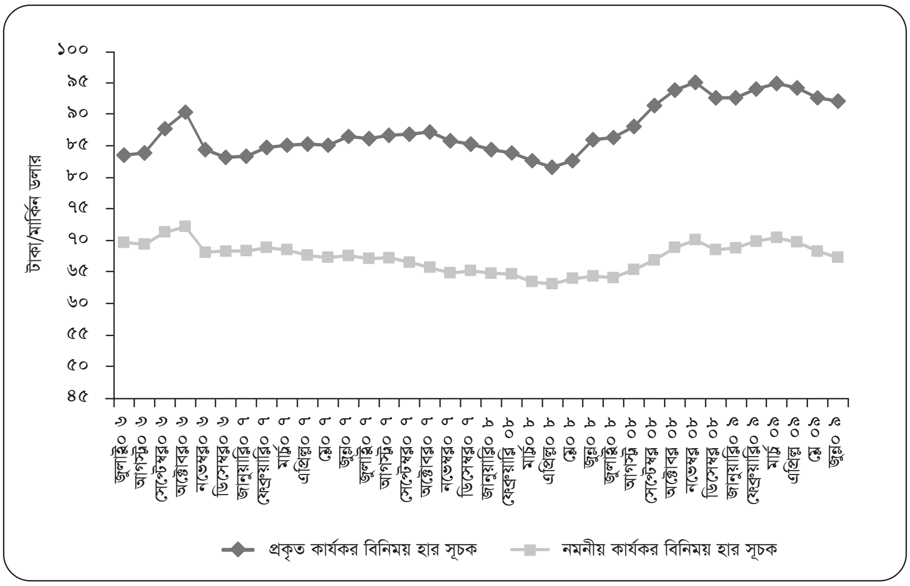

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

ডলার থেকে বাড়িয়ে ১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়। ২০০৯ সালের জুনে ঘোষিত ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটের মাধ্যমে সরকার মন্দায় ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলোকে সহায়তার জন্য ৫,০০০ কোটি

টাকার আরেকটি প্রণোদনাগুচ্ছ ঘোষণা করায় তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য এবং চামড়াসহ ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলো আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১.৫.৪ ভবিষ্যৎ মুদ্রানীতি

সার্বিকভাবে আর্থিক খাতের আগামীর চিত্র বেশ অস্পষ্ট। ব্যাংকিং খাত ও অর্থনীতির অবস্থা সম্পর্কে কোনো পূর্বাভাস দেওয়া যাচ্ছে না। বিনিয়োগ অবস্থার ধীরগতির কারণে (কৃষি ও শিল্প খাতের মতো উৎপাদনশীল খাতে ঋণ সরবরাহ কমে যাওয়া এবং ব্যাংকে ব্যাপক উদ্বৃত্ত তারল্য যার প্রমাণ দেয়) মাঝারি সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা যেতে পারে। ব্যাপক প্রণোদনাগুচ্ছের ফল হিসেবে আগামী মাসগুলোতে বড় বড় অর্থনীতির পুনর্জাগরণের সম্ভাবনার মুখে বিশ্ববাজারে পণ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাই ভবিষ্যৎ মুদ্রানীতিতে মূল্য স্থিতিশীলতা ধরে রাখা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনা, আর্থিক খাতের অলস অর্থ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণকে আরও সহজলভ্য করা, এবং মুদ্রার যোগানের প্রবৃদ্ধি ও মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামা কে নিরবচ্ছিন্ন তদারকির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিকে জোরদারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৬ প্রকৃত খাত

১.৬.১ কৃষি

২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের কৃষি খাতে চারটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখযোগ্য: ১. রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন হলেও কৃষক তার ন্যায্যমূল্য এমনকি উৎপাদন ব্যয় প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়; ২. বাংলাদেশে সার সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে এবং বিশ্ববাজারে সারের মূল্য হ্রাস পায়; ৩. আন্তর্জাতিক বাজারে গুঁড়ো দুধের মূল্য হ্রাসের প্রেক্ষিতে ব্যাপক গুঁড়ো দুধ আমদানির ফলে স্থানীয় দুগ্ধশিল্পে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে; এবং ৪. মাংস উৎপাদন বাড়লেও ডিম উৎপাদনে ধস নামে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং ধান উৎপাদন

২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে মোট খাদ্যশস্য (ধান ও গম) উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ২২ লাখ মেট্রিক টন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ উৎপাদন (চিত্র ১.১৯)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে বোরো ধানের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭৮ লাখ মেট্রিক টন; আমন ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৬ লাখ মেট্রিক টন; এবং আউস ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৯ লাখ মেট্রিক টন। অন্যদিকে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে গম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮.৫ লাখ মেট্রিক টন। মোট খাদ্যশস্য এবং চাল উৎপাদনের পরিমাণ আগের বছরের চেয়ে (২০০৭-০৮ অর্থবছর) যথাক্রমে ৮.০ শতাংশ ও ৮.২ শতাংশ বেশি ছিল। তিনটি ধান উৎপাদন মৌসুমেই (আউস, আমন ও বোরো) ধানের ভালো ফলন এবং গম উৎপাদনেও একই অবস্থার কারণে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের এতটা ভালো উৎপাদন হয়েছে।

উৎপাদনের পরিমাণের দিক থেকে এটি একটি ভালো মৌসুম হলেও, মুনাফার দিক থেকে বোরো ধান উৎপাদনকারীদের জন্য এটি ছিল একটি মন্দ বছর। সংগ্রহ মৌসুমে মাঠপর্যায়ে মোটা চাল ও ধানের মূল্য কোন কোন ক্ষেত্রে এতটাই কম ছিল যে কৃষকদের উৎপাদন খরচের চেয়েও কম দামে ধান বিক্রি করতে হয়েছে। ২০০৯ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সিপিডির গবেষকদের একটি দল নওগাঁ, রংপুর, বগুড়া ও ময়মনসিংহের কিছু নির্বাচিত এলাকায় মাঠপর্যায়ে পরিদর্শনে গিয়ে জানতে পারেন বিদ্যমান বাজারদরে

চিত্র ১.১৯: ২০০৮-০৯ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রাক্কলন

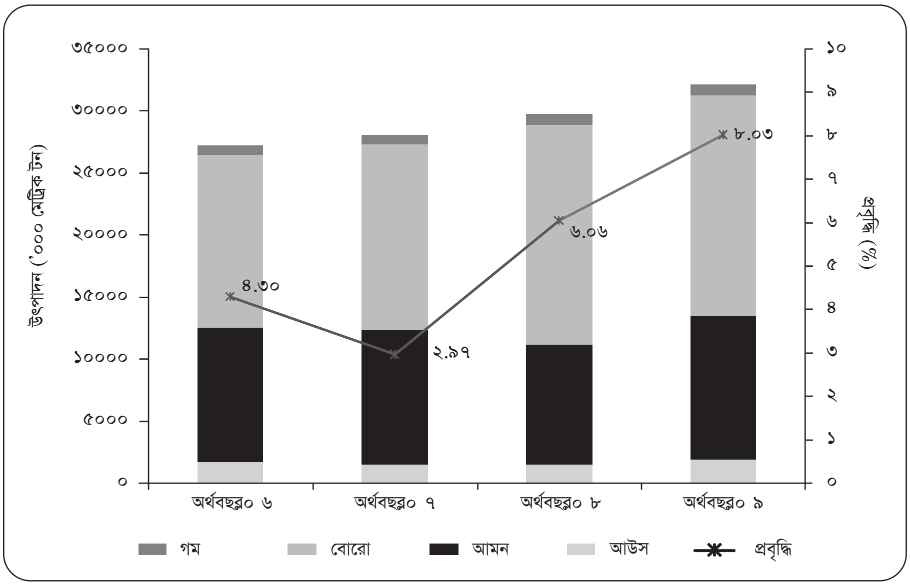

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

প্রতি একরে ধান উৎপাদকদের লোকসানের পরিমাণ ছিল ১,৭০০ থেকে ৪,০০০ টাকা (সারণি ১.৮)।[৮] মাঠ পরিদর্শনের অন্যান্য পর্যবেক্ষণের মধ্যে ছিল: (১) ধানভেদে (হাইব্রিড ও উচ্চ ফলনশীলজাত) এবং সেচ পদ্ধতির (বিদ্যুৎ অথবা ডিজেলচালিত) ভিন্নতার দিক থেকে প্রতি কেজি বোরো ধানের অনুমিত উৎপাদন ব্যয় ছিল ১১.৭৩ টাকা থেকে ১২.৭৫ টাকার মধ্যে। বিদ্যুৎচালিত সেচের তুলনায় ডিজেলচালিত সেচে উৎপাদিত ধানের উৎপাদন ব্যয় ছিল বেশি। বোরো ধান উৎপাদনের ভারিত গড় মূল্য ছিল ১২.৪৯ টাকা, আর চাল উৎপাদনের মূল্য প্রতি কেজি ২০.১৪ টাকা। (২) কৃষকেরা ব্যবসায়ীদের কাছে ভেজা ধান বিক্রি করেছেন। শুকনো ধানের হিসাবে কৃষকেরা হাইব্রিড ধান বিক্রি করে প্রতি কেজি ১০ থেকে ১১.৬৭ টাকা; বিআর২৮ প্রতি কেজি ১১.৬৭ থেকে ১২.৫০ টাকা এবং বিআর২৯ প্রতি কেজি ১৪.০৬ টাকা পেয়েছে। (৩) মাঠপর্যায়ে মোটা চালের ধানের গড় মূল্য (প্রতি কেজি ১০.৮৫ টাকা) ছিল গড় উৎপাদন ব্যয়ের (প্রতি কেজি ১২.৪৯ টাকা) চেয়ে কম।

কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সরকারি খাতে খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (পিএফডিএস) চাহিদার প্রয়োজনে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় প্রতি কেজি ধান সংগ্রহের মূল্য ১৪ টাকা এবং চালের মূল্য ২২ টাকা নির্ধারণ করে। উৎপাদন ব্যয় এবং ধানের বিদ্যমান বাজার মূল্যের নিরিখে এটি ছিল যৌক্তিক দাম। তবে, এই খাতে সরকারের সাফল্য ছিল খুবই সীমিত। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সরকার মাত্র ১৪.৮২ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য (১৪.৪৮ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ০.৩৪ লাখ মেট্রিক টন গম) কিনতে সক্ষম হয়, যা আগের বছরের সংগৃহীত ৮.৭ লাখ মেট্রিক টনের চেয়ে ৬৬.৫ শতাংশ বেশি। আগের বছরের (অর্থবছর ২০০৭-০৮) ৬৯.৫ শতাংশের বিপরীতে আলোচ্য বছরের অর্জন ছিল ১১১ শতাংশ। চলতি

[৮] গবেষক দল প্রয়োজনীয় তথ্য জানার জন্য কৃষক, বিক্রেতা, কলমালিক এবং স্থানীয় খাদ্য সংগ্রহ কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলেন।

সারণি ১.৮: ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বোরো উৎপাদন খরচ এবং আয়

ব্যবহৃত উপকরণ	উচ্চ ফলনশীল বোরো জাত		হাইব্রিড বোরো জাত	
	ডিজেলচালিত সেচ (টাকা)	বিদ্যুৎচালিত সেচ (টাকা)	ডিজেলচালিত সেচ (টাকা)	বিদ্যুৎচালিত সেচ (টাকা)
বীজ	৬০০.০০	৬০০.০০	১৩২০.০০	১৩২০.০০
সার	৪৩০৮.০০	৪৩০৮.০০	৫২২৫.০০	৫২২৫.০০
গোবর সার	৪০০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০
কীটনাশক	৫০০.০০	৫০০.০০	৮৬০.০০	৮৬০.০০
মানব শ্রম	১০৬০০.০০	১০৬০০.০০	১১৭২০.০০	১১৭২০.০০
জমি চাষ	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০
সেচ	৪০০০.০০	২০০০.০০	৪০০০.০০	২০০০.০০
চলতি মূলধনের সুদ	১১১০.৪০	১০১০.৪০	১২৬৬.২৫	১১৬৬.২৫
জমির ভাড়া	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০
মোট ব্যয় (টাকা/একর)	২৯৩১৮.৪০	২৭২১৮.৪০	৩২৫৯১.২৫	৩০৪৯১.২৫
ধান উৎপাদন খরচ (টাকা/কেজি)	১২.৭৫	১১.৮৩	১২.৫৪	১১.৭৩
চালের উৎপাদন খরচ (টাকা/কেজি)	২০.৫৩	১৯.১৩	২০.২১	১৮.৯৭
একর প্রতি উৎপাদন (কেজি)	২৩০০	২৩০০	২৬০০	২৬০০
ধানের মূল্য (টাকা/কেজি), ২০০৯ এর মধ্য মে	১২.০০	১২.০০	১১.০০	১১.০০
মোট আয় (টাকা/একর)	২৭৬০০.০০	২৭৬০০.০০	২৮৬০০.০০	২৮৬০০.০০
নীট আয় (টাকা/একর)	(-) ১৭১৮.৪০	৩৮১.৬০	(-) ৩৯৯১. ৩০	(-) ১৮৯১.৩০

উৎস: সিপিডি মাঠপর্যায়ের জরিপ, ২০০৯।

দ্রষ্টব্য: ধান থেকে চালে রূপান্তরের জন্য ১ কেজি ধান = ০.৬৫ কেজি চাল ধরা হয়েছে। ধান সিদ্ধ করা সহ ভাঙ্গানোর খরচ ধরা হয়েছে কেজি প্রতি ০.৬০ টাকা।

মৌসুমে সরকার ১২.৫ লাখ মেট্রিক টন বোরো (১১ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ১.৫ লাখ মেট্রিক টন গম) সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ২০০৯ সালের ১ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ৭.১৫ লাখ বোরো ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগ্রহমূল্য এবং কৃষকের প্রাপ্ত মূল্যের মধ্যে ব্যবধানের প্রেক্ষিতে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনার প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তৈরির বিষয়টি নতুনভাবে উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকের মালিকানায় চালকল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়, যাতে তারা মিল থেকে সরকারের চাল সংগ্রহের সুবিধা পুরোপুরি পেতে পারে। বেসরকারি খাতের গুদাম যাতে কৃষকেরা ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যবহার করতে পারে, তাও বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। সম্ভবত এটিও হতে পারে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। সরকার ঘোষিত সংগ্রহমূল্য এবং কৃষকের প্রাপ্ত মূল্যের ব্যবধানের সমস্যাটি আগামী দিনেও বহাল থাকতে পারে। তাই সব সুবিধাভোগীর অংশগ্রহণে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে এর একটি কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করা জরুরি।

সারের প্রাপ্যতা ও মূল্য

২০০৮–০৯ অর্থবছরে সারের প্রাপ্যতাসংক্রান্ত বড় কোনো অভিযোগ ছিল না। তবে অর্থবছরের শুরুতে সারের মূল্য ছিল কৃষকদের জন্য একটি উদ্বেগের বিষয়। ২০০৮ সালের মে ও জুনের মধ্যে মাঠপর্যায়ে সব ধরনের সারের মূল্য লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে ইউরিয়া ও টিএসপির (ট্রিপল সুপার ফসফেট) মূল্য বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়, এমওপির (মিউরিয়েট অব পটাশ) মূল্য বাড়ে ১.৫ গুণ। সারের উচ্চমূল্যের কারণে আমন মৌসুমে কৃষকেরা নন-ইউরিয়া সার বেশি ব্যবহার করে। এমন পরিস্থিতিতে নবনির্বাচিত সরকার ২০০৯ সালের ১৪ জানুয়ারি সারের মূল্য পুনর্নির্ধারণ করে টিএসপি প্রতি কেজি ৪০ টাকা, এমওপি ৩৫ টাকা এবং ডিএপি প্রতি কেজি ৪৫ টাকা বেঁধে দেয়, যার পেছনে রয়েছে বড় ধরনের

ভর্তুকি। এই সময়োপযোগী উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল ইউরিয়া ভিন্ন অন্য সারগুলোতে ভর্তুকি বাড়িয়ে সারের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারকে উৎসাহিত করা এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস। সরকার মাঠপর্যায়ে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সক্ষম হয়। ফলে কৃষকেরা সরকারের নির্ধারিত দামে সার কিনতে পেরেছে। এটি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বোরো ও গম উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট সারের সরবরাহ ছিল ২৮ লাখ মেট্রিক টন, যার মধ্যে ছিল ২৪ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ২ লাখ মেট্রিক টন টিএসপি, ০.৫ লাখ মেট্রিক টন ডিএপি, ১.৫ লাখ মেট্রিক টন এমওপি (সারণি ১.৯)। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সব ধরনের সারের ব্যবহার ছিল গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সারের অস্বাভাবিক উচ্চমূল্য ওই অর্থবছরের সার ব্যবহারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নন-ইউরিয়া সার (টিএসপি, এমওপি এবং ডিএপি) ব্যাপক পরিমাণে আলু ও শীতকালীন সবজি চাষে ব্যবহৃত হয় বলে এগুলোর ত্বরিত ব্যবহার বাড়ানোর সুযোগ খুবই সীমিত। বোরো চাষীদের একটি বড় অংশ মধ্য-জানুয়ারি তে চারা রোপণ করেছে। তাই তাদের পক্ষেও বোরো ধান উৎপাদনে নন-ইউরিয়া সার ব্যবহারের কোনো সুযোগ ছিল না। এই সবগুলো কারণেই ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সারের ব্যবহার হ্রাস পায়।

সারণি ১.৯: বাংলাদেশে সার সরবরাহ

(লাখ মেট্রিক টন)

সার	অর্থবছর ২০০৪-০৫	অর্থবছর ২০০৫-০৬	অর্থবছর ২০০৬-২০০৭	অর্থবছর ২০০৭-০৮	অর্থবছর ২০০৮-০৯
ইউরিয়া	২৫.২৩	২৪.৬১	২৫.২৭	২৬.৬৮	২৪.০০
টিএসপি	৪.২০	৪.৩৬	৩.৪০	৪.৬১	২.০০
ডিএপি	১.৭১	১.৩০	১.১৫	২.৫০	০.৫০
এমওপি	২.৬০	২.৯১	২.৩০	৪.০১	১.৫০
মোট	৩৩.৭৪	৩৩.১৮	৩২.১২	৩৭.৮০	২৮.০০

উৎস: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়।

চিত্র ১.২০: আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম (ইউরিয়া, ডিএপি, টিএসপি ও এমওপি): জুলাই ২০০৫ – জুন ২০০৯

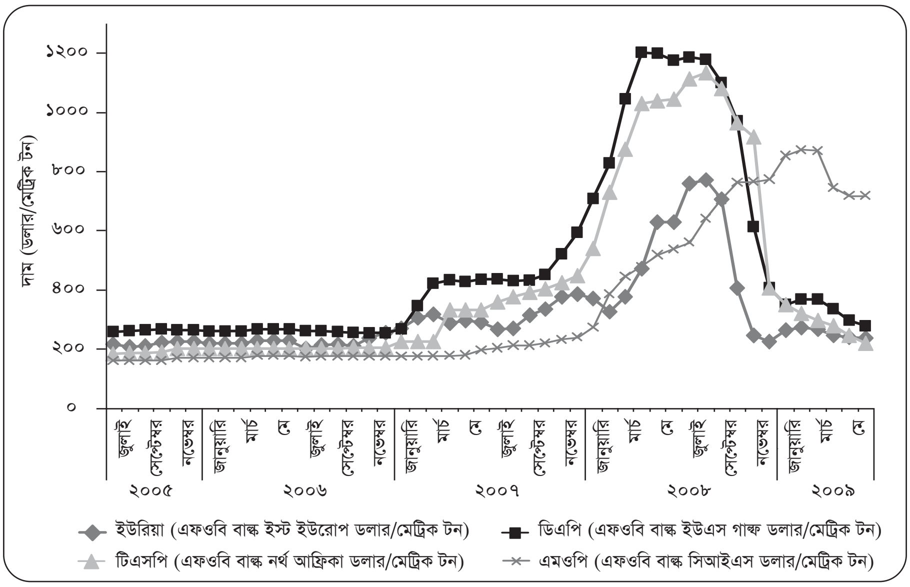

উৎস: কমোডিটি মার্কেট রিভিউ, বিশ্বব্যাংক।

২০০৮ সালের জুলাই থেকে ২০০৯ সালের জুলাইয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে এমওপি ছাড়া সব ধরনের সারের মূল্য ব্যাপকভাবে কমেছে (চিত্র ১.২০)। এই সময়ে ইউরিয়া, টিএসপি ও ডিএপির মূল্য যথাক্রমে ৬৯ শতাংশ, ৮০ শতাংশ ও ৭৭ শতাংশ কমেছে। অন্যদিকে এমওপির মূল্য বেড়েছে ২৮ শতাংশ। ২০০৯ সালের জুনে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি মেট্রিক টন ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারের মূল্য ছিল যথাক্রমে ২৩৮, ২২০, ২৭৮ ও ৭১৮ মার্কিন ডলার। ইউরিয়া, টিএসপি ও ডিএপি সারের ২০০৭ ও ২০০৮ সালের ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধির পর আবারও তা উল্টোদিকে মোড় নিয়ে ২০০৬ সালের সমান পর্যায়ে নেমে আসে। তবে এমওপির মূল্যের উর্ধ্বগতি বজায় থাকে। বর্তমান আন্তর্জাতিক মূল্য অনুসারে বিভিন্ন ধরনের সারের আমদানিমূল্য (জাহাজ ভাড়া ও বীমা ব্যয়সহ) দাঁড়ায় প্রতি কেজি ইউরিয়া ১৯.৭০ টাকা, টিএসপি ১৮.৫০ টাকা, ডিএপি ২২.৪৫ টাকা এবং এমওপি ৫২.৬০ টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে সারের মূল্য হ্রাসের প্রেক্ষিতে সরকার নন-ইউরিয়া সারের মূল্য আরও কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। এটি সারের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারকে আরও উৎসাহিত করবে এবং উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস করবে, যা দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কৃষিপণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সহায়তা করবে।

দুধ উৎপাদন

২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে দুধের উৎপাদন ছিল ২২ লাখ ৮৬ হাজার মেট্রিক টন, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের দুধ উৎপাদনের চেয়ে ১৩ শতাংশ কম এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরের চেয়ে ০.৩ শতাংশ বেশি। এ বছর গুঁড়ো দুধের আন্তর্জাতিক মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়, যা দেশের দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক বাজারে গুঁড়ো দুধের মূল্য ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পায় (প্রতি মেট্রিক টনের মূল্য ৪,১৭৫ মার্কিন ডলার থেকে ২,১০০ ডলার হয়) (চিত্র ১.২১)। বাংলাদেশের আমদানিকৃত প্রধান দুগ্ধপণ্য হচ্ছে সুইটেন্ড মিল্ক পাউডার (এইচএস ০৪০২১০) এবং নন-সুইটেন্ড মিল্ক পাউডার (এইচএস ০৪০২২১)। ২০০৮-০৯

চিত্র ১.২১: আন্তর্জাতিক বাজারে গুঁড়ো দুধের দাম: জুলাই ২০০৬ – জুন ২০০৯

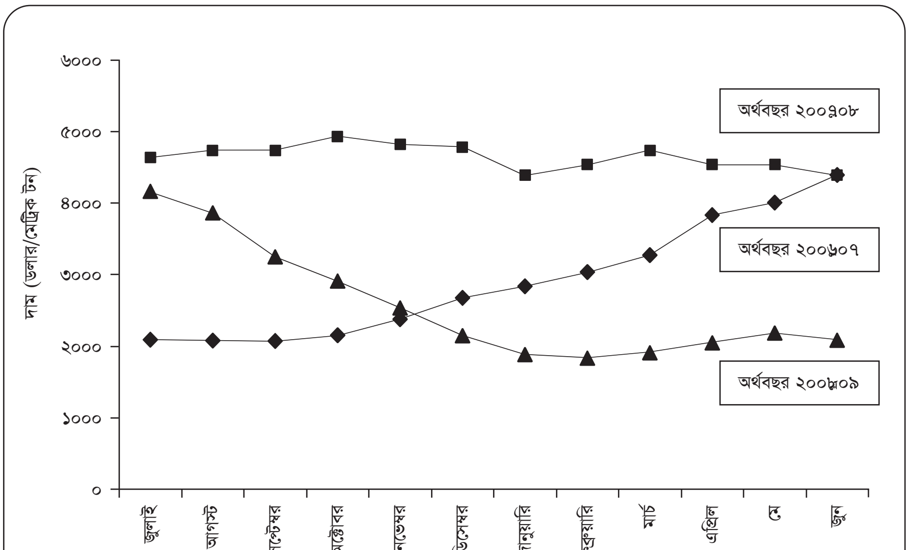

উৎস: ইন্টারন্যাশনাল ডেইরি মার্কেট নিউজ রিপোর্ট, ইউএসডিএ।

অর্থবছরে সুইটেন্ড ও নন্সুই টেন্ড মিল্ক পাউডার আমদানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১,১৯০ ও ১৯,২৪০ হাজার মেট্রিক টন, যা ২০০৭–০৮ অর্থবছরের তুলনায় ১০৭ শতাংশ ও ৫৩ শতাংশ বেশি। মূল্যের দিক থেকে ২০০৮–০৯ অর্থবছরে সুইটেন্ড মিল্ক পাউডার আমদানির পরিমাণ আগের অর্থবছরের তুলনায় ৩৫ শতাংশ বেশি ছিল। তবে নন্সুই টেন্ড মিল্ক পাউডার আমদানির পরিমাণ ছিল ১৮ শতাংশ কম। ২০০৯ সালের প্রথম তিন মাসের পরিসংখ্যান দেখলে আমদানিকৃত দুধের প্রভাবের তীব্রতা উপলব্ধি করা যাবে। ওই সময়ে (২০০৮–০৯ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিক তথা জানুয়ারি–মার্চ) সুইটেন্ড গুঁড়ো দুধ আমদানি হয়েছে ৫,২৭০ মেট্রিক টন, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৩ গুণ। অন্যদিকে নন্সুইটেন্ড গুঁড়ো দুধ আমদানির পরিমাণ ছিল ৫,৫০০ হাজার মেট্রিক টন, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ছিল ৬১ শতাংশ বেশি। ২০০৮–০৯ অর্থবছরে সুইটেন্ড গুঁড়ো দুধে কার্যকর আমদানি শুল্ক ছিল ৩৩ শতাংশ (যা ২০০৭–০৮ অর্থবছরে ছিল ৩৭ শতাংশ); নন্সুই টেন্ড গুঁড়ো দুধে তা ছিল ৭৭ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৭৮ শতাংশ। হঠাৎ এই স্বল্পমূল্যের দুধের বিশাল আমদানি দেশীয় দুগ্ধ উৎপাদক ও কোম্পানিগুলোর জন্য বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করে।[৯] কৃষকেরা জানিয়েছে, ২০০৯ সালের এপ্রিলে বাজারে দুধের দাম উৎপাদন ব্যয়ের (৩৫ টাকা প্রতি লিটার) অনেক নিচে চলে আসে, কেননা ক্রেতারা তা আরও কম দামে কিনতে চেয়েছে।

মে মাসের মাঝামাঝি সিপিডির গবেষকদের একটি দল সিরাজগঞ্জ পরিদর্শন করে। তারা সেখানে দুগ্ধ খামারি, গোখাদ্য বিক্রেতা এবং মিল্ক ভিটা সহ বিভিন্ন কোম্পানির কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে। ওই পরিদর্শন থেকে যেসব পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায় সেগুলো হলো: (১) আন্তর্জাতিক বাজারে দুধের উচ্চমূল্য এবং মেলামাইন কেলেঙ্কারির কারণে দেশে তরল দুধের চাহিদা অনেক বেড়ে যাওয়ায় ২০০৭ ও ২০০৮ সালে খামারিরা ভালো ব্যবসা করেছে; (২) স্বল্পমূল্যের গুঁড়ো দুধের সহজলভ্যতার কারণে ভোক্তা ও মিষ্টি প্রস্তুতকারকদের কাছে তরল দুধের চাহিদা বেশ কমে যায়; (৩) কোম্পানিগুলো কৃষক ও খামারিদের কাছ থেকে দুধ কেনার পরিমাণ এবং দুধের মূল্য (লিটারে ৪ থেকে ৬ টাকা) উভয়ই কমিয়ে দেয়; (৪) ২০০৯ সালের মার্চ–এপ্রিলে গোখাদ্যের দাম আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ কমে যায়।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে খামারিদের জন্য যেসব সহায়তা দেওয়া যেতে পারে: (১) দুগ্ধ উৎপাদনের ওপর থেকে ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহার; (২) গুঁড়ো দুধের আমদানি শুল্কের পুনর্বিন্যাস; (৩) দুগ্ধ খামারঘন এলাকাগুলোতে পশুসম্পদ অধিদপ্তর থেকে অধিকসংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ করে খামারিদের উন্নততর কারিগরি সেবা প্রদান; (৪) ভর্তুকি মূল্যে ওষুধ ও ভ্যাকসিন সরবরাহ। এমন অবস্থায় ২০০৯–১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে গৃহীত কিছু ব্যবস্থাকেও স্বাগত জানাতে হয়। এগুলো হচ্ছে: ১. আমদানিকৃত গুঁড়ো দুধে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ; ২. তরল দুধকে গুঁড়ো দুধে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান ২.৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার; ৩. গুঁড়ো দুধের মূল্য ১০০ টাকা কেজি নির্ধারণ, যার ফলে গুঁড়ো দুধ উৎপাদনে ভ্যাটের পরিমাণ প্রতি কেজিতে ৫০ টাকা থেকে ১৫ টাকায় নেমে আসে। আশা করা যায়, এসব উদ্যোগের ফলে ডেইরি খাত উপকৃত হবে।

মাংস ও ডিম উৎপাদন

২০০৮–০৯ অর্থবছরে মাংসের উৎপাদন ছিল ১০ লাখ ৮৪,০০০ মেট্রিক টন, যা ২০০৭–০৮ ও ২০০৬–০৭ অর্থবছরের চেয়ে ৪.২ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে মোট ডিমের উৎপাদন ছিল ৪৬,৯৬১ লাখ, যা ২০০৭–০৮ অর্থবছরের তুলনায় ১৭.০ শতাংশ এবং ২০০৬–০৭ অর্থবছরের তুলনায় ১২.৫ শতাংশ

[৯] ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে শত শত খামারি রাস্তায় দুধ ঢেলে দুধের দাম কমে যাওয়ার প্রতিবাদ করে।

কম। বার্ড ফ্লুর বিস্তার ডিম উৎপাদনের এই নিম্নমুখী প্রবণতার কারণ। বড় খামারগুলো বার্ড ফ্লু থেকে লেয়ার মুরগি রক্ষার কৌশল জানলেও ছোট খামারগুলোর তা জানা না থাকায় তারা ডিম উৎপাদনই বন্ধ করে দেয়। উৎপাদন হ্রাসের আরেকটি কারণ ছিল ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রদানে অসম্মতি।

১.৬.২ শিল্প

২০০৮-০৯ অর্থবছরে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি

শিল্প খাতের জন্য ২০০৮–০৯ অর্থবছরটি ছিল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর দুর্ভাবনার সময়কাল। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব ২০০৮–০৯ অর্থবছরের প্রথমার্ধে অনুভূত হতে শুরু করে।

এর সঙ্গে ছিল ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯ অনুসারে ২০০৮–০৯ অর্থবছরে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.৯২ শতাংশ, যা আগের বছরের তুলনায় ১.৫ শতাংশ কম। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শিল্প উৎপাদন পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০৮–০৯ অর্থবছরে বড়, মাঝারি ও ছোট – সব শিল্পেই যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এ হিসাব মতে, ২০০৮–০৯ অর্থবছরে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৪ শতাংশ, যা ২০০৭–০৮ অর্থবছরে ছিল ৬.৯ শতাংশ। ছোট আকারের শিল্পে ২০০৭–০৮ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.৮ শতাংশ, যা ২০০৮–০৯ অর্থবছরে বেড়ে হয়েছে ৭.৮ শতাংশ।[১০]

চিত্র ১.২২: বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের কোয়ান্টাম সূচক (কিউআইপি)

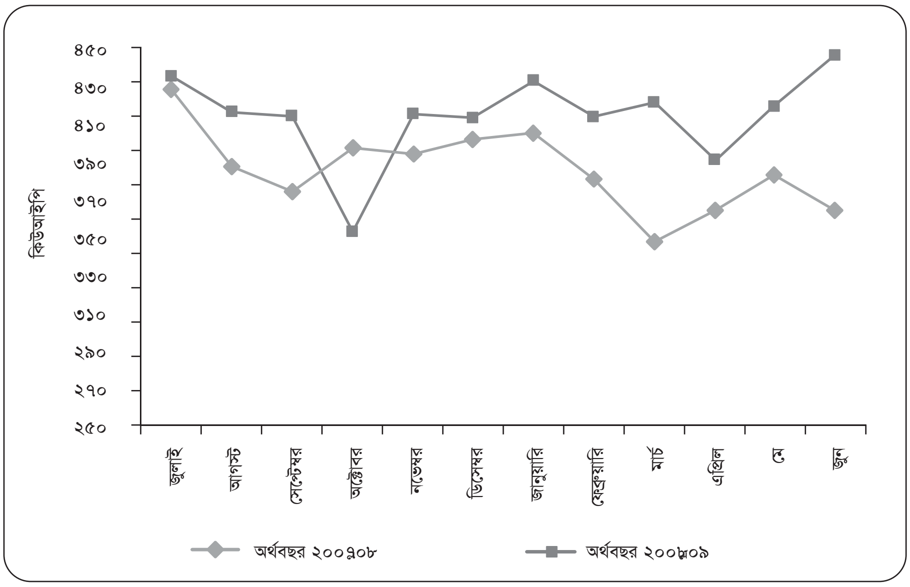

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

[১০] ২০০৯ সালের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষায় কয়েক মাসের প্রক্ষেপিত উপাত্ত এবং শিল্প উৎপাদন পরিসংখ্যানের কিউআইপি নির্ণয়ে ব্যবহৃত সূচকের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলনে পার্থক্যের বিষয়টি আংশিক ব্যাখ্যা করা যায়।

২০০৮–০৯ অর্থবছরে শিল্পোৎপাদন (ম্যানুফ্যাকচারিং) ওঠানামার মধ্যে ছিল (চিত্র ১.২২ এবং সারণি ১.১০)। তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, ২০০৮–০৯ অর্থবছরে এ খাতের ব্যাপক ওঠানামা আগের বছরের চেয়ে বেশি ছিল।[১১] ২০০৮ সালের জুলাই–ডিসেম্বর সময়ে উৎপাদনের অস্থিতিশীলতা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। সম্ভবত ওই অর্থবছরের প্রথমার্ধে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার তীব্রতর প্রভাবের কারণে এটা হয়েছিল। বেশির ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত ২০০৮–০৯ অর্থবছরের প্রথমার্ধে ব্যাপক উত্থান-পতনের মধ্যে পড়ে। আরও একটি রপ্তানিমুখী পণ্য, পাটবস্ত্রও অর্থবছরের শেষার্ধে একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। অন্যদিকে, স্থানীয় বাজারমুখী পণ্য সিমেন্ট উৎপাদনে এই ওঠানামা ছিল অনেক কম। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য চাহিদার ওঠানামা ২০০৮–০৯ অর্থবছরে দেশে রপ্তানিমুখী পণ্যের উৎপাদন ও বিনিয়োগে বেশ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সারণি ১.১০: ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে উৎপাদনের ওঠা-নামা

শিল্প	পরিমিত ব্যবধান					
	অর্থবছর ২০০৭–০৮			অর্থবছর ২০০৮–০৯		
	জুলাই–ডিসেম্বর	জানুয়ারি–জুন	জুলাই–জুন	জুলাই–ডিসেম্বর	জানুয়ারি–জুন	জুলাই–জুন
ম্যানুফ্যাকচারিং (কিউআইপি)	১৮.২	১৯.৯	২১.৮	২৮.২	১৮.৭	২৩.৭
তৈরি পোশাক (মিলিয়ন টাকা)	৩৯৮৩.৩	৩২২৬.৬	৪৬১৪.৯	৬০৯৭.৫	৩৪১৯.৮	৫০৯৯.৩
পাটবস্ত্র (মেট্রিক টন)	১৪৮১.৮	২৯৯৬.৩	২৩৬১.১	২৭১০.১	৮৬৮১.৯	৬১৩৪.৫
সিমেন্ট (মেট্রিক টন)	৮৩৬২.৮	১৮০৪২.৯	১৬০৫২.৯	১২২৪.৪	১১৩৬৩.০	৭৮৫৭.৬

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি শিল্প খাতের কার্যক্রম

শিল্প উৎপাদন সূচক অনুযায়ী ২০০৮–০৯ অর্থবছরে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের তুলনায় বড় ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধির হার কম ছিল। এ সময়ে ক্ষুদ্র ও বড় আকারের শিল্পসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৭.৮ শতাংশ ও ৭.৪ শতাংশ (চিত্র ১.২৩)। কারণ এ সময় কাঠজাত দ্রব্য, কাগজ ও কাগজজাত সামগ্রীসহ লৌহজাত সামগ্রীর উৎপাদন অনেকাংশে কমে যাওয়ার পাশাপাশি পাট, সুতা বা বস্ত্র খাতের বেশ কিছু বড় ও মাঝারি শিল্পের উৎপাদনও কিছুটা কমে যায়। অন্যদিকে একই সময়ে আসবাবপত্র, খাদ্য ও পানীয়, তামাকসহ বিভিন্ন ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বেড়েছে অনেক। তবে আয়তন ও ধরনভেদে ২০০৮–০৯ অর্থবছরের অস্থিতিশীল সময়ে তেমন কোন বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়নি।

বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির গতি শ্লথ হওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন কমে যাওয়ায় ২০০৮–০৯ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদানও প্রায় অপরিবর্তিত দেখা গিয়েছে। ২০০৭–০৮ অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ বেড়েছে ১৬.৯ শতাংশ হারে। এক বছর পরে এই বৃদ্ধির হার ১৪.৪ শতাংশে এসে ঠেকে। ফলশ্রুতিতে আলোচ্য সময়ে জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান প্রায় স্থবির হয়ে ১৭.৭৮ শতাংশে দাঁড়ায়। এক বছর আগে এই খাতের অবদান ছিল ১৭.৭৭ শতাংশ। বিগত কয়েক বছর ধরে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া পুঁজির উৎপাদনশীলতা কমতে থাকাকেই নির্দেশ করে। ২০০৫–০৬ অর্থবছরে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত ছিল ৩.৭৪ শতাংশ, যেটি ২০০৮–০৯ অর্থবছরে ৪.১১

[১১] ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের পরিমিত ব্যবধান ২০০৭–০৮ অর্থবছরে ছিল ২১.৮ যা বেড়ে ২০০৮–০৯ অর্থবছরে হয়েছে ২৩.৭।

শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এই অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৩.৮১ শতাংশ ও ৩.৯১ শতাংশ (সারণি ১.১১)।

চিত্র ১.২৩: কিউআইপি অনুসারে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পোৎপাদনের পরিবর্তন

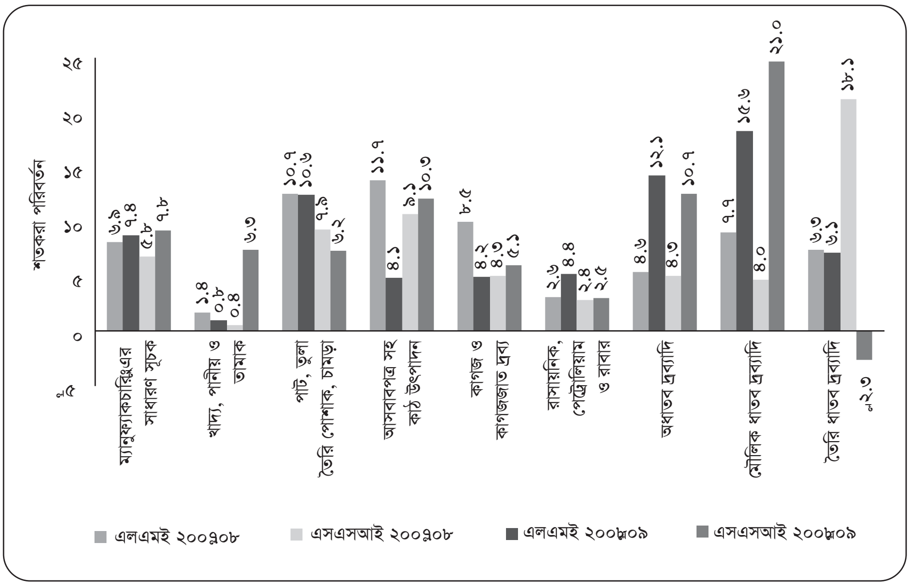

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব থেকে প্রাক্কলিত।
দ্রষ্টব্য: এলএমই: বৃহৎ ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান; এসএসআই: ক্ষুদ্র শিল্প।

সারণি ১.১১: সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ

নির্দেশক	অর্থবছর ২০০৬-০৭	অর্থবছর ২০০৭-০৮	অর্থবছর ২০০৮-০৯
বিনিয়োগ (বিলিয়ন টাকা)			
মোট বিনিয়োগ	১১৫৫.৯০	১৩২১.৩০	১৪৮৬.৯০
সরকারি	২৫৭.৩০	২৭০.৪০	২৮৪.৯০
বেসরকারি	৮৯৮.৬০	১০৫০.৯০	১২০২.০০
হ্রাস/বৃদ্ধি (%)			
মোট বিনিয়োগ	১২.৮০	১৪.৩০	১২.৫০
সরকারি	৩.২০	৫.১০	৫.৪০
বেসরকারি	১৫.৯০	১৬.৯০	১৪.৪০
ক্রমবর্ধমান পুঁজি-উৎপাদন অনুপাত	৩.৮১	৩.৯১	৪.১১

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯।

জিডিপিতে সামগ্রিক শিল্প খাতের অবদান প্রায় একই হওয়ার পেছনে বড় ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগের স্থবিরতাও দায়ী। সেই সঙ্গে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট সরকারি বিনিয়োগ ২৮,৪৮০ কোটি টাকা থাকলেও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যাসহ বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে কম গুরুত্ব দেওয়ার ফলে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, যেখানে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সক্ষমতার অনেক কম ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।

সেবা খাত

মোট জাতীয় উৎপাদনে ৪৯.৭ শতাংশ অবদান যে রাখে সেই সেবা খাত ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তবে পূর্ববর্তী বছরে এই খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৪৯ শতাংশ। সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি কম হওয়ার পেছনে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির শ্লথগতি আংশিকভাবে দায়ী। এই সময়ে সেবা খাতের বড় কয়েকটি উপখাত যেমন – পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধি বেশ কমে যায়। সেই সাথে যুক্ত হয় আর্থিক খাত, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা (সারণি ১.১২)। সেবা খাতের কম প্রবৃদ্ধির পেছনে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রপ্তানিমুখী শিল্পের বিরাজমান অনিশ্চয়তাও প্রভাব ফেলে থাকতে পারে। এর বাইরে আলোচ্য সময়ে সেবা খাতের অন্যান্য উপখাতের প্রবৃদ্ধি ছিল তুলনামূলকভাবে বেশ ভালো। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জনপ্রশাসন, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত সেবা, বিমান ও স্থল পরিবহন। ভবিষ্যতে বেসরকারি খাতের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য সমাজকল্যাণমূলক খাতসমূহে (যেমন – শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনপ্রশাসন) আরও বেশি বিনিয়োগ দরকার হবে।

সারণি ১.১২: স্থিরমূল্যে সামষ্টিক জাতীয় উৎপাদন (ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬)

খাত	২০০৮-০৯ অর্থবছরে জিডিপিতে অবদান	২০০৮-০৯ অর্থবছরে সেবা খাতে অবদান	সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির হার		
			২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
পাইকারি ও খুচরা	১৪.৪৪	২৯.০৮	৮.০৪	৬.৮২	৬.৩৫
হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	০.৭১	১.৪৩	৭.৫২	৭.৫৫	৭.৫৮
পরিবহন, স্টোরেজ ও যোগাযোগ	১০.৬১	২১.৩৭	৮.০৩	৮.৫৫	৭.৬১
আর্থিক	১.৮৪	৩.৭১	৯.১৮	৮.৮৯	৮.০০
আবাসন, ভাড়া ব্যবসা	৭.৩৫	১৪.৮০	৩.৭৬	৩.৭৫	৩.৮১
জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২.৭৯	৫.৬২	৮.৪১	৬.২১	৭.০২
শিক্ষা	২.৬৪	৫.৩২	৮.৯৬	৭.৮০	৮.০৪
স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা	২.৩৫	৪.৭৩	৭.৬৪	৭.০২	৭.৫৫
কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিসেবা	৬.৯৩	১৩.৯৫	৪.৫৮	৪.৬২	৪.৬৮
মোট	৪৯.৬৬	১০০.০০	৬.৭০	৬.৪৯	৬.২৫

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯।

শিল্প খাতে বিনিয়োগ: ঋণ প্রবাহ

আলোচ্য অর্থবছরে শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ ও চলতি মূলধন বিতরণের ক্ষেত্রেও ওঠানামা ছিল লক্ষণীয়। এই সময়ে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মোট শিল্প মেয়াদি ঋণ ১ শতাংশ কমে ১৯,৯৭২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ঋণ বিতরণে মন্দাভাব দেখা দিলেও অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় সামগ্রিক ঋণ বিতরণ বাড়ে (অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ঋণ প্রবাহ বেড়েছে ৭.৪৮ শতাংশ, যা আগের বছরের তুলনায় কম)। অর্থবছরের পরবর্তী ছয় মাসে এটি বাড়ার হার ছিল ৫.১৯ শতাংশ।

তবে উল্লেখিত সময়ে শিল্প খাতের বকেয়া মেয়াদি ঋণ আদায়ের হার গত অর্থবছরের তুলনায় বেড়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এই হার ছিল ১৯.৭ শতাংশ। মজার ব্যাপার হলো, অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে বিতরণকৃত ঋণ আদায়েরের হার (৩২.৫ শতাংশ) দ্বিতীয় ছয় মাসের তুলনায় অনেক বেশি ছিল (৯.৮ শতাংশ)। দ্বিতীয় প্রান্তিকের শেষ তিন মাসে (এপ্রিল-জুন) ঋণ আদা য়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ করা যায়।

সরবরাহকৃত মেয়াদি ঋণের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, যেটি বাড়ার হার অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ওঠানামা কর লেও পরবর্তী ছয় মাসে মোটামুটি স্থিতিশীল হয়ে আসে (চিত্র ১.২৪)। এ সময় মধ্যমেয়াদি ঋণের প্রবাহ বাড়ার গতি একই রকম ছিল। তবে স্বল্পমেয়াদি ঋণ বিতরণে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি বরং বিভিন্ন সময়ে ওঠানামা ল ক্ষ করা গেছে।

চিত্র ১.২৪: শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণের নীট বিতরণ

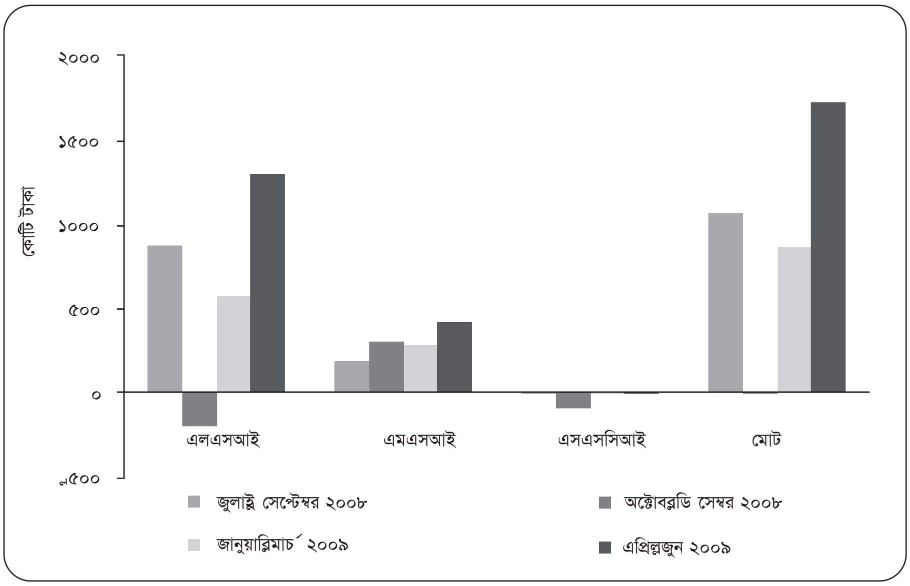

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।
দ্রষ্টব্য: এলএসআই: বৃহৎ শিল্প; এমএসআই: মাঝারি শিল্প; এসএসসিআই: ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প।

উল্লেখিত চিত্র থেকে দেখা যায়, ২০০৮্ল০৯ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় শিল্পের মধ্যে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অসমতা আগের মতোই ছিল। শিল্প খাতে বিতরণকৃত মোট আগাম ঋণের ৮৯ শতাংশ গিয়েছে বৃহদাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে, যারা দেশের মোট শিল্প স্থাপনার ৬.৪ শতাংশ এবং শিল্পে নিয়োজিত কর্মসংস্থানের ৫৫.৬ শতাংশের যোগান দেয়। অন্যদিকে মোট শিল্প স্থাপনার ৮৭.৯ শতাংশের অধিকারী এবং কর্মসংস্থানের ৩৫.৯ শতাংশের যোগানদাতা ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ মোট ঋণের মাত্র ৪.১ শতাংশ পেয়েছে। এই অর্থায়নের একটি অংশ বড় ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কারখানা স্থাপনে বিনিয়োজিত হয়েছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের শিল্পগুলোতে নবোদ্যম প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন সরকারের উন্নয়ন কৌশলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) উন্নয়ন প্রসঙ্গ বেশ জোরালোভাবে এসেছে। নতুন সরকার আসার পরও এই খাতের উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ২০০৮্ল০৯ অর্থ বছরের শেষে এই খাতে ঋণ বিতরণের হার বিগত বছরের তুলনায় ৩৮.৩ শতাংশ বেড়ে ৪৮,৪৭৩ কোটি ৫০ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে (সারণি ১.১৩)। তবে অর্থবছরের শেষ তিন মাসে এই খাতে ঋণ প্রবাহ বেড়েছে অনেক বেশি।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য মোট ঋণের ৫৬ শতাংশ যোগান দিয়েছে বেসরকারি ব্যাংকগুলো। বেসরকারি ব্যাংকগুলো উক্ত অর্থবছরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩১ শতাংশ বেশি ঋণ

সারণি ১.১৩: ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে ঋণের পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ধরন	অর্থবছর ২০০৭-০৮	মোট ঋণের অবদান (%)	অর্থবছর ২০০৮-০৯	মোট ঋণের অবদান (%)	তুলনামূলক পরিবর্তন
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক	৯৯১৮.৮৭	২৮.৩০	১৬৪৯৮.২৪	৩৪.০০	৬৬.৩৩
বেসরকারি ব্যাংক	১৯৮৮৯.৭৬	৫৬.৮০	২৬০৪৭.৪৫	৫৩.৭০	৩০.৯৬
বিদেশি ব্যাংক	৬১১.৬৭	১.৭০	১২৭৭.৬২	২.৬০	১০৮.৮৭
বিশেষায়িত ব্যাংক	৩২৪৯.০৯	৯.৩০	২৯৪৪.০৯	৬.১০	-৯.৩৯
আর্থিক প্রতিষ্ঠান	১৩৭১.০৮	৩.৯০	১৭০৬.১২	৩.৫০	২৪.৪৪
মোট	৩৫০৪০.৪৬	১০০.০০	৪৮৪৭৩.৫২	১০০.০০	৩৮.৩৪

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

দিয়েছে। অন্যদিকে সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক, বিদেশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথাক্রমে ৬৬ শতাংশ, ১০৪ শতাংশ ও ২৪ শতাংশ বেশি ঋণ বিতরণ করেছে। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এ সম্প্রসারণ বৈশ্বিক মন্দা মোকাবেলায় দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের সহায়ক নীতির প্রতিফলন বলে বলা যেতে পারে।

তবে সমমূলধনী শিল্প তহবিল থেকে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে তেমন একটা বরাদ্দ হয়নি। ২০০৮-এর এপ্রিল থেকে ২০০৯এর মার্চ পর্যন্ত মাত্র তিনটি প্রকল্প অর্থ বরাদ্দের জন্য তালিকাভুক্ত হয়। উল্লেখ্য, এই তহবিল পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশকে (আইসিবি) দায়িত্ব দিয়েছে[১২], যার আওতায় এ সংস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহকারী এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে এবং মূলধন সহায়তা প্রত্যাশী নতুন প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন করবে, অর্থ বরাদ্দ দেবে এবং চলমান প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে এই কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কৌশলগত দক্ষতা ও জনবল আইসিবির আছে কিনা, সেটা এখনও পরিষ্কার নয়।

বিশ্বমন্দার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিমুখী শিল্প এবং অভ্যন্তরীণ বাজারনির্ভর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সরকার ২০০৯এর এপ্রিলে ৩,৪২০ কোটি টাকার প্রণোদনাগুচ্ছ কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই কর্মসূচির আওতায় পাটজাত দ্রব্য, চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী, হিমায়িত মাছ এবং চিংড়ি শিল্প খাত ইতিমধ্যে বিদ্যমান নগদ অর্থ সহায়তার পাশাপাশি ২.৫ শতাংশ হারে বাড়তি নগদ সহায়তা পেতে শুরু করেছে। যেসব পশ্চাৎমুখী শিল্প (যেমন বস্ত্র, সাইকেল, হালকা প্রকৌশল সামগ্রী ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদি) আগে থেকেই নগদ সহায়তা পেত, তাদের জন্য সেই সুযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়া এই সহায়তার আওতায় রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সঠিক সময়ে নগদ সহায়তার অর্থ ছাড়করণ, ৭ শতাংশ হার সুদে রপ্তানি ঋণ ও রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল থেকে বেশি বরাদ্দ। নতুন করে বিভিন্ন তহবিলে, যেমন: ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটিজ (৪০০ কোটি টাকা), এসএমই তহবিল (৬০০ কোটি টাকা) এবং গৃহনির্মাণ তহবিল (৫০০ কোটি টাকা) এবং সমমূলধনী শিল্প তহবিলে (৩০০ কোটি টাকা) অর্থ বরাদ্দ দেওয়ায় দেশীয় বাজারনির্ভর শিল্পগুলো উপকৃত হতে পারে। একই সঙ্গে সরকারের এসব উদ্যোগ রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোকে বিশ্ববাজারের নাজুক চাহিদা পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সহায়তা করেছে।

[১২] ২০০৯ সালের ১ জুন দুই পক্ষের মধ্যে এ সংক্রান্ত এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

শিল্প উৎপাদন সামগ্রীর আমদানি গতি-প্রকৃতি

শিল্পোৎপাদনের জন্য কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্য এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে ২০০৮–০৯ অর্থবছরে এক ধরনের মিশ্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এই সময়ে কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্য আমদানির পরিমাণ ছিল ১০,২৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত বছরের তুলনায় ৬.৯৫ শতাংশ বেশি। একই সময়ে মূলধনী ও অন্যান্য সামগ্রীর আমদানি ১২.২ শতাংশ বেড়ে ৬,১৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। কমেছে বেশ কিছু পণ্যের আমদানি। বিশেষ করে মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি ১৪.৭ শতাংশ কমে যাওয়া আশঙ্কাজনক। এতে দীর্ঘমেয়াদে নতুন কলকারখানা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তবে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল আমদানি শিল্পোৎপাদন বাড়াবে – এমনটাই নির্দেশ করে। এই কাঁচামালগুলোর মধ্যে রয়েছে টেক্সটাইল ফেব্রিকস (১০.৯ শতাংশ), সুতা (১৪.৭ শতাংশ), তুলা (৬.৪ শতাংশ), ডায়িং ও ট্যানিং সামগ্রী (১৮.৯ শতাংশ)। তবে স্ট্যাপল ফাইবারের আমদানি কমেছে ২ শতাংশ।

কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তির হার থেকেও শিল্প খাতের কর্মকাণ্ড বোঝা যেতে পারে। ২০০৮–০৯ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে শিল্প খাতের কাঁচামাল আমদানির জন্য ঋণপত্র নিষ্পত্তির হার বেশি ছিল (চিত্র ১.২৫)। অন্যদিকে বস্ত্র, চামড়া, পাট ও তৈরি পোশাকের মতো প্রধান প্রধান শিল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতির ঋণপত্র নিষ্পত্তির হার ছিল কম (চিত্র ১.২৬)।

চিত্র ১.২৫: কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তির হারের পরিবর্তন: অর্থবছর ২০০৭-০৮ ও অর্থবছর ২০০৮-০৯

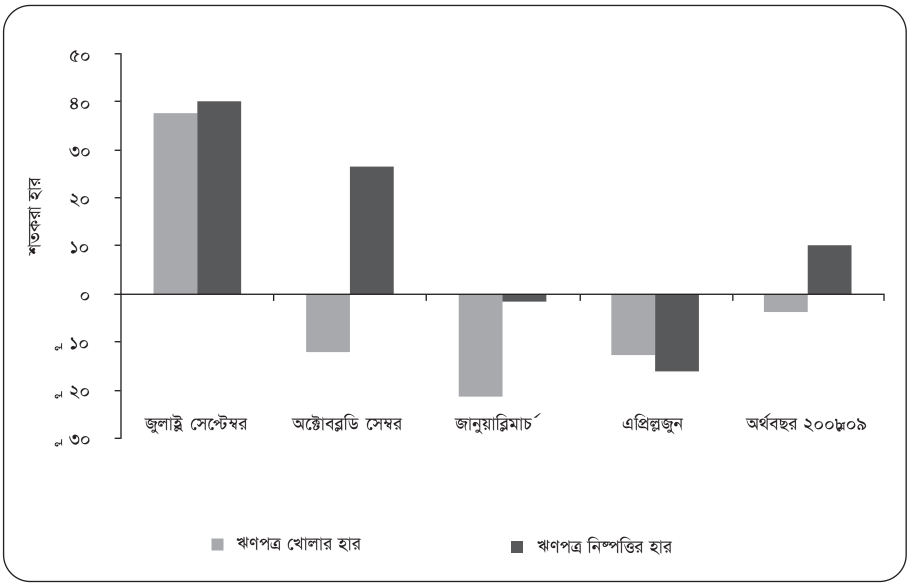

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০৮–০৯ অর্থবছরে মোট আমদানিতে কম্পিউটার ও এর আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ, গাড়ি, মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল ও ইলেকট্রনিকস যন্ত্রাংশের মতো বিভিন্ন অপ্রচলিত শিল্প খাতের অবদান ছিল চোখে পড়ার মতো, যা মোট নিষ্পন্ন হওয়া ঋণপত্রের ৮.৯ শতাংশ। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশ পণ্যের আমদানি ছিল বেশ চাঙ্গা (সারণি ১.১৪)। ২০০৮–০৯ অর্থবছরে আমদানিনির্ভর এসব পণ্যের বেশির ভাগের বেলায় ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০ শতাংশের বেশি।

চিত্র ১.২৬: মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তির হারের পরিবর্তন: অর্থবছর ২০০৭-০৮ ও অর্থবছর ২০০৮-০৯

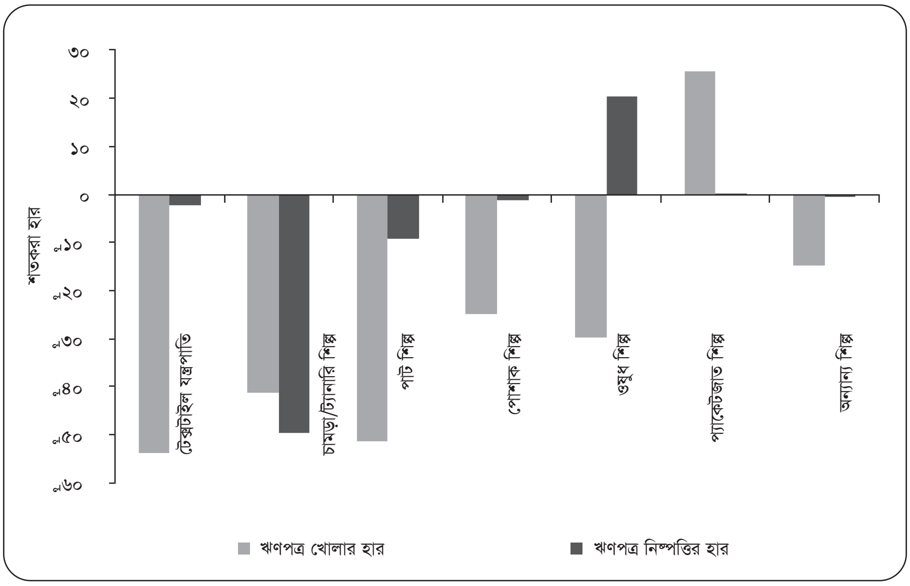

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১.১৪: অপ্রচলিত খাতের যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তির হারের পরিবর্তন

(শতাংশ)

খাত	২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে পরিবর্তন		
	ঋণপত্র খোলা	ঋণপত্র নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন ঋণপত্র
বিভিন্ন শিল্প খাতের যন্ত্রপাতি	১৪.৬	১৩.৩	৭.৯
অন্যান্য যন্ত্রপাতি	১.৯	-০.৯	১৯.৫
নৌযানের জন্য ডিজেল ইঞ্জিন	৪৫.৪	২৮.৮	৭.০
কম্পিউটার আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ	৪.৪	১৩.৯	-২.৫
গাড়ি, মোটরসাইকেল সামগ্রী	২৪.০	২৬.৫	৬.২
সাইকেল সামগ্রী	-১৩.৬	-১২.৮	-৪.৪
অন্যান্য ইস্পাত ও লোহার সামগ্রী	১৮.২	১৫.৩	৯.১
গাড়ি	২৪.৬	৯.১	৮.০
অন্যান্য ইলেকট্রনিকস যন্ত্রাংশ	২৮.৭	২৮.৫	৭.৯
ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার	-৩.৩	৮.৯	০.৮
অন্যান্য	১৮.৭	৩১.৬	৪.১

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

এ সময় গাড়ি, মোটরসাইকেল, ইলেকট্রনিকস যন্ত্রাংশ, কম্পিউটার আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ, নৌযানের ডিজেল ইঞ্জিন আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তির হার বেড়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্পে কম পরিমাণ বিনিয়োগের ক্রান্তিকালে অপ্রচলিত শিল্প প্রসারের জন্য আমদানি বৃদ্ধি পাওয়া শিল্প খাত বিস্তৃত করার পথে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

২০০৯ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটে উৎপাদন, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব: একটি তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন

বিশ্ব আর্থিক সংকট দেশের প্রধান প্রধান শিল্প খাতের উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, সেটা যাচাই করার জন্য সিপিডি ২০০৯এর ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন খাতের মোট ৯০ জন উদ্যোক্তার মধ্যে একটি জরিপ পরিচালনা করে।[১৩] এদের মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশের বক্তব্য ছিল বিশ্বমন্দা উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ওপর "তেমন কোন নেতিবাচক" প্রভাব ফেলবে না, বা পড়লেও আংশিকভাবে কিছু পড়তে পারে (চিত্র ১.২৭)। তবে তৈরি পোশাক, তথ্যপ্রযুক্তি, ওষুধ ও ব্যাংকিং খাতের কিছু উদ্যোক্তার মতে, ২০০৯ সালে তাদের খাতসমূহ ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হবে, যার ফলশ্রুতিতে রপ্তানি আয় কমে যেতে পারে।

চিত্র ১.২৭: বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাত সম্পর্কে সংশ্লিষ্টখাতের উদ্যোক্তাদের অভিমত

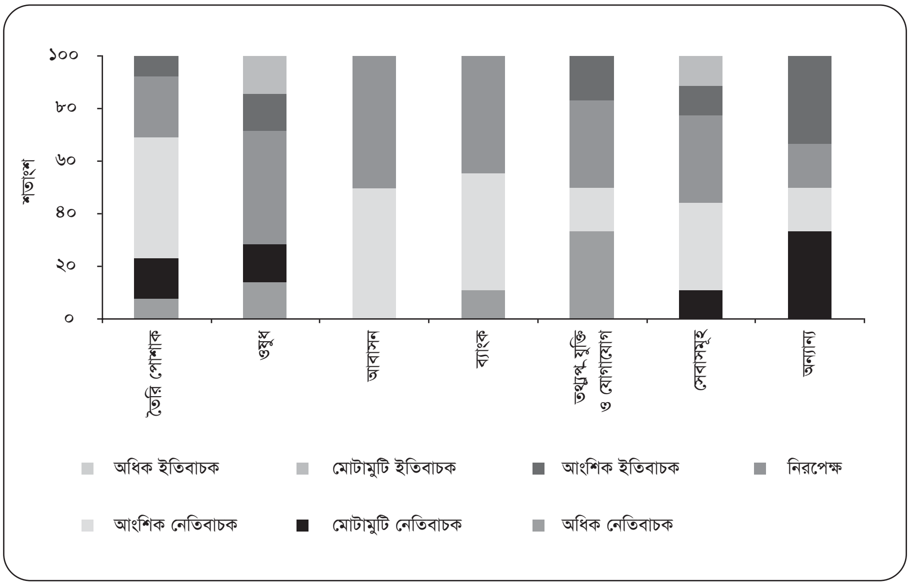

উৎস: সিপিডির তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন জরিপ, ২০০৯।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মতে, ২০০৮এর জুলাই থেকে ২০০৯এর জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ওপর তেমন কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি (চিত্র ১.২৮)। তাদের মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান উৎপাদন, বিনিয়োগ ও নতুন লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেও সেটাকে তারা বৈশ্বিক মন্দার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত না বলে জানিয়েছে। তবে উদ্যোক্তারা বলেছেন, উল্লেখিত সময়ে বিনিয়োগ কিছুটা কমেছে (চিত্র ১.২৯)।

[১৩]যেসব খাত থেকে জরিপে উত্তরদাতাদের নেওয়া হয়েছে, সেসব খাত হলো: তৈরি পোশাক, বস্ত্র, চামড়া. হিমায়িত খাদ্য, ওষুধ, আবাসন ও নির্মাণ, ব্যাংক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

চিত্র ১.২৮: ২০০৭-০৮ অর্থবছর এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরে নিজ নিজ উৎপাদন সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অভিমত

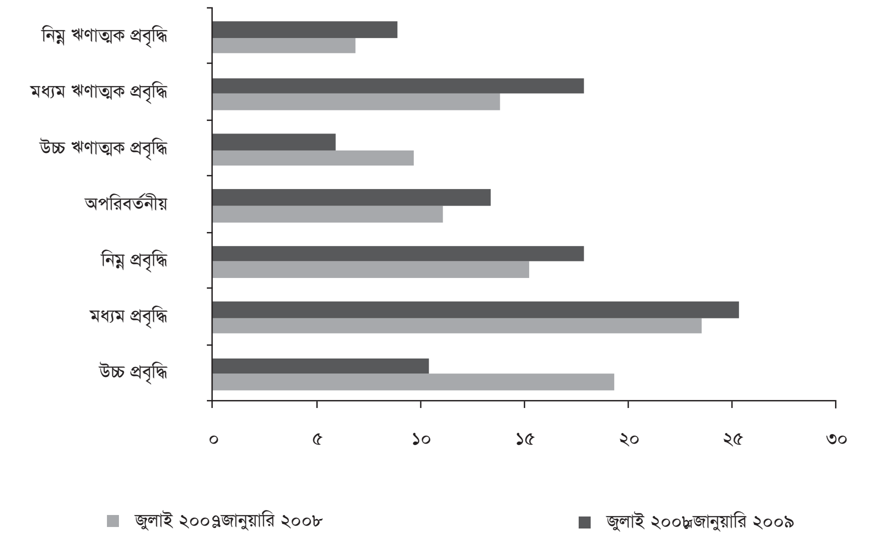

উৎস: সিপিডির তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন জরিপ, ২০০৯।

চিত্র ১.২৯: ২০০৭-০৮ অর্থবছর এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিনিয়োগ সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অভিমত

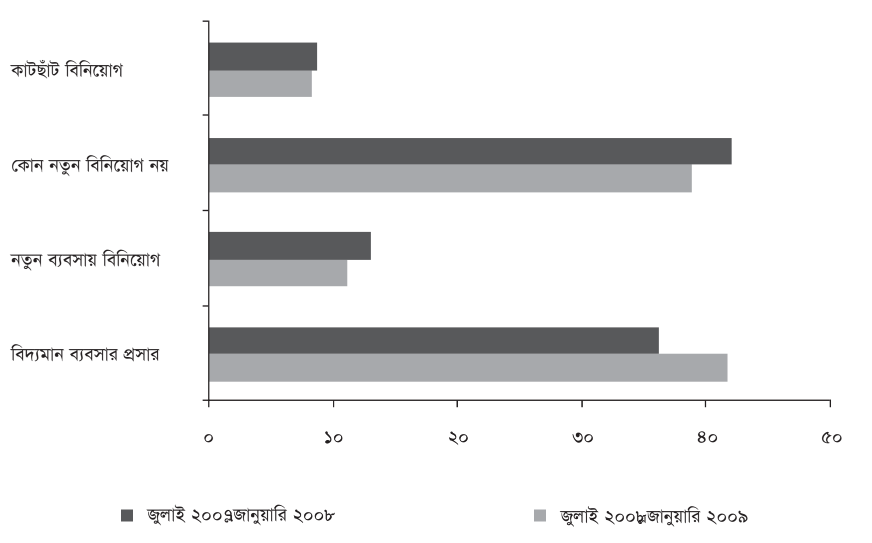

উৎস: সিপিডির তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন জরিপ, ২০০৯।

জরিপে অংশ নেওয়া রপ্তানিমুখী বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকদের মতামত অনুযায়ী, বিশ্বমন্দার কারণে তৈরি পোশাকের দাম কমেছে ৫ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশের মতো। অন্যদিকে অন্যান্য পণ্যের দাম বেড়েছে (প্রায় ৯ শতাংশের মতো)। উদ্যোক্তাদের মতে, ২০০৮-এর জানুয়ারি থেকে ২০০৯-এর জানুয়ারি পর্যন্ত ওষুধশিল্পের কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে প্রায় ১৫ শতাংশ।

জরিপে দেখা যায়, আর্থিক সংকটের কারণে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কায় বেশ কিছু উদ্যোক্তা ব্যয় কমানোর কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন (সারণি ১.১৫)। তবে তারা জানান, প্রচুর শ্রমিক ছাঁটাই করার তেমন কোন সম্ভাবনা তাদের নেই। কেউ কেউ খরচ কমানোর জন্য শ্রমিক-কর্মচারীদের বাড়তি সুযোগ-সুবিধা কমানো, কারখানার উৎপাদন সক্ষমতা কম ব্যবহার করা অথবা প্রয়োজনে দুই-একটি উৎপাদন ইউনিট কমিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। তবে তারা জানান, শুধুমাত্র বাজারে তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা কমে গেলে তারা এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন।

সারণি ১.১৫: বৈশ্বিক মন্দা ঘনীভূত হলে সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের মতামত

ব্যবস্থা	মন্দার কারণে	মন্দা ঘনীভূত হলে
শ্রমিক ছাঁটাই	৮.৩	১১.১
মজুরি কর্তন	০.০	৩.৭
শ্রমঘণ্টা বাড়ানো	৪.২	৬.৫
শ্রমিকদের বাড়তি সুযোগ-সুবিধা কমা নো	৫.৬	১০.২
মুনাফা কমানো	২৯.২	২৫.০
কারখানার উৎপাদন সক্ষমতা কমানো	৫.৬	১২.০
উৎপাদন ইউনিট বন্ধ করা	৫.৬	১১.১
উপরের কিছুই না	৪১.৭	২০.৪

উৎস: সিপিডি তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন জরিপ, ২০০৯।

১.৬.৩ বৈশ্বিক মন্দার সময়ে বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহ

মন্দার কারণে বিদেশি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে। এ সময় ৯৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ

চিত্র ১.৩০: বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং পোর্টফোলিও বিনিয়োগের মাসিক গতি-প্রকৃতি

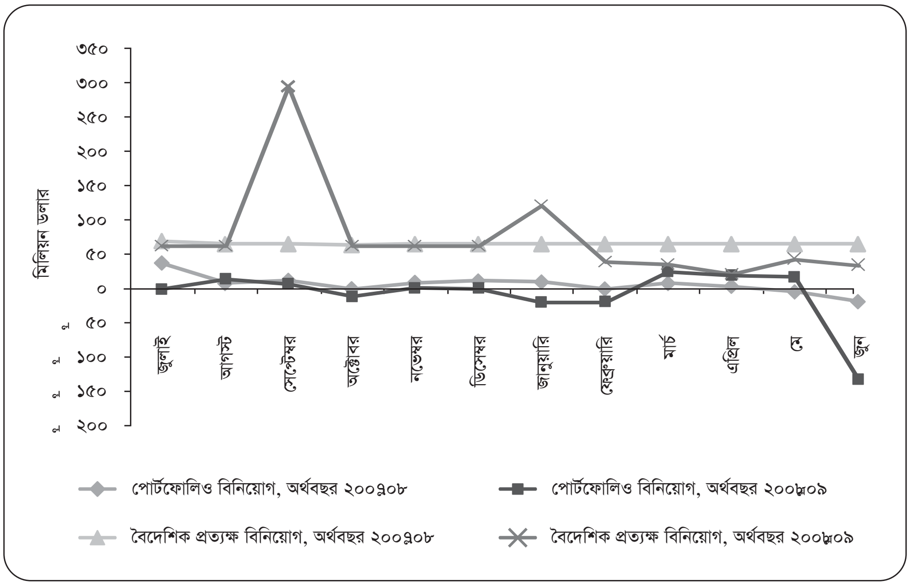

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

এসেছে, যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১৪.৩ শতাংশ বেশি। বস্তুত, এটা কোন এক বছরে বাংলাদেশে আসা সবচেয়ে বেশি বিদেশি বিনিয়োগ। তবে একটি মোবাইল টেলিফোন কোম্পানির একাংশের মালিকানা হাতবদল হওয়ার জন্য আসা বিনিয়োগটি বাদ দিলে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৮-০৯এ তেমন কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি (চিত্র ১.৩০)। অবশ্য এই বাড়তি বিদেশি বিনিয়োগ ভবিষ্যতে দেশে টেলিযোগাযোগ খাতের জন্য হ্যান্ডসেট, যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

পোর্টফোলিও বিনিয়োগ, যার প্রবাহ বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে, ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে তা আরও হ্রাস পেয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে পোর্টফোলিও (পুঁজিবাজারে) বিনিয়োগ এসেছে ৭৮.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। এক বছর পর নতুন বিনিয়োগ আসার পরিবর্তে ১৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বিনিয়োগ পুঁজিবাজার থেকে ফেরত গিয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজার থেকে শেয়ার বিক্রি করে বের হয়ে যাওয়ার প্রবণতা ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের প্রায় পুরো সময়ে পরিলক্ষিত হয়েছে। পরবর্তী অর্থবছরেও এই ধারা অব্যাহত থাকতে দেখা গেছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর মেয়াদে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ পোর্টফোলিও বিনিয়োগ পুঁজিবাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে।

রপ্তানিনির্ভর শিল্প খাতে বিনিয়োগে মন্দাভাব দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলগুলোতেও (ইপিজেড) দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন রপ্তানি প্রক্রিয়াজতকরণ এলাকায় ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বস্ত্র, তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, জুতা ও তাঁবু বানানো খাতে মোট ১৪৮.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ এসেছে, যা বিগত বছরের তুলনায় ৪৪.৩ শতাংশ কম (সারণি ১.১৬)।

সারণি ১.১৬: রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড	অর্থবছর ২০০৭-০৮	অর্থবছর ২০০৮-০৯	তুলনামূলক পরিবর্তন (%)
চট্টগ্রাম	১০৫.৫০	৪৭.২২	-৫৫.২৪
ঢাকা	১০১.১০	৩০.৩৯	-৬৯.৯৪
আদমজী	৩০.৩০	২১.০৭	-৩০.৪৬
কর্ণফুলী	১৬.৪০	২৭.৯০	৭০.১২
কুমিল্লা	৮.৭০	৮.২০	-৫.৭৫
মংলা	২.০০	-০.৯৬	-১৪৮.০০
ঈশ্বরদী	১.৪০	১৪.০৪	৯০২.৮৬
উত্তরা	০.১০	০.১৭	৭০.০০
মোট	২৬৫.৬০	১৪৮.০৩	-৪৪.২৭

উৎস: বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষ (বেপজা)।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও আদমজীর মতো প্রধান প্রধান বড় প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪০-৭০ শতাংশ কম বিনি য়োগ হয়েছে। নতুন কারখানা স্থাপনে পর্যাপ্ত জায়গার অভাব এক্ষেত্রে বাড়তি কারণ হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে। অন্যদিকে কর্ণফুলী ও ঈশ্বরদী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহ ছিল ইতিবাচক। এই অঞ্চলগুলোতে আগের বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে বিনিয়োগ ৭০ শতাংশ বেড়ে মোট ২৭.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। ঈশ্বরদীতে দেশীয় কোম্পানি রহিম আফরোজ ব্যাটারির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিনিয়োগ করেছে। অন্যদিকে, ভৌগোলিক অবস্থান ও বিভিন্ন উপযোগ সুবিধার কারণে কর্ণফুলী ইপিজেড নতুন বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে।

২০০৯এর প্রস্তাবিত খসড়া শিল্পনীতিতে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা গড়ে তোলার ব্যাপারে সরকার বেশ জোর দিয়েছে। তবে অর্থনীতিতে অবদানের কথা বিবেচনায় রেখে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সরকারের নীতি–সহায়তা অব্যাহত থাকা উচিত।

২০০৮–০৯ অর্থবছরে বিনিয়োগ নিবন্ধনের হার ছিল বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। আলোচ্য সময়ে মোট ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বিনিয়োগ নিবন্ধিত হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরে মোট নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (সারণি ১.১৭)। অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ প্রকল্প নিবন্ধনের হার ততটা আশাব্যঞ্জক না হলেও (মোট ২,৪৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), মোট নিবন্ধন বাড়ার পেছনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে বিদেশি বিনিয়োগের নিবন্ধন (২০০৮–০৯ অর্থবছরে মোট বিদেশি বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল ২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরে ছিল ৬৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের এই নিবন্ধিত বিনিয়োগ প্রত্যাশাগুলোকে বাংলাদেশ প্রকৃত বিনিয়োগে রূপান্তরিত করতে পারবে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়। কারণ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিবন্ধিত বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করাটা বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ১.১৭: বিনিয়োগ বোর্ডে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বিনিয়োগ নিবন্ধন

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বছর	অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ	শতভাগ বিদেশি ও যৌথ মালিকানাধীন বিনিয়োগ	মোট নিবন্ধন
অর্থবছর ২০০৭–০৮	২৮২৭.০০	৬৫৭.৮৬	৩৪৮৪.৮৬
অর্থবছর ২০০৮–০৯	২৪৬৭.০০	২০৭১.৬৮	৪৫৩৮.৬৮
শতকরা পরিবর্তন	–১২.৭৩	২১৪.৯১	৩০.২৪

উৎস: বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ।

বিদেশি বিনিয়োগ ২০০৮–০৯ অর্থবছরে লেনদেনের ভারসাম্যে তেমন কোন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারেনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের জরিপ অনুযায়ী, উক্ত অর্থবছরে ৯০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে, যা লেনদেনের ভারসাম্যে উল্লেখিত তথ্যের তুলনায় কিছুটা কম (৯৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (সারণি ১.১৮)। পক্ষান্তরে, বিদেশি কোম্পানিগুলো একই বছরে ৮৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, মুনাফা ও লভ্যাংশ এবং আয় বাংলাদেশের বাইরে পাঠিয়েছে। এর মধ্যে আয় বাবদ তেল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো পাঠিয়েছে ৬৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশে আসা মোট বিদেশি বিনিয়োগের ৭১.৭ শতাংশ। সব মিলিয়ে ফেরত পাঠানো মুদ্রা একই সময়ে দেশে আসা বিদেশি বিনিয়োগের ৯৭ শতাংশ।

সারণি ১.১৮: বিদেশি বিনিয়োগ আসা ও বিনিয়োগকারীদের আয় প্রেরণ পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহ সম্পর্কিত শ্রেণী বিভাগ	অর্থবছর ২০০৭–০৮	অর্থবছর ২০০৮–০৯	তুলনামূলক পরিবর্তন (%)
বিদেশি বিনিয়োগ আসার পরিমাণ	৬৯৮.০০	৯০৬.৩৭	২৯.৮৫
বিদেশি বিনিয়োগ প্রেরণের পরিমাণ	৬৫৩.০৫	৮৭৯.৯৩	৩৪.৭৪
	(৯৩.৬%)	(৯৭.১%)	
রয়্যালটি ও লাইসেন্স ফি	৭.৮৯	২২.৬৬	১৮৭.২০
মুনাফা ও লভ্যাংশ	১৭৩.৩৩	২০৭.৩৯	১৯.৬৫
তেল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর আয়	৪৭১.৮৩	৬৪৯.৮৮	৩৭.৭৪
নিট বিদেশি বিনিয়োগ	৪৪.৯৫	২৬.৪৪	–৪১.১৮

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক বিদেশি বিনিয়োগ জরিপ।

খাতওয়ারি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০৮–এর জানুয়ারি–ডিসেম্বর সময়ে টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ এসেছে ৬৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মোট বিদেশি বিনিয়োগের প্রায় ৬০ শতাংশ (সারণি ১.১৯)। টেলিযোগাযোগ খাতে আসা এই বিনিয়োগের মধ্যে ৩৭৩.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মিসর থেকে এসেছে। বাকিটা এসেছে জাপানের ফোন কোম্পানি এনটিটি ডোকোমো কর্তৃক মোবাইল ফোন কোম্পানি একেটেলের কিছু শেয়ার কেনা বাবদ। এর বাইরে ব্যাংকিং, বস্ত্র ও পোশাক এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প খাতে যথাক্রমে ১৪১.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১২৬.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২২.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে। অন্য কোন খাতে তেমন উল্লেখযোগ্য বিদেশি বিনিয়োগ হয়নি। অর্থাৎ দেশীয় বাজারনির্ভর শিল্প খাতগুলো মূলত বেশি পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। আর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব এসব দেশীয় বাজারনির্ভর শিল্পগুলোয় কম অনুভূত হওয়ায় মন্দার আগে ও পরে বিদেশি মালিকানাধীন বিনিয়োগ প্রবাহে তেমন অভাব পরিলক্ষিত হয়নি (২০০৭ সালের জানুয়ারি–জুন ও জুলাই–ডিসেম্বর মেয়াদে যথাক্রমে ৩৮১.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে; ২০০৮ সালের জানুয়ারি–জুন মেয়াদে বিনিয়োগ আসার পরিমাণ ছিল ৪৮৩.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; জুলাই–ডিসেম্বর মেয়াদে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০২.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

সারণি ১.১৯: খাতওয়ারি বিদেশি বিনিয়োগ আগমন পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাত	২০০৭ (জানুয়ারি–ডিসেম্বর)	২০০৮ (জানুয়ারি–ডিসেম্বর)
মোট	৬৬৬.৩৭	১০৮৬.৩১
কৃষি ও মৎস্য আহরণ	৭.৩৩	১৪.৪৩
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও তেল	২১৫.৯৪	১০১.০২
ম্যানুফ্যাকচারিং	১৪২.৬৮	১৬৮.৪৯
ব্যবসা ও বাণিজ্য	৯২.৮৮	১৫৩.৪০
টেলিযোগাযোগ, পরিবহন ও স্টোরেজ	২০১.৯০	৬৪১.৩৯
সেবা	৫.৬৪	৭.৫৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক বিদেশি বিনিয়োগ জরিপ।

এটা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে যে পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামোর নিশ্চয়তা বিধান করতে না পারলে বড় আকারের বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা কঠিন হবে। বিদ্যুতের সংকট ইতিমধ্যে একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। যে স্থানীয় গ্যাসের কারণে একসময় বাংলাদেশ বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে মনে করা হতো, তা এখন আর মিলছে না। বরং গ্যাস সরবরাহ ঠিকমতো পাওয়া যাবে কি না, সেটাই এখন দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সম্ভাব্য দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জ্বালানির প্রয়োজন মেটানো দরকার। এ জন্য সমুদ্র সহ দেশের অভ্যন্তরে নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানের বিষয়টিকে আগামী বাজেটে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মাধ্যমে বিদ্যমান বিনিয়োগ পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটানো নবনির্বাচিত সরকারের জন্য হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

১.৬.৪ পুঁজিবাজার: অস্থিরতা বেড়েছে

২০০৮–০৯ অর্থবছরের অধিকাংশ সময়ে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে বড় ধরনের নিম্নগতি দেখা যায়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সার্বিক শেয়ার মূল্য সূচক ২০০৮ সালের জুলাইয়ের ২৩৬৯.০৩ পয়েন্ট থেকে কমে ২০০৯ সালের মার্চে দাঁড়ায় ২০৩৩.৩ পয়েন্টে। ২০০৯ সালের জুনে এসে সূচক আবার বেড়ে ২৫২৬.২৪ পয়েন্টে দাঁড়ায় (চিত্র ১.৩১)। ২০০৮–০৯ অর্থবছরে তার আগের অর্থবছরের তুলনায় শেয়ার মূল্য সূচকে পতন ঘটে ২৫.১৩ শতাংশ; এমনকি ব্লু চিপ শেয়ারের (ডিএসই ২০) ক্ষেত্রে বড়

ধরনের দরপতন লক্ষণীয়। ২০০৯ সালের মার্চ নাগাদ উভয় শেয়ারের মূল্য সূচকে কিছুটা উর্ধ্বগতি দেখা দেয়। দেশের পুঁজিবাজার এ সময় দু'ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়: ২০০৮-০৯ অর্থবছরে নিম্নমাত্রার বিদেশি বিনিয়োগ এবং বিদ্যমান বিদেশি বিনিয়োগের একটি অংশ প্রত্যাহার (চিত্র ১.৩২)। তবে মোট বাজার মূলধনে পোর্টফোলিও বিনিয়োগের অংশ খুব কম থাকায় (২.৫ শতাংশের কম) এই বিদেশি বিনিয়োগ প্রত্যাহারে পুঁজিবাজারের ওপর তেমন উল্লেখযোগ্য কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি।

চিত্র ১.৩১: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার মূল্য সূচকের গতি-প্রকৃতি

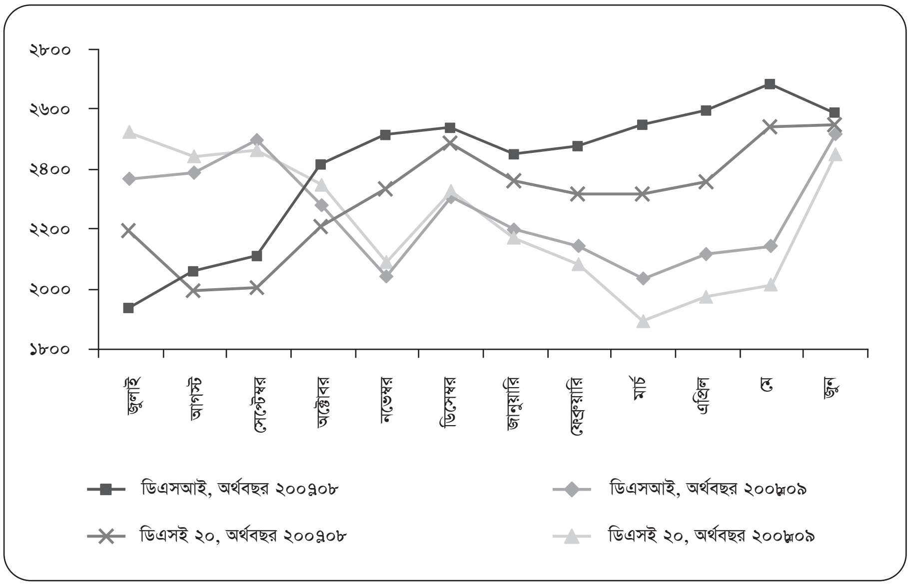

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।

চিত্র ১.৩২: পুঁজিবাজারে পোর্টফোলিও বিনিয়োগের মাসিক গতি-প্রকৃতি

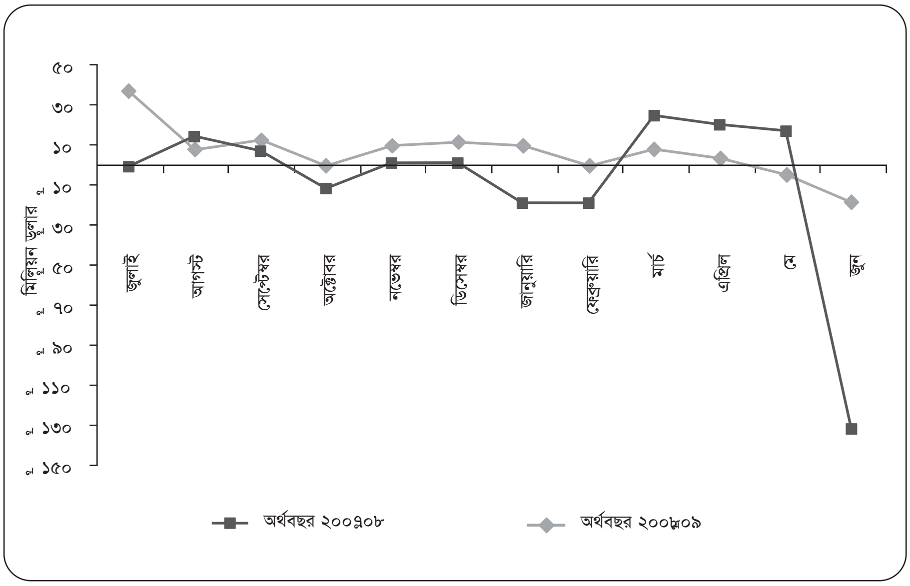

উৎস: মাসিক ইকোনমিক ট্রেন্ডস, বাংলাদেশ ব্যাংকের ভিত্তিতে হিসাবায়িত।

২০০৮ সালের জুলাই থেকে ২০০৯ সালের মে মাসের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বাজার মূলধন ছিল ১৩.৯৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৫.৭৯ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে। তবে ২০০৯ সালের জুনে এটি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯.০২ বিলিয়ন ডলার (চিত্র ১.৩৩)। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে বাজার মূলধনের ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

চিত্র ১.৩৩: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে বাজার মূলধনের গতিধারা

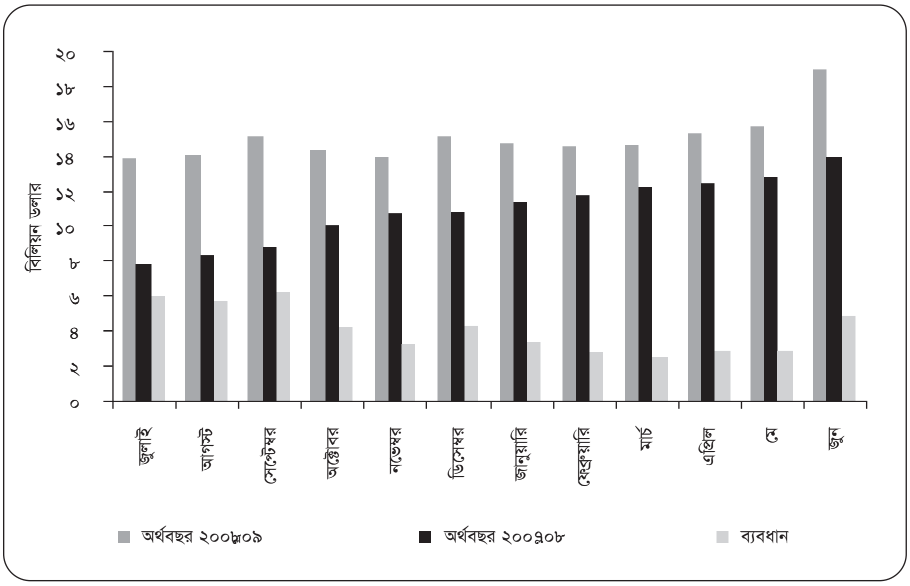

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।

চিত্র ১.৩৪: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মূল্য-আয় অনুপাতের মাসিক গতিধারা

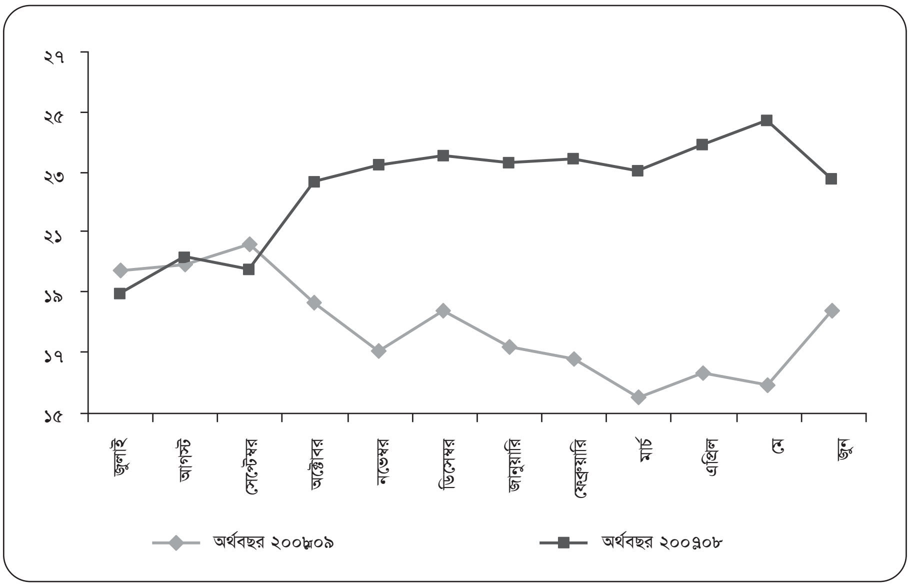

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।

পুঁজিবাজারে শেয়ারের মূল্য সূচকের পতনের জের ধরে মূল্য-আয় অনুপাত (পি/ই অনুপাত) কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় (চিত্র ১.৩৪)। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ অনুপাতের উচ্চমাত্রার পর (২০০৭ সালের নভেম্বর থেকে ২০০৮ সালের জুন পর্যন্ত ২৩ থেকে ২৫-এর মধ্যে থাকে) ২০০৮-০৯ অর্থবছরে নিম্নমাত্রার মূল্য-আয় অনুপাত সম্ভবত বাজার সংশোধনের ইঙ্গিত বহন করে। আগের পর্যায় থেকে কমতে কমতে ২০০৯ সালের মার্চ শেষে এই অনুপাত ১৫.৫ শতাংশে পৌঁছায়। তবে ২০০৯ সালের জুনে এ অনুপাত দাঁড়ায় ১৮.৪ শতাংশ।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট ১৩টি কোম্পানি তাদের প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (আইপিও) বাজারে আনে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরেও একই সংখ্যক কোম্পানি তাদের শেয়ার ছাড়ে (সারণি ১.২০)। মোট শেয়ারের সংখ্যা, স্পন্সরদের শেয়ার ধারণ, গণপ্রস্তাবের জন্য শেয়ার এবং মোট ইস্যুকৃত শেয়ারের অংশ হিসেবে গণপ্রস্তাব – এসব বিচারে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বেশ কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা গেছে। তবে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট পরিশোধিত মূলধন আগের অর্থবছরের (৪.২৪ শতাংশ) তুলনায় কম। পুঁজিবাজারের গভীরতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য নতুন দেশীয় শেয়ার ও বহুজাতিক কোম্পানির শেয়ার বাজারে আসা জরুরি। আশা করা যায় যে, এক্ষেত্রে বাজারে গ্রামীণফোনের শেয়ার ইস্যু হবে এক ধাপ অগ্রগতি।

সারণি ১.২০: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে গণপ্রস্তাবের অবস্থা

বিষয়	অর্থবছর ২০০৭-০৮	অর্থবছর ২০০৮-০৯*	তুলনামূলক পরিবর্তন (%)
আইপিওর সংখ্যা	১২	১৩	৮.৩৩
মোট ইস্যুকৃত শেয়ার (আইপিও-পরবর্তী)	৭৬১২৭৩১৪	১৯৩২৯০০০০	১৫৩.৯০
স্পন্সরদের অংশ (শেয়ার)	৪৫২৪৫২৬৪	৮৭০২০০০০	৯২.৩৩
গণপ্রস্তাব (শেয়ার)	৩০৮৮২০৫০	১০৮৯৭০০০০	২৫২.৮৬
মোট ইস্যুকৃত শেয়ারের মধ্যে গণপ্রস্তাবের অংশ (আইপিও-পরবর্তী)	৪০.৫৭	৫৬.৩৮	৩৮.৯৭
মোট পরিশোধিত মূলধন (আইপিও-পরবর্তী) (কোটি টাকায়)	৭৪৯.৬৮	৭১৭.৯০	-৪.২৪

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটের তথ্যের ভিত্তিতে হিসাবায়িত।

দ্রষ্টব্য: *২০০৮-০৯ অর্থবছরে সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেড মোট ২৩ লাখ শেয়ারের মধ্যে (প্রাথমিক গণপ্রস্তাব-পরবর্তী) মাত্র ৫ লাখ নতুন শেয়ার ইস্যু করে, যার মধ্যে আবার মাত্র ২০ শতাংশ ছিল জনসাধারণের জন্য।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার নানা পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এবং এসব চ্যালেঞ্জ কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা দরকার। অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে মার্চেন্ট ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান ছিল অন্যতম বড় ঘটনা। যদিও এই উদ্যোগ বাজারের ওপর কিছু মার্চেন্ট ব্যাংক, বড় বিনিয়োগকারী ও ব্রোকারেজ হাউসের নিয়ন্ত্রণ এড়াতে সহায়তা করবে, তবে অধিকাংশ ব্যাংকের দুর্বল কার্যক্রম এই উদ্যোগের কার্যকারিতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এ অবস্থায় বিনিয়োগকারীদের আশঙ্কা দূর করতে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কার্যকর পদক্ষেপ এবং প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠার দরকার হবে। পুঁজিবাজারে কোম্পানিগুলোর বড় ইস্যু আকর্ষণে বুক বিল্ডিং-সংক্রান্ত নিয়মকানুন অনুমোদিত হয়েছে। লভ্যাংশ ঘোষণার সময় শেয়ার প্রতি আয়, নীট সম্পদমূল্য এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর শেয়ার প্রতি নীট পরিচালন নগদ প্রবাহ প্রকাশের নতুন নির্দেশনার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি কমিশনের আরেকটি পদক্ষেপ। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের জন্য তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদন সহজলভ্য হওয়া উচিত (এসব রিপোর্ট ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে দেওয়া যেতে পারে), যা কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম ও

আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের ভালো ধারণা দেবে। ২০০৮০৯ অর্থ বছরের প্রথম চার মাসে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা (বাংলাদেশ ব্যাংক সহ) কিছু নতুন সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে রয়েছে, জেড ক্যাটাগরির কয়েকটি শেয়ারের লেনদেন স্থগিত রাখা, স্টক পোর্টফোলিওর ওপর মাসিক প্রতিবেদন দাখিল বাধ্যতামূলক করা এবং নতুন রূপান্তরযোগ্য শেয়ার বিক্রির ওপর বিধিনি ষেধ আরোপ করে লকইন পিরিয় ড চালু করা। পুঁজিবাজারে জটিলতা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রেখে এখানে উদ্ভূত বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি পৃথক আইনী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ করবে। মূলধনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে পদ্মা সেতুর মতো বড় আকারের বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের বিষয়টি সরকারের বিবেচনা করা উচিত। তাছাড়া এসব প্রকল্পের সিকিউরিটাইজেশনের প্রয়োজনীয়তার দিকটিও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১.৬.৫ খসড়া শিল্পনীতি ২০০৯: একটি পর্যালোচনা

২০০৯ সালের এপ্রিলে খসড়া শিল্পনীতি প্রকাশ করা হয়, যা অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং সংশ্লিষ্টদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। প্রথমত, নতুন শিল্পনীতির মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে শিল্পায়নের জন্য কার্যকর কৌশল তৈরিতে সক্ষমতার প্রশ্নে নতুন নির্বাচিত সরকারের জন্য ছিল একটি পরীক্ষা। দ্বিতীয়ত, শিল্প খাতে কাঠামোগত পরিবর্তনের আলোকে নতুন অথবা সম্ভাবনাময় শিল্পের উদ্ভব এবং বাজার বহুমুখীকরণের চাহিদা বিবেচনায় নতুন একটি শিল্পনীতি খুবই জরুরি। বেসরকারি খাতকে উৎসাহ দিতে এবং সরকারি খাতের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠন ও সংস্কারের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে নীতি নির্দেশনা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ফলশ্রুততে একটি নতুন বাস্তবতার উদ্ভব হয়েছে, যা মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের কৌশল পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। উল্লেখিত বিষয়গুলোর আলোকে প্রত্যাশিত উদ্দেশ্য ও ফলাফল অর্জনে খসড়া শিল্পনীতি সংশোধন করার দরকার রয়েছে।

শিল্পনীতি ২০০৯ চূড়ান্তভাবে ঘোষিত হলে তা হবে স্বাধীনতার পর নবম শিল্পনীতি। বর্তমানে শিল্পনীতি ২০০৫ বলবৎ রয়েছে। খসড়া শিল্পনীতি ২০০৯এর প্রণয়ন প্রক্রিয়া গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ব্যাপক আলোচনা এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে শুরু হয়। নতুন সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তৈরি খসড়া পর্যালোচনাসহ প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখে। খসড়া শিল্পনীতি ২০০৯ শিল্পনীতি ২০০৫এর তুলনায় কিছুটা সংক্ষিপ্ত। এতে রয়েছে ১৬টি অধ্যায় যাতে কিছু নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (যেমন: নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা); এবং কিছু বিষয় বাদ দেওয়া হয়েছে (যেমন: কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং তদসম্পর্কিত মন্ত্রণালয়গুলোর ভূমিকা)। খসড়া শিল্পনীতি ২০০৯এ নানা বিষ য়ের অন্তর্ভুক্তি বিবেচনায় মনে হয় যে, বিভিন্ন ইস্যুর তুলনামূলক গুরুত্ব নীতিতে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। বিদেশি বিনিয়োগ, রপ্তানিমুখী শিল্প, উৎপাদনশীলতা, মানবসম্পদ ও প্রযুক্তির মতো ইস্যুগুলো যথাযথ গুরুত্ব পায়নি।

খসড়া শিল্পনীতি ২০০৯এর বিভিন্ন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এতে শিল্পের শ্রেণীকরণ বাড়ানো, প্রতিটি ক্যাটাগরির শিল্পের বিস্তৃত সংজ্ঞা, নতুন ক্যাটাগরির শিল্পের সূচনা (সংরক্ষিত শিল্প), থ্রাস্ট সেক্টরের তালিকা ছোট করা, রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে অবস্থিত দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিদেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সমান সুবিধা প্রদান এবং নারী উদ্যোক্তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার এবং সাংস্কৃতিক স্পর্শকাতরতার মধ্যে ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় “সংরক্ষিত শিল্প” নামক নতুন ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্তি যৌক্তিক মনে হয়। এই তালিকায় ১৬টি শিল্পকে রাখা হয়েছে। তবে এই তালিকায় ব্যাংক, বীমা ও শিপিং কোম্পনি রাখার বিষয়টি বোধগম্য নয়।

রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের বাইরে দেশীয় ভারী শিল্পের উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তাবিত নীতিতে উভয় ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য একই প্রণোদনা ও সুবিধার কথা বলা হয়েছে। শিল্পনীতি থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে সরকার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব বাড়াতে আগ্রহী। এ কাজ করতে গিয়ে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত বিদ্যমান নীতিসমূহকে যাতে দুর্বল করা না হয় তা দেখতে হবে। নীতি-সহায়তার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান একটি ভালো পদক্ষেপ। তবে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার সময় দক্ষতার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া উচিত হবে। যেমন: ইপিজেডে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কোটা হিতে বিপরীত হতে পারে এবং যথাযথ বিবেচনার পরই তা বাস্তবায়ন করা উচিত।

প্রস্তাবিত শিল্পনীতি ২০০৯ সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠন এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার প্রশ্নেও একটি অবস্থান নিয়েছে। তবে শিল্পনীতি ২০০৯-এ সন্নিবেশিত নীতি অবস্থান বেসরকারীকরণের ওপর সরকারের বিদ্যমান নীতি (বেসরকারিকরণ আইন ২০০৫) এবং এ খাতের অন্যান্য নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৮৪ সাল থেকে ঘোষিত শিল্পনীতিগুলো উদারীকরণ-বান্ধব এবং একই সঙ্গে বেসরকারি খাতনির্ভর শিল্পায়ন-বান্ধব। এই প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত শিল্পনীতি ২০০৯-এ শিল্প উন্নয়নে সরকারি খাতের "পরিপূরক" ভূমিকার বিষয়টি কিছু বিভ্রান্তির জন্ম দেবে। কেননা, এ বিষয়ে প্রকৃত পক্ষে কী বোঝানো হয়েছে, তার পরিষ্কার ব্যাখ্যা নেই।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর বেসরকারীকরণ অব্যাহত না রাখার ঘোষণার মাধ্যমে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, যা বেসরকারীকরণ আইন ২০০৫ এবং পাটনীতি ২০০৫-সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বর্তমানে ২৫টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া এই নীতি অন্যান্য কিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের বাজারে শেয়ার ছাড়ার বিষয়টিও অনিশ্চিত করতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের জন্য ভুল সংকেত হতে পারে। অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের অদক্ষতা ও লোকসানের আলোকে এবং ফলশ্রুতিতে রাজস্ব আয়ের ওপর প্রতিবন্ধকতার বিবেচনায় এসব প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিয়ে যেকোন সংস্কার হওয়া উচিত। শিল্পনীতি ২০০৯ সরকারের বেসরকারীকরণ নীতির সহায়ক হওয়া উচিত এবং এসব সরকারি প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন প্রশ্নে এর অবস্থান পরিষ্কার হওয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ, কিন্তু এটি আরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত।

১.৬.৬ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর বেসরকারীকরণ পরিস্থিতি

দেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮৪টি। বিভিন্ন কারণে এসব প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ। এসব প্রতিষ্ঠানে সার, পাট, রাসায়নিক দ্রব্য ও ইস্পাতসহ গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু পণ্য উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, কিছু প্রতিষ্ঠানে বড় অঙ্কের ঋণের বোঝা এবং বেশ কিছু ইউনিটের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বেসরকারীকরণ কমিশনের হাতে ২৯টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছিল। তবে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার (প্রথমার্ধে) এবং নতুন নির্বাচিত সরকার (দ্বিতীয়ার্ধে) কোন সময়েই এই প্রক্রিয়া এগোয়নি। গত দুই বছরে মাত্র একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে। আরেকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের হস্তান্তর এখনও প্রক্রিয়াধীন (সারণি ১.২১)। বাকি ২৭টি প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন কারণে বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার বাইরে নেওয়া হয়েছে। সরকারি খাতের আওতায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় চালু করার জন্য

নতুন সরকারের নীতি অবস্থানের কারণে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পাঁচটি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালনার প্রস্তাব রয়েছে। ছয়টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান সর্বাধিক শেয়ারহোল্ডারদের কাছে লীজ অথবা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং বাকি ১০টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

সারণি ১.২১: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া

খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান	হস্তান্তর	অনুমোদন এবং হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন	পুনঃদরপত্র এবং পুনর্মূল্যায়নের প্রক্রিয়াধীন	লীজ প্রক্রিয়াধীন	বেশি শেয়ারহোল্ডারদের কাছে হস্তান্তরের বিবেচনাধীন	ভ্যালুয়েশনের প্রক্রিয়াধীন	মামলা সমস্যা	পুনরায় চালু করার বিবেচনাধীন	মন্ত্রণালয়ে* ফেরত যাওয়ার প্রক্রিয়াধীন
টেক্সটাইল ও হ্যান্ডলুম (৭)		১	১	২			২	১	
রাসায়নিক (৫)	১		১		১		১	১	
পরিবেশ ও বন (৪)			১			১			২
পাট (১)							১		
প্রকৌশল ও বিবিধ (৬)					৩	১			২
চা (১)						১			
চিনি (১)		১							

উৎস: বাংলাদেশ প্রাইভেটাইজেশন কমিশন।
দ্রষ্টব্য: *পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

সরকার নয়টি বস্ত্র ও তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এই সংখ্যা সাতে নেমে এসেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই সাতটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি ইতিমধ্যে সরকার চালু করবে এমন তালিকায় রয়েছে। তিনটি পাটকল বেসরকারীকরণের প্রাথমিক প্রক্রিয়ার আওতায় ছিল। সরকার এ তালিকা থেকে দুটিকে বাদ দিয়েছে এবং অন্যটি মামলাসংক্রান্ত জটিলতায় ভুগছে। বেসরকারীকরণের জন্য ছয়টি রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত ছিল, কিন্তু সরকার সম্প্রতি তা থেকে একটি প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া বাতিল করেছে এবং এটিকে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের মাধ্যমে বেসরকারীকরণ কার্যক্রমে তেমন একটা গতি ছিল না। প্রধানত সরকারের "ধীরে চলো" নীতি এবং কিছু বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করার নীতির কারণেই ওই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বেশ কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দুর্বল পরিচালনদক্ষতা, ব্যাপক লোকসান, বড় অঙ্কের ঋণের বোঝা এবং অতিরিক্ত জনবল রয়েছে। সরকারি খাতের পাঁচটি কর্পোরেশনের মধ্যে কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন লাভজনক অবস্থায় আছে। বস্তুত, এর কার্যক্রমের উন্নতি হচ্ছে; ২০০১-০২ অর্থবছরে এর নীট লাভ ছিল ১২ কোটি ৬২ লাখ টাকা, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়ায় ৩১ কোটি ৪৬ লাখ টাকা। আলোচ্য অর্থবছরে গত কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প কর্পোরেশন ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দ্বিতীয়বারের মতো লাভের মুখ দেখে।

অন্যান্য কর্পোরেশন (বাংলাদেশ বস্ত্রকল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন) কয়েক বছর ধরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লোকসান দিয়ে আসছে। বিভিন্ন বিশ্লেষণে (Moazzem and Sharmin ২০০৯) দেখানো হয়েছে যে, অভ্যন্তরীণ বিষয়, যেমনঃ নিম্ন মাত্রার উৎপাদন ও পরিচালন অদক্ষতা, সেকেলে যন্ত্রপাতির ব্যবহার, যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে না পারা, অতিরিক্ত জনবল, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা, দুর্নীতি, দুর্বল বিপণন কৌশল, বড় অঙ্কের ঋণের বোঝা এবং কারখানা ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতার অভাব বাংলাদেশে সরকারি খাতের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বল কার্যক্রমের জন্য প্রধানত দায়ী। যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল, সেগুলো আবার ফেরত আনতে সরকারের উদ্যোগের কারণে বিভিন্ন পক্ষ থেকে উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছে। প্রথমত, কর্পোরেশন ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান, পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের পুনর্গঠন ও সংস্কার ছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান লাভজনক হবে তা আশা করার তেমন কোন কারণ নেই। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন কর্পোরেশনে সরকারি ভর্তুকি সহায়তার জন্য বড় অঙ্কের দাবি থাকা সত্ত্বেও এর সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করা আকর্ষণীয় কোন পদক্ষেপ ছিল না। এমনকি "জনবাদী" দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানের অতিরিক্ত জনবলের ইউনিটগুলোতে সবার কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে গেলেও শ্রমিকদের মজুরির জন্য অনেক ভর্তুকি দরকার হবে, যা সরকারের জন্য কঠিন হবে। তৃতীয়ত, সরকারি খাতের অনেক পাটকল অনেক দিন ধরে বন্ধ অথবা কম ক্ষমতা ব্যবহার করে চলছে। এসব ইউনিটের মেরামত ও প্রযুক্তি, পরিচালন ও আর্থিক অদক্ষতা, ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক সম্পর্ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগের জন্য প্রচুর সম্পদ দরকার। এমনকি এসব প্রতিষ্ঠান সংস্কারে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় করলেও, এগুলো লাভজনক হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত দক্ষতানির্ভর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা প্রতিষ্ঠিত না হয়। এক্ষেত্রে সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে কঠিন নীতি অবস্থান নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে।

১.৬.৭ জ্বালানি

বিদ্যুৎ খাত

অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ বাংলাদেশে অন্যতম সমস্যা, যা বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে মারাত্মক বাধার সৃষ্টি করছে। এ কারণে নতুন বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হচ্ছে আর চলমান বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কবলে পড়ে যন্ত্রপাতির ক্ষতি হচ্ছে, উৎপাদনে ক্ষতি হচ্ছে এবং অধিকতর ব্যয়বহুল বিকল্প উৎস ব্যবহারের কারণে জ্বালানি বাবদ ব্যয় বাড়ছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশ্তেহারে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০১১ সালের মধ্যে ৫,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০১৩ সালের মধ্যে ৭,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

নবনির্বাচিত সরকারের জন্য মানদণ্ড

সরকারি হিসাবে ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে ২,৮৭৯.৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপরীতে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ৩,৩০৫ মেগাওয়াট, যেখানে ঘাটতি ছিল ৪২৫.৬ মেগাওয়াট। তবে নবনির্বাচিত সরকারের কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে এই চাহিদা-সরবরাহ পার্থক্য ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে কমে দাঁড়ায় ৫৩.১ মেগাওয়াট (কাগজেকলমে গড় চাহিদা ছিল ৩,৭১৪.৪ মেগাওয়াট, যার বিপরীতে সরবরাহ ছিল ৩,৬৬১.৪ মেগাওয়াট)। ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি হয় ২৭ শতাংশ। বর্ধিত উৎপাদন ক্ষমতা ৪০৯.৪ মেগাওয়াটের

মধ্যে নতুন উৎপাদন হিসেবে যোগ হয় ২৫৪ মেগাওয়াট[১৪], যার মধ্যে সরকারি খাত থেকে আসে ৭০ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে আসে ২৫৪ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মেরামতের কারণে বাকি ৮৫.৪ মেগাওয়াট যোগ হয়। বর্তমান সরকারের প্রথম মাসে (জানুয়ারি) সর্বোচ্চ চাহিদা ৪,১০০ মেগাওয়াটের বিপরীতে ৩,৮৬০.৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, যেখানে ২০০৯ সালের জুনে সর্বোচ্চ উৎপাদনের মাত্রা বেড়ে দাঁড়ায় (অতিরিক্ত ১৭২.৬ মেগাওয়াট সহ) ৪,৩৩৩.২ মেগাওয়াট।

বিদ্যুৎ উৎপাদন

২০০৯ সালের জানুয়ারিতে চাহিদা-সরবরাহ পার্থক্য ছিল ৫৭৫.২ মেগাওয়াট (সর্বোচ্চ), যা একই বছরের ফেব্রুয়ারি ও জুনে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯১৫ মেগাওয়াট এবং ১,৭৫০ মেগাওয়াট। ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত গড়ে লোডশেডিং ছিল ৩৮১.৫ মেগাওয়াট। চিত্র ১.৩৫ থেকে দেখা যায় যে, চাহিদা-সরবরাহ পার্থক্য পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে এই পার্থক্য ছিল মাত্র ৬৮ মেগাওয়াট, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১৭৫ মেগাওয়াটে পৌঁছায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অধিকতর ভালো রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কারণে স্থাপিত ক্ষমতার অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল সর্বোচ্চ (৭৮ শতাংশ)।

চিত্র ১.৩৫: স্থাপিত ক্ষমতা, উৎপাদন ক্ষমতা, বিদ্যুৎ চাহিদা ও চাহিদা-সরবরাহ পার্থক্য

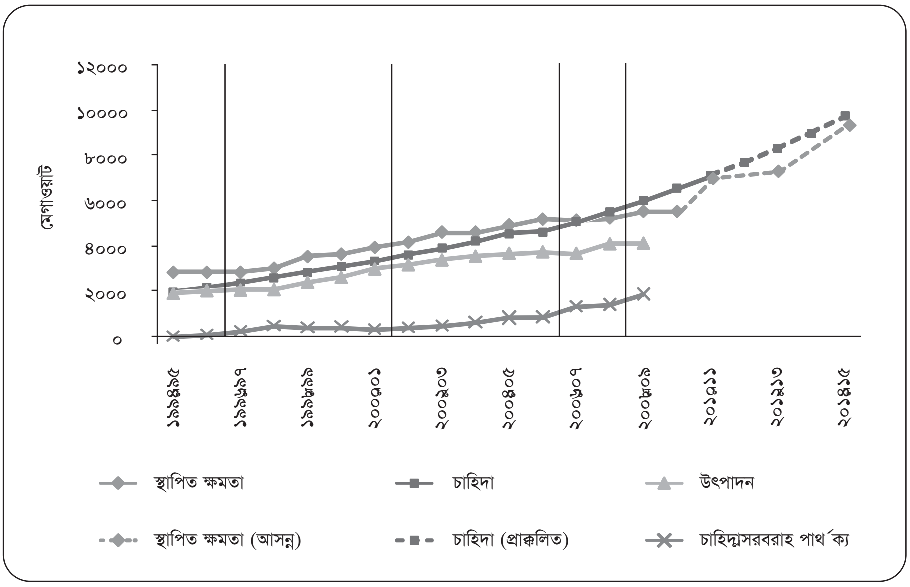

উৎস: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মাস্টারপ্ল্যান আপডেট।

আগে চালু হওয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ২০১৪ সাল নাগাদ ৪,০৬৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। অন্যদিকে নতুন সরকার ২০১৫ সাল নাগাদ ৩,৩২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করেছে (জ্বালানি তেল নির্ভর ৪০০ মেগাওয়াট সহ)। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী

[১৪] এই ২৫৪ মেগাওয়াটের মধ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি), ১৫-বছর মেয়াদি ও ৩-বছর মেয়াদি ভাড়াকৃত পাওয়ার প্ল্যান্ট ও যথাক্রমে ৯২ মেগাওয়াট, ২২ মেগাওয়াট ও ১৪০ মেগাওয়াট যোগ করেছে।

ইশ্‌তেহারে ২০১১ সালের মধ্যে ৫,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০১৩ সালের মধ্যে ৭,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করা হয়। তবে চলমান ও সাম্প্রতিক উৎপাদন কার্যক্রম পরিকল্পনার (২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত) আওতায় এটি অর্জন করা সম্ভব ন্নাও হ তে পারে। ২০১১ সাল শেষে ৫,০০০ মেগাওয়াট লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩,২৮১ মেগাওয়াট ঘাটতি এবং ২০১৩ সাল শেষে ৭,০০০ মেগাওয়াট লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩,২৪১ মেগাওয়াট ঘাটতির মুখোমুখি হতে পারে সরকার। অন্যদিকে ২০১৫ সাল শেষে মোট উৎপাদন ৭,৩৪৯ মেগাওয়াটে পৌঁছাতে পারে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

বিভিন্ন কারণে উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যকার ব্যবধান বাড়ছে। এর মধ্যে রয়েছে: ক) গ্যাসের সংকট; খ) বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর অনেক পুরোনো হয়ে যাওয়া; এবং গ) সাম্প্রতিক সময়ে কাপ্তাই হ্রদে বৃষ্টির অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্ষতিকর প্রভাব। উল্লেখিত কারণে ২০০৯ সালের এপ্রিলে ৮৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি হয়েছে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

গ্যাস উৎপাদন

বাংলাদেশের ২১.৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ) গ্যাসের প্রমাণিত মজুদ রয়েছে। উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মধ্যে ৮.০৫ টিসিএফ গত ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে; বাকি ৭.৩৬ টিসিএফ এখন মজুদ হিসেবে রয়েছে। তবে, বিদ্যমান এই ৭.৩৬ টিসিএফ ২০১৫ সালের পর বাংলাদেশের সামগ্রিক চাহিদা মেটাতে পারবে না। জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে (Khan ২০০৯), ২০২৫ সাল নাগাদ জ্বালানি চাহিদা মেটাতে ২৪ টিসিএফ গ্যাস প্রয়োজন (এজন্য প্রায় ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন)।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্যাসের উৎপাদন ৬ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ হারে বেড়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রেকর্ড ৮.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে উৎপাদনে, যার মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮,৫১০.৭১৯ এমএমসিএম (মিলিয়ন ঘনমিটার)। এটা বর্তমান রিজার্ভ ব্যবহারের বৃদ্ধিই নির্দেশ করে (সারণি ১.২২)। যদিও ৪০ শতাংশের বেশি গ্যাসই বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে এবং সিএনজিতে রূপান্তরের কাজ সহ অন্যান্য কাজে গ্যাসের ব্যবহারও সাম্প্রতিক সময়ে বেড়েছে (চিত্র ১.৩৬)। তবে, গ্যাসের স্বল্পতার কারণে সরকার বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে সার কারখানাসমূহ ও বিভিন্ন শিল্প ইউনিট, যেমন–সুতা ও বস্ত্র কারখানাগুলোতে গ্যাসের সরবরাহ রাতের বেলায় সীমিত/নিয়ন্ত্রিত করেছে।

সারণি ১.২২: বিভিন্ন বছরে গ্যাস উৎপাদন

(এমএমসিএম)

অর্থবছর	পেট্রোবাংলা	আইওসি*	মোট	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০২-০৩	৯৪৪৯.১০	২৪৭৬.৭০	১১৯২৫.৯০	
২০০৩-০৪	৯৭১৫.১০	৩১০৬.০০	১২৮২১.১০	৭.৫০
২০০৪-০৫	১০০৮৬.৫০	৩৬৯৬.৯০	১৩৭৮৩.৪০	৭.৫০
২০০৫-০৬	১০১১৬.৬০	৪৮০৪.৩০	১৪৯২০.৮০	৮.৩০
২০০৬-০৭	১০১৪৮.৫০	৫৭৭১.৭০	১৫৯২০.১০	৬.৭০
২০০৭-০৮	৯২৮২.০০	৭৭৩২.৫০	১৭০১৪.৫০	৬.৯০
২০০৮-০৯	৯২২২.০৬	৯২৮৮.৬৫	১৮৫১০.৭০	৮.৮০

উৎস: এমআইএস রিপোর্ট, পেট্রোবাংলা।

দ্রষ্টব্য: *আইওসি: ইন্টারন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি।

চিত্র ১.৩৬: বিভিন্ন খাতে গ্যাসের ব্যবহার

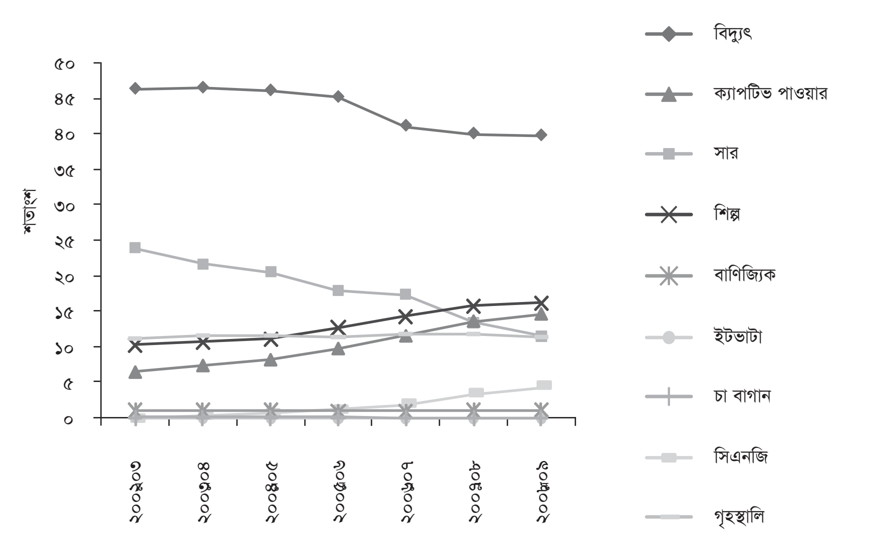

উৎস: এমআইএস রিপোর্ট, পেট্রোবাংলা।

সার্বিক গ্যাস বিতরণের ক্ষেত্রে বেসরকারি কোম্পানিগুলোর অংশীদারিত্ব সাম্প্রতিক সময়ে বেড়েছে। গত সাত বছরে বেসরকারি কোম্পানিগুলোর অংশ ২০০২-০৩ অর্থবছরের ২১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (চিত্র ১.৩৭)। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে উৎপাদনের ক্ষেত্রে

চিত্র ১.৩৭: সরকারি ও বেসরকারি খাতে গ্যাসের উৎপাদন

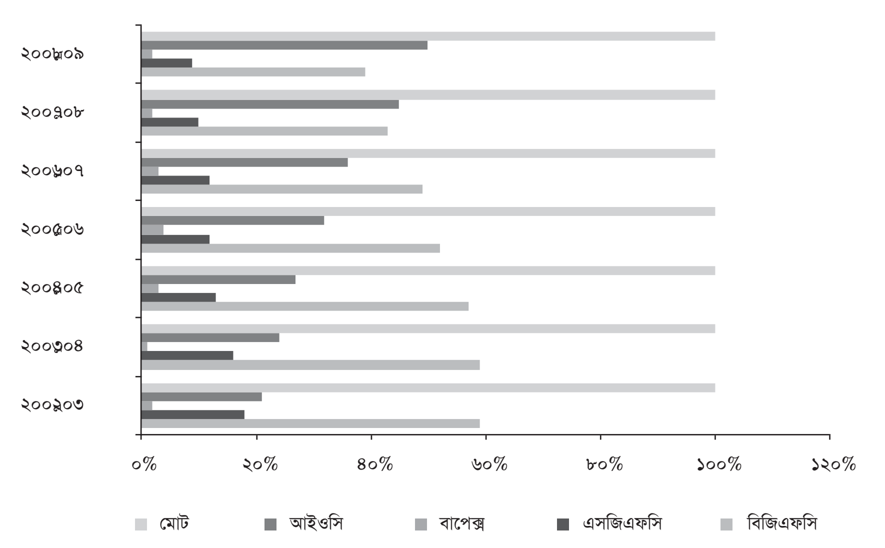

উৎস: পেট্রোবাংলা।

দ্রষ্টব্য: বাপেক্স: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি; এসজিএফসি: সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি; বিজিএফসি: বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি।

পেট্রোবাংলার অংশ ছিল ৫৫ শতাংশ, যা ২০০৮–০৯ অর্থবছরে ৫০ শতাংশে নেমে এসেছে। দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জরুরি প্রয়োজন মেটানোর প্রেক্ষিতে জ্বালানি খাতে স্থানীয় উপস্থিতি জোরদার করার জন্য বাপেক্সকে আরও শক্তিশালী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ্যাসবিদ্যুতের বর্তমান অঙ্কগুলো বলে দেয় যে ২০২১ সাল নাগাদ ৫,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (আওয়ামী লীগের ইশতেহার অনুসারে) অর্জন করতে হলে ১,০০০ এমএমসিএফডি গ্যাসের প্রয়োজন হবে, যা বর্তমান সরবরাহ ৬৭৫ এমএমসিএফডির চেয়ে ৪০ শতাংশ বেশি।

১.৭ বহির্খাত

১.৭.১ রপ্তানি খাতের অবস্থা

২০০৭–০৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১৪.০৯ বিলিয়ন ডলার (চিত্র ১.৩৮), যা ২০০৬–০৭ অর্থবছরের চেয়ে ১৫.৯২ শতাংশ বেশি। ২০০৮–০৯ অর্থবছরের অবস্থা মোটামুটিভাবে একই ধরনের ছিল (১৫.৫৪ বিলিয়ন ডলার)। ওই অর্থবছরে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয় ১০.২৮ শতাংশ (সারণি ১.২৩)। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সময় যখন বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানি আয় কমে গেছে, তখন বাংলাদেশে এই রপ্তানি আয় স্পষ্টতই ইতিবাচক। তবে ২০০৮–০৯ অর্থবছরের শুরুতে ১৬.৩ বিলিয়ন ডলারের যে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, অর্থবছর শেষে তা ০.৭৬ বিলিয়ন ডলার কম হয়েছে।

চিত্র ১.৩৮: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পণ্যের রপ্তানি: অর্থবছর ২০০৭-০৮ ও অর্থবছর ২০০৮-০৯

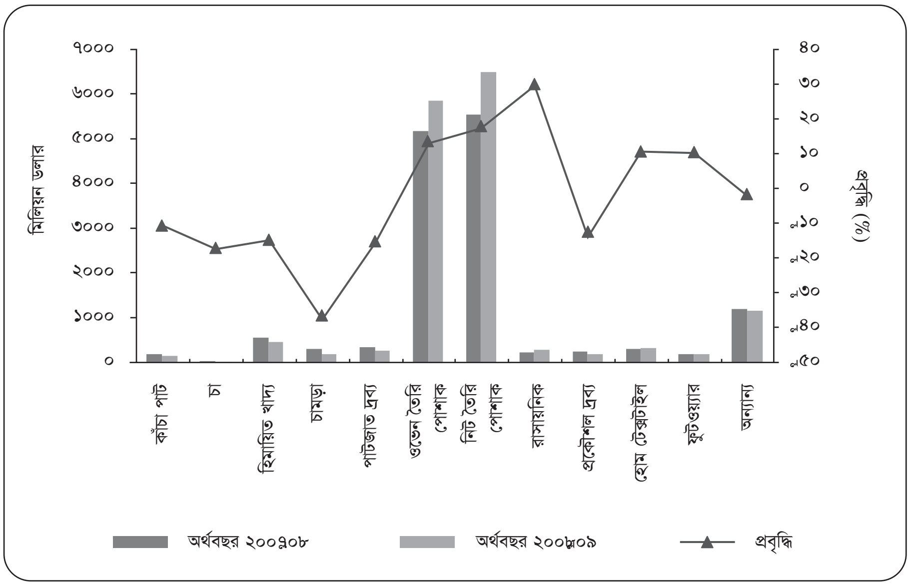

উৎস: সিপিডি ট্রেড ডাটাবেইজ, ২০০৯।

সারণি ১.২৩: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের ত্রৈমাসিক প্রবৃদ্ধি

পণ্য	অর্থবছর ২০০৭–০৮ ও অর্থবছর ২০০৮–০৯				
	১ম প্রান্তিক	২য় প্রান্তিক	৩য় প্রান্তিক	৪র্থ প্রান্তিক	জুলাই–জুন
কাঁচা পাট	–২৭.৬১	৫.৬০	–৩৮.০৫	২২.০৪	–১০.৫২
চা	৩৬.২৭	–২৮.৪৫	–৪১.৫২	–৫৬.৬২	–১৭.৩৩
হিমায়িত খাদ্য	১৫.৬৯	–২৪.৩১	–৩২.২৪	–২১.০৪	–১৪.৮৩
চামড়া	–৬.৩৪	–৫০.২৪	–৪১.৩৯	–৪৬.৮৩	–৩৭.৬১
পাটজাত দ্রব্য	–৪.৩১	–৩২.০৫	–১৮.০৮	–৭.২৩	–১৫.৪১
তৈরি পোশাক	৪৪.৬৪	৫.৪১	১২.৭২	৩.৭৯	১৫.৩৯
ওভেন তৈরি পোশাক	৩৬.৬৬	৬.৩১	৯.৮৬	৪.০১	১৩.২৪
নিট তৈরি পোশাক	৫২.০৪	৪.৬২	১৫.৭৭	৩.৬১	১৭.৩৯
রাসায়নিক	১৯৫.৮০	–১৩.৭৫	১৫.০১	–২৮.৪২	২৯.৬৮
প্রকৌশল দ্রব্য	৩০.৯১	–৫৫.৭৮	–৭.৬০	–৮.৮২	–১৩.৭৬
হোম টেক্সটাইল	২৭.৭৫	–৩.৯৩	৩৮.৩৬	–৯.১২	১০.৬৭
ফুটওয়্যার	৪৯.০৪	৮.৮১	৩.৬৯	–১৩.৫৭	১০.২৪
অন্যান্য	৫৪.৬১	–১৭.১৪	–১৮.৮৯	–১০.৩০	–২.০৪
মোট রপ্তানি	৪২.৪৫	–১.৬০	৬.০৩	–০.৫৬	১০.২৮

উৎস: সিপিডি ট্রেড ডাটাবেইজ, ২০০৯।

তৈরি পোশাক খাতের পরিস্থিতি

বিশ্বমন্দার প্রভাবে তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানির সম্ভাব্য হ্রাস নিয়ে ব্যাপক শঙ্কা ছিল। পুরো ২০০৮–০৯ অর্থবছর জুড়েই রপ্তানিতে ওঠানামা বেড়ে যায়; তৈরি পোশাক বাদে অন্যান্য পণ্য সমস্যায় পড়ে আর প্রায় সব ক্ষেত্রেই মূল্যে নিম্নমুখী চাপ দেখা যায়।

বস্তুত, ২০০৮–০৯ অর্থবছরের দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রান্তিকে বাংলাদেশের রপ্তানিতে বিশ্ব আর্থিক মন্দার বৈরী প্রভাব সঞ্চারিত হয়। তারপরও গুরুত্বপূর্ণ পণ্য তৈরি পোশাক এই অর্থবছরে ১৫.৩৯ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে; এটা মূলত হয়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাজারে ভালো করার সুবাদে। আবার, ২০০৮–০৯ অর্থবছরের দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রান্তিকে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানিতে আগের অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ৫.৪১ শতাংশ ও ৩.৭৯ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বাজারের অপেক্ষাকৃত কম দরের পোশাক প্রস্তুত করে। আবার ওয়াল্লমার্ট, ক্লেমার্ট সহ বড় বড় খুচরা বিপণি বিতানগুলো সাধারণত কম দামের পোশাক বিক্রি করে। এসব প্রতিষ্ঠান তাই বাংলাদেশের প্রধান ক্রেতা। ফলে মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশ বেশির ভাগ বাজারে তার অংশ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। তবে, ২০০৯ সালের মার্চ ও এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক ও সামগ্রীর খুচরা পর্যায়ে বিক্রি যথাক্রমে ৬.৬ শতাংশ ও ৬.৫ শতাংশ হারে কমে যায়, যেটা বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যের চাহিদায় ধস নামার ইঙ্গিত দেয়, পরবর্তী মাসগুলোয় যা প্রমাণিত হয়েছে।[১৫] তবে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাজারে ইতিবাচক প্রবণতার আভাস মেলে। সে সময় জেসি পেনি ছাড়া অন্য গুরুত্বপূর্ণ খুচরা ব্যবসায়ীদের শেয়ার মূল্য ঊর্ধ্বগামী হচ্ছিল, যা ভবিষ্যৎ বাজারের ইতিবাচক দিকের নির্দেশক ছিল (চিত্র ১.৩৯)।

[১৫] ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওয়াল্লমা র্টের বিক্রি ৫.১ শতাংশ বাড়ে যেখানে বিশ্লেষকরা ২.৪ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তবে টার্গেট করপ., নর্ডস্টর্ম, গ্যাপ, জেসি পেনি এবং মেসির ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাদের সবার বিক্রিই আগের বছরের তুলনায় কমে যায়।

চিত্র ১.৩৯: কতিপয় বৈশ্বিক খুচরা বিপণি বিতানের শেয়ার দর

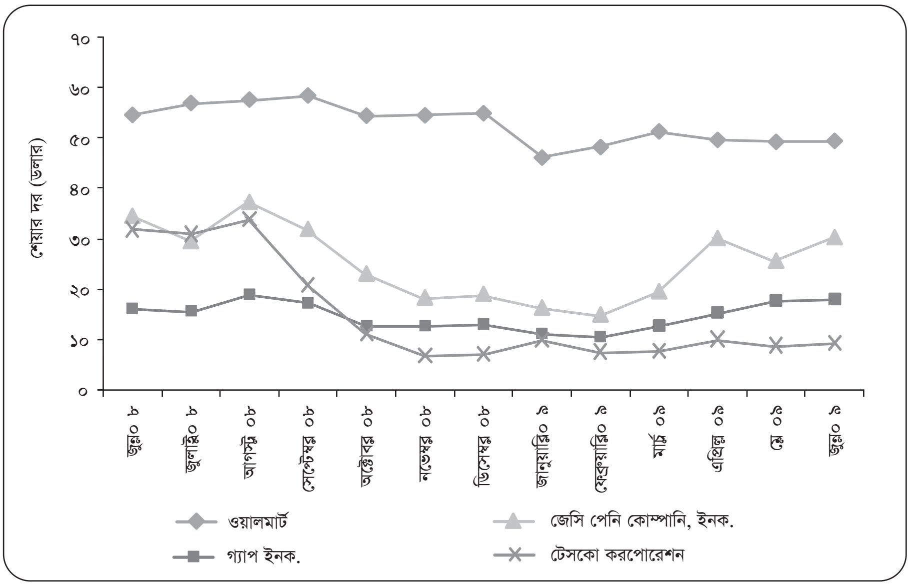

উৎস: yahoo ফাইন্যান্সের দেওয়া পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে সিপিডির হিসাব।

চীনের পোশাক রপ্তানির ওপর থেকে কোটার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর (২০০৮ সালের জানুয়ারি) আশঙ্কা করা হয়েছিল যে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি কমে যাবে। এই আশঙ্কা বাস্তবে সত্য প্রমাণিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তথ্যউপাত্ত হতে দেখা যায়, যখন বৈশ্বিক আমদানি কমে যাচ্ছিল,

চিত্র ১.৪০: বিশ্ব এবং উলেখযোগ্য কতিপয় দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানি: অর্থবছর ২০০৭-০৮ ও অর্থবছর ২০০৮-০৯

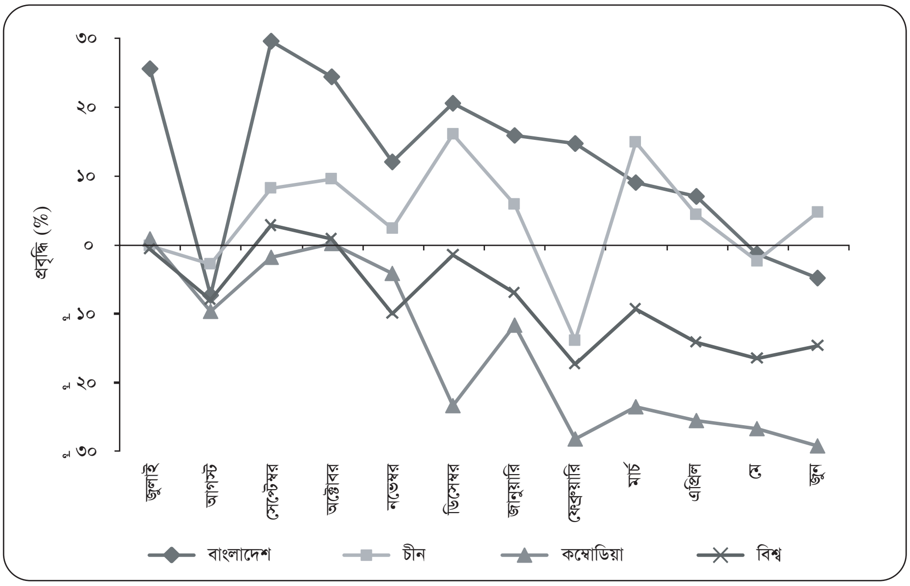

উৎস: ইউএসআইটিসি ডাটাবেইজের ভিত্তিতে সিপিডির হিসাব।

বাংলাদেশ ও চীন দুই দেশই সেই একই সময়ে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করছিল। ২০০৮–০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১.৫৭ শতাংশ, আর চীনের ক্ষেত্রে ৩.৫৯ শতাংশ; যদিও সার্বিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মোট আমদানি আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৭.৩৫ শতাংশ কমে গিয়েছিল। অন্যদিকে, ওই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে কম্বোডিয়ার তৈরি পোশাক রপ্তানি ১৪.৩ শতাংশ কমে যায়। ভিয়েতনাম তুলনামূলকভাবে বৈশ্বিক মন্দায় কম আক্রান্ত হওয়ায় ২০০৭–০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৮–০৯ অর্থবছরে তাদের প্রবৃদ্ধি হয় ৭.৬১ শতাংশ (চিত্র ১.৪০)।

যদিও বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাত একটি কঠিন সময়ের মোকাবেলা করে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে, কিন্তু অন্য কিছু রপ্তানিমুখী খাত ২০০৮–০৯ অর্থবছরে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তৈরি পোশাক-বহির্ভূত খাতের রপ্তানি কমেছে ৬.০৯ শতাংশ হারে। ২০০৮–০৯ অর্থবছরের রপ্তানি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশের চামড়াশিল্পের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৩৭.৬১ শতাংশ হারে কমে গেছে। এটা ঈদ মৌসুমে পশুর চামড়ার চাহিদা কম থাকার বিষয়টির প্রতিফলন।[১৬] অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতের মধ্যে কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি যথাক্রমে ১০.৫ শতাংশ ও ১৪.৮ শতাংশ কমে যায়, এবং হিমায়িত খাদ্যের ক্ষেত্রে এ হার ছিল (–) ১৪.৮ শতাংশ (বক্স ১.১)। অবশ্য, ফুটওয়্যার রপ্তানিতে ১০.২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়ে মোট রপ্তানি ১৮৬.৯৭ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়।

বক্স ১.১: হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি হ্রাস

নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশের হিমায়িত খাদ্যশিল্প দ্রুত উন্নতি করতে থাকলেও এটা স্যানিটারি (জীবাণুমুক্ত বা পরিচ্ছন্নতা) সুবিধা, প্রযুক্তিগত খাপ খাওয়ানো ও প্রশিক্ষণ চাহিদার বিদ্যমান মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেনি, যখন এসপিএস-টিবিটি (স্যানিটারি অ্যান্ড ফাইটোস্যানিটারি এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কৌশলগত বাধা) কমপ্লায়েন্সের মান নিয়ে বিশ্ববাজারে অব্যাহতভাবে চাপ বাড়ছে। এ অবস্থায় নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ১৯৯৭ সালে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিচ্ছন্নতা-সম্পর্কিত বিষয়গুলো পরিপালনে (কমপ্লায়েন্স) গুরুতর কিছু ঘাটতি পাওয়া যাওয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বাংলাদেশ থেকে মৎস্য পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। যুক্তরাজ্যে পাঁচ মাস রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা থাকায় (আগস্ট-ডিসেম্বর ২০০৯) মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫ মিলিয়ন ডলারে। কমপ্লায়েন্স-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু উদ্যোগ নেওয়ার পর ইইউর এই নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। কিন্তু বিষয়টির ইতি এখানেই হয়নি। এ বছরের শুরুতে (২০০৯) বাংলাদেশ থেকে যাওয়া স্বাদু পানির চিংড়িতে (গলদা চিংড়ি) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক এন্টিবায়োটিক নাইট্রোফুরান পাওয়া যাওয়ায় ইইউ ৫০টিরও বেশি চালান বাতিল করে। ওই চালানগুলোর মোট মূল্য ছিল প্রায় ৬০ কোটি টাকা (৮.৭ মিলিয়ন ডলার)। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ইউরোপে ছয় মাসের জন্য গলদা চিংড়ি রপ্তানি থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, যা শুরু হয় ২০০৯ সালের ১ জুন। এই পদক্ষেপ বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী চিংড়িশিল্পের রপ্তানি আয় ভবিষ্যতে আরও কমিয়ে দেবে। যদিও নোনাপানির চিংড়ি বা বাগদা চিংড়ি এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ২০০৭–০৮ অর্থবছরে ৩.৬৪ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর বিশ্ব আর্থিক মন্দার কারণে চাহিদা কমে যাওয়ায় হিমায়িত খাদ্য বিশেষ করে চিংড়ি বর্তমানে একটি হতাশাজনক সময় পার করছে। ২০০৮–০৯ অর্থবছরে এই খাত থেকে রপ্তানি ১৪.৮৩ শতাংশ কমে যায়, এক বছর আগের ৫৩৪ মিলিয়ন ডলার থেকে কমে দাঁড়ায় ৪৫৪.৮৫ মিলিয়ন ডলারে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক উপাদানগুলো আসে খাদ্য থেকে। আর যেহেতু নাইট্রোফুরানের ব্যবহার বাংলাদেশে নিষিদ্ধ, সেহেতু ক্ষতিকর এই উপাদান অবৈধভাবে আসছে। অনেকে সন্দেহ করেন যে চিংড়ি উৎপাদকেরা যেসব মৎস্যখাদ্য ব্যবহার করেন সেগুলোতে নাইট্রোফুরান থাকে। শুধু সাতক্ষীরাতেই ১৭,০০০ চিংড়ি খামারের জন্য ৫৮টি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট আছে; ফলে, অপরাধীদের চিহ্নিত করা খুবই কঠিন একটি কাজ।

নাইট্রোফুরানের মিশ্রণের বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করতে সরকার একজন বিদেশি পরামর্শক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চিংড়ি চাষের এলাকাগুলোর পানি ও মাটি পরীক্ষা করারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যদিও পরিস্থিতি কার্যকরভাবে সামাল দিতে অন্যান্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা পরিপালনের জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কার্যকর করা উচিত। যারা নির্ধারিত মান অনুসরণ করবে না, তাদের চিহ্নিত করতে যথাযথ তদারকি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

[১৬] ২০ বর্গফুট গরুর পশুর চামড়া ঈদ-উল-আজহার পর বিক্রয় হয় ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকার মধ্যে, যেখানে গত বছর এর দাম ছিল ১,৩০০ থেকে ১,৪০০ টাকা পর্যন্ত। একইভাবে, ছাগলের চামড়া বিক্রি হয় ১০০–১৫০ টাকায়, যেখানে গত বছর এর বিক্রি হয়েছিল ২৫০–৩০০ টাকায়।

সার্বিক প্রবৃদ্ধিকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রপ্তানিতে যে ১০.৩১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তা হয়েছে মূলত পরিমাণগত প্রবৃদ্ধির কারণে, যার হার ১৩.৮৪ শতাংশ। তবে গড় রপ্তানি মূল্য ১.৮৬ শতাংশ কমেছে।

বাণিজ্য শর্ত

বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে যে স্থবিরতা চলছে, তাতে এই খাতে মূল্য বৃদ্ধির নেতিবাচক অভিঘাতই প্রতিফলিত হচ্ছে। এটাকে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশের টার্মস অব ট্রেড বা বাণিজ্য শর্তের ক্ষেত্রে যে অবনতি ঘটেছে, সেটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যউপা ত্তে দেখা যায়, ২০০৭–০৮ অর্থ বছরে দেশের রপ্তানি মূল্যসূচক ও আমদানি মূল্যসূচক দুটোই যথাক্রমে ৩.৫ শতাংশ ও ৩.৪ শতাংশ বেড়েছে। ফলে ২০০৬–০৭ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৭–০৮ অর্থ বছরে বাণিজ্য শর্তে ০.১ শতাংশ উন্নতি হয়েছে (সারণি ১.২৪)। যখন আন্তর্জাতিক বাজারে পোশাক পণ্যের দাম কমতে শুরু করেছে, তখন থেকে সাধারণ বা সার্বিক রপ্তানি মূল্যসূচক কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে তা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। যদি আমদানি মূল্যসূচকের সঙ্গে পোশাকের রপ্তানি মূল্যসূচকের তুলনা করা হয়, তাহলে বাণিজ্য শর্তে পতন বা অবনতির হার দাঁড়াবে (–) ১.৯৬ শতাং শে।

সারণি ১.২৪: বাণিজ্যের সাধারণ শর্ত এবং বাণিজ্য শর্ত: বস্ত্র খাত বিবেচনায়

(ভিত্তি: ২০০০ অর্থবছর = ১০০)

অর্থবছর	রপ্তানি মূল্যসূচক	আমদানি মূল্যসূচক (এমপিআই)	পোশাকের মূল্যসূচক (এপিআই)	বাণিজ্য শর্ত	এপিআই/এমপিআই* ১০০ (পোশাকের বাণিজ্য শর্ত)
অর্থবছর ২০০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
অর্থবছর ২০০১	১০২.৪০	১০৭.৫৩	১০০.৮২	৯৫.২৪	৯৩.৭৭
অর্থবছর ২০০২	১০৪.৮২	১১৫.৬১	৮৪.৯০	৯০.৬৭	৭৩.৪৩
অর্থবছর ২০০৩	১০৭.৪৪	১২৪.৫৭	৮৩.১৪	৮৬.২৫	৬৬.৭৪
অর্থবছর ২০০৪	১১৫.০৭	১২৯.৬২	৮০.৩৪	৮৮.৭৮	৬১.৯৮
অর্থবছর ২০০৫	১১৮.৮২	১৩৪.২১	৭৭.৮৭	৮৮.৫৪	৫৮.০২
অর্থবছর ২০০৬	১২১.১৮	১৩৯.৫০	৭৪.২৫	৮৬.৮৮	৫৩.২৩
অর্থবছর ২০০৭	১২৭.০৬	১৪৪.৫৮	৭১.২৫	৮৭.৮৮	৪৯.২৮
অর্থবছর ২০০৮	১৩১.৫৩	১৪৯.৫৫	৭০.৭৭	৮৭.৯৬	৪৭.৩২

উৎস: সিপিডি ট্রেড ডাটাবেইজ, ২০০৯।

নির্বাচিত প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের মূল্যে উল্লেখিত প্রবণতা প্রতিফলিত হয়। ২০০৬ সালে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম বা জ্বালানি তেল আমদানিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হতো, তা ছিল দেশের ২.৩৪ ডজন তৈরি পোশাকের রপ্তানিমূল্যের সমান। আর ২০০৮ সালে প্রতি ব্যারেল পেট্রোলিয়াম বা জ্বালানি তেলের আমদানি ব্যয় বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৩.৪ ডজন পোশাকের রপ্তানিমূল্যের সমান। তবে বিশ্ব বাজারে তেল সহ বিভিন্ন পণ্যের দাম কমার ফলে প্রতি ব্যারেল পেট্রোলিয়াম বা জ্বালানি তেলের আমদানি ব্যয় কমে অবশ্য ২.০৩ ডজন তৈরি পোশাকের রপ্তানিমূল্যের পর্যায়ে নেমে আসে। একইভাবে ২০০৬ সালে প্রতি টন চাল আমদানিতে বাংলাদেশকে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হতো তা ছিল দেশের ০.৫২ টন পাটজাত পণ্যের রপ্তানিমূল্যের সমান। ২০০৮ সালে এবং ২০০৯ সালের জুন নাগাদ প্রতি টন চালের আমদানি ব্যয় দাঁড়ায় যথাক্রমে ১.১৪ টন এবং ১.০৪ টন পাটজাত পণ্যের রপ্তানিমূল্যের সমান (সারণি ১.২৫)। গম ও সয়াবিন আমদানির ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের দাম কমা সত্ত্বেও

বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানিমূল্য এখনও প্রধান আমদানি পণ্যগুলোর ২০০৬ সালের দামের পর্যায়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। নিকট ভবিষ্যতে বিশ্ববাজারে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের দাম যেভাবে বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে, তাতে সার্বিক বিবেচনায় এ কথা বলা যায় যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্তে আরেক দফা পতন বা অবনতি ঘটবে।

সারণি ১.২৫: রপ্তানিমূল্যের ক্রয়ক্ষমতার অবনতি

পণ্য	তৈরি পোশাক, ডজন হিসাবে			বৃদ্ধির সময়কাল (বি/এ)	বৃদ্ধির সময়কাল (সি/এ)	পাটপণ্য, টন হিসাবে			বৃদ্ধির সময়কাল (ই/ডি)	বৃদ্ধির সময়কাল (এফ/ডি)
	২০০৬ (গড়) (এ)	২০০৮ (গড়) (বি)	২০০৯ (জুন) (সি)			২০০৬ (গড়) (ডি)	২০০৮ (গড়) (ই)	২০০৯ (জুন) (এফ)		
১ ব্যারেল তেল (জ্বালানি)	২.৩৪	৩.৪৪	২.০৩	১.৫	০.৯	০.১১	০.১৭	০.১০	১.৫	০.৯
১ টন চাল	১০.৯৭	২৩.১৮	২১.৮৬	২.১	২.০	০.৫২	১.১৪	১.০৪	২.২	২.০
১ টন গম	৭.০৭	১১.২৫	৮.৩১	১.৬	১.২	০.৩৩	০.৫৫	০.৩৯	১.৭	১.২
১ মেট্রিক টন সয়াবিন তেল	২১.১৯	৩৯.১২	২৬.২৮	১.৮	১.২	১.০০	১.৯৩	১.২৫	১.৯	১.২

উৎস: সিপিডি ট্রেড ডাটাবেইজ, ২০০৯।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সপ্তম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক

আসন্ন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সপ্তম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠককে বাংলাদেশের জন্য তার বাণিজ্যিক স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়ার একটি সুযোগ হিসেবে দেখা যায়। বাংলাদেশকে ডব্লিটিওর দোহা বৈঠকের চলমান সমঝোতা প্রক্রিয়া থেকে ফল পেতে হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৌশল নির্ধারণ করতে হবে, যেন ডব্লিউটিওর দোহা বৈঠকের সমঝোতা প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের মৌলিক বা প্রধান স্বার্থগুলো গুরুত্ব পায়। ডব্লিউটিওর চূড়ান্ত সমঝোতায় অগ্রাধিকারভিত্তিক সুবিধাসমূহ তুলে নেওয়া হলে তা বাংলাদেশের জন্য বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রাখা দরকার সেটি হলো, দোহায় অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিওর মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে (এলডিসি) সব পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেটি "বাণিজ্যিকভাবে অর্থপূর্ণ" উপায়ে যাতে বাস্তবায়িত হয় তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে জোর দিতে হবে।[১৭] এছাড়া এলডিসিভু ক্ত কোনো দেশই যাতে এলডিসিবহির্ভূত দেশগুলোর তুলনায় কোনভাবেই অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা কম না পায়, সে বিষয়েও বাংলাদেশকে জোরালো যুক্তি দাঁড় করানোর দায়িত্ব পালন করতে হবে।[১৮] এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি বিদ্যমান "যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি" (ইউএস প্রেফারেন্সিয়াল স্কীম) সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেজন্য বাংলাদেশকে এই কর্মসূচির ব্যাপারেও মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে সক্রিয় আলোচনা চালাতে হবে। ২০০৯ সালের ২২ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুজন জন প্রতিনিধি, সিনেটর ডায়ানে ফেইনস্টেইন এবং কিট বন্ড এশিয়ার ১৪টি স্বল্পোন্নত দেশকে বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত

[১৭]এটা সর্বজনবিদিত যে, এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ৯৭ শতাংশ শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত পণ্যের তালিকায় বাংলাদেশি পণ্য অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সেই দেশকে রাজি করানো।

[১৮]এটি তথাকথিত অসমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর বিষয়কে নির্দেশ করে, যেখানে কেবল দুটি উন্নয়নশীল দেশকেই (শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান) অধিক হারে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (পোশাক পণ্যের জন্য) দেওয়া হয়েছে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশগুলো এ সুযোগ পায়নি এবং তাদেরকে আফ্রিকান গ্রোথ অ্যান্ড অপরচুনিটি অ্যাক্ট (আগোয়া) বা ক্যারিবিয়ান বেসিন ইনিশিয়েটিভ (সিবিআই)এর ম তো কোন সুবিধাও দেওয়া হয়নি।

সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে একটি বিল উত্থাপন করেছেন। 'নিউ পার্টনারশিপ ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট' (এনপিডিএ) বা 'উন্নয়নের জন্য নয়া অংশীদারিত্ব চুক্তি' শীর্ষক এই বিলের গুরুত্ব অনুধাবন করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় এটির সমর্থনে বাংলাদেশকে অবশ্যই একটি সুসমন্বিত কৌশল গ্রহণ করতে হবে।[১৯] এই বিল নিয়ে কী হয়, সেদিকে বাংলাদেশ সরকারের সতর্ক নজর রাখা যেমন অপরিহার্য, তেমনি সম্ভাব্য যা কিছু করণীয় তার সবই করা দরকার।

জীবাণু ও পরিচ্ছন্নতা, বাণিজ্যের কৌশলগত বাধাসমূহ এবং পরিবেশের ইস্যু নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বর্তমানে যে সমঝোতা প্রক্রিয়া চলছে, তাতে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানের বিষয়ে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে। কারণ এই সংস্থার বর্তমান বাণিজ্য সমঝোতা প্রক্রিয়া থেকে কৃষি পণ্যের রপ্তানি (এসপিএস্টিবিটি), নিটওয় ্যার পণ্য (পর্যাপ্ত সুবিধা) ও অন্যান্য খাতে কমপ্লায়েন্স বা পরিপালনীয় শর্তাবলী পূরণের সক্ষমতা বাড়ানোর শর্ত জুড়ে দেওয়া হতে পারে। সেজন্য বাংলাদেশকে এসব বিষয় বিবেচনা করে সহায়ক রপ্তানি নীতিমালা গ্রহণ ও প্রণোদনা কাঠামো জোরদার করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট এবং আর্থিক প্রণোদনা কর্মসূচি

আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগীদের মধ্যে ভিয়েতনাম, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশ বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮০৯ অর্থ ´বছরে সহায়ক নীতিমালা গ্রহণ করেছে যা আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতাকে পিছিয়ে দিতে পারে। এসব দেশ গত এক বছরে তাদের নিজ নিজ মুদ্রার অবমূল্যায়নের (বিনিময় হার কমানো) সপক্ষে পদক্ষেপ নিয়েছে (৬ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত), যা বাংলাদেশের জন্য একটি উদ্বেগের বিষয় বৈকি। এমনকি কোন কোন প্রতিযোগী দেশ আর্থিক পুনরুদ্ধার প্যাকেজ বা কর্মসূচি নিয়ে তাদের রপ্তানিমুখী খাতগুলোকে ব্যাপক হারে প্রণোদনা সুবিধা দিয়েছে। যে কারণে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পোশাকের মতো প্রতিযোগিতায় সক্ষম খাতের রপ্তানিতেও প্রভাব পড়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চীনের নেওয়া পুনরুদ্ধার কর্মসূচির আওতায় এখন কম দামি পোশাক পণ্যের বাজার বাড়ানোর জন্য প্রণোদনার পরিমাণ বাড়ানো হয়।[২০] ফলে, বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে এ খাতে শক্তিশালী অবস্থানে থাকলেও এরূপ কর্মসূচির ফলে হুমকি বা ঝুঁকির মুখে পড়ে। প্রতিযোগী দেশগুলোর কাছ থেকে এ ধরনের চ্যালেঞ্জ আসতে থাকায় এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চলমান সংকটের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ২০০৯ সালের এপ্রিলে ৩,৪২৪ কোটি টাকার একটি আর্থিক প্রণোদনাগুচ্ছ ঘোষণা করে। এটি আকারে ২০০৮০৯ অর্থবছরের বাজেটের ৩.৪ শতাংশ এবং জিডিপির ০.৬ শতাংশের সমান। এই গুচ্ছে নগদ অর্থ ভর্তুকি, রাজস্ব পদক্ষেপ, বর্ধিত ঋণের সুবিধা, সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে সরকার কৃষি খাতের জন্য ১,৫০০ কোটি টাকা, কৃষিঋণ বিতরণে পুনর্মূলধনের যোগান হিসেবে ৫০০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ খাতের জন্য ৬০০ কোটি টাকা, রপ্তানিমুখী খাতগুলোর জন্য ৪৫০ কোটি টাকা এবং সামাজিক নিরাপত্তা (খাদ্য) খাতে ৩৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। রপ্তানিমুখী খাতগুলোর জন্য মোট বরাদ্দকৃত ৪৫০ কোটি টাকা পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং হিমায়িত খাদ্য – এই তিনটি উপখাতে অতিরিক্ত ২.৫ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়ার লক্ষ্যে রাখা হয়। এই বরাদ্দ ছিল ২০০৮০৯ অর্থ ´বছরের বাজেটে বরাদ্দ করা ১,০৫০ কোটি টাকার অতিরিক্ত। আশা করা হচ্ছে, আগামী ২০০৯১০ অর্থ ´বছরের বাজেটেও অতিরিক্ত বরাদ্দসহ এই গুচ্ছ সহায়তা অব্যাহত রাখা হবে।

[১৯]এটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পোশাক পণ্যের শুল্কহারভিত্তিক কোটা, পণ্যের উৎসবিধি (রুলস অব অরিজিন), শ্রম ইস্যু সহ পরিপালনীয় শর্তাবলী, বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব (ট্রিপস) এবং অন্যান্য মানসংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

[২০]চীন তার প্রণোদনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রপ্তানিমুখী কম দামের পণ্যের ওপর থেকে ইতিপূর্বে আরোপিত কর প্রত্যাহার করে নিয়েছে। রপ্তানিকারকদের কম দামের পণ্য ছেড়ে উচ্চমানসম্পন্ন বা বেশি দামি পোশাক পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহিত করতে এই কর আরোপ করা হয়েছিল।

পুনরায় দক্ষিণ-দক্ষিণ বাণিজ্যে মনোযোগ

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জন্য আবারও দক্ষিণ৹দক্ষিণ বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশকে এখন দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো, বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার কৌশল গ্রহণে জোর দিতে হবে। তবে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে কিছু উৎসাহব্যঞ্জক লক্ষণও দেখা দিয়েছে বলা যায়।[২১] বিশ্ব অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে অবশ্যই নিজস্ব শক্তিসামর্থ্যের অবস্থান থেকে যথাযথ প্রণোদনা সুবিধা সংবলিত রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে রপ্তানিমুখী প্রধান খাতগুলোর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক একটি প্রণোদনা কার্যক্রম হাতে নেওয়া প্রয়োজন।

১.৭.২ আমদানি খাতের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের আমদানি খাতে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে। ২০০৭৹০৮ অর্থবছরে দেশে মোট ২১.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্যসামগ্রী আমদানি হয়েছে, যা ২০০৬৹০৭ অর্থবছরের মোট আমদানির চেয়ে ২৬.০৭ শতাংশ বেশি। আমদানি প্রবৃদ্ধির এই প্রবণতা অবশ্য ২০০৮৹০৯ অর্থবছরেও বজায় থাকে। যদিও আলোচ্য ২০০৮৹০৯ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যে অস্থিরতা ছিল লক্ষণীয়। যেমন: এই অর্থবছরের প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য বাড়ে, আবার শেষার্ধে তা কমে যায়। সার্বিকভাবে ২০০৮৹০৯ অর্থবছরে আমদানি খাতে আগের অর্থবছরের তুলনায় ৪.০৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটে। আলোচ্য ২০০৮৹০৯ অর্থবছরে মোট আমদানির মধ্যে সর্বোচ্চ ৯.৩৩ শতাংশ আমদানি হয় বস্ত্র ও পণ্য খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আমদানি হয় জ্বালানি তেল খাতে, মোট আমদানিতে যার অংশ ৮.৮৭ শতাংশ (চিত্র ১.৪১)। তবে আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্য আমদানিতে ৩৭.৪৩

চিত্র ১.৪১: নির্বাচিত কিছু পণ্যের আমদানি: অর্থবছর ২০০৭-০৮ ও অর্থবছর ২০০৮-০৯

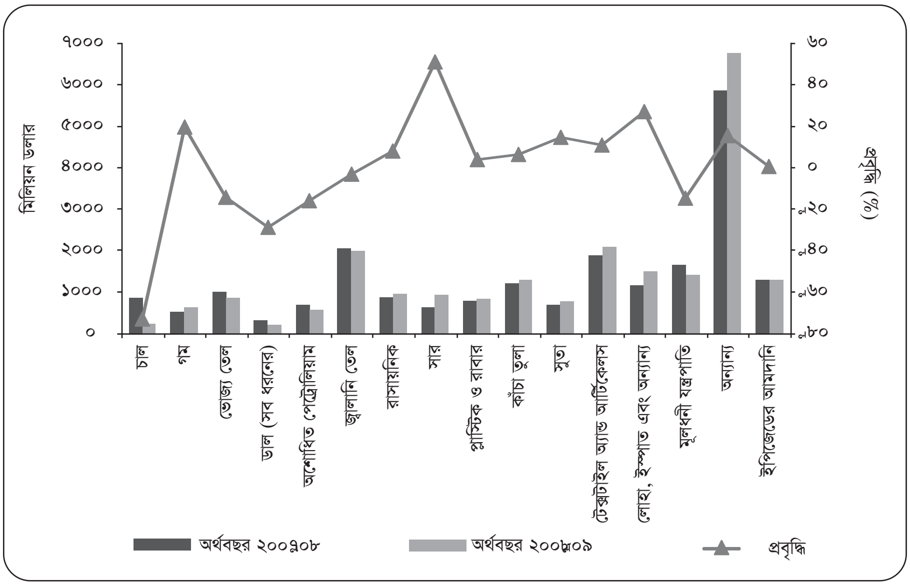

উৎস: সিপিডি ট্রেড ডাটাবেইজ, ২০০৯।

[২১]জাপানের বৃহত্তম খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান ইউনিকলো ২০০৯ সালে বাংলাদেশ থেকে ৬০ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি মূল্যের তৈরি পোশাক কেনার পরিকল্পনা করে, যা বিশ্ববাজার থেকে কোম্পানিটির মোট ক্রয়ের ২০ শতাংশ। এছাড়া বিশ্বের অনেক বড় বড় কোম্পানিও চীনের বাইরে আরও একটি দেশ থেকে তৈরি পোশাক কিনতে চায়। এক্ষেত্রে তাদের বিবেচনায় বাংলাদেশের নামও ভালোভাবেই রয়েছে।

শতাংশ কমে যায়। আর এর মধ্যে এককভাবে চাল আমদানি কমে ৭২.৬২ শতাংশ। বিশ্ববাজারে দাম কমায় এবং দেশে বোরো ধানের ভালো ফলন হওয়ায় বাংলাদেশ এক্ষেত্রে ২০০৮০৯ অর্থবছরে বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। তাই এ বছর বাংলাদেশের চাল আমদানির পরিমাণ কমে ৬.০৩ লাখ মেট্রিক টনে নেমে আসে; ২০০৭০৮ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ২০.৫৫ লাখ মেট্রিক টন।

২০০৮০৯ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে চাল আমদানি কমে যাওয়ার প্রবণতার সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাংকে খোলা মোট আমদানি ঋণপত্রের সঙ্গতি ছিল। এ বছর চাল আমদানির লক্ষ্যে মাত্র ৫১.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণপত্র খোলা হয়, যা এর আগের অর্থবছরে চাল আমদানির জন্য খোলা মোট ঋণপত্র মূল্যের চেয়ে ৯৬.১৭ শতাংশ কম। একইভাবে ২০০৮০৯ অর্থবছরে চাল আমদানির জন্য খোলা মোট ঋণপত্র নিষ্পত্তির হার ২০০৭০৮ অর্থবছরের চেয়ে ৭৩.৬১ শতাংশ কমেছে।

২০০৮০৯ অর্থবছরে দেশে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও জ্বালানি তেলের আমদানি আগের ২০০৭০৮ অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ১৪.৭১ শতাংশ ও ২.৯৭ শতাংশ কমেছে। আলোচ্য বছরে মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি কমে যাওয়ার প্রবণতার সঙ্গে এ জন্য আমদানি ঋণপত্র খোলার হারেও মিল লক্ষ করা গেছে। এ বছর মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য মোট ঋণপত্র খোলা হয় ১.২৩ বিলিয়ন ডলারের, যা ২০০৭০৮ অর্থবছরের চেয়ে ২৯.৫৮ শতাংশ কম। ২০০৮০৯ অর্থবছরে মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য খোলা ঋণপত্র নিষ্পত্তির হার ২০০৭০৮ অর্থবছরের চেয়ে কমেছে ০.৭৮ শতাংশ। তবে মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি কমে যাওয়াটা দেশের অর্থনীতির জন্য ভালো নয়। কারণ মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি কমলে দেশে বিনিয়োগের ওপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ে। আলোচ্য বছরে বস্ত্র খাতের যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলার হার এর আগের অর্থবছরের চেয়ে ৫৩.৭৪ শতাংশ কমেছে। রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোর মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে সরকারের ইনডেমনিটি বন্ড প্রথা তুলে নেওয়া ও শুল্ক ছাড় দিয়ে মাত্র ১ শতাংশ ধার্য্য করার পরও এসব গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের আমদানি কমার প্রবণতাটা উদ্বেগজনকই বটে। কিছু মূলধনী যন্ত্রপাতির দাম হ্রাস পাওয়া দিয়ে সার্বিকভাবে মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি কমে যাওয়ার বিষয়টি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যাবে না। এ ধরনের হতাশাজনক পরিস্থিতিতে সিপিডির পরামর্শ হচ্ছে, সরকার রপ্তানিমুখী শিল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে কাস্টমস ডিউটি বা শুল্ক প্রত্যাহারের কথা বিবেচনা করে দেখতে পারে।

২০০৮০৯ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এর আগের ২০০৭০৮ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের আমদানি ব্যয় ১৪৫.৭৯ শতাংশ বেড়েছিল। বিশেষ করে ২০০৮ সালের জুন মাসের দিকে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে ব্যারেল প্রতি ১৩০ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়। পরের দুটি প্রান্তিকে (অক্টোবর ২০০৮ থেকে মার্চ ২০০৯) অবশ্য আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম ৮৮.৬২ শতাংশ হ্রাস পায়। এর মধ্যে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পেট্রোলিয়াম বা জ্বালানি তেলের দাম কমতে শুরু করে এবং ক্রমাগতভাবে কমার ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালের মে মাসের দিকে ব্যারেল প্রতি ৫৬.৭২ ডলারে নেমে আসে। প্রাপ্ত তথ্যউপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ২০০৮০৯ অর্থবছরের অক্টোবর ফেব্রুয়ারি সময়কালে দেশে কোনো অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানি হয়নি! অন্যদিকে এই অর্থবছরের প্রথম তিনটি প্রান্তিকে দেশে জ্বালানি তেলের আমদানি ৩৪.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে আমদানিকৃত জ্বালানি তেলের মোট আমদানি ব্যয় দাঁড়ায় ১.৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৯ সালের মার্চ থেকে জ্বালানি তেলের আমদানি কমতে থাকে। অর্থবছর শেষে সার্বিকভাবে দেশের আমদানি খাতে () ২.৯৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। তবে মধ্যবর্তী পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কাঁচা তুলা (৬.৪৪ শতাংশ), সুতা (১৪.৬৫ শতাংশ) এবং লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতব পদার্থে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয় (২৭.৩৩ শতাংশ) (চিত্র ১.৪১)।

১.৭.৩ ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তি

২০০৭-০৮ অর্থবছরে খোলা মোট আমদানি ঋণপত্রের মূল্যমান ছিল ২৪.৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের ২০০৬-০৭ অর্থবছরে খোলা ঋণপত্রের মোট মূল্যমানের তুলনায় ৪০.০২ শতাংশ বেশি। আবার ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ২০.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমদানি ঋণপত্র নিষ্পত্তি হয়, যা এর আগের ২০০৬-০৭ অর্থবছরের চেয়ে ২৭.৫৬ শতাংশ বেশি। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে আমদানি ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল, তা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বজায় থাকেনি, বরং কমেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট ২১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের আমদানি ঋণপত্র খোলা হয়, যা আগের ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ১০.৭৭ শতাংশ কম। তবে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে আগের অর্থবছরের চেয়ে ঋণপত্র নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবণতাই লক্ষ করা গিয়েছে, আগের অর্থবছরের চেয়ে এ হার ৫.২৬ শতাংশ বেড়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে নিষ্পত্তি হওয়া আমদানি ঋণপত্রের মোট মূল্যমান ছিল ২১.৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে নিষ্পত্তি হওয়া ঋণপত্রের মোট মূল্যমানের চেয়ে ১.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি (সারণি ১.২৬)।

সারণি ১.২৬: ঋণপত্র খোলা এবং নিষ্পত্তি: অর্থবছর ২০০৭-০৮ বনাম অর্থবছর ২০০৮-০৯

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

পণ্য সামগ্রী	ঋণপত্র খোলা			ঋণপত্র নিষ্পত্তি		
	অর্থবছর ২০০৭-০৮	অর্থবছর ২০০৮-০৯	প্রবৃদ্ধি (%)	অর্থবছর ২০০৭-০৮	অর্থবছর ২০০৮-০৯	প্রবৃদ্ধি (%)
ভোগ্যপণ্য	২০২৬.৩২	৮৩৭.৭৬	-৫৮.৬৬	১৪১১.৯৬	৮৭১.০৯	-৩৮.৩১
চাল	১৩৪১.৭০	৫১.৪১	-৯৬.১৭	৮৫৯.৪৭	২২৬.৭৯	-৭৩.৬১
গম	৬৮৪.৬২	৭৮৬.৩৬	১৪.৮৬	৫৫২.৪৯	৬৪৪.৩১	১৬.৬২
মধ্যবর্তী পণ্য	২০৪২.২৪	২২২৩.৯৯	৮.৯০	১৭৬৬.৭১	২১২৩.৭২	২০.২১
শিল্পের কাঁচামাল	৯০১৭.৮৮	৮৫৫৩.৯১	-৫.১৫	৭৬৮৯.০৪	৮৪৯৪.২২	১০.৪৭
তুলা থেকে উৎপাদিত সুতা (কটন ইয়ার্ন)	৫২৯.৯৪	৪৭২.৫৮	-১০.৮২	৪৩৬.৫৫	৫০০.৯৮	১৪.৭৬
তুলা থেকে উৎপাদিত সুতা (কটন ইয়ার্ন) বিবিএলসি*	৩১৬.০১	৩০৩.৮৯	-৩.৮৪	২৫৮.৯৬	৩২০.৬৩	২৩.৮১
টেক্সটাইল ফেব্রিকস উপকরণ	৩০৩৪.১৪	২৯৯৫.০০	-১.২৯	২৬৯২.৯১	৩০৩৬.৭৩	১২.৭৭
টেক্সটাইল ফেব্রিকস উপকরণ বিবিএলসি	২৭৯৯.৭৬	২৮৩৩.৬০	১.২১	২৪৯৮.০২	২৮৭৫.১০	১৫.১০
ফেব্রিকস উপকরণ	২১৩৭.৪৫	২১২৭.৮৯	-০.৪৫	১৮৯৫.৪৩	২১৯৬.৪১	১৫.৮৮
ফেব্রিকস উপকরণ	৬৬২.৩০	৭০৫.৭২	৬.৫৬	৬০২.৫৮	৬৭৮.৬৯	১২.৬৩
পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য	২৫৭৬.৭০	১৮৬৪.৫৬	-২৭.৬৪	২২৯০.০৪	২০৩৬.৮৫	-১১.০৬
মূলধনী যন্ত্রপাতি	১৭৫৩.৭৪	১২৩৪.৯৯	-২৯.৫৮	১৪১৪.৯৭	১৪০৩.৯৩	-০.৭৮
বস্ত্র	৫৪৯.১৯	২৫৪.০৫	-৫৩.৭৪	৪০১.৬৯	৩৯৩.৮২	-১.৯৬
বিবিধ শিল্পের যন্ত্রপাতি	১৬৩১.৫৪	১৮৭০.০৮	১৪.৬২	১৪৪৪.৮৯	১৬৬২.৩৬	১৫.০৫
অন্যান্য ঋণপত্রসমূহ	৩৯৪০.০৪	৩৯৩৮.৭১	-০.০৩	৩১৪৭.০৩	৩৬৭২.৪০	১৬.৬৯
বাণিজ্যিক খাত	২০৬০.৯০	২২৯৯.৭৩	১১.৫৯	১৭৬৪.৫৬	২০৪৬.০৫	১৫.৯৫
শিল্প খাত	১৮৭৯.১৫	১৬৩৮.৯৮	-১২.৭৮	১৩৮২.৪৬	১৬২৬.৩৫	১৭.৬৪
মোট	২৪৪৩৫.৬০	২১৮০২.৭৪	-১০.৭৭	২০৩৭২.৫৯	২১৪৪৪.৩৫	৫.২৬

উৎস: সিপিডি ট্রেড ডাটাবেইজ, ২০০৯।

দ্রষ্টব্য: *বিবিএলসি: ব্যাক্টুব ্যাক এলসি বা ঋণপত্র।

আলোচ্য অর্থবছরে জ্বালানি তেল আমদানি ২৭.৬৪ শতাংশ কমে যায়। এর মধ্যে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলার পরিমাণ কমেছে যথাক্রমে ৪৬.৬২ শতাংশ ও ১৭.০৮ শতাংশ। এই অর্থবছরের আমদানি ব্যয় পরিশোধের ক্ষেত্রেও, অর্থাৎ ঋণপত্র নিষ্পত্তিতেও একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই অর্থবছরে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিতে ১৫.৯৬ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়। সম্ভবত ২০০৮ সালের অক্টোবর থেকে বিশ্ববাজারে ক্রমাগতভাবে জ্বালানি তেলের দাম কমে যাওয়া এবং একই মাস থেকে পরবর্তী ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশে জ্বালানি তেলের কোন প্রকার আমদানি না হওয়ার কারণেই এমনটি ঘটে থাকতে পারে।[২২]

১.৭.৪ বিরূপ বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতির বিপরীতে প্রবাসী আয় প্রবাহ

বিশ্বব্যাপী রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের প্রবাহ তেমন ভালো না হলেও ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে এক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির রেকর্ড লক্ষ করা যায়। এই অর্থবছরে দেশে আগের ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় প্রবাসী আয়ে ২২.৪২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। এর মধ্যে ২০০৯ সালের জুন মাসে বিদেশ থেকে দেশে ৯১৯.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রবাসী আয় আসে, যা ছিল মাসিক হিসাবে সর্বোচ্চ। দেশের মোট প্রবাসী আয়ের সর্বোচ্চ ২৯.৫১ শতাংশ আসে সৌদি আরব থেকে। তারপরই রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮.১১ শতাংশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৬.২৬ শতাংশ প্রবাসী আয়ের প্রবাহ। একইভাবে অন্যান্য দেশ থেকেও প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বেড়েছে। বিশেষ করে মালয়েশিয়া থেকে আলোচ্য ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এর আগের অর্থবছরের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ প্রবাসী আয় আসে (চিত্র ১.৪২)।

চিত্র ১.৪২: দেশভিত্তিক প্রবাসী আয়ের প্রবাহ

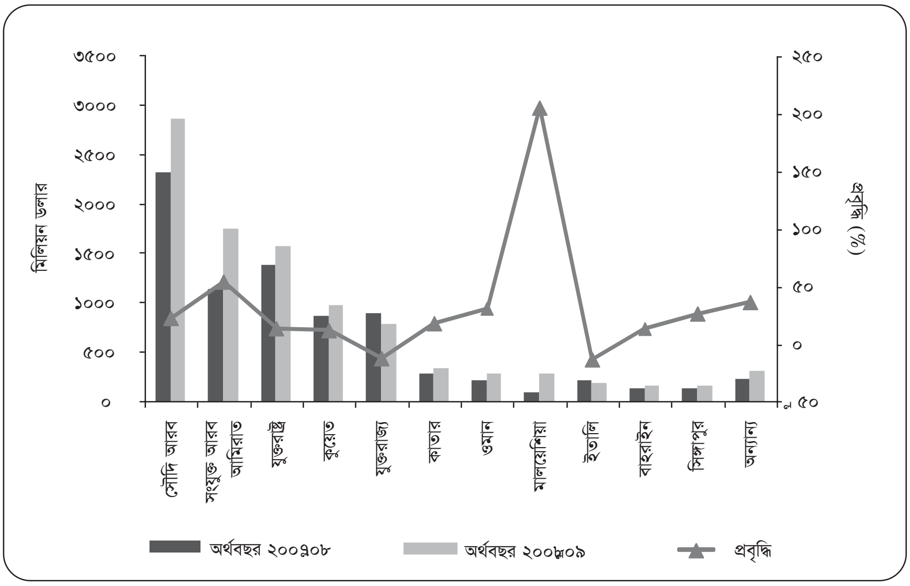

উৎস: সিপিডি ট্রেড ডাটাবেইজ, ২০০৯।

[২২]অক্টোবর ২০০৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত কোন জ্বালানি তেল আমদানি না হওয়ার বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করতে হবে।

বাংলাদেশি শ্রমিকেরা প্রধানত উপসাগরীয় দেশগুলোতেই অভিবাসী হয়। বাংলাদেশের মোট প্রবাসী বা অভিবাসী শ্রমিকের মধ্যে ৫৩ লাখ বা ৮০ শতাংশই অবস্থান করছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। জ্বালানি তেলের বিপুল পরিমাণ মজুদ থাকায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও এর ভালো দাম পেয়ে এসব দেশের সরকারগুলো বড় ধরনের অবকাঠামো প্রকল্প হাতে নেওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য ব্যাপক হারে অভিবাসন বা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে এশীয় দেশগুলোতে আর্থিক সংকটের সময় দেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহে স্থিতিশীলতা লক্ষ করা যায়। তখন অবশ্য প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমার আশঙ্কা করা হয়েছিল। বিশ্বব্যাংকও এ ব্যাপারে সতর্কবাণী দিয়েছিল। বিশ্বব্যাংক তখন প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি কমে ৫ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশের মধ্যে নেমে আসবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল। বাস্তবে দেখা গিয়েছে, যেসব উন্নয়নশীল দেশ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছিল অন্যতম।

শ্রমিক অভিবাসন

২০০৭-০৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে মোট ৯ লাখ ৮১ হাজার ১০২ জন শ্রমিক বিদেশ যায়। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এই সংখ্যা কমে ৬ লাখ ৫০ হাজার ৫৯ জনে নেমে আসে। এক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, অতীতের বছরগুলোতে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়া শ্রমশক্তির অধিকাংশই আধাদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ হলেও ২০০৮ সালে পেশাদার ও দক্ষ শ্রমিকদের বিদেশে যাওয়ার হার উল্লেযোগ্য হারে বেড়েছে (সারণি ১.২৭)। আধাদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ শ্রমিকদের চেয়ে পেশাদার ও দক্ষরা তুলনামূলকভাবে বেশি মজুরি পাওয়া দেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাড়ার অন্যতম কারণ হতে পারে। এছাড়া সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বিদেশ থেকে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর খরচ কমে যাওয়াও আরেকটি বড় কারণ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

সারণি ১.২৭: অভিবাসী শ্রমিকদের শ্রেণীবিন্যাস

(শতাংশ)

বছর	শ্রমিক অভিবাসন বা বহির্গমন	বিভিন্ন শ্রেণী বা ক্যাটাগরির শ্রমিকদের অংশ				
		পেশাদার	দক্ষ	আধাদক্ষ	স্বল্প দক্ষ	মোট
২০০৬	৩৮১৫১৬	০.২৪	৩০.২৭	৮.৯০	৬০.৫৯	১০০.০০
২০০৭	৮৩২৬০৯	০.০৮	১৯.৮৬	২২.০৬	৫৮.০০	১০০.০০
২০০৮	৮৭৫০৫৫	০.২১	৩২.১৬	১৫.১৮	৫২.৪৪	১০০.০০

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপাত্তের আলোকে সিপিডির প্রাক্কলন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত থেকেও দেখা যায় যে সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশ থেকে অভিবাসী শ্রমিকদের নিজ দেশে অর্থ পাঠানোর খরচ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশেরই একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। ২০০৮ সালে যেখানে সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে ২০০ মার্কিন ডলার পাঠাতে গড়ে ১০.৮০ ডলার খরচ পড়ত, সেখানে ২০০৯ সালের প্রথম প্রান্তিকেই তা কমে ৫.৬৮ ডলারে নেমে আসে। বিদেশ থেকে বাংলাদেশি শ্রমিকদের অর্জিত অর্থ কম খরচে দেশে পাঠানোর সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকও বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়।

কিন্তু বিদেশ থেকে অভিবাসী শ্রমিকদের দেশে ফিরে আসা বা প্রত্যাবাসনের হার বেড়ে যাওয়াটা এখন বাংলাদেশের জন্য একটি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই ক্ষেত্রে দুঃখজনক হলেও সত্য যে বিদেশ থেকে প্রত্যাবাসিত বা ফিরে আসা শ্রমিকদের মোট সংখ্যা কত, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেই হিসাব রাখার কোনো কৌশল এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। এই বিষয়ে জোর দেওয়া প্রয়োজন। তবে জনশক্তি, কর্মসংস্থান

ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) একটি প্রাক্কলনে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বিভিন্ন দেশের ব্যয় সংকোচনের কারণে মোট ২৮ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিকের দেশে ফিরে আসার তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। বিদেশ থেকে ফিরে আসা বা প্রত্যাবাসিত শ্রমিকদের জন্য সরকারের প্রণোদনা গুচ্ছে কোন সুবিধা রাখা হয়নি। সেজন্য বিদেশ থেকে ফেরত আসা ব্যক্তিদের প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেন তারা এখনকার এই কঠিন সময়ে নিজস্ব উদ্যোগে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। অভিবাসী বা বিদেশে গমনেচ্ছু শ্রমিকদের জন্য নতুন বাজার অনুসন্ধানে বাংলাদেশের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর বিষয়েও জোর দেওয়া উচিত। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের আলোকে একটি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া দরকার, যাতে আগ্রহী শ্রমিকেরা দক্ষতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেশের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে যাওয়ার সুযোগ পায়।

১.৭.৫ বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য ভালো অবস্থায় বা সন্তোষজনক ধারায় রয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে যেখানে বাংলাদেশের সার্বিক বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে ছিল ৩৩১ মিলিয়ন ডলার, সেখানে তা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বেড়ে ২,০৫৮ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে (সারণি ১.২৮)। বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে চলতি হিসাবের ভারসাম্যেও একই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে যেখানে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত ছিল ৭০২ মিলিয়ন ডলার, সেখানে তা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৫৩৬ মিলিয়ন ডলার। এ জন্য অবশ্য প্রবাসী আয় প্রেরণকারী ও রপ্তানিকারকদের ধন্যবাদ জানাতে হয়। কারণ, অপরাপর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যখন চলতি হিসাবের ভারসাম্য নেতিবাচক হয়ে ওঠে, তখন প্রবাসী আয় ও রপ্তানি আয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুবাদে বাংলাদেশের উদ্বৃত্তাবস্থায় বিপরীত প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

সারণি ১.২৮: বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

উপাদানসমূহ	অর্থবছর ২০০৭-০৮	অর্থবছর ২০০৮-০৯
বাণিজ্য ভারসাম্য	-৫৩৩০	-৪৭০৮
সেবা	-১৫২৫	-১৬২১
চলতি হস্তান্তর	৮৫৫১	১০২২৬
সরকারি হস্তান্তর	১৪৯	৭২
বেসরকারি হস্তান্তর	৮৪০২	১০১৫৪
এর মধ্যে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ	৭৯১৫	৯৬৮৯
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	৭০২	২৫৩৬
মূলধনী হিসাব	৫০৯	৪৫১
আর্থিক হিসাব	-৩৯২	-৮০৮
ভ্রান্তি ও বাদসমূহ	-৪৮৮	-১২১
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	৩৩১	২০৫৮

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, নভেম্বর ২০০৯।

বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্যেও ঘাটতি কমেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের ঘাটতি দাঁড়ায় ৪,৭০৮ মিলিয়ন ডলার, যেখানে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে তা ছিল ৫,৩৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির প্রধান কারণ হচ্ছে আমদানি বৃদ্ধি পাওয়া। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় পরিশোধের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২০,২৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার,

যা এর আগের ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ১৯,৪৮১ মিলিয়ন ডলার। এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণেই মূলত ২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় বেড়ে গিয়েছিল। এছাড়া সার আমদানি ব্যয় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ৬৩১.৬ মিলিয়ন ডলার থেকে ৫১ শতাংশ বেড়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে হয়েছে ৯৫৫.১ মিলিয়ন ডলার। একইভাবে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে লৌহ ও ইস্পাত আমদানিতে বাংলাদেশের ব্যয়ের পরিমাণ ২৭.৩৩ শতাংশ বেড়েছে। তবে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য আমদানি ব্যয় ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ১৪.৭১ শতাংশ কমেছে।

আলোচ্য অর্থবছরে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত হয় ২,৫৩৬ মিলিয়ন ডলার। তবে বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য কোন দিকে যাবে, সেটি নির্ভর করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর: (ক) বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য, যা আগামী মাসগুলোয় বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম পরিবর্তন এবং প্রবাসী আয় প্রবাহের গতিপ্রকৃতির আলোকে নির্ধারিত হবে; (খ) বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহে চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব। এ অবস্থায় বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান সংকটের প্রেক্ষিতে স্বল্প আয়ের দেশগুলোর সহায়তায় বিশ্ব সম্প্রদায় সাম্প্রতিক সময়ে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সক্রিয় সম্পৃক্ততা বাড়ানো উচিত।

১.৭.৬ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

প্রবাসী আয়ের প্রবাহ ও রপ্তানি খাতে উচ্চ হারের প্রবৃদ্ধির সুবাদে দেশে ২০০৯ সালের জুন মাসের শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুদ আগের ২০০৮ সালের একই সময়ের তুলনায় ২১.৫০ শতাংশ বেড়েছে। আলোচ্য অর্থবছরের জুন মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকে মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ৭,৪৭০.৯৬ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়, যা দিয়ে কয়েক মাসের আমদানি ব্যয় পরিশোধের মতো সক্ষমতা পরিলক্ষিত হয় (চিত্র ১.৪৩)। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে মোট যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

চিত্র ১.৪৩: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং সমতুল্য মাসের আমদানি

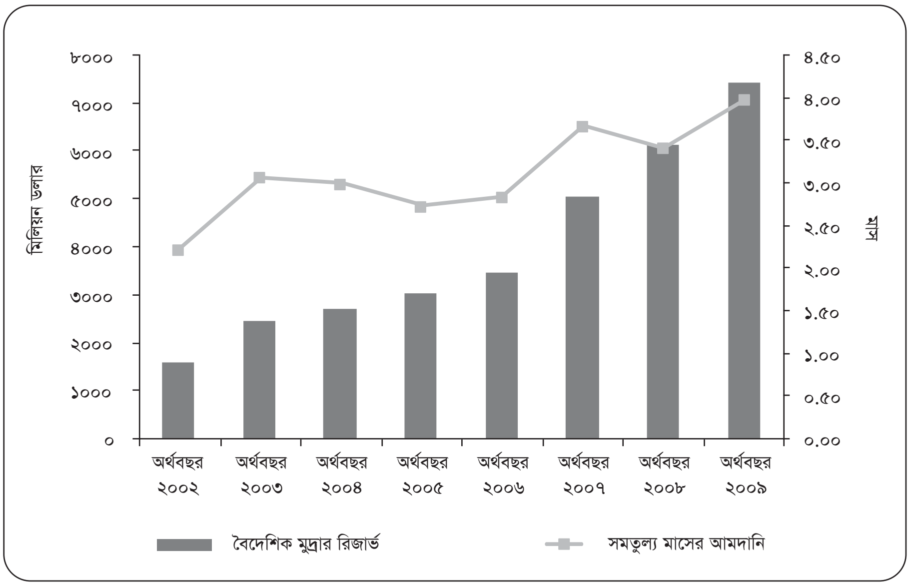

উৎস: সিপিডি ট্রেড ডাটাবেইজ, ২০০৯।

ছিল, তা দিয়ে চার মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যেতো। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের এই পরিস্থিতিতে আশা করা যায় যে নিকট ভবিষ্যতেও একই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে, অর্থাৎ তা টেকসই হবে। এটি বাংলাদেশের জন্য বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা ও প্রয়োজনীয় আমদানি ব্যয় মেটানোর ব্যাপারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বৈকি।

বাংলাদেশ ব্যাংককে বৈদেশিক মুদ্রাবাজার বা আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারের গতিপ্রকৃতির ওপর নজর রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সব সময়ই মুদ্রাবাজারের পরিবর্তন ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বিষয়ে তদারকি কার্যক্রম চালাতে হবে এবং গতিশীল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে নিরাপদ অবস্থায় রাখতে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১.৭.৭ বৈদেশিক সাহায্য

সারণি ১.২৯এ দেখা যায় যে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ মোট ১.৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সাহায্য ছাড় বা অবমুক্ত করা হয়েছে, যা এর আগের অর্থবছরের তুলনায় ৩৩৫ মিলিয়ন ডলার কম। তবে দেশে বৈদেশিক ঋণের মূল বা আমল পরিশোধের পরিমাণ ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ৫৫৬ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৬৪১.২ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের প্রকৃত পরিমাণ কমে ১,০৮৫.৯১ মিলিয়ন ডলারে নেমে আসে, যা এর আগের ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ১,৪৭৫.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সারণি ১.২৯: বৈদেশিক উৎস থেকে সরকারের ঋণ ও অনুদান সাহায্য গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি

অর্থবছর	সাহায্য গ্রহণ পরিস্থিতি			পরিশোধ পরিস্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)		
	মোট সাহায্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	অনুদানের অংশ (%)	ঋণের অংশ (%)	আসল	সুদ	মোট
১৯৮৪-৮৫	১২৬৯.৪৪	৫৫.৪০	৪৪.৬০	১০৬.০০	৬৪.০০	১৭০.০০
১৯৯৩-৯৪	১৫৫৮.৬৪	৪৫.৫৬	৫৪.৪৪	২৬৩.০০	১৩৯.০০	৪০২.০০
২০০৫-০৬	১৩৬৫.১৯	৩৬.৬৬	৬৩.৩৪	৫০২.০০	১৭৬.০০	৬৭৮.০০
২০০৬-০৭	১৬৩০.৫৭	৩৬.১৯	৬৩.৮১	৫৪০.০০	১৮২.০০	৭২২.০০
২০০৭-০৮	২০৬১.৫২	৩১.৯২	৬৮.০৮	৫৮৬.০০	১৮৪.০০	৭৭০.০০
২০০৮-০৯	১৭২৬.৯১	৩০.২৮	৬৯.৭২	৬৪১.০০	১৮২.০০	৮২৩.০০

উৎস: সিপিডি-আইআরবিডি ডাটা বেইজ, ২০০৯।

বিশ্ব অর্থনীতি সংকোচনের পরিণতিতে দেশে যাতে প্রবৃদ্ধি না কমে, সেজন্য সরকারের উচিত বৈদেশিক সাহায্যকে অর্থায়নের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচনা করা। কারণ, এই সাহায্য মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেয় না, আর এর ফলে সরকারকেও অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে কম ঋণ নিতে হয়। ফলশ্রুতিতে, বেসরকারি খাতের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ হ্রাস পায় না। বৈদেশিক সাহায্য ছাড়করণ বা অবমুক্ত করা এবং এর কার্যকর ব্যবহারের বিষয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের সামনে তিনটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে: (ক) দাতাদের প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্য সময়মতো ছাড়করণ এবং এর বিপরীতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যে পরিমাণ অর্থের যোগান নেওয়া প্রয়োজন, সেটির ব্যবস্থা করা, যাতে বৈদেশিক সাহায্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়; (খ) দক্ষতার সঙ্গে বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর সব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা; এবং (গ) যেসব কর্মকাণ্ডে বৈদেশিক সাহায্য ব্যয় বা বিনিয়োগ করা হয়, সেখান থেকে যথাসম্ভব সর্বোচ্চ ফল পাওয়া নিশ্চিত করা।

১.৮ সামাজিক খাত

স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার অধিকতর মানোন্নয়নসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়টিকে বাংলাদেশের সরকারগুলো বরাবরই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। এ ধরনের নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারগুলো সামাজিক নিরাপত্তা খাতসমূহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তহবিল বরাদ্দ করে চলেছে। একই প্রবণতা লক্ষ করা গেছে ২০০৮-০৯ অর্থবছরেও (সারণি ১.৩০)। এই অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, নারী ও শিশুসহ সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর আওতায় ৬,৪১৪ কোটি ৪৩ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে (যা ২৩,০০০ কোটি টাকার সংশোধিত এডিপির মোট বরাদ্দের ২৭ শতাংশের বেশি)। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের এডিপি বরাদ্দ এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তেছে আওয়ামী লীগ সরকারের ওপর। কারণ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার সুবাদে তারা ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতা গ্রহণ করে।

সারণি ১.৩০: ২০০৮-০৯ অর্থবছরে খাতওয়ারি পরিকল্পিত বরাদ্দ এবং ব্যয়

(কোটি টাকা)

উপখাতসমূহ (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো সহ)	এডিপি বরাদ্দ (অর্থবছর ২০০৯)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (অর্থবছর ২০০৯)	ব্যবহার) (অর্থবছর ২০০৮-০৯)	
			মোট	বরাদ্দের হার (%)
স্বাস্থ্য খাত				
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২৪১৬.৪৩	২৬১৫.০৪	২০০৬.৩৬	৭৭.০০
শিক্ষা ও প্রযুক্তি				
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	২৩৬৯.৩৫	২১১৩.৭৯	২০৫৫.১৫	৯৭.০০
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৮২৬.০৫	৯৮৫.৫৪	৯৪৮.৯৭	৯৬.০০
বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১২৬.৩৯	১০৬.০৯	৯৯.৮১	৯৪.০০
নারী উন্নয়ন ও শিশুবিষয়ক				
নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১৮.১৬	১১৬.৫৪	১১৫.৭০	৯৯.০০
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী				
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪৭.৭০	৯০.৩৭	৫৩.৪০	৫৯.০০
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	২১০.৬৬	১৯১.০৮	১৬৪.৯৫	৮৬.০০
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৮৯.৬২	৯৫.৯৮	৮০.১৪	৮৩.০০

উৎস: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ।

১.৮.১ স্বাস্থ্য খাত

২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তার ৭৭ শতাংশ ব্যবহার হয়েছে। এটি এ খাতের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি হতাশাজনক চিত্র বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে এই অর্থবছরে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাত কর্মসূচির আওতায় যেসব কর্মসূচিতে অর্থ ছাড় করা হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশেরই বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। তা সত্ত্বেও সার্বিকভাবে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড়করণ উভয় ক্ষেত্রেই কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা নিম্ন পর্যায়েই রয়ে গেছে। অথচ যেকোন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে ব্যবস্থাপনায় গুণগত মান ও দক্ষতার ওপর। অন্যদিকে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচির জন্য মোট বরাদ্দকৃত তহবিলের ৮৫ শতাংশেরও বেশি ব্যবহার হয়েছে।

অধিকতর ভালো স্বাস্থ্যসেবার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক

পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টিসংক্রান্ত জরুরি সেবাগুচ্ছ কার্যক্রমের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্প্রতি প্রতি ৬,০০০ লোকের জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক কর্মসূচি চালু করে। এর প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক হচ্ছে একটি ওয়ান্ স্টপ সেবাকেন্দ্র। আওয়ামী লীগ এর আগে ক্ষমতায় থাকাকালে ১৯৯৬-২০০০ সা লে দেশব্যাপী মোট ১৩,৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিলেও শেষ পর্যন্ত ১০,৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ হয়েছিল। ২০০৯ সালে আবার ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরেই আওয়ামী লীগ সরকার গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পুনরায় এই কমিউনিটি ক্লিনিক কর্মসূচি চালু করে। ২০০৯ সালেরই জুন নাগাদ ১০,৩৪৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনার দায়িত্ব কমিউনিটি গ্রুপগুলোর কাছে হস্তান্তর করা হয়। এর মধ্যে ৮,৪৬৪টিতে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে (সারণি ১.৩১)। ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে পুনরায় কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো চালু করার পর জেলা পর্যায়ে মোট ১২ কোটি ৫০ লাখ টাকার ওষুধ সরবরাহ করা হয়। একই বছরের জুন মাস নাগাদ পাইপলাইনে থাকে আরও ৪ কোটি ৪০ লাখ টাকার ওষুধ। তবে দেশব্যাপী সব কমিউনিটি ক্লিনিক সঠিকভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করতে হলে অন্ততপক্ষে ২৩০ কোটি টাকার প্রয়োজন। পাশাপাশি এ ধরনের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করতে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী ও দক্ষ সহকারী নিয়োগের বিষয়ে জোর দিতে হবে। পাশাপাশি কমিউনিটি গ্রুপগুলোর মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোকেও এই কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে নিবিড় তদারকি ও মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সারণি ১.৩১: কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর অবস্থা (জুন ২০০৯ পর্যন্ত)

বিভাগ	নির্মিত	হস্তান্তর	এপ্রিল ২০০৯ থেকে কার্যকর	নির্মিত হলেও পরে ধ্বংস হয়ে গেছে	মন্তব্য
ঢাকা	২৯৫১	২৮২২	২০৯১	১৬	১৬: নদী ভাঙন কবলিত
চট্টগ্রাম	১৬৬৩	১৬২১	১৪৩১	৪	২: নদী ভাঙন কবলিত; ২: সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে
রাজশাহী	৩২৫৫	৩১৭১	২৪৫৪	৪৩	৪৩: নদী ভাঙন কবলিত
খুলনা	১৩৮৫	১৩৮০	১৩২২	২	২: সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে
বরিশাল	৮০১	৭৩৭	৫৯৮	৩২	৩২: নদী ভাঙন কবলিত
সিলেট	৬৬৮	৬১৮	৫৬৮	২	২: সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে
মোট	১০৭২৩	১০৩৪৯	৮৪৬৪	৯৯	

উৎস: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

১.৮.২ শিক্ষা ও প্রযুক্তি

২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বরাদ্দকৃত মোট অর্থের যথাক্রমে ৯৮ শতাংশ ও ৯৬ শতাংশ ব্যবহার হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে সংশোধিত এডিপির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ের (পিইডিপি-২) জন্য বরাদ্দকৃত মোট অর্থের মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৯৭ শতাংশ। একইভাবে শিক্ষা খাতের প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়), রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (আরওএসসি) এবং সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এসইকিউএইপি) প্রভৃতি কর্মসূচিতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ করা যায় (সারণি ১.৩২)।

সারণি ১.৩২: ২০০৮-০৯ অর্থবছরে শিক্ষা খাতের প্রধান প্রকল্পসমূহের অবস্থা

(কোটি টাকা)

প্রকল্প	সংশোধিত বরাদ্দ	ব্যয়	সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার (%)
প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)	৪৮৮.০০	৪৭৮.০০	৯৭.৯৫
রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (আরওএসসি)	৮৭.৫৬	৮৪.১৮	৯৬.১৪
সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এসইকিউএইপি)	১১২.৪২	৯৯.১২	৮৮.১৭

উৎস: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ; শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

এসব প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারি প্রচেষ্টা অবশ্যই আরও জোরদার করতে হবে। কারণ, দেশের সব শিশুর জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সর্বাত্মক তৎপরতা চালানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশে এখন শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর বিষয়ে গভীর মনোযোগ দেওয়ার সময় এসেছে। এছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথে এগিয়ে যেতে হলে সরকারের উচিত হবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে একটি ই-এডু কেশন সেল গঠন করা।

১.৮.৩ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

সমাজের বিভিন্ন অংশের হতদরিদ্র ও ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করতে এবং তাদের কাছে সম্পদ পৌঁছানোর লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি পরিচালনা করছে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ ধরনের কর্মসূচির ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চলমান মন্দার প্রভাবে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ দেশের আরও ২৪ লাখের মতো মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যেতে পারে।

২০০৮-০৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে জিডিপির ২.২৫ শতাংশ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বরাদ্দের তুলনায় ০.১১ শতাংশ বেশি। আলোচ্য ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে দরিদ্র ও ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীকে নগদ ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে যেসব কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়, সেগুলো ছিল খুবই ইতিবাচক। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন তথা মাসিক নগদ ভাতা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান যেমন সাবলীল ছিল, তেমনি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের মধ্যে তা বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরাসরিভাবে জড়িত তিনটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংশোধিত এডিপি পরিচালনায় দুর্বলতা দেখা গেছে। মন্ত্রণালয় তিনটি হলো: সমাজকল্যাণ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান – এই দুটি মন্ত্রণালয়ই সংশোধিত এডিপির আওতায় বরাদ্দকৃত মোট অর্থের ৮০ শতাংশের কিছু বেশি ব্যবহার করতে পেরেছে। অন্যদিকে একই অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশোধিত এডিপির আওতায় বরাদ্দকৃত মোট অর্থের মাত্র ৫৯ শতাংশ ব্যবহার করেছে। এসব নিয়মিত বরাদ্দের বাইরে সরকার বিশ্বমন্দার প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালের ১৯ এপ্রিল ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি প্রণোদনাগুচ্ছ ঘোষণা করে। এই গুচ্ছে মোট বরাদ্দের মধ্যে ১১ শতাংশ অর্থ রাখা হয় বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির জন্য। ২০০৯ সালের জুন মাসেই ঘোষণা করা হয় সরকারের দ্বিতীয় প্রণোদনাগুচ্ছ। এতে মোট বরাদ্দ দেওয়া হয় ৭২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এতেও বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কর্মসৃজন কর্মসূচি

প্রাপ্ত তথ্যউপা ত্ত মতে, উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা ২০,০০০ বেকারকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিতে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চলমান মন্দার কারণে চাকরি বা কাজ হারিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে ফিরে আসা নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে ১,৫০০ থেকে ২,০০০ কোটি টাকার একটি ব্যয় বরাদ্দের পরিকল্পনা করে সরকার। এ ছাড়া সরকার ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচির পরিবর্তে কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ কর্মসূচি চালুরও পরিকল্পনা করে। তবে এই কর্মসূচিতে আলাদাভাবে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে, নাকি অতীতের কর্মসূচিগুলোর অব্যবহৃত অর্থ ও পরবর্তী বাজেটের নতুন বরাদ্দের সঙ্গে সমন্বয় করে নেওয়া হবে, সেটি পরিষ্কার নয়।

দেশের যেসব এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি আরও জোরদার করা প্রয়োজন, সেই সব দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করতে সরকারের দারিদ্র্যের নয়া মানচিত্র ব্যবহার করা উচিত। সেই সাথে দেশের উত্তরাঞ্চলের মঙ্গাপীড়িত বিভিন্ন জেলা এবং ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে বিধ্বস্ত এলাকাগুলোর প্রতি মনোযোগ বাড়াতে হবে। বর্তমান সরকারের উচিত হবে নতুন উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নেওয়া পাঁচ বছরের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা কর্মসূচি অব্যাহত রাখা। এ ছাড়া পরিবেশগত ঝুঁকির মুখে পড়া অঞ্চল ও মানুষের সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের (৩০০ কোটি টাকা) অর্থও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে।

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা (পিএফডিএস)

২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে মূল্যভিত্তিক (মনেটাইজড) ও মূল্যবহির্ভূত (নন্‌ম নেটাইজড) ব্যবস্থার আওতাধীন খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ আগের অর্থবছরের চেয়ে ৮২ শতাংশ বেশি হয়েছে। তবে তা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৭ শতাংশ কম ছিল (সারণি ১.৩৩)। অতীতে প্রায়শই ভাতা সহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায়

সারণি ১.৩৩: ২০০৮-০৯ অর্থবছরে চ্যানেল-ওয়ারি খাদ্যশস্য বিতরণ

('০০০ মেট্রিক টন)

খাত	চ্যানেল	সংশোধিত বাজেট (অর্থবছর ২০০৮-০৯)			সামগ্রিকভাবে বিতরণ (১ জুলাই ২০০৮-৩০ জুন ২০০৯)			সংশোধিত বাজেটের মোট বরাদ্দের বিপরীতে বিতরণের হার (%)		
		চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট	চাল	গম	মোট
মূল্যভিত্তিক ব্যবস্থা	ইপি	১৪৮	১০৮	২৫৬	১৩৩	৮৬	২১৯	৮৯.৮৬	৭৯.৬৩	৮৫.৫৫
	ওপি	১৬	১০	২৬	১৭	৫	২২	১০৬.২৫	৫০.০০	৮৪.৬২
	এলই	১৩৩	০	১৩৩	১০	০	১০	৭.৫২	০.০০	৭.৫২
	ওএমএস	৩৭০	০	৩৭০	১৯৫	০	১৯৫	৫২.৭০	০.০০	৫২.৭০
	অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০
	উপমোট	৬৬৭	১১৮	৭৮৫	৩৫৫	৯১	৪৪৬	৫৩.২২	৭৭.১২	৫৬.৮২
মূল্যবহির্ভূত ব্যবস্থা	এফএফডব্লিউ	৩০৩	২৮	৩৩১	৩৬২	৩৩	৩৯৫	১১৯.৪৭	১১৭.৮৬	১১৯.৩৪
	টিআর	১৪৩	১২০	২৬৩	২৫৮	১১০	৩৬৮	১৮০.৪২	৯১.৬৭	১৩৯.৯২
	ভিজিএফ	৫০০	০	৫০০	৫০৭	০	৫০৭	১০১.৪০	০.০০	১০১.৪০
	ভিজিডি	১৬৫	১০০	২৬৫	১৪১	১৩৮	২৭৯	৮৫.৪৫	১৩৮.০০	১০৫.২৮
	জিআর	৬৪	০	৬৪	৪৩	০	৪৩	৬৭.১৯	০.০০	৬৭.১৯
	অন্যান্য	৭৫	০	৭৫	৯২	০	৯২	১২২.৬৭	০.০০	১২২.৬৭
	উপমোট	১২৫০	২৪৮	১৪৯৮	১৪০৩	২৮১	১৬৮৪	১১২.২৪	১১৩.৩১	১১২.৪২
সর্বমোট		১৯১৭	৩৬৬	২২৮৩	১৭৫৮	৩৭২	২১৩০	৯১.৭১	১০১.৬৪	৯৩.৩০

উৎস: খাদ্য পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ ইউনিট, বাংলাদেশ।

দ্রষ্টব্য: ইপি: এসেনশিয়াল প্রায়োরিটি; ওপি: আদার প্রায়োরিটি; এলই: লার্জ এমপ্লয়ার্স; ওএমএস: ওপেন মার্কেট সেল; এফএফডব্লিউ: ফুড ফর ওয়ার্ক; টিআর: টেস্ট রিলিফ; ভিজিএফ: ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং; ভিজিডি: ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট; জিআর: গ্র্যাচুইশাস রিলিফ।

সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতির পক্ষপাত ও প্রভাব লক্ষ করা গেছে। সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে এ ধরনের পক্ষপাত ও প্রভাব পরিহার করতে হবে।

ঘূর্ণিঝড় আইলায় বিধ্বস্ত উপকূলীয় এলাকাগুলোতে ভিজিডি ও ভিজিএফ–এ দুটি কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় ও বরাদ্দ করার প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি ভিজিএফ কর্মসূচি সম্প্রসারণে বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাংকের নেওয়া বৈশ্বিক খাদ্য সংকট মোকাবিলা কর্মসূচি (গ্লোবাল ফুড ক্রাইসিস রেসপন্স প্রোগ্রাম) থেকেও তহবিল পাওয়ার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ ছাড়া সমাজের যেসব মানুষ এ ধরনের সহায়তা পাওয়ার উপযুক্ত হলেও পায়নি, তাদের এবং সুবিধাবঞ্চিতদের এর আওতায় নিয়ে আসার জন্য নতুন তালিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার পাশাপাশি এক্ষেত্রে তদারকি বাড়াতে ও লক্ষ্য অর্জন করতে জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে।

১.৯ ২০০৯-১০ অর্থবছরের পূর্বাভাস ও চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগের পূর্বাভাস

নতুন নীতি প্রণয়ন ও নীতিমালায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে কিছুটা অনিশ্চয়তা এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার কারণে ২০০৮৹০৯ অর্থ´বছর ছিল বাংলাদেশের জন্য এক অনিশ্চয়তাপূর্ণ বছর। তার পরও এই বছরে ৫.৯ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনকে কিছুটা সন্তোষজনকই বলতে হবে। আলোচ্য ২০০৮৹০৯ অর্থ´বছরে দেশের কৃষি খাতে ব্যাপক হারে ফলন বাড়ার পাশাপাশি রপ্তানি আয়েও উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব বিলম্বে পড়বে এবং তা থেকে উত্তরণে বেশ কিছু সময় লাগতে পারে – এমন আশঙ্কা থেকেই ২০০৯৹১০ অর্থ´বছরের জিডিপিতে প্রাথমিকভাবে ৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ছিল গত ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা। কিন্তু এর আগে ২০০৮৹০৯ অর্থ´বছরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কিছু নাজুকতার পরও জিডিপিতে প্রায় ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। আর বিশ্ব অর্থনীতিতেও এখন মন্দার মাত্রা কমেছে এবং বাজেটেও সম্প্রসারণমূলক নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেজন্য ২০০৯৹১০ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে যে হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে, সেটাকে সিপিডি সহ অনেকেই "বেশ রক্ষণশীল" বলেই মনে করে। মনে রাখতে হবে যে বর্তমান মহাজোট সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও প্রতিশ্রুতির উচ্চাভিলাষ লক্ষ করা গেছে, যা তাদের কাছে দেশের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০০৯ সালের ১২ জুন বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী অবশ্য জানিয়েছেন যে তারা প্রকৃত অর্থে আলোচ্য অর্থবছরে (২০০৯৹১০) জিডিপি তে ৫.৫ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে আশা করছেন। তবে এ কথাও ঠিক, বিশ্ব অর্থনীতিতে বিদ্যমান অনিশ্চয়তা ও পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি বিবেচনা করে সরকার যেভাবে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে চেয়েছে, সেটিও খুব আশ্চর্যজনক কিছু নয়।

বাংলাদেশের জিডিপি যেসব উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত, তাতে বছরে ৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিশেষভাবে ব্যতিক্রমী কিছু করার প্রয়োজন কম বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে জিডিপিতে ৬ শতাংশ বা এর চেয়ে বেশি হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে কর্মকাণ্ড জোরদার করার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে ২০০৯৹১০ অর্থ´বছরের জাতীয় বাজেটে জিডিপির খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলনের তথ্য সেভাবে তুলে ধরা হয়নি। এ অবস্থায় সার্বিকভাবে জিডিপিতে গড় লক্ষ্যমাত্রা ৬ শতাংশের আশপাশে (কিঞ্চিৎ কম্ব বেশি) হিসাব করে সিপিডি তার অতীত

সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা, সাম্প্রতিক প্রবণতা ও বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে খাতভিত্তিক জিডিপির প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করেছে (সারণি ১.৩৪)।

সারণি ১.৩৪: খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণসমূহ

খাত	প্রবৃদ্ধি (অর্থবছর ২০০৮-০৯)	প্রবৃদ্ধি (অর্থবছর ২০০৯-১০)*
কৃষি	৪.৭	৩.৫
শিল্প	৫.৯	৬.৫-৭.০
সেবা	৬.৩	৬.৫
জিডিপি	৫.৯	৬.০-৬.৩

উৎস: সিপিডির প্রক্ষেপণ ও হিসাব নিরূপণ করা হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী।
দ্রষ্টব্য:*জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার আলোকে খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয়েছে।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশের কৃষি খাতের উৎপাদনে ৪.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হওয়ার প্রেক্ষাপটে ২০০৯-১০ অর্থবছরেও উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করাটা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। এ ক্ষেত্রে একটি নিরাপদ যুক্তি হচ্ছে, সরকারি নীতি-সহায়তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকায় এবং খরার কারণে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু জায়গায় প্রভাব পড়া ছাড়া দেশে বড় ধরনের কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হওয়ায় ফসলের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়নি বলে এবার আমন ধানের উৎপাদনে প্রায় ৩.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। সে আলোকেই আশা করা যায়, চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি হতে পারে।

শিল্প খাতে গত এক দশকে (২০০০-০১ থেকে ২০০৮-০৯ অর্থবছর) গড়ে প্রায় ৭ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। তবে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ খাতে ৫.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হওয়ার প্রেক্ষিতে চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত একই প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়। আশার কথা হচ্ছে, বিশ্ব অর্থনীতি এরই মধ্যে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রবণতা শুরু হওয়ায় এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে। ফলে ২০০৯-১০ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে দেশের শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি বাড়তে পারে। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ প্রবাহ নৈরাশ্যজনক হওয়ায় আলোচ্য অর্থবছর শেষে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি গত এক দশকের গড় প্রবণতার চেয়ে কম কিন্তু গত অর্থবছরের চেয়ে বেশি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সব দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশের শিল্প খাতে ৬.৫ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে।

অতীতের প্রবণতা থেকে দেখা যায় যে, প্রকৃত খাতগুলোতে সীমিত অর্জনের পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের সেবা খাতের কার্যক্রমে মোটামুটি স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। ২০০০-০১ থেকে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত সেবা খাতে প্রত্যাশিত হারে (গড়ে ৬.৫ শতাংশ) প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে সরকার বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ছিল আগের অর্থবছরের চেয়ে কিছুটা কম। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপির ২৪.২ শতাংশ, সেখানে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে তা ২৩.৬ শতাংশে প্রাক্কলন করা হয়েছে (সারণি ১.৩৫)। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে (বড় এডিপি বিবেচনায় নিয়ে)। বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপির ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১৯.৬ শতাংশ থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছরে কিছুটা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাজেটে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়বে বলে যে প্রত্যাশার কথা বলা হয়েছে, তা বাস্তবায়িত করতে হলে সার্বিক বিনিয়োগ পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটাতে হবে।

সারণি ১.৩৫: ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি-বিনিয়োগ কাঠামো

নির্দেশক	অর্থবছর ২০০৮-০৯ (সাময়িক)	অর্থবছর ২০০৮-০৯ (প্রক্ষেপিত)
জিডিপির প্রকৃত প্রবৃদ্ধি (%)	৫.৯	৫.৫-৬.০
মোট বিনিয়োগ (জিডিপির শতকরা হার হিসেবে)	২৪.২	২৩.৬
ক্রমবর্ধমান মূলধন-উৎপাদন অনুপাত	৪.১	৪.৩-৩.৯
এডিপি (জিডিপির শতকরা হার হিসেবে)	৩.৭	৪.৪

উৎস: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে সিপিডির প্রাক্কলন হিসাব করা হয়েছে।

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ শতাংশে প্রাক্কলনের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান মূলধন-উৎপাদন অনুপাত ৪.৩ শতাংশ বাড়বে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যার মধ্যে পুঁজির উৎপাদনশীলতা হ্রাসের আশঙ্কা রয়েছে। অর্থনীতি তথা জিডিপিতে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে একই হারে বিনিয়োগ প্রবাহ (জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করা না হলে) এবং মূলধন-উৎপাদন অনুপাত অনুযায়ী পুঁজির উৎপাদনশীলতায় ৩.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগের প্রবাহও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ প্রবাহ না থাকলে অবশ্য সক্ষমতার সদ্ব্যবহার এবং প্রযুক্তিগত আধুনিকায়নের মাধ্যমে পুঁজির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব। এক্ষেত্রে বহুল আলোচিত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস

নতুন মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় (যার মেয়াদ ২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত) দেশের অর্থনীতিতে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থবছরে যথাক্রমে ৬ শতাংশ ও ৬.৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে (সারণি ১.৩৬)। এ কাঠামোতে মূল্যস্ফীতির হার ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৬.৫ শতাংশে এবং ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থবছরে ৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের এ ধরনের একটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে বিশ্ব অর্থনীতিতে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বাড়ার পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

মধ্যমেয়াদি কাঠামোর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতির হার জিডিপির ৫ শতাংশ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের জন্য আরও কমিয়ে ৪.৭ শতাংশ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। সরকারের বর্তমান ব্যয় প্রবণতার আলোকেই বাজেট ঘাটতি কমানোর এই লক্ষ্যমাত্রা। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০ অর্থবছরে (জিডিপির অনুপাতে বা অংশ হিসেবে) উল্লেখযোগ্য হারে বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হলেও পরবর্তী বছরগুলোতে তা আবার কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। রাজস্ব আহরণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাটা হবে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সেজন্য এ বিষয়ে জোর দেওয়া প্রয়োজন। এ কাঠামোতে আরও বলা হয়েছে যে সরকার বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে অভ্যন্তরীণ উৎসের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার পথে অগ্রসর হতে চায়।

মুদ্রাবাজারের দিকে তাকালে দেখা যায় যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে মুদ্রা সরবরাহ প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংকোচনের নীতি নেওয়া হয়েছে, যা মূলত রক্ষণশীল উপায়ে মুদ্রা সম্প্রসারণের নীতিই বটে। দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ইতিপূর্বে সিপিডি সহনীয়ভাবে সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণের

সারণি ১.৩৬: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাস: অর্থবছর ২০০৯-১০ থেকে অর্থবছর ২০১১-১২

নির্দেশক	প্রক্ষেপণ		
	অর্থবছর ২০০৯–১০	অর্থবছর ২০১০–১১	অর্থবছর ২০১১–১২
উৎপাদন			
প্রকৃত প্রবৃদ্ধি (%)	৫.৫–৬.০	৬.০	৬.৫
মূল্যস্ফীতি (১২–মাসের গড় বার্ষিক হার)	৬.৫	৬.০	৬.০
মোট বিনিয়োগ (জিডিপির শতকরা হারে)	২৩.৬	২৪.৩	২৫.২
ক্রমবর্ধমান মূলধন–উৎপাদন অনুপাত	৪.৩–৩.৯	৪.১	৩.৯
সরকারি হিসাব (জিডিপির শতকরা হারে)			
মোট রাজস্ব আয়	১১.৬	১১.৩	১১.৫
কর	৯.৩	৯.২	৯.৫
কর–বহির্ভূত	২.৩	২.১	২.১
মোট ব্যয়	১৬.৬	১৬.১	১৬.২
চলতি ব্যয়	১০.৩	১০.০	১০.০
বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়	৪.৪	৪.৬	৪.৭
সার্বিক ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত)	–৫.০	–৪.৮	–৪.৭
অর্থায়ন	৫.০	৪.৮	৪.৭
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.০	২.৬	২.৩
ব্যাংক ব্যবস্থা	২.৪	২.০	১.৮
ব্যাংক বহির্ভূত	০.৬	০.৫	০.৫
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন	২.০	২.২	২.৪
মুদ্রা ও ঋণ (% পরিবর্তন)			
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৭.৫	১৭.১	১৭.১
বেসরকারি খাতে ঋণ	১৮.৩	১৮.৫	১৮.৫
ব্যাপক মুদ্রা	১৬.৩	১৬.২	১৬.০
লেনদেনের ভারসাম্য			
রপ্তানি (% পরিবর্তন)	১২.৫	১৭.৫	১৮.৫
আমদানি (% পরিবর্তন)	১৩.০	১৭.০	১৬.০
প্রবাসী আয় (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	১০.৬	১১.৬	১২.৮
প্রবাসী আয় (% পরিবর্তন)	৯.৩	৯.৪	১০.৩
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (জিডিপির শতকরা হারে)	০.২	–০.১	–০.৪
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৭.৫	৮.৫	৯.৫
আমদানি মূল্যমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মাস হিসেবে)	২.৫	২.৩	২.০
বিনিময় হার (টাকা/মার্কিন ডলার)	৭০.৭	৭১.৮	৭২.৯

উৎস: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো।

পরামর্শ দিয়েছিল। যাই হোক, একই সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বাড়ার মানে হলো সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ কমতে পারে। সেক্ষেত্রে এটি হবে প্রস্তাবিত সম্প্রসারণমূলক রাজস্বনীতির সঙ্গে সঙ্গতিহীন। ২০০৯–১০ অর্থবছরের তুলনায় ২০১০–১১ ও ২০১১–১২ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি আরও কমবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০০৯–১০ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া চলবে এমন সম্ভাবনায় বহির্খাতগুলোতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা রক্ষণশীল রাখা হয়েছে। তবে আগামী অর্থবছরে (২০১০–১১) এ

ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও তখন লেনদেনের ভারসাম্য চাপে থাকতে পারে এমন আশঙ্কা রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যসামগ্রীর দামের ওঠানামা এবং খাদ্য আমদানির ওপরই মূলত নির্ভর করছে উচ্চ হারে প্রাক্কলিত আমদানি লক্ষ্যমাত্রার পূর্ণ অর্জন। নিকট ভবিষ্যতে বিশ্ব অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো বা পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু হওয়া এবং এর গতিপ্রকৃতির ওপরও বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভর করবে। তবে মধ্যমেয়াদে বিশেষ করে প্রবাসী আয়ের পূর্বাভাসকেও নেহায়েত রক্ষণশীল বলেই মনে হয়।

কর্মসংস্থানের পূর্বাভাস

বাংলাদেশের শ্রমবাজারের হালনাগাদ কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার নিয়ে সর্বশেষ যে তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়, সেটিও আবার ২০০৫-০৬ অর্থবছরের অর্থাৎ কয়েক বছরের পুরোনো। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিরূপণ প্রাক্কলনের বিষয়ে এখানে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) দ্বারা প্রণীত পদ্ধতিই[২৩] অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করতে ভিত্তি বছরের খাতওয়ারি মূল্য সংযোজন এবং একটি নির্দিষ্ট সময়কালের খাতওয়ারি বা খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা প্রয়োজন। মূল্য সংযোজনের বিষয়টি প্রাক্কলন করা হয় দেশের অতীত কর্মসংস্থানের উপাত্তের আলোকে। অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে এই পদ্ধতির একটি সুবিধা হচ্ছে, এতে প্রক্ষেপিত সময়ের কর্মসংস্থানের পারিসংখ্যানিক চিত্র প্রয়োজন পড়ে না। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের দুর্বলতা বা ঘাটতি রয়েছে, সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে এই পদ্ধতিটাই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রবণতা নিরূপণ বা প্রাক্কলনের জন্য সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক। সবগুলো খাতকে যোগ করলে বা হিসাবে ধরলে দেশের অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ঘটিত পরিবর্তনের সার্বিক চিত্র উঠে আসে।

এক্ষেত্রে একটি কথা বলে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বিভিন্ন ধরনের অনুমানের আলোকেই উল্লেখিত পদ্ধতির চর্চা বা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত, মধ্যমেয়াদে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের মধ্যকার ধারাবাহিকতা; দ্বিতীয়ত, মধ্যমেয়াদে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে শিল্প খাতের সঙ্গে সমন্বয় সাধন; এবং প্রক্ষেপণ বা প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য সময়কালে উৎপাদন প্রযুক্তির স্থিতিশীল অবস্থাকে অনুমানে ধরা হয়েছে।

সিপিডির প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশের অর্থনীতিতে মোট কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৫ কোটি ১২ লাখে দাঁড়ায়। এর মধ্যে শিল্প খাতে কর্মসংস্থান হয় ৭৬ লাখ এবং সেবা খাতে কর্মসংস্থান হয় ১ কোটি ৯৫ লাখ মানুষের (সারণি ১.৩৭)। তবে কৃষি খাতই যে দেশের সবচেয়ে বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ, সে অবস্থা অব্যাহত রয়েছে। এ খাতে দেশের সর্বোচ্চ ২ কোটি ৪১ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এসব দিক বিবেচনায় মনে করা হয়, শ্রমশক্তি বৃদ্ধির প্রবণতা আগের মতোই রয়েছে। সেই আলোকে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা ৫ কোটি ৩১ লাখে প্রাক্কলন করা হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রাক্কলিত বেকারত্বের হার ৩.৬ শতাংশ বাদ দেওয়া হয়েছে।

[২৩] এই পদ্ধতিতে খাতওয়ারি কর্মসংস্থানের পরিবর্তনকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে: $\Delta E_i = (\eta_i)(\lambda_i)\Delta Y_i$
এখানে ΔE_i হচ্ছে খাতওয়ারি কর্মসংস্থানের পরিবর্তন; η_i হচ্ছে খাতওয়ারি কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা; λ_i হচ্ছে খাতওয়ারি গড় শ্রমঘনত্ব (একক প্রতি মূল্য সংযোজনে কর্মসংস্থান); ΔY_i হচ্ছে প্রক্ষেপিত সময়কালে খাতওয়ারি মূল্য সংযোজনে পরিবর্তন; এবং i হচ্ছে খাত।

সারণি ১.৩৭: বাংলাদেশের শ্রমবাজার ও কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রক্ষেপণ

(মিলিয়ন)

খাত	অর্থবছর ২০০৫-০৬	অর্থবছর ২০০৭-০৮ (প্রাক্কলিত)	অর্থবছর ২০০৮-০৯ (প্রাক্কলিত)	অর্থবছর ২০০৯-১০ (প্রক্ষেপিত)
কৃষি	২২.৮	২৪.১	২৫.০	২৫.৬
শিল্প	৬.৯	৭.৬	৭.৯	৮.৩
সেবা	১৭.৭	১৯.৫	২০.৪	২১.৩
মোট কর্মসংস্থান	৪৭.৪	৫১.২	৫৩.৩	৫৫.২
শ্রমশক্তি	৪৯.৫	৫৩.১	৫৫.২	৫৭.৩
বেকারত্বের হার (%)	৪.৩	৩.৬	৩.৬	৩.৭

উৎস: শ্রমশক্তি জরিপ ২০০৫-০৬, বাংলা দেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং সিপিডির প্রাক্কলন।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর প্রেক্ষিতে কর্মসংস্থানও বেড়েছে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বিশেষ করে কৃষি খাতে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়ার ইতিবাচক ফল হিসেবে এ খাতে শ্রমের চাহিদাও বাড়ে। যেহেতু কৃষি খাতে শ্রমিকের আংশিক বা অসম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হওয়ার হারটা খুবই বেশি যেমন – কম সময়ে কাজ করা (সারণি ১.৩৮), সেহেতু দেশের প্রকৃত কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি সারণি ১.৩৭-এ দেখানো প্রবণতার চেয়ে আরও খারাপই হবে বলে ধারণা করা যায়। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশের শিল্প খাতে মোট কর্মসংস্থান কিছুটা হ্রাস করে প্রাক্কলন করা হয়। সে অনুযায়ী এ বছর শিল্প খাতে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হয় মাত্র ৪ লাখ মানুষের। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানিও কমে। এক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থান হয় ৩ লাখ মানুষের। উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনার আলোকে আলোচ্য ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে বেকারত্বের হার ৩.৬ শতাংশে প্রাক্কলন করা হয়। অবশ্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা সংশোধনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতের শ্রমশক্তি আর বেকারত্বের হারও নতুনভাবে প্রাক্কলন করতে হয়।

সারণি ১.৩৮: বিভিন্ন খাতে উনিয়োজন এবং সাপ্তাহিক শ্রমঘণ্টা

নির্দেশক	অর্থবছর ১৯৯৯-০০	অর্থবছর ২০০২-০৩	অর্থবছর ২০০৫-০৬
উননিয়োজন / অর্ধ বেকারত্ব (%)			
মোট	১৬.৬	৩৭.৬	২৪.৫
পুরুষ	৭.৪	প্রযোজ্য নয়	১০.৯
মহিলা	৫২.৮	প্রযোজ্য নয়	৬৮.৩
২০০৫-০৬ সা লের গড় সাপ্তাহিক শ্রমঘণ্টা			
খাত	মোট (ঘণ্টা)	পুরুষ (ঘণ্টা)	মহিলা (ঘণ্টা)
কৃষি ও বন	৪৬	৫২	২৬
মৎস্য	৩৭	৪৮	১৮
ম্যানুফ্যাকচারিং	৫৪	৫৬	৪৯
নির্মাণ	৫০	৫১	৩৬
পাইকারি, খুচরা ব্যবসা	৫৫	৫৬	৩৫
হোটেল ও রেঁস্তোরা	৬০	৬১	৪৪
পরিবহন	৫৭	৫৭	৫৩
আর্থিক খাত	৪৬	৪৭	৪৩
আবাসন	৫০	৫১	৪৫
শিক্ষা	৪৮	৪৯	৪৪
স্বাস্থ্য ও সামাজিক কর্মকাণ্ড	৪৯	৫২	৪৫
অন্যান্য কমিউনিটিভিত্তিক ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	৪৯	৫৩	৪১

উৎস: শ্রমশক্তি জরিপ ২০০৫-০৬, বাংলা দেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

২০০৯১০ অর্থবছরের জন্য জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির হার ৫.৫ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ হতে পারে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এ অবস্থায় অর্থনীতিতে দ্রুত কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত না হলে এই অর্থবছরে দেশে মোট কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৫ কোটি ৫২ লাখে দাঁড়াবে। এর মধ্যে কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের সংখ্যা দাঁড়াবে ২ কোটি ৫৬ লাখ। আর সেবা খাতে এই সংখ্যা হবে ২ কোটি ১৩ লাখ। এই অর্থবছরে শিল্প খাতে অতিরিক্ত ৪ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০০৯১০ অর্থবছরে দেশে বেকারত্বের হার খানিকটা বেড়ে ৩.৭ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। এক্ষেত্রে দেশের কৃষি খাতে বিপুল সংখ্যক শ্রমের উপস্থিতি একটি উদ্বেগ তৈরি করেছে। কারণ, বেকারদের একটি বড় অংশ পরিপূর্ণ কাজের সুযোগ পাবে না। তাই কৃষি খাতে আংশিক বা অসম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত শ্রমশক্তির সংখ্যা আরও বাড়বে। শ্রমশক্তির আংশিক বা অসম্পূর্ণভাবে কাজে নিয়োজিত হওয়ার বিপরীত প্রবণতা প্রথম ২০০২০৩ অর্থবছরে লক্ষ করা গেছে, যা পরবর্তী বছরগুলোতে মোটামুটি অব্যাহত ছিল। কিন্তু চলতি ২০০৯১০ অর্থবছরে তা আবার বেড়ে যাচ্ছে (সারণি ১.৩৭ এবং ১.৩৮)। এতে প্রতীয়মান হয় যে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দার কারণে উন্নত ও উন্নয়নশীল বহু দেশে জনবল ছাঁটাইয়ের যে প্রবণতা দেখা গেছে, তা বাংলাদেশের বেলায় দ্রুত ন্যাও ঘট তে পারে। তবে বিশ্বমন্দার কারণে দেশের শ্রমবাজারের আধুনিকায়ন ও পুনর্গঠনের সম্ভাবনা যে ব্যাহত হতে পারে, সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

চ্যালেঞ্জসমূহ

২০০৮০৯ অর্থবছরটি ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি ব্যতিক্রমী সময়। একদিকে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস ও অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে নাজুকতা, অন্যদিকে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব। এ রকম প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে সার্বিকভাবে সন্তোষজনক অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। এই অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে প্রায় ৬ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয়ে ৪.৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, একই সময়ে বিশ্বের স্বল্প আয়ের দেশগুলোর মধ্যে অল্প কয়েকটিতেই কেবল এরকম দেখা গেছে। এ ধরনের উল্লেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রবণতা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষণ। আলোচ্য সময়ে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির অধিকাংশ সূচকই ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে। নানা ধরনের ক্রটি ও প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও ২০০৮০৯ অর্থবছরের শেষে বাংলাদেশের অর্থনীতি সার্বিকভাবে পিছিয়ে থাকেনি, বরং ঠিকই এগিয়ে গেছে। সেজন্য ২০০৯১০ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি আগের অর্থবছরের তুলনায় আরও ভালোভাবে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো ছাড়াও নতুন কিছু বিষয় দেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনের পথে চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিতে পারে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে নতুন সমস্যাগুলো অর্থনীতির জন্য নতুন কোন সুযোগ তৈরি করবে না। কথায় আছে, যার যত বেশি প্রস্তুতি থাকে, ভাগ্যও তাকে তত সহায়তা করে।

২০০৯১০ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ হয়ে দেখা দিতে পারে এমন বিষয়গুলোর ওপর এখানে আলোকপাত করা হলো। সিপিডি মনে করে, এই বিষয়গুলোর ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া উচিত।

বিনিয়োগ বৃদ্ধি

২০০৮০৯ অর্থবছরে দেশে বিনিয়োগের প্রবাহ কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে ২০০৯১০ অর্থবছরে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক থেকেই এডিপি বাস্তবায়নের গতি বাড়ানোর চেষ্টা চালাতে হবে। তাতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ উৎসাহ ও প্রবাহ দুটোই বাড়বে বলে আশা করা যায়। এ লক্ষ্য অর্জনে পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করে, দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল নিয়ে ও প্রণোদনা দিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর

প্রাতিষ্ঠানিক ও মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধি টেকসই করার বিষয়ে জোর দিতে হবে। সরকারি–বেসরকারি অংশীদারিত্বের মতো নতুন কর্মসূচিগুলো এ ধরনের চাহিদা বাড়িয়ে দিতে পারে। এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাজের মান ও তদারকির বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সুনির্দিষ্টভাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সহ অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন সাধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে পিপিপির ওপর জোর দিতে হবে। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সুদের হার সংক্রান্ত নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংককেই পালন করতে হবে অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বেসরকারি খাতের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধনের যোগান নিশ্চিত করার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতির হারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিনিময় হার বজায় রাখা এবং ঋণ ও আমানতের সুদের হারে ব্যবধান আরও কমিয়ে আনার ব্যাপারে ভূমিকা নিতে হবে। প্রয়োজনে একটি কার্যকর নীতিমালা হাতে নিয়ে ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ এবং আমানতের বিপরীতে সর্বনিম্ন সুদের হার বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। বিনিয়োগের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর জোর দিয়ে অবকাঠামোসহ আধুনিক খাতগুলোতে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার বিষয়ে জোর দিতে হবে।

কৃষি খাতকে শক্তিশালীকরণ

২০০৮–০৯ অর্থবছরের অভিজ্ঞতার আলোকে ২০০৯–১০ অর্থবছরেও দেশে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। এক্ষেত্রে উৎপাদক বনাম ভোক্তা স্বার্থে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, সেটার মধ্যে ভারসাম্য আনা একটি চ্যালেঞ্জ বটে। গতিশীল ভর্তুকি ও প্রণোদনা নীতি এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রচলন বাড়ানোর মাধ্যমে কৃষি খাতে উচ্চ ফলনশীল খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। সরকারের ক্রয় নীতিমালায় যেমন প্রকৃত কৃষকের উপকৃত হওয়ার সুযোগ থাকা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে যতটা সম্ভব মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের লাভবান হওয়ার সুযোগ নস্যাৎ করা। কার্যকর সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের কাছে সময়মতো সার ও উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা বা গুদামজাতকরণের সুবিধা তৈরি করার পাশাপাশি সময়মতো বাজারের ওপর হস্তক্ষেপ করে পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করাও সরকারের একটি জরুরি দায়িত্ব। কয়েকটি কৌশলগত পণ্যের ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশকেও (টিসিবি) কাজে লাগাতে হবে। তবে এই সংস্থার ভূমিকা ও কার্যক্রমের পদ্ধতি হতে হবে পরিকল্পিত। বাজার যাতে দক্ষভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরিচালিত হয়, সেটি নিশ্চিত করাও সরকারের জন্য এক ধরনের সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ বৈকি।

বহির্খাতের সুরক্ষা

২০০৮–০৯ অর্থবছরে রপ্তানি খাতে সার্বিকভাবে প্রবৃদ্ধি হলেও এতে অবনতির লক্ষণ ছিল। বিশ্ব অর্থনীতিতে বিদ্যমান মন্দা প্রলম্বিত হওয়ার প্রভাবে বাংলাদেশ অর্থনীতির তথা বহির্খাতে এমনটি ঘটে থাকতে পারে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ২০০৮–০৯ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে কমলেও আশা করা হচ্ছে যে ২০০৯–১০ অর্থবছরে তা আবার ঘুরে দাঁড়াবে। তবে ২০০৮–০৯ অর্থবছরের শেষ দুটি প্রান্তিকে রপ্তানি খাতে যেভাবে উচ্চ হারে আয় হয়েছে, তা ধরে রাখাটাও হবে এক কঠিন কাজ। পণ্য ও সেবা রপ্তানির বাজারে যাতে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে, সেজন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে জোর দিতে হবে। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে প্রণোদনা কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের কারণে যেসব শ্রমিককে বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আসতে হয়েছে, তাদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ঋণ ও প্রয়োজনীয় সেবা–সহায়তা পাওয়ার সু যোগ করে দিতে হবে। এছাড়া প্রয়োজনে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

কর্মসূচির আওতায় নেওয়া উচিত। বাংলাদেশকে নতুন রপ্তানি বাজারের অনুসন্ধান ও পণ্য বহুমুখীকরণের ওপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা থেকে উত্তরণের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পণ্য ও সেবা রপ্তানি বাড়ানো যায়। এ ছাড়া রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অমিত সম্ভাবনা এবং বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি পোশাক আমদানির সুযোগ গ্রহণ করতে জাপানি ব্যবসায়ীরা যে আগ্রহ দেখিয়েছে, সেটি কাজে লাগাতে হবে। মনোযোগ দিতে হবে প্রতিবেশী দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানির সম্ভাবনা কাজে লাগানোর বিষয়ে।

সরকারি অর্থায়ন জোরদারকরণ

রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হওয়া এবং রাজস্ব আহরণে কাঠামোগত দুর্বলতা থাকার কারণে বাংলাদেশের আমদানিনির্ভর অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করতে হয়েছে। সেজন্য আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আহরণ কম হওয়ায় তা বিশেষ করে আয়কর আদায়ের পরিমাণ বাড়ানোর মাধ্যমে পূরণ করে নিতে হবে। সরকারকে শুধু করভিত্তি ও করের আওতা বাড়ানোই নয়, পাশাপাশি অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাও জোরদার করতে হবে। বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহ কমতে থাকার পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ আহরণের পরিমাণ বাড়ানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা দরকার। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে যেহেতু ঘাটতির হার বাড়বে, সেহেতু প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করেই ঘাটতি অর্থায়ন করতে হবে। বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন এমনভাবে হতে হবে, যেন মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি না হয়। সেজন্য সম্ভব হলে ঘাটতি অর্থায়নে বাজেটীয় পদক্ষেপের সাহায্য নেওয়াই শ্রেয়।

জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলা

বাংলাদেশ যদিও বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে খুবই নগণ্য ভূমিকা রেখে থাকে (বিশ্বের মোট গ্যাস নির্গমনের এক শতাংশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ), তথাপি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও বৃষ্টিপাত, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া এবং ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থা খুবই নাজুক। ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (আইপিসিসি) চতুর্থ মূল্যায়নে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ক্রমবর্ধমানভাবে দৃশ্যমান।[২৪] বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, পানি সম্পদ, উপকূলীয় সম্পদ, জীবিকার নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো প্রভৃতি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ অবশ্য এরই মধ্যে "বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা" (২০০৮ ও ২০০৯) এবং জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (২০০৯-২০১৮ সালের জন্য) সহ বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলোয় কিছু জরুরি কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এর মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ, গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থাপনা, সক্ষমতা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও খনন কর্মসূচি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের প্রয়োজনে ন্যায়সঙ্গতভাবে তহবিল বরাদ্দ করার জন্য বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপর চাপ তৈরি করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে ডিসেম্বরে (২০০৯ সাল) কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশকে তার স্বার্থ রক্ষায় কয়েকটি বিষয়ে সোচ্চার কণ্ঠে কথা বলতে হবে। বিষয়গুলো হচ্ছে:

[২৪]সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বাংলাদেশের খুলনা শহরকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত একটি এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

(ক) জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় সব পক্ষের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক প্রতিশ্রুতি আদায়; (খ) অভিযোজন ও প্রশমনকাজে গবেষণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন; (গ) অভিযোজনের জন্য বিশেষ করে মেধাস্বত্ব অধিকারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি স্থানান্তর; এবং (ঘ) যেকোন পরিকল্পিত পদক্ষেপে বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।

প্রশাসনের উন্নয়নে পুনর্পদক্ষেপ

প্রশাসনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতির সঞ্চার করতে হলে সরকারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি নেওয়া সংস্কার কর্মসূচিগুলো অব্যাহত রাখতে হবে এবং সেগুলো আরও জোরদার করতে হবে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকেও জোরদার করতে হবে এবং বাজেটীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এলাকার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকির দায়িত্বভার ন্যস্ত করতে হবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ওপর। সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব কর্মসূচিতে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করতে হলে তাদের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে দেশে একটি পিপিপি আইনও প্রণয়ন করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত নিয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে কার্যকর অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা যায়।

সংস্কার অব্যাহত রাখা

কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের উন্নয়ন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সংস্কারের বিষয়টি। এ লক্ষ্যে গঠন করা হয় রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন (আরআরসি) এবং বাংলাদেশ বেটার বিজনেস ফোরাম (বিবিবিএফ)। দেশে নিয়ন্ত্রণ পরিবেশের উন্নয়ন, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, প্রধান বিনিয়োগ বাধাগুলো নিরসন এবং সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এ ধরনের সংস্থা গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ বেটার বিজনেস ফোরামের দেওয়া ২৯০টি সুপারিশ থেকে ৯৪টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাকি ১৫৩টিও অনুমোদিত হয়ে এখন বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। অন্যদিকে রেগুলেটরি রিফর্ম কমিশনের করা মোট ১৩৫টি সুপারিশের মধ্যে ৪৬টি বাস্তবায়িত হয়েছে। আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে আরও নয়টি সুপারিশ। এ দুই সংস্থার প্রধান কিছু সুপারিশের মধ্যে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার উন্নয়ন, অনুমোদনের সময় কমানো এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা চালুর কথা রয়েছে, যেগুলো দেশে সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটেও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। এই বাজেটেও প্রশাসনের উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণসহ বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রমের প্রস্তাব করা হয়। অন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এবং "মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০৯।" তবে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে সংস্কার পদক্ষেপসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করাকে একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে এবং সে লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

১.১০ উপসংহার

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে জনগণের মধ্যে প্রবল আশাবাদের সৃষ্টি হওয়া এবং দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকার পরিস্থিতিতে ২০০৯-১০ অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় বাজেটীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনি এসব পদক্ষেপের যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর জোর দেওয়াটাও অপরিহার্য। তবে এক্ষেত্রে পদক্ষেপ বা নীতিমালায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখার

পাশাপাশি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত সরকারের সব অংশ এবং সংশ্লিষ্ট সব উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয় ও প্রতিশ্রুতি থাকাটাও জরুরি। চলমান সংকটের পরিস্থিতিতে ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রণোদনা কার্যক্রম ও চক্রবিরোধী (কাউন্টার-সাইক্লিক্যাল) নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে শুধু কার্যকর সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাই নয়, বরং এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য নীতিমালাও গ্রহণ করতে হবে, যেন বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় যেসব চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ দেখা দেবে, তা থেকেও বাংলাদেশ লাভবান হতে পারে।

ডিসেম্বর ২০০৮

গ্রন্থপঞ্জী

CPD. 2007. *State of the Bangladesh Economy in FY2005-06 and Outlook for FY2006-07*. Dhaka: Centre for Policy Dialogue (CPD).

Khan, F.K. 2009. "Energy Sector: Challenges of Adding New Capacity," in *Development with Equity and Justice: Immediate Tasks for the Newly Elected Government*. Dhaka: Centre for Policy Dialogue (CPD).

Moazzem, K.G. and Chowdhury, S. 2009. "Restructuring of the Jute Manufacturing Sector in Bangladesh at Cross-Roads: Challenges and the Way-out," in *Development with Equity and Justice: Immediate Tasks for the Newly Elected Government*. Dhaka: Centre for Policy Dialogue (CPD).

Razzaque, A. 2004. The Small Country Assumption, Econometric Estimates and Policy Making: A Reassessment with Bangladesh's RMG Exports to the European Union. *The Bangladesh Development Studies*, XXX (1 & 2).

অধ্যায় ২

২০০৯১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট বিশেষণ

২.১ সূচনা

২০০৯ সালের ১১ জুন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের অর্থমন্ত্রী ২০০৯১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট এবং ২০০৮০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট উপস্থাপন করেন। বর্তমান সরকার পরিবর্তনের কর্মসূচি দিয়ে অর্থনীতি এবং দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম বছরের মাঝামাঝি সময়ে এসে প্রণীত এই জাতীয় বাজেটে নতুন সরকারের অগ্রাধিকারগুলো প্রতিফলিত হয়েছে। বাজেট কাঠামো এবং এর প্রস্তাবনাগুলো বিশেষণের ধারাবাহিকতায় সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবারও ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেটের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুশীল সমাজের অবস্থান তুলে ধরতে একটি সংলাপের আয়োজন করে।

বাজেট ঘোষণার পরের দিন, ১২ জুন সিপিডি এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করেছিল। ২০০৯ সালের ২০ জুন অর্থমন্ত্রী এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশিষ্ট গোষ্ঠীর অংশগ্রহণে ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেটের ওপর সিপিডির মতামত তুলে ধরা হয়। নীতিনির্ধারক, রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, ব্যবসায়ী নেতা, শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বাজেট আলোচনায় অংশ নেন।

নবনির্বাচিত সরকারের প্রথম বাজেট দেওয়া হয়েছে বৈশ্বিক আর্থিক বাজারের নজিরবিহীন এক অস্থিরতার সময়ে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮০৯ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করেছিল এবং অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে এসে বর্তমান সরকার অর্থনীতি পরিচালনা শুরু করে। সুতরাং ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেট ছিল নবনির্বাচিত সরকারের জন্য তার নির্বাচনী ইশতেহার এবং রূপকল্প দলিলে উপস্থাপিত বিভিন্ন নীতি ঘোষণা এবং আনুষাঙ্গিক লক্ষ্যমাত্রাগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে তা স্পষ্ট করার প্রথম সুযোগ। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট তখন 'ঘরের দরজায় হস্তী দর্শনের' মতো অবস্থা, অর্থাৎ তা অবজ্ঞা করার কোন সুযোগই নেই, ফলে বাজেটের প্রক্ষেপণ ও প্রস্তাবনা তৈরির সময় এ বিষয়টিকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হয়েছিল।

অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) সহ অন্যান্য অর্থনীতির তুলনায় বাংলাদেশ বৈশ্বিক সংকটে কম ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বাজেটে এই সংকটের একটি ছাপ রয়েছে, যা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ এবং সম্পদ আহরণের লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে এই বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ঠিক করা হয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচনী ইশ্তেহার এবং ভবিষ্যত রূপকল্পে উলেখ করা প্রতিশ্রুতি পূরণের বাধ্যবাধকতাও বাজেট দলিলে প্রাধান্য পেয়েছে।

বর্তমান অর্থবছরের বাজেট বিশেষণে সিপিডি রাজস্ব প্রত্যাশার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, বিভিন্ন বাজেট প্রস্তাবনা নিরীক্ষা করেছে এবং বাজেট বাস্তবায়নে সক্ষমতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত উদ্যোগগুলো চিহ্নিত করেছে। এক্ষেত্রে সম্পদ সংগ্রহ এবং বাস্তবায়ন উভয় দিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপনের সময় অর্থমন্ত্রী ২০০৮০৯ থেকে ২০১০১১ অর্থবছর সময়কাল পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র (পিআরএসপি) সহ শেষ দু'বছরের জন্য সংশোধিত পিআরএসপি অব্যাহত রাখতে সরকারের ইচ্ছার কথা জানান। এটি সরকারের সার্বিক পরিকল্পনায় একটি বড় ধরনের পরিবর্তন। কেননা সাম্প্রতিক অতীতে সরকার একটি দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০২০১৫) এবং পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার (২০১০২০২১) মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যার মধ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর বাইরে আঞ্চলিক ও জেলাভিত্তিক পরিকল্পনার কথাও বাজেটে বলা হয়েছে। বিগত বাজেটগুলোর তুলনায় ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেটের আরেকটি বড় পরিবর্তন হচ্ছে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে (পিপিপি) উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত। দুর্নীতি দমনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে সংস্কার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা সহ আরও কিছু প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বাজেট ঘোষণায় ছিল, যা রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আগের বাজেটগুলো যে প্রাধান্য দিয়ে আসছিল তা থেকে ভিন্ন।

২.২ সরকারি অর্থায়ন

২.২.১ রাজস্ব আয়

২০০৮০৯ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

২০০৭০৮ অর্থবছরে ২২ শতাংশ উচ্চ রাজস্ব প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ২০০৮০৯ অর্থবছরে ১৭.৩ শতাংশ রাজস্ব প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এই অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের ওপর বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের নেতিবাচক প্রভাব সত্ত্বেও সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী মোট রাজস্ব আয়ে ১৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়, যা সন্তোষজনক। তবে রাজস্ব আদায়ের মূল লক্ষ্যমাত্রা ৬৯,৩৮২ কোটি টাকার তুলনায় ২০২ কোটি টাকা আদায় কম হয়েছে।[১] এই সময়কালে কর রাজস্ব বাড়ে ১৫.৪ শতাংশ, যেখানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর এবং এনবিআরবহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ১৫.৭ শতাংশ এবং ৯.২ শতাংশ। অন্যদিকে করবহির্ভূত রাজস্ব আদায়ে রেকর্ড পরিমাণ ২৪.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। ২০০৮০৯ অর্থবছরের আয়কর আদায় পরিস্থিতিও উৎসাহব্যঞ্জক, এ সময় ১৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। এটি প্রশংসার দাবি রাখে।

২০০৯১০ অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা

সামগ্রিক রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা

সরকার ২০০৯১০ অর্থবছরে ৭৯,৪৬১ কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যা আগের অর্থবছরের (সংশোধিত বাজেট) চেয়ে ১০,২৮১ কোটি টাকা (১৪.৯ শতাংশ) বেশি। ২০০৯১০

[১] ২০০৮০৯ অর্থবছরে রাজস্ব আয় কমে দাঁড়ায় ৬৩,৮৪৭ কোটি টাকা (মূল লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৫,৫৩৫ কোটি টাকা কম)। ২০০৭০৮ অর্থবছর থেকে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি ঘটে ৮ শতাংশ।

অর্থবছরে রাজস্বজিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) অনুপাত অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ১১.৬ শতাংশ। এটি অর্জিত হলে তা ২০০৮০৯ অর্থ´বছরের অনুপাতের (১১.৩ শতাংশ) চেয়ে খানিকটা বেশি হবে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজস্বজিডিপি অনুপাত পাকি স্তান ও শ্রীলংকার চেয়ে তখনও কম থাকবে (যদিও ভারতের তুলনায় তা কিছুটা ভালো হবে)[২] (চিত্র ২.১)।

চিত্র ২.১: দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের করজিডিপি এবং রাজ স্বজিডিপি অনুপাত: অর্থ´বছর ২০০৮০৯

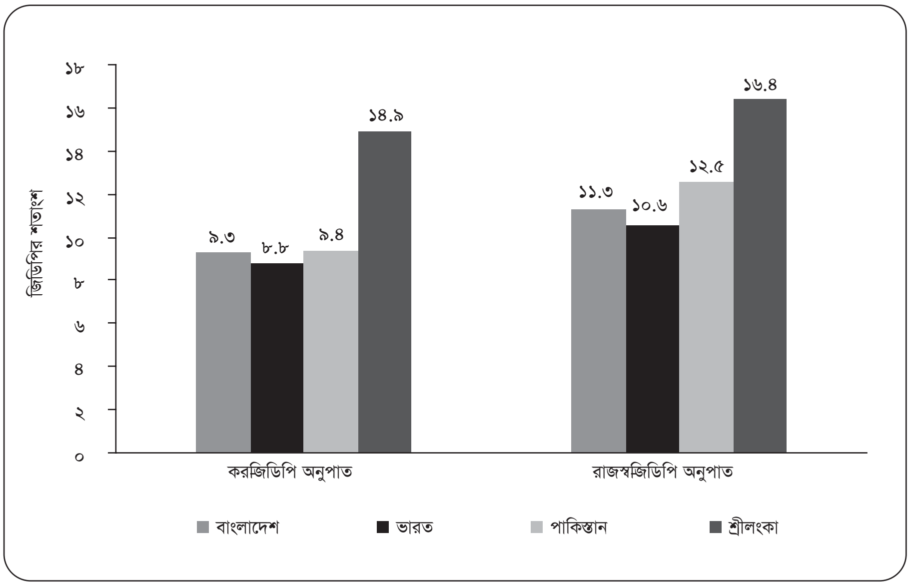

উৎস: বাজেট দলিল এবং সংশিষ্ট দেশগুলোর অর্থনৈতিক পর্যালোচনা প্রতিবেদনসমূহ।
দ্রষ্টব্য: সবগুলো দেশের সংশোধিত বাজেট হিসাব; শুধু ভারতের জন্য ২০০৮০৯ অর্থ´বছরের প্রকৃত হিসাব।

উৎসগুলোর বর্ধিত অবদান

রাজস্ব আয়ের নতুন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০০৯১০ অর্থ´বছরে ১০,২৮১ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ আসবে এনবিআর কর থেকে (৭৭.৮ শতাংশ) এবং করবহির্ভূত প্রাপ্তি হিসেবে আসবে ১৮ শতাংশ (চিত্র ২.২)। এনবিআরবহির্ভূত কর উৎস থেকে আসবে বাকি ৪.২ শতাংশ। রাজস্ব প্রবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড় অংশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের। এই উৎস থেকে প্রাক্কলিত রাজস্ব পেতে হলে স্থানীয় পর্যায়ে আদায় কার্যক্রম জোরদার করার দরকার হবে, কেননা আমদানিতে ধীরগতির কারণে বাণিজ্য সংক্রান্ত শুল্ক আদায় হ্রাস পাওয়া অব্যাহত থাকতে পারে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করের লক্ষ্যমাত্রা

২০০৯১০ অর্থ´বছরের মোট রাজস্ব আদায়ের পরিকল্পনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উপাদানের অংশ ৭৬.৮ শতাংশ, যা ২০০৮০৯ অর্থ´বছরে (সংশোধিত) ছিল ৭৬.৬ শতাংশ। ২০০৯১০ অর্থ´বছরে রাজস্ব

---

[২] ভারতের অনুপাত তুলনামূলকভাবে কম মনে হয় কারণ এটি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কর। যদি প্রাদেশিক কর এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় তাহলে অনুপাত উলেখযোগ্য হারে বাড়বে।

চিত্র ২.২: রাজস্ব প্রবৃদ্ধিতে উৎসসমূহের বর্ধিত অবদান: অর্থবছর ২০০৯১০

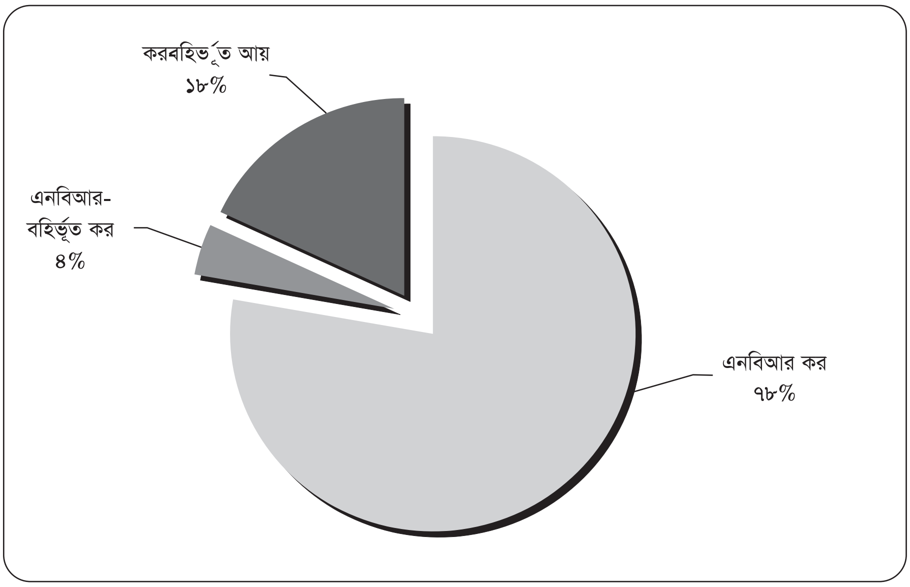

উৎস: ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেট দলিল।

বোর্ডের রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ২০০৮০৯ অর্থবছরের সংশোধিত পরিমাণের তুলনায় ১৫.১ শতাংশ বেশি (সারণি ২.১)। ২০০৮০৯ অর্থবছরে (সংশোধিত) প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫.৮ শতাংশ। আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি কম ধরা হলেও তা নিম্ন আমদানি মূল্যের প্রেক্ষিতে যৌক্তিক। এক্ষেত্রে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে যে, ২০০৮০৯ অর্থবছরের রাজস্ব আদায় বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চ পণ্যমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম কয়েক মাসে রাজস্ব আদায়ে উচ্চ প্রবণতা ছিল।

সারণি ২.১: গত দুই দশকে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি

(শতাংশ)

উপাদান	অর্থবছর ৯২-অর্থবছর ৯৬	অর্থবছর ৯৭-অর্থবছর ০১	অর্থবছর ০২-অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ২০০৭	অর্থবছর ২০০৮	অর্থবছর ২০০৯*	অর্থবছর ২০১০**
মোট রাজস্ব	১৪.১	৮.৫	১৩.৮	৮.৬	২২.০	১৭.০	১৪.৯
এনবিআর কর	১৩.২	১০.৮	১২.৭	৯.৫	২৬.৬	১৫.৮	১৫.১
এনবিআরবহিভূর্ত কর	১৩.৫	৫.০	৯.০	২১.৬	২৪.৮	৯.২	১৭.০
করবহিভূর্ত রাজস্ব	১৮.৮	৫.৩	২০.৯	২.৭	৫.৪	২৪.১	১৩.৬

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপাত্তের ওপর নির্ভর করে হিসাব এবং ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেট দলিল।
দ্রষ্টব্য: *২০০৮০৯ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা।
**২০০৯১০ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রা।

২০০৯১০ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উপাদানের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা প্রধানত উচ্চ আয়কর আদায়ের ওপর নির্ভরশীল, যেখানে ২০০৮০৯ অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২২.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে (চিত্র ২.৩)। মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৩.৩ শতাংশ।

সাম্প্রতিক সময়ে আমদানি শুল্ক আদায়ে নিম্নমুখী প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও এ খাতে ২০০৯১০ অর্থ বছরে ১০.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এটি সম্ভবত বাজেটে প্রস্তাবিত নতুন শুল্ক কাঠামোর কারণে করা হয়েছে। নতুন শুল্ক কাঠামোতে বিলাস পণ্যের ওপর শুল্কের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন পণ্যের ওপর নতুন করে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে (এ অধ্যায়ের ২.৩ অংশে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে)। ২০০৯১০ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে হবে তার মধ্যে আয়কর থেকে আসবে ৩৭.৮ শতাংশ এছাড়া আরও ৩৩.৫ শতাংশ রাজস্ব আদায়ের প্রত্যাশা করা হয়েছে বেশি হারে ভ্যাট আদায়ের মাধ্যমে (চিত্র ২.৩)। ফলে রাজস্ব আদায়ে সাফল্য আয়কর ও ভ্যাটের আওতা সম্প্রসারণের ওপর নির্ভর করবে।

চিত্র ২.৩: অতিরিক্ত এনবিআর রাজস্বে বিভিন্ন উৎসের অবদান: অর্থবছর ২০০৯১০

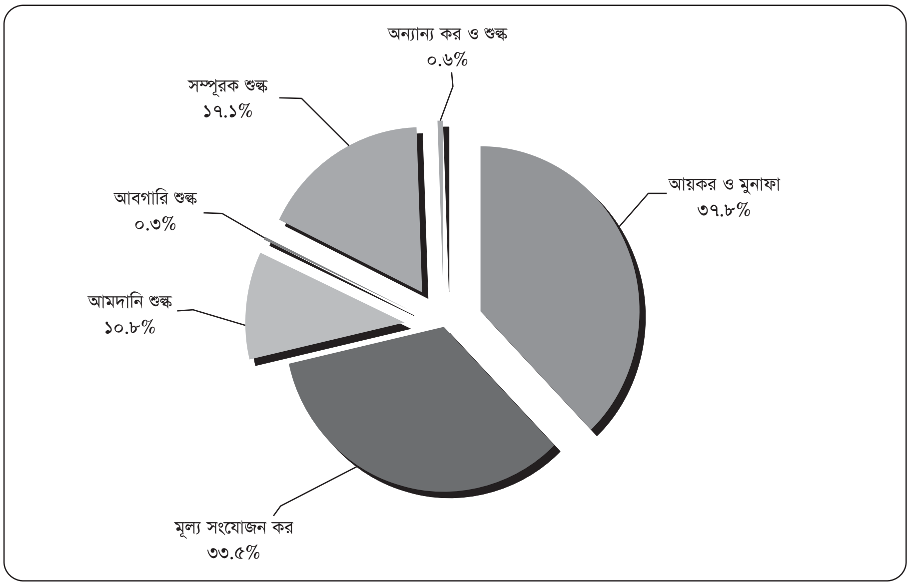

উৎস: ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেট দলিল।

এনবিআর-বহির্ভূত করের লক্ষ্যমাত্রা

২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত রাজস্ব বাজেটের তুলনায় ২০০৯১০ অর্থ বছরে এনবিআরবহির্ভূত কর আদায়ে ১৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত অর্থবছরে এক্ষেত্রে মাত্র ৯.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিবেচনায় এটি বেশ আশাবাদী লক্ষ্যমাত্রা। অন্যদিকে আগের অর্থবছরে উলেখযোগ্য হারে উচ্চ প্রবৃদ্ধির (২৪.১ শতাংশ) প্রেক্ষিতে ২০০৯১০ অর্থ বছরে করবহির্ভূত রাজস্ব আদায়ে ১৩.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাকে রক্ষণশীল বলে প্রতীয়মান হয়।

এক্ষেত্রে ২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা একটু বেশি মনে হচ্ছে এবং বছর শেষে তা নাও অর্জিত হতে পারে। যদি তাই ঘটে তাহলেও ২০০৯১০ অর্থ বছরের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ২০০৮০৯ অর্থবছরের চূড়ান্ত আদায়ের তুলনায় প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশি হবে। কেননা, ২০০৮০৯ অর্থ বছরের

সংশোধিত বাজেটে আমদানি শুল্ক আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৯.১ শতাংশ, শেষ পর্যন্ত এই প্রবৃদ্ধি অর্জিত নাও হতে পারে।[৩]

২.২.২ সরকারি ব্যয়

ব্যয়ের তুলনায় আয় দ্রুত হারে বাড়াতে একটি সুদৃঢ় আর্থিক কাঠামোর দরকার হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ গত কয়েক বছর ধরে সঠিক পথে রয়েছে। ২০০০০১ অর্থ´বছর থেকে ২০০৬০৭ অর্থ´বছর সময়কালে রাজস্ব আয়ে ১৩.৫ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধির বিপরীতে সরকারি ব্যয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.৯ শতাংশ। তবে দুঃখজনক হচ্ছে এর পেছনে মূল কারণ হলো উন্নয়ন প্রকল্পগুলো ধারবাহিকভাবে অবাস্তবায়িত থেকে যাওয়া। বিপরীত চিত্র হলো, ২০০৭০৮ অর্থ´বছরে ১৪ শতাংশ আয় প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ব্যয় বেড়েছিল রেকর্ড ৪০.১ শতাংশ। উচ্চ পণ্যমূল্যের কারণে উচ্চ আমদানি ব্যয় ও ভর্তুকি পরিশোধের কারণে সে সময় ব্যয় বেশি বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ২০০৮০৯ অর্থ´বছরের সংশোধিত বাজেট অনুসারে ব্যয় বৃদ্ধি পায় প্রায় ৫ শতাংশ এবং আয় বৃদ্ধি পায় ১৭ শতাংশ। তবে ২০০৮০৯ অর্থ´বছরের আয়ব্ যয়ের হিসাব চূড়ান্ত হলে, বিশেষত উন্নয়ন ব্যয়[৪] এবং আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আয়ের প্রেক্ষিতে সংশোধিত বাজেটের সঙ্গে তার উলেখযোগ্য পার্থক্য থাকবে। এর বিপরীতে ২০০৯১০ অর্থ´বছরে রাজস্ব ব্যয়ে ২০.৯ শতাংশ এবং আয়ে মাত্র ১৪.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে যা আগের অর্থবছরের উল্টো পরিস্থিতি। এর ফলে আগত অর্থবছরে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা কিছুটা চাপের মুখে পড়তে পারে।

২০০৯১০ অর্থ´বছরের বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের (১০.৪ শতাংশ) তুলনায় উন্নয়ন ব্যয়ে উলেখযোগ্য উচ্চ প্রবৃদ্ধি[৫] (৩২.৬ শতাংশ) প্রাক্কলন করা হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, ২০০৯১০ অর্থ´বছরে প্রকৃত উন্নয়ন ব্যয় প্রত্যাশা অনুযায়ী হয় কিনা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নিম্ন বাস্তবায়নের সাম্প্রতিক ধারার পরিবর্তন ঘটে কিনা।

খাতভিত্তিক বরাদ্দ পরিস্থিতি

মোট ব্যয়ের বিবেচনায় (উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন) জন প্রশাসন (৮৫.৯ শতাংশ), জ্বালানি ও বিদ্যুৎ (৪৮.২ শতাংশ) এবং পরিবহন ও যোগাযোগ (৪১.৫ শতাংশ) খাতে বরাদ্দ উলেখযোগ্য হারে বেড়েছে। জন প্রশাসন খাত সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ (মোট বরাদ্দের ১৬.৮ শতাংশ) পেয়েছে; দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সুদ পরিশোধ (১৪.৩ শতাংশ) (সারণি ২.২)।

অন্যদিকে ২০০৮০৯ অর্থ´বছরের সংশোধিত বাজেট বিবেচনায় নিলে কৃষি খাতে বরাদ্দ সবচেয়ে বেশি কমানো হয়েছে (১,৪৬৫ কোটি টাকা অথবা ১৪.১ শতাংশ)। এরপরই বরাদ্দ কমানো হয়েছে বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম খাতে ১২.১ শতাংশ; গৃহায়ণ খাতে ৮.৩ শতাংশ এবং শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা খাতে ৬.১ শতাংশ বরাদ্দ কমানো হয়েছে। বিশ্ব বাজারে বিরাজমান নিম্ন পণ্যমূল্য বাজেট বরাদ্দ হ্রাসের কতটুকু ক্ষতিপূরণ করতে সক্ষম হবে তা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা দরকার।

[৩] ২০০৮০৯ অর্থ´বছরে আমদানি শুল্কে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় (-) ২.৮ শতাংশ।

[৪] ২০০৮০৯ অর্থ´বছরে প্রকৃত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) ব্যয় দাঁড়ায় ১৯,৬৬৮ কোটি টাকা।

[৫] ২০০৮০৯ অর্থ´বছরে প্রকৃত এডিপি ১৯,৬৬৮ কোটি টাকার তুলনায় ২০০৯১০ অর্থ´বছরে এডিপির লক্ষ্যমাত্রা ৫৫.১ শতাংশ বেশি।

সারণি ২.২: সরকারি ব্যয়ের খাতভিত্তিক বরাদ্দ

খাত	সংশোধিত বাজেটের অংশ অর্থবছর ২০০৮০৯ (%)	বাজেটের অংশ অর্থবছর ২০০৯১০ (%)	২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে পরিবর্তন	
			কোটি টাকা	%
জন প্রশাসন	১০.৮	১৬.৮	৮৫৪৪	৮৫.৯
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	৩.২	৩.৯	১৪০১	৪৮.২
পরিবহন ও যোগাযোগ	৫.৭	৬.৭	২১৭৮	৪১.৫
সুদ	১৪.৫	১৪.৩	২৪৯৪	১৮.৭
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	৮.২	৮.১	১৩১৭	১৭.৪
স্থানীয় সরকার ও পলী- উন্নয়ন	৮.১	৭.৯	১২৮৪	১৭.৩
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১৩.৬	১৩.০	১৮৫২	১৪.৮
স্বাস্থ্য	৬.৭	৬.৩	৭৮৪	১২.৭
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	৬.৬	৫.৭	২০৮	৩.৪
প্রতিরক্ষা	৭.৫	৬.৪	১৬৬	২.৪
শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	১.০	০.৮	৫৬	৬.১
গৃহায়ণ	১.৫	১.১	১১৩	৮.৩
বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিষয়	১.১	০.৮	১২৯	১২.৯
কৃষি	১১.৩	৮.১	১৪৬৫	১৪.১

উৎস: ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেট দলিল।

রাজস্ব ব্যয়

সংশোধিত বাজেট অনুসারে ২০০৮০৯ অর্থ বছরের রাজস্ব ব্যয়[৬] দাঁড়িয়েছে ৬৬,২৬৯ কোটি টাকা। এটি ২০০৭০৮ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় উলেখযোগ্য হারে বেশি (২৮.৮ শতাংশ)। যদিও ২০০৭০৮ অর্থ বছরের স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে উচ্চ পণ্যমূল্যের কারণে ব্যয় উলেখযোগ্য হারে বেড়েছিল। তবে প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে ৩,৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার কারণে ২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এটি মনে রাখতে হবে যে, রাজস্ব ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ভর্তুকি অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি এগুলো রাজস্ব ব্যয়ের অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো তাহলে ২০০৮০৯ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি আরও কম হতো। সুতরাং ২০০৮০৯ অর্থ বছরের চূড়ান্ত রাজস্ব ব্যয় কমতে পারে, কেননা শেষ কয়েক মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কমে যাওয়ার কারণে ভর্তুকির প্রয়োজনও কমে গিয়েছিল।

২০০৯১০ অর্থ বছরে রাজস্ব ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৭২,৯৭৯ কোটি টাকা যা ২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চাইতে ১০.১ শতাংশ বেশি (সারণি ২.৩)। রাজস্ব ব্যয়ের গঠন কাঠামো অনুযায়ী তিনটি প্রধান খাতে ব্যয় (বেতনভাতা, সুদ পরি শোধ এবং ভর্তুকি ও স্থানান্তর) মোট ব্যয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ। এ তিনটি খাত মিলে ব্যয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা মাত্র ৬ শতাংশ যা ২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে ছিল ২৭.৪ শতাংশ। বর্তমান অর্থবছরে নিম্ন মাত্রার ব্যয় প্রাক্কলনের পেছনে রয়েছে ভর্তুকি ও স্থানান্তর খাতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির (০.৫ শতাংশ) প্র‍ত্যাশা, যেখানে ২০০৮০৯ অর্থ বছরে

[৬]এখানে মোট বর্ধিত অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে। যদি উঠে আসা অংশগুলো বাদ দেওয়া হয় তাহলে ২০০৮০৯ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব ব্যয় দাঁড়ায় ৬৫,০৫১ কোটি টাকা। ২০০৯১০ অর্থ বছরের জন্য এটি হবে ৭১,৭৭৪ কোটি টাকা।

(সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা) ৪৫.৮ শতাংশ ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়। বেতন ও ভাতার জন্য প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫.৮ শতাংশ, যা ২০০৮০৯ অর্থবছরে ছিল ২১.৬ শতাংশ। অন্যদিকে ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেটে নতুন বেতন কাঠামোর সম্ভাব্য সংশেষ থাকায় থোক বরাদ্দ নয় গুণ বাড়িয়ে ৪,২৮৮ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে।

সারণি ২.৩: ২০০৯১০ অর্থবছরে রাজস্ব ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা

(শতাংশ)

খাত	২০০৯ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি (সংশোধিত বাজেট)	২০১০ অর্থবছরের জন্য প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা	২০০৯ অর্থবছরের অংশ (সংশোধিত বাজেট)	২০১০ অর্থবছরের অংশ (বাজেট)
বেতন ও ভাতা	২১.৬	৫.৮	২২.৮	২১.৯
পণ্য ও সেবা	৩৪.২	৩.২	১৩.৮	১২.২
সুদ পরিশোধ	৬.৮	১৮.৭	২০.১	২১.৭
অভ্যন্তরীণ	৮.৫	২০.৬	১৮.১	১৯.৮
বৈদেশিক	৬.৩	২.০	২.০	৩.৫
ভর্তুকি ও চলতি স্থানান্তর	৪৫.৮	০.৫	৩৯.১	৩৫.৩
থোক বরাদ্দ	২১.৮	৯১৮.৫	০.৬	৫.৯
সম্পদ সংগ্রহ ও পুর্ত কার্য	৬৬.৬	৪.৪	৩.৬	৩.১
বর্ধিত মোট অনুন্নয়ন ব্যয়	২৮.৮	১০.১	১০০.০	১০০.০

উৎস: ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেট দলিল।

মোট রাজস্ব ব্যয় প্রবৃদ্ধিতে পূর্বে উলেখিত তিনটি প্রধান খাতের অংশ প্রায় ৪৮.৩ শতাংশ। মোট রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধিতে থোক বরাদ্দের অবদান সবচেয়ে বেশি (৫৭.৬ শতাংশ)। অন্যদিকে পণ্য এবং সেবা খাতের অবদান ঋণাত্মক (-) ৪.৪ শতাংশ (সারণি ২.৪)।

সারণি ২.৪: রাজস্ব ব্যয় প্রবৃদ্ধিতে উৎসসমূহের অবদান: অর্থবছর ২০০৮০৯ ও অর্থবছর ২০০৯১০

(শতাংশ)

খাত	২০০৮০৯ অর্থবছরে বর্ধিত অবদান (সংশোধিত বাজেট)	২০০৯১০ অর্থবছরে বর্ধিত অবদান (বাজেট)
বেতন ও ভাতা	১৮.১	১৩.২
পণ্য ও সেবা	১৫.৮	৪.৪
সুদ পরিশোধ	৫.৭	৩৭.২
ভর্তুকি ও চলতি স্থানান্তর	৫৪.৮	২.০
থোক বরাদ্দ	০.৮	৫৭.৬
সম্পদ সংগ্রহ ও পুর্ত কার্য	৬.৪	১.৬

উৎস: ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেট দলিল।

তবে উদ্বেগের বিষয় হলো, ২০০৯১০ অর্থবছরে সুদ পরিশোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১৮.৭ শতাংশ রয়েছে যা ২০০৮০৯ অর্থবছরে ছিল ৬.৮ শতাংশ। স্থানীয় সুদ পরিশোধ ২০.৬ শতাংশ বাড়বে বলে ধরা হয়েছে, যেখানে বৈদেশিক সুদ পরিশোধ বাড়বে ২ শতাংশ। সাম্প্রতিককালে অনুদান ও বাজেট সহায়তা হিসেবে বৈদেশিক সাহায্য প্রত্যাশার চেয়ে কম থাকায় স্থানীয় উৎস থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ বেড়ে গিয়েছে এবং এ কারণে স্থানীয় সুদ পরিশোধে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

২০০৮-০৯ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন

২০০৮০৯ অর্থ বছরে এডিপির আকার প্রাথমিকভাবে ২৫,৬০০ কোটি টাকায় নির্ধারণ (জিডিপির ৪.২ শতাংশ) করা হয়। অর্থবছরের প্রথম তিনটি প্রান্তিকে নিম্নমাত্রার বাস্তবায়ন অগ্রগতির কারণে সংশোধিত এডিপি ২৩,০০০ কোটি টাকায় (জিডিপির ৩.৭ শতাংশ) নামিয়ে আনা হয়, যা মূল এডিপির তুলনায় ১০.১৬ শতাংশ কম।[৭]

২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প সাহায্য ১,৮০০ কোটি টাকা এবং স্থানীয় মুদ্রায় অর্থায়ন ৮০০ কোটি টাকা কমানো হয়। খাতওয়ারি বরাদ্দের বিবেচনায় পেট্রোলিয়াম, গ্যাস ও খনিজ (৭৫.২৬ শতাংশ), গণ যোগাযোগ (৩৯.২৮ শতাংশ) এবং সমাজকল ্যাণ খাতে (৩১.২৬ শতাংশ) বরাদ্দ সবচেয়ে বেশি কমিয়ে এডিপি সংশোধন করা হয়।

২০০৮০৯ অর্থ বছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিস্থিতি হতাশাজনক ছিল। এ সময় পর্যন্ত মাত্র ৪৬ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়। এক্ষেত্রে প্রকৃত এডিপি ব্যয় ১৯,৫০০ কোটি টাকার মতো হবে বলে ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত। উলেখ্য যে, ১৯,৫০০ কোটি টাকার এডিপি জিডিপির ৩.২ শতাংশ যা এডিপি বাস্তবায়নের ইতিহাসে সর্বনিম্ন।

২০০৯-১০ অর্থবছরের নতুন এডিপি

২০০৯১০ অর্থ বছরের এডিপির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩০,৫০০ কোটি টাকা (প্রক্ষেপিত জিডিপির ৪.৪ শতাংশ)। এটি ২০০৮০৯ অর্থ বছরের মূল এডিপির চেয়ে ১৯.১ শতাংশ এবং সংশোধিত এডিপির চেয়ে ৩২.৬ শতাংশ বেশি। যদি ২০০৮০৯ অর্থ বছরের জন্য প্রক্ষেপিত ১৯,৫০০ কোটি টাকার এডিপি শেষ পর্যন্ত সত্য হয়, তাহলে ২০০৯১০ অর্থ বছরের এডিপির লক্ষ্যমাত্রা এর তুলনায় ৫৫ শতাংশ বেশি। এডিপির আকারে এতো উলেখযোগ্য বৃদ্ধি ২০০৯১০ অর্থ বছরের নিম্নমাত্রার বিনিয়োগ প্রক্ষেপণের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে মানানসই নয়, যেখানে ৫.৫ শতাংশ হারে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলা হয়েছে। উচ্চ বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য সরকারি বিনিয়োগকে পথ দেখাতে হবে। তাহলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি এর চেয়ে বেশি হবে বলে প্রত্যাশা করা যাবে।

২০০৯১০ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট প্রকল্প সংখ্যা ৮৮৬টি। উলেখ করা প্রয়োজন যে, এর মধ্যে ২০০৯ সালের জুনের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল এমন ১৬৫টি প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ৩,৫১৫.৯ কোটি টাকা (মোট এডিপি বরাদ্দের ১১.৫ শতাংশ)। বর্তমান অর্থবছরের এডিপিতে মাত্র ৩৫টি প্রকল্প নতুন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৩৭৬ কোটি টাকা (মোট এডিপি বরাদ্দের ১.২ শতাংশ)। গত অর্থবছরের প্রকল্পগুলোর জের যদি না টানতে হতো অর্থাৎ এসব প্রকল্প সময়মতো শেষ হলে নতুন এডিপির আকার হতো ২৬,৯৮৫ কোটি টাকা।

২০০৯১০ অর্থ বছরে খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ৪,০৫৪ কোটি টাকা (২০০৮০৯ অর্থবছরের মূল এডিপির তুলনায়)। অনুনমোদিত প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দ বেড়েছে ৯৮৫.৭ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৩.২ শতাংশ) যেখানে থোক বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ৮৪৫.২৭ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ২.৭ শতাংশ)।

[৭]২০০৮০৯ অর্থ বছরে প্রকৃত এডিপি ছিল জিডিপির ৩.২ শতাংশ।

নতুন এডিপিতে প্রকল্প সাহায্যের অংশ ধরা হয়েছে ৪২.১ শতাংশ (২০০৮০৯ অর্থবছরের মূল এডিপিতে ছিল ৪৩.৯ শতাংশ)। এর মধ্যে স্থানীয় মুদ্রার অংশ ৫৭.৯ শতাংশ (২০০৮০৯ অর্থবছরের এডিপিতে ছিল ৫৬.১ শতাংশ)। এডিপি বরাদ্দের বিচারে পাঁচটি অগ্রাধিকার খাত হলো – পরিবহন, শিক্ষা ও ধর্ম, স্থানীয় সরকার, অবকাঠামো পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ (সারণি ২.৫)।

সারণি ২.৫: ২০০৯১০ অর্থবছরের এডিপিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমূহ

(শতাংশ)

খাত	২০০৮০৯ অর্থবছর (প্রকৃত এডিপিতে অংশ)	২০০৯১০ অর্থবছর (সংশোধিত এডিপিতে অংশ)	২০০৯১০ অর্থবছরে অংশ	২০০৮০৯ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির তুলনায় প্রবৃদ্ধি
পরিবহন	১৩.৫	১১.০	১৫.৩	৮৪.৯
শিক্ষা ও ধর্ম	১৩.৮	১৪.১	১৩.৬	২৭.৮
স্থানীয় সরকার	১৩.৮	১৫.৬	১১.৯	১.২
অবকাঠামো পরিকল্পনা	৮.৭	১০.৮	১১.৯	৪৬.১
বিদ্যুৎ	১৩.৭	১১.৬	১১.৭	৩৩.৫

উৎস: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)।

গত দশ বছরের এডিপি বাস্তবায়নের ঐতিহাসিক গতিধারা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৯০০ অর্থবছরে প্রকৃত এডিপিতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল সর্বোচ্চ ২৩.৭ শতাংশ, পক্ষান্তরে সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি ছিল ২০০১০২ অর্থবছরে (-) ১৩.২ শতাংশ। দশ বছ রে গড়ে এডিপিতে ৫.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ২০০৮০৯ অর্থবছরে প্রক্ষেপিত প্রকৃত এডিপির (১৯,৫০০ কোটি টাকা) ওপর এসব পরিসংখ্যান ব্যবহার করে দেখা যায়, ২০০৯১০ অর্থবছরের জন্য সর্বোত্তম দৃশ্যকল্প হতে পারে ২৪,০০০ কোটি টাকার প্রকৃত বাস্তবায়ন (জিডিপি লক্ষ্যমাত্রার ৩.৫ শতাংশ), যা বাজেটে উলেখিত অংকের তুলনায় ৬,২০০ কোটি টাকা কম। অন্যদিকে গত ১০ বছরের গড় বৃদ্ধি বিবেচনায় নিলে প্রকৃত এডিপি ২০,৮০০ কোটি টাকা (জিডিপি লক্ষ্যমাত্রার ৩ শতাংশ এবং মূল এডিপির ৯,৭০০ কোটি টাকা কম) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এডিপির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে কিছু কঠিন এবং সাহসী প্রচেষ্টার দরকার হবে।

২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেটে অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় এডিপি বাস্তবায়নের জন্য কিছু সংস্কার প্রস্তাবনা তুলে ধরেন:

১. প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সংস্কার, যা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ও জটিল;
২. সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার সংস্কার করতে গণখাতে ক্রয় বিধি (পিপিআর) এবং আইন (পিপিএ) সংশোধন;
৩. প্রকল্প পরিচালকদের দক্ষতা ও ভূমিকা পরিবীক্ষণ;
৪. এডিপির ৭৮ শতাংশ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ে পরিবীক্ষণ জোরদার;
৫. ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড ব্যবহারের মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরিবীক্ষণ।

এসব প্রস্তাবনার বাইরেও সরকার এডিপি বাস্তবায়ন পরিস্থিতির উন্নয়নে নিম্নের পরামর্শগুলো বিবেচনা করতে পারে:

- সকল চলমান প্রকল্প সময়মতো শেষ করার জন্য প্রকল্প ভিত্তিক সুবিবেচিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এসব কর্মপরিকল্পনা সংশিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষের তৈরি এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া উচিত। যেহেতু এসব প্রকল্প যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে সেহেতু কর্মপরিকল্পনাগুলোর জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) অথবা পরিকল্পনা কমিশনের মতো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের দরকার হওয়া উচিত নয়।

- উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় সরকারের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ছাড় করা যেতে পারে। এতে করে এসব প্রতিষ্ঠান তাড়াতাড়ি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে পারবে।
- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং তদারকিতে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা বাড়ানো উচিত। পরিকল্পনা কমিশনের নীতিমালার ভিত্তিতে উপজেলা কর্তৃপক্ষকে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।
- সকল মন্ত্রণালয়ে মধ্যমেয়াদি বাজেটীয় কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে বাজেটের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। যেসব মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে এ কাঠামোর আওতায় এসেছে সেসব মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন প্রকল্পে সম্পদ বরাদ্দের ক্ষমতা দেওয়া উচিত। এখনও পর্যন্ত এ ধরনের বরাদ্দ অর্থ মন্ত্রণালয় দিয়ে থাকে।

২.২.৩ বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন

২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছে ২৪,৯৬০ কোটি টাকা (জিডিপির ৪.১ শতাংশ) যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের চেয়ে ১৬.১ শতাংশ বেশি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাজস্ব আয় এবং ব্যয় উভয় বিচারে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত রাজস্ব কাঠামোর প্রক্ষেপণ বড় ধরনের সমন্বয়ের মুখে পড়তে যাচ্ছে। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এডিপি বাস্তবায়নের সম্ভাবনা খুব কম থাকায় শেষ বিশ্লেষণে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম হতে পারে।

২০০৯-১০ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি ধরা হয়েছে ৩৪,৩৫৮ কোটি টাকা যা জিডিপির ৫ শতাংশ (সারণি ২.৬)। অর্থাৎ সম্পদের ঘাটতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৩৭.৭ শতাংশ বেশি এবং সম্ভবত প্রকৃত ঘাটতির চেয়ে আরও বেশি হবে।

সারণি ২.৬: ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটের ঘাটতি অর্থায়ন

অর্থায়নের উৎস	২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট		২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট	
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি (%)	পরিমাণ (কোটি টাকা)	২০০৮-০৯ অর্থবছরের (সংশোধিত) তুলনায় প্রবৃদ্ধি (%)
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	১৪১৯৮.০	১০.৫	২০৫৫৫.০	৪৪.৮
ব্যাংক্ত বহির্ভূত ঋণ	৩৫০০.০	৩৮.৬	৩৮০০.০	৮.৬
ব্যাংক ঋণ	১০৬৯৮.০	৩.৬	১৬৭৫৫.০	৫৬.৬
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন	১০৭৬২.০	২৪.৬	১৩৮০৩.০	২৮.৩
অনুদান	৪৯২৯.০	১০৪.৩	৫১৩০.০	৪.১
ঋণ	১০২১৫.০	-৩.৬	১৩২১৫.০	২৯.৪
ঋণ পরিশোধ	৪৩৮২.০	০.২	৪৫৪২.০	৩.৭
মোট বৈদেশিক অর্থায়ন	১৫১৪৪.০	১৬.৪	১৮৩৪৫.০	২১.১
মোট অর্থায়ন	২৪৯৬০.০	১৬.১	৩৪৩৫৮.০	৩৭.৭
জিডিপির শতকরা হিসেবে মোট অর্থায়ন	৪.১		৫.০	

উৎস: ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট দলিল।

এদিকে অনুমান করা হচ্ছে যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়া ২০০৯-১০ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হতে পারে। উত্তরণ প্রক্রিয়ার সুযোগ নেওয়া এবং চলমান সংকটের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার প্রয়োজনে উচ্চ বাজেট ঘাটতির নীতি সম্ভবত সুবিবেচনাপ্রসূত। ২০০৯-১০ অর্থবছরের

বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য স্থানীয় উৎসের ওপর বেশি নির্ভর করা হয়েছে। ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত খাত মিলে এ উৎস থেকে ৫৯.৮ শতাংশ অর্থায়ন আসবে (চিত্র ২.৪)। বাজেট ঘাটতির ৪৮.৮ শতাংশ ব্যাংক ঋণ থেকে (স্থানীয় অর্থায়নের ৮১.৫ শতাংশ) এবং ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে ১১ শতাংশ অর্থায়ন (স্থানীয় অর্থায়নের ১৮.৫ শতাংশ) করা হবে (চিত্র ২.৫)। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ঘাটতির অর্থায়নে ব্যাংক এবং ব্যাংক বহির্ভূত ঋণের অংশ যথাক্রমে ৪২.৯ শতাংশ ও ১৪ শতাংশ।

চিত্র ২.৪: ঘাটতি অর্থায়নের উৎসসমূহ

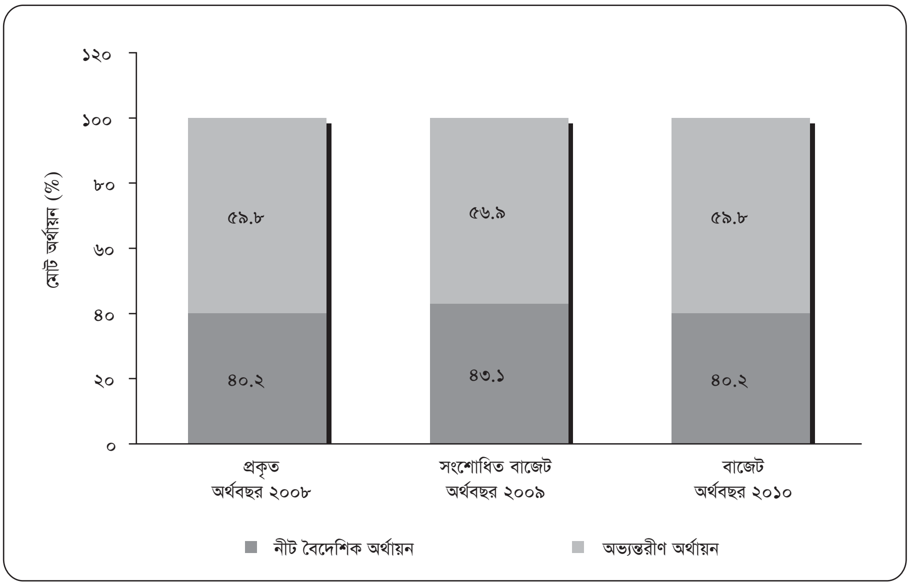

উৎস: ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট দলিল।

চিত্র ২.৫: স্থানীয় অর্থায়নের উৎসসমূহ

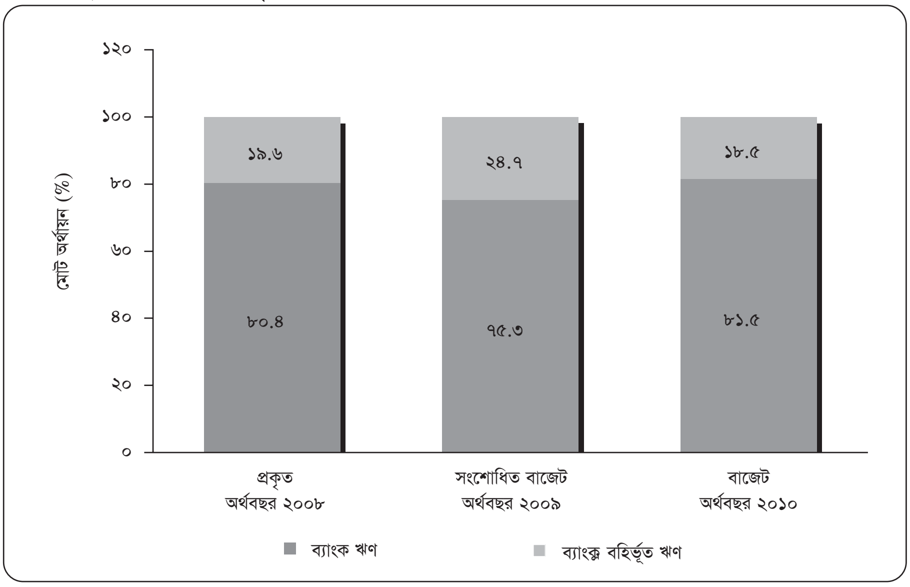

উৎস: ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট দলিল।

অর্থায়ন কাঠামোর কর্মসূচিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বৈদেশিক অর্থায়নের সঙ্গে জড়িত উচ্চ ব্যয়। মোট হিসাবে ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বৈদেশিক অর্থায়নের পরিমাণ ১৮,৩৪৫ কোটি টাকা (প্রায় ২.৬ বিলিয়ন ডলার) যা ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২১.১ শতাংশ বেশি। নীট ভিত্তিতে ২০০৯ ১০, অর্থবছরে প্রক্ষেপিত বৈদেশিক অর্থায়নের পরিমাণ ১৩,৮০৩ কোটি টাকা (প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার) যা ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৮.৩ শতাংশ বেশি। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক অর্থায়নের প্রাক্কলন সাম্প্রতিক গতিধারার তুলনায় অনেক উচ্চ (২০০৭ ০৮ অর্থবছর ছাড়া, কেননা এ সময় সাহায্য প্রবাহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল)। আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ২০০৯ ১০ অর্থবছরে বৈদেশিক অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা ২০০৭ ০৮ অর্থবছরের প্রকৃত প্রবাহের চেয়ে প্রায় ৬০ শতাংশ বেশি। যদি এই অর্থায়ন আসে তাহলে তা হবে এক বছরে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সাহায্য প্রবাহ। বড় অংকের বাজেট সহায়তাসহ দাতাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং বৈদেশিক সহায়তার অর্থ দিয়ে এডিপি বাস্তবায়নের সঠিক কৌশল গ্রহণ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। অন্যথায় এডিপি বাস্তবায়নের পুরো পরিকল্পনাটি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। আবার উচ্চ ব্যাংক ঋণের চাহিদা সৃষ্টি হয়ে এটি রাজস্ব কাঠামোতে ভারসাম্যহীনতা আনতে পারে।

২.৩ রাজস্ব পদক্ষেপসমূহের চিত্র

কর ও শুল্ক পদক্ষেপসমূহ

প্রত্যক্ষ কর

আয়কর

রাজস্ব আদায়ের জন্য বাংলাদেশ আয়করের মতো প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ করের ওপর বেশি নির্ভরশীল। তবে আর্ন্তজাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কমে যাওয়ার ফলে আমদানি থেকে রাজস্ব আদায় কমে যাওয়ায় সরকারকে আয়কর থেকে রাজস্ব আয় বাড়ানোর প্রচেষ্টা নিতে হয়েছে। ২০০৯ ১০ অর্থবছরে আয়করের স্তর আগের মতই রয়েছে এবং করমুক্ত আয়ের সীমা ১৬৫,০০০ টাকা বহাল রাখা হয়েছে (সারণি ২.৭)। নারী ও বয়স্ক নাগরিকদের করমুক্ত আয়ের সীমাও ১৮০,০০০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যদিও বয়স্ক নাগরিকদের সর্বনিম্ন বয়সসীমা ৭০ বছর থেকে কমিয়ে ৬৫ বছর করা হয়েছে। সরকারি চাকরিজীবীদের অবসরের বয়স বিবেচনা করে (বর্তমানে ৫৭ বছর) এটি করা হয়েছে।

সারণি ২.৭: বিভিন্ন অর্থবছরে আয়কর স্তরের বিন্যাস

হার	অর্থবছর ২০০৩	অর্থবছর ২০০৪	অর্থবছর ২০০৫	অর্থবছর ২০০৬	অর্থবছর ২০০৭	অর্থবছর ২০০৮	অর্থবছর ২০০৯	অর্থবছর ২০১০
শূন্য	৭৫০০০	৯০০০০	১০০০০০	১০০০০০	১২০০০০	১৫০০০০	১৬৫০০০*	১৬৫০০০**
১০ শতাংশ	১৫০০০০	১৫০০০০	২০০০০০	২০০০০০	২৫০০০০	২৭৫০০০	২৭৫০০০	২৭৫০০০
১৫ শতাংশ	১৫০০০০	১৫০০০০	২৫০০০০	২৫০০০০	৩০০০০০	৩২৫০০০	৩২৫০০০	৩২৫০০০
২০ শতাংশ	২৫০০০০	২৫০০০০	৩৫০০০০	৩৫০০০০	৩৫০০০০	৩৭৫০০০	৩৭৫০০০	৩৭৫০০০
স্থিতির ওপর ২৫ শতাংশ	স্থিতির পরিমাণের ওপর	স্থিতির পরিমাণের ওপর	স্থিতির পরিমাণের ওপর	স্থিতির পরিমাণের ওপর	স্থিতির পরিমাণের ওপর	স্থিতির পরিমাণের ওপর	স্থিতির পরিমাণের ওপর	স্থিতির পরিমাণের ওপর
সর্বনিম্ন কর	১২০০	১২০০	১৫০০	১৫০০	১৮০০	২০০০	২০০০	২০০০

উৎস: www.riraproject.org.bd/income_tax.php

দ্রষ্টব্য: *এই শর্তে যে ৭০ বছরের বেশি বয়স্ক নারী এবং প্রতিবন্ধী করদাতাদের জন্য কর অব্যাহতির সীমা ১৮০,০০০ টাকা।

** এই শর্তে যে ৬৫ বছরের বেশি বয়স্ক নারী এবং প্রতিবন্ধী করদাতাদের জন্য কর অব্যাহতির সীমা ১৮০,০০০ টাকা।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে কৃষি খাত থেকে করযোগ্য আয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে পুরুষদের জন্য ২০০,০০০ টাকা এবং মহিলাদের জন্য ২১৫,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই উদ্যোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়। ২০০৯ ১০ অর্থবছরে অবসরপ্রাপ্তদের পেনশনের অর্থে কেনা সঞ্চয়পত্র করমুক্ত রাখা হয়েছে। সমতার বিবেচনায় এটিও একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

কালো টাকা সাদা করার স্কীম

২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকে ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত সময়কালে সরকার বিনা প্রশ্নে অঘোষিত আয় বৈধ করার সুযোগ দিয়েছে। তবে শর্ত দেওয়া হয়েছে যে, এ ধরনের আয়ের ওপর ১০ শতাংশ কর দিতে হবে এবং অঘোষিত অর্থ সরকার মনোনীত খাতগুলোতে বিনিয়োগ করতে হবে। বৈশ্বিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাবের আলোকে এবং বিনিয়োগের জন্য তহবিলের প্রয়োজনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সৎ ও নীতিবান করদাতাদের পুরস্কৃত করা এবং কর ফাঁকিবাজ ও অপ্রদর্শিত আয় রয়েছে এমন লোকজনকে শাস্তির যে নীতি রয়েছে তার বিবেচনায় এ ধরনের স্কীম সমালোচনার মুখে পড়েছে। এখানে বৈধভাবে অর্জিত আয় ও অপ্রদর্শিত অর্থ এবং অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ ও অপ্রদর্শিত অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। অপ্রদর্শিত আয় ২০১২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে যা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কর ফাঁকিবাজদের অপেক্ষা করতে এবং এ সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে পারে। ফলে ২০১২ সালের আগ পর্যন্ত এ পদক্ষেপের প্রকৃত সুফল নাও পাওয়া যেতে পারে। এ সুযোগ পাওয়া শিল্পের তালিকা অনেক বড় এবং সাধারণ অনেক শিল্পকেই এ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অবকাঠামো, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পুঁজিবাজারের মত কিছু নির্ধারিত অগ্রাধিকার খাতে এ সুযোগ সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল।[৮]

কর্পোরেট কর এবং বিনিয়োগ ইস্যুসমূহ

বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০১২ সালের পর কর অবকাশ সুবিধা অব্যাহত রাখা হবে না। এর পরিবর্তে শিল্পায়ন ও শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত করতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের বাইরে শিল্পের জন্য বিশেষ কর হার প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে ঢাকা ও চট্টগ্রামে (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি ব্যতীত) নতুন প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের জন্য ৫ শতাংশ, তৃতীয় ও চতুর্থ বছরের জন্য ১০ শতাংশ, এবং পঞ্চম বছরের জন্য ১৫ শতাংশ হারে হ্রাসকৃত কর প্রদানের সুবিধা পাবে। রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগের রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় এক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের জন্য ৫ শতাংশ, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বছরের জন্য ১০ শতাংশ, এবং সপ্তম বছরের জন্য ১৫ শতাংশ কর আরোপ করা হবে। কর্পোরেট করের হার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অপরিবর্তিত রয়েছে, তবে মোবাইল ফোন অপারেটরদেরকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তি এবং কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের অন্তত ১০ শতাংশ শেয়ার বাজারে ছাড়ার শর্তে (প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (আইপিও) ছাড়ার আগে ৫ শতাংশের বেশি হবে না) তাদের কর্পোরেট কর ৩৫ শতাংশে নামানো হয়েছে। একই ধরনের উদ্যোগ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটে নেওয়া হলেও তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। মাত্র একটি কোম্পানি (গ্রামীণফোন) বাজারে তার শেয়ার ছাড়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। তবে আশা করা হচ্ছে যে, এই সুবিধা অব্যাহত থাকলে তা অন্যদেরও পুঁজিবাজারে আসতে উৎসাহিত করবে।

[৮]কালো টাকা সাদা করার স্কীম নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের পর সরকার শুধুমাত্র ২০০৯ ১০ অর্থবছরের জন্য অপ্রদর্শিত অর্থের বৈধতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০০৯ সালের ৩০ জুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার সুযোগ পাওয়া যাবে শুধুমাত্র জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১০ পর্যন্ত (জুন ২০১২ এর পরিবর্তে); তবে বিনিয়োগের সময় এবং অন্যান্য সংশ্লি ষ্টতথ্য, যেমন – টাকার উৎস সহ এ ধরনের বিনিয়োগ থেকে কর্মসংস্থানের প্রক্ষেপণ প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকাশ করা দরকার।

সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় জমি বিক্রি থেকে অর্জিত মূলধনের বিপরীতে উৎসে কর কর্তনের হার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করা হয়েছে। অন্য এলাকায় অ্ কৃষি জমির দাম ১ লাখ টাকার বেশি হলে এই হার বিদ্যমান ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১ শতাংশে নামবে।

আয়কর থেকে অধিকতর রাজস্ব আদায় করতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন উদ্যোগ, যেমন – আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রাজস্ব প্রশাসনের আধুনিকায়ন এবং কর প্রদান প্রক্রিয়া সহজ করতে প্রত্যেক জেলায় বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে করের আওতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

খাতভিত্তিক রাজস্ব উদ্যোগ

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধ, স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া এবং কৃষি উৎপাদন বাড়াতে কর হ্রাস সহ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এর মধ্যে কিছু পদক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

শুল্ক কাঠামোতে পরিবর্তন এবং রাজস্ব আয়ের ওপর এর প্রভাব

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটের শুল্ক কাঠামোতে সরকার কিছু পরিবর্তন এনেছে। আমদানি শুল্ক বাড়ানো হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে রাজস্ব আয় বাড়াতে, আবার কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় শিল্প সুরক্ষায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য মৌলিক কাঁচামালের আমদানি শুল্ক ৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত ৮ ডিজিট পর্যায়ের এইচএস কোডভুক্ত ৭৭৪ ধরনের পণ্যের আমদানি শুল্ক আয়ের ওপর একটি প্রভাব ফেলতে পারে। তবে তা নির্ভর করবে এসব পণ্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপকতার ওপর। এ বাবদ সরকারের প্রাক্কলিত রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ ৩৮৩ কোটি টাকা। আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, ভ্যাট ও অগ্রিম বাণিজ্য ভ্যাট হারে পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ রাজস্ব আয়ের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হিসাবে আমদানি শুল্ক কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে সরকারের অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হবে প্রায় ৯ শতাংশ (শুধুমাত্র আমদানি শুল্ক থেকে)।

সিপিডির এক বিশ্লেষণে হিসাব করা হয়েছে যে, যদি আমদানি মূল্যের ক্ষেত্রে ২০০৭ ০৮ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর হিসেবে ধরা হয় এবং ২০০৯ ১০ অর্থবছরের শুল্ক কাঠামো তার ওপর (আমদানি মূল্য) প্রযোজ্য হয়, তাহলে এক্ষেত্রে সরকারের রাজস্ব আয় দাঁড়াবে ১৯,৮১৮ কোটি টাকা, যা ২০০৭ ০৮ অর্থবছরের তুলনায় ১,০৬০ কোটি টাকা বেশি (৫.৬৫ শতাংশ)।

অন্যদিকে, যদি ২০০৮ ০৯ এবং ২০০৯ ১০ অর্থবছরের মধ্যমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর (এমটিএমএফ) আমদানি প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় নেওয়া হয় (উভয় অর্থবছরে ১৩ শতাংশ) তাহলে আমদানি থেকে মোট রাজস্ব আয় দাঁড়াবে ২৫,৩০৫ কোটি টাকা, যা ২০০৭ ০৮ ও ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ২৭.৫ শতাংশ এবং ১২.৩ শতাংশ বেশি। সিপিডির প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৮ ০৯ অর্থবছরে আমদানি সম্পর্কিত রাজস্ব আয় হবে প্রায় ২১,১৯৬ কোটি টাকা। ২০০৯ ১০ অর্থবছরে আমদানি সম্পর্কিত রাজস্ব ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের প্রক্ষেপিত আদায় থেকে ১৯.৪ শতাংশ বেশি হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। অন্যদিকে, যদি ২০০৯ ১০ অর্থবছরের শুল্ক কাঠামো ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের আমদানি মূল্যের ওপর কার্যকর করা হয়, তাহলে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হবে ১,১৯৮ কোটি টাকা

অথবা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের চেয়ে ৫.৬৫ শতাংশ বেশি। এর অর্থ হলো, কাঁচামালের ওপর আমদানি শুল্ক ৭ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হলেও সরকার তৈরি পণ্য এবং অন্যান্য পণ্যে শুল্ক বাড়িয়ে রাজস্ব আয় বাড়াতে সক্ষম হবে। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, রাজস্ব আয় অনুমানের ক্ষেত্রে সিপিডির প্রক্ষেপণে মোট কর ভার (টিটিআই) বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।[৯]

স্থানীয় উৎপাদনকারীদের নিরুৎসাহিত করে শুল্ক কাঠামোতে এমন পরিবর্তন না আনার ব্যাপারে বর্তমান সরকার সতর্ক। অগ্রিম বাণিজ্য ভ্যাট বিদ্যমান ১.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২.৫ শতাংশে উন্নীত করার সরকারি সিদ্ধান্ত মৌলিক কাঁচামাল আমদানিকারকদের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন সুবিধা দেয়নি। সিপিডির হিসাবে যখন আমদানি শুল্ক ৭ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে (অগ্রিম বাণিজ্য ভ্যাট শূন্য শতাংশ রেখে) নামানো হয় তখন মোট কর ভার প্রায় ২ শতাংশ কমে যায়। তৈরি পণ্য উৎপাদনকারীরা যারা তাদের পণ্যের উপাদান হিসেবে কাঁচামাল আমদানি করে থাকেন, তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এই প্রণোদনা কোম্ড উলের (combed wool) সুতা আমদানিকারকদের জন্য বরং কম, কেননা তাদের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ আমদানি শুল্কসহ অগ্রিম বাণিজ্য ভ্যাট ১.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২.২৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে এক্ষেত্রে মোট কর ভার কমেছে ১.৪৭ শতাংশ। রাজস্ব আদায়ের প্রেক্ষাপটে বিলাস পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত সঠিকভাবেই নেওয়া হয়েছে। সারণি ২.৮-এ দেখানো হয়েছে যে, মোট কর ভার ৩০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ অথবা তার চেয়ে বেশি উন্নীত হয়েছে। তবে আমদানি শুল্কের ওপর সামগ্রিক প্রভাব এসব পণ্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপকতার ওপরও নির্ভর করবে।

সারণি ২.৮: শুল্ক কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন

শুল্ক কাঠামোতে পরিবর্তন	কাস্টমস শুল্ক	সম্পূরক শুল্ক	ভ্যাট	অগ্রিম বাণিজ্য ভ্যাট	অগ্রিম আয়কর	মোট কর ভার	মোট কর ভারের পরিবর্তন এবং রাজস্ব আয়ে তার প্রভাব
কাস্টমস শুল্ক ৭ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে হ্রাস; অগ্রিম বাণিজ্য ভ্যাট ১.৫ শতাংশ থেকে ২.২৫ শতাংশে বৃদ্ধি (কোম্ড উলের সুতা)							
পুরাতন	৭.০০	০.০০	১৬.০৫	১.৭৭	৩.০০	২৭.৮২	-১.৪৭
নতুন	৫.০০	০.০০	১৫.৭৫	২.৬০	৩.০০	২৬.৩৫	
কাস্টমস শুল্ক ৩ শতাংশ থেকে ০ শতাংশে হ্রাস; অগ্রিম বাণিজ্য ভ্যাট ১.৫ শতাংশ থেকে ২.২৫ শতাংশে বৃদ্ধি (সৌর প্যানেল)							
পুরাতন	৩.০০	০.০০	১৫.৪৫	১.৭০	৩.০০	২৩.১৫	-২.৬৭
নতুন	০.০০	০.০০	১৫.০০	২.৪৮	৩.০০	২০.৪৮	
সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশে বৃদ্ধি (শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র)							
পুরাতন	২৫.০০	২৫.০০	২২.৫০	২.৪৮	৩.০০	৭৭.৯৮	৫৯.৯৮
নতুন	২৫.০০	৭৫.০০	৩০.০০	৪.৯৫	৩.০০	১৩৭.৯৫	

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাজেট দলিলের ভিত্তিতে সিডিপির হিসাব।

কৃষি

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। বাজেটে সার, বীজ এবং প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য আমদানিতে শূন্য শুল্ক অব্যাহত রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় চাল আমদানির ওপর ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার (চাল আমদানি নিরুৎসাহিত করতে) সিপিডির পরামর্শ বাজেটে প্রতিফলিত হয়নি।

স্থানীয় শিল্প রক্ষায় সরকার গুঁড়ো দুধ আমদানিতে ১২ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ এবং স্থানীয় উৎপাদনের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব করেছে।[১০] স্থানীয় ডেইরি শিল্পের স্বার্থ রক্ষায়

[৯]২০০৯ সালের ৩০ জুন জাতীয় বাজেট পাশের সময় সরকার কিছু ক্ষেত্রে শুল্ক হার পরিবর্তন করে, যার ফলে রাজস্ব আয়ের প্রাক্কলনে কিছুটা ভিন্নতা আসতে পারে। তবে তা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নয়।

[১০]২০০৯ সালের ৩০ জুন গুঁড়ো দুধের বিপুল পরিমাণ আমদানির ওপর ২.৫ শতাংশ ভ্যাট নির্ধারণ করা হয়।

২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে তরল দুধ থেকে গুঁড়ো দুধে রূপান্তর প্রক্রিয়ার ওপর প্রযোজ্য ২.৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া বাজেটে প্রতি কেজিতে ১০০ টাকা ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রতি কেজিতে ভ্যাট দাঁড়াবে ৫০ টাকার পরিবর্তে মাত্র ১৫ টাকা।

শিল্প

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, উৎপাদন ব্যয় কমাতে এবং রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করতে সরকার কাঁচামালের শুল্ক কাঠামোয় পরিবর্তন এনেছে। আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্কে পরিবর্তনের পাশাপাশি সরকার প্রথমবারের মতো বিলাস ও স্বাস্থ্য হানিকর পণ্যসমূহকে ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্কের আওতায় ফেলে ৫ শতাংশ হারে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করেছে। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে – সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, মোটর গাড়ি, টেলিভিশন, সিগারেট প্রভৃতি। এছাড়া বাজেটে বিলাস পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে, যদিও এক্ষেত্রে পরিবর্তনের হার উল্লেখ করা হয়নি।

পার্টিকেল বোর্ড, হার্ড বোর্ড, মধ্যম ঘনত্বের ফাইবার বোর্ড, প্লাইউড, চামড়াজাত পণ্য প্রভৃতির ওপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ এবং ফুটওয়্যার, সিরামিক সামগ্রী, টেবিল সামগ্রী এবং স্যানিটারি সামগ্রীর ওপর একটি সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছে, যা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় স্থানীয় শিল্পকে কিছু সুরক্ষা দেবে ও সম্ভবত আমদানি পর্যায় থেকে রাজস্ব আয় কিছুটা বাড়াবে। একই ধরনের পদক্ষেপ স্থানীয় তরল গ্লুকোজ ও ডেক্সট্রোজ উৎপাদনকারী প্ল্যান্টের (২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ) এবং বিস্কুট ফ্যাক্টরির (সম্পূরক শুল্ক ৬০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করা) সুরক্ষায় নেওয়া হয়েছে। এর বাইরে সমুদ্রগামী জাহাজের নিবন্ধনে যে মন্দা আছে তা কাটিয়ে উঠতে বর্তমানে বাজেটে ৩,০০০ মেট্রিক টন অথবা তদূর্ধ্ব জাহাজের ওপর ৭ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। স্থানীয় রেফ্রিজারেটর এবং মোটর সাইকেল উৎপাদকদের সহায়তা করতে সরকার এসব শিল্পকে এক বছরের জন্য ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব করেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

মোবাইল ফোন সেটের ওপর ৩০০ টাকা সুনির্দিষ্ট শুল্কের পরিবর্তে ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ এবং সব ধরনের সম্পূরক শুল্ক, ভ্যাট এবং অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহারের প্রস্তাবের ফলে উচ্চমূল্যের সেটের ওপর বেশি শুল্ক এবং স্বল্পমূল্যের সেটের ওপর কম শুল্ক নির্ধারিত হবে। তবে এই সিদ্ধান্ত মোবাইল হ্যান্ডসেটের চোরাচালান হওয়াকে উৎসাহিত করতে পারে, যার পরিণতিতে সরকারের রাজস্ব আয় কমে যেতে পারে।[১১]

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

জ্বালানি ঘাটতির কারণে সিপিডি এবং অন্যান্যদের প্রস্তাব অনুযায়ী ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য নবায়ন ফি প্রত্যাহার, সৌর প্যানেলের ওপর থেকে ৩ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার এবং স্থানীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও স্থানীয়ভাবে তৈরি জেনারেটরের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত একটি উৎসাহব্যঞ্জক

[১১] এদিকে ২০০৯ সালের ৩০ জুন মোবাইল ফোনের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।

উদ্যোগ। তবে অগ্রিম বাণিজ্য ভ্যাট ১.৫ শতাংশ থেকে ২.২৫ শতাংশে উন্নীত করার কারণে ওই উদ্যোগের যেসব সুবিধা পাওয়া যেত, তার ওপর কিছুটা বিরূপ প্রভাব পড়বে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের ওপর সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬০ শতাংশ এবং এর যন্ত্রাংশের ওপর ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

২.৪ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)

বিনিয়োগের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সরকারি৷ বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ধারণাটি ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে সূচনা করা হয়েছে। যদিও বাজেটে পিপিপি বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন উপাদান, এরূপ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অবকাঠামো প্রকল্প, বিশেষত স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাংলাদেশে আগেই সূচিত হয়েছে। তবে পিপিপি উদ্যোগের জন্য প্রথমবারের মতো বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ সমস্যা বাংলাদেশে দেশী ও বিদেশী উভয় বিনিয়োগের জন্য মূল প্রতিবন্ধকতা। ঐতিহাসিকভাবে বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন এবং উন্নয়ন সরকারের প্রাথমিক দায়৷ দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। তবে অবকাঠামোর জন্য চাহিদা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা বেড়ে যাওয়ায় অবকাঠামো প্রকল্পে অর্থায়ন, উদ্ভাবনমূলক চর্চা এবং কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজনে গত দুই দশকে বিশ্বব্যাপী সরকারগুলো বেসরকারি খাতের দিকে ঝুঁকছে। বিশ্বের ৩০টিরও বেশি দেশে এ ধরনের অংশীদারিত্ব রয়েছে, যার অধিকাংশই উন্নত দেশ। অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশ যেমন, চীন, ব্রাজিল, চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতও এ ধরনের উদ্যোগের সঙ্গে সংযুক্ত।

বরাদ্দ

২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে পিপিপি প্রকল্পগুলোর জন্য ২,৫০০ কোটি টাকা (বাজেটের ২.২ শতাংশ) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তিনটি ক্ষেত্রে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে: (১) পিপিপিতে ঋণ ও সমমূলধনী অংশীদারিত্বের জন্য অবকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২,১০০ কোটি টাকা; (২) ঝুঁকিপূর্ণ অথচ অপরিহার্য প্রকল্পসমূহ বাবদ ভায়াবিলিটি গ্যাপ তহবিলের জন্য ভর্তুকি হিসেবে বরাদ্দ ৩০০ কোটি টাকা; এবং (৩) বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনার জন্য কারিগরি সম্ভাব্যতা তহবিলে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ অবকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল (বিআইআইএফ) সহ পিপিপির আওতায় তহবিল বাড়ানোর পরিকল্পনার কথা সরকার উল্লেখ করেছে, যা বেসরকারি খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে। অন্যান্য ভবিষ্যত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে সিকিউরিটাইজেশনের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহের জন্য লেনদেন করা (এক্ষেত্রে যমুনা ও পদ্মা সেতুর কথা বাজেট দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে)।

পিপিপির জন্য চিহ্নিত খাতসমূহ

বেশিরভাগ দেশে এ ধরনের অংশীদারিত্ব প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবহন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোর দিকে মনোযোগ দিয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এখন পর্যন্ত কয়েকটি বড় প্রকল্প নতুন পিপিপি উদ্যোগের আওতায় আনা হয়েছে। এর সবগুলো পরিবহন ও বিদ্যুৎ খাতের সঙ্গে সর্ম্পকিত। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত এবং পরিবহন অবকাঠামো খাত (রাস্তাঘাট, রেল, বন্দর, বিমানবন্দর এবং পানি পরিবহন) অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে সাতটি বড় প্রকল্পে বিনিয়োগের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে (একটি প্রকল্পে ১.৮ বিলিয়ন ডলার এবং ছয়টি প্রকল্পে ২৫.৯ বিলিয়ন ডলার ব্যয় প্রাক্কলন করা

হয়েছে)। স্বল্পমেয়াদি প্রকল্পগুলোর জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিবহনকে সম্ভাব্য এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিবহন খাতে ৩.৬ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, আর্টিকুলেটেড বাস সার্ভিস ও বাস রুট ফ্রানচাইজ প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষা খাতের জন্য মানসম্মত মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবাসন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অডিটরিয়াম, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যায়ামাগার, ডিগ্রী কলেজগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান অথবা গবেষণা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে ক্যান্সার ও অন্যান্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পিপিপির জন্য বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জসমূহ

উল্লেখিত বিস্তারিত ইস্যুসমূহের পাশাপাশি পিপিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।

- পিপিপির আওতায় চলমান প্রকল্পগুলো নতুন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে কীভাবে সমন্বিত হবে? বর্তমানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল), ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ) এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার (আইআইএফসি) এর আওতায় ৬৪টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা নতুন পিপিপি কাঠামোর আওতায় আনতে হবে।
- প্রক্ষেপিত পিপিপি নেতৃত্বাধীন বিনিয়োগ বরাদ্দকৃত এডিপির দ্বিগুণেরও বেশি এবং মধ্যমেয়াদে পিপিপির সফল বাস্তবায়ন হলে এ দুইয়ের পার্থক্য আরও বাড়তে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে এডিপি বাস্তবায়নে ধীরগতির বিবেচনায় এটি জ্বালানি, অবকাঠামো এবং সামাজিক সেবার উপাদান হিসেবে এডিপির ওপর চাপ কমাতে বিকল্প কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হবে কিনা সেটি একটি প্রশ্ন।
- নতুন পিপিপি উদ্যোগগুলোর প্রত্যাশিত মডেল কী হবে? প্রকল্পের ধরনের ভিত্তিতে পিপিপির মডেল বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন – নির্মাণ্ণ অধিগ্রহণ্ণ পরিচালনা (বিওও), নির্মাণ্ণ পরিচালনাু হস্তান্তর (বিওটি) এবং নির্মাণ্ণ অধিগ্রহণ্ণ পরিচালনাু হস্তান্তর (বিওওটি)। একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য কীভাবে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর পরামর্শ দেওয়া হবে এবং তার জন্য নীতিমালা কী হবে, তা পিপিপি উদ্যোগের সফলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত মনোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেস হাইওয়ের মতো বড় প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে। এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকর করতে হবে। জমির মূল্য নির্ধারণের নীতিমালা কী হবে, সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬ এবং সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ পিপিপি প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা এই বিষয়গুলোর নিষ্পত্তিও আগেই হতে হবে।
- পিপিপি উদ্যোগগুলোর জন্য কর প্রণোদনা কী হওয়া উচিত? পিপিপি প্রকল্পগুলোর মধ্যে কি রাজস্ব পদক্ষেপে ভিন্নতা থাকা উচিত হবে? পিপিপির অবস্থান পত্র তিনটি কর প্রণোদনার প্রস্তাব করেছে। প্রথমত, বিনিয়োগকৃত অর্থের ওপর সর্বনিম্ন কর হার আরোপ করে কর ছাড় দেওয়া; দ্বিতীয়ত, পিপিপি প্রকল্পগুলোর জন্য মূলধনী পণ্যে সর্বনিম্ন হারে আমদানি শুল্ক আরোপ; এবং তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা থেকে আহরিত মুনাফার ওপর সর্বনিম্ন হারে কর আরোপ। এটি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, এসব প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রণোদনা অন্যান্য প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) এবং রপ্তানিমুখী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেওয়া প্রণোদনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণই হবে এবং এক্ষেত্রে স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবে না।
- পিপিপির জন্য পণ্যমূল্য নির্ধারণ একটি অন্যতম বড় বিষয় হতে পরে। পিপিপি প্রকল্পগুলোতে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া কী হবে? পণ্যমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সবাই যাতে লাভবান হতে পারে এমন ফলাফলের জন্য স্বচ্ছতা এবং কারিগরি দক্ষতা মূল বিষয় হবে।

- পিপিপি কি বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের জন্য বড় প্রণোদনা হিসেবে কাজ করবে? বেশ কিছু প্রণোদনার সুযোগ থাকলেও প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে এরূপ বিনিয়োগ প্রবাহ সম্ভাবনাময় হতে পারেনি। অন্যান্য পিপিপি অথবা বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাবের বিপরীতে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পৃক্ত পিপিপি প্রকল্পে অতিরিক্ত প্রণোদনা দেওয়া হবে কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে।
- পিপিপি প্রকল্পে অর্থায়ন হবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পিপিপি প্রকল্পগুলোতে কি দাতাদের অর্থায়ন থাকতে পারবে? দাতাদের অর্থায়ন কি সরকারের ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে না কি তা ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হবে? পিপিপির জন্য পুঁজিবাজার অথবা বৈদেশিক বাণিজ্যিক ঋণ নেওয়া যাবে? পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তি কি বাধ্যতামূলক হবে?
- স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাসহ সামাজিক খাতে পিপিপির অনুমতি দেওয়া হলে এসব প্রকল্প ব্যবহারকারীদের প্রবেশজনিত ব্যয় কীভাবে নির্ধারিত হবে? এখানে কি বেসরকারি মুনাফার জন্য সরকারি অর্থায়ন ব্যবহৃত হবে?

তাই সরকার পিপিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত পিপিপি সেলের জন্য কার্যকর জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা কৌশলগত ইস্যু হবে। সরকারের উচিত বাংলাদেশের পিপিপি প্রকল্পগুলোতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য বৈশ্বিক অবকাঠামো তহবিলগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করা। ভারত ২০০৭ সালে পিপিপি কর্মসূচি চালু করে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ভারত তাদের পিপিপি সক্ষমতা বাড়াতে বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সহায়তা নিতে বেশ সক্রিয়। যদি বাংলাদেশ সরকারি ও বেসরকারি খাতের অভিজ্ঞ লোকজনদের নিয়ে একই পথ অনুসরণ করে তাহলে অনুরূপ অগ্রগতি না হওয়ার কোন কারণ নেই।

২.৫ খাতভিত্তিক উদ্যোগ

২.৫.১ কৃষি এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দ

২০০৯-১০ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ (৫,৯৬৫ কোটি টাকা) ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের (৭,৬৪৩ কোটি টাকা) তুলনায় ২২ শতাংশ কম এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের (৫,৫৬৬ কোটি টাকা) তুলনায় ৯.২ শতাংশ কম। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের (৬,১০০ কোটি টাকা) সঙ্গে তুলনা করা হলে তা ২.২ শতাংশ কম (চিত্র ২.৬)। অন্যদিকে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় বরাদ্দ বেড়েছে যথাক্রমে ১১৪ কোটি টাকা (১৮.৯ শতাংশ), ২৮ কোটি টাকা (১১.২ শতাংশ) এবং ৭৫ কোটি টাকা (১৭.৩ শতাংশ)। ২০০৯-১০ অর্থবছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে ১,৪৮৩ কোটি টাকা যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৪ কোটি টাকা কম। কৃষি এবং কৃষি খাত সংশ্লি ষ্টশিল্পগুলোতে (শস্য, পশুসম্পদ, মৎস্য, বন, ভূমি এবং পানি সম্পদ) ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৮,৯৫০ কোটি টাকা যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ১৪.১ শতাংশ কম এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মূল বাজেটের চেয়ে ৩.৫ শতাংশ কম। কৃষির জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ১,৬৯৭ কোটি ৬২ লাখ টাকা, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের চেয়ে ৮.৮৬ শতাংশ কম। কৃষি উন্নয়নের জন্য সরকারি বিনিয়োগ প্রকৃতপক্ষে কমানো হয়েছে যদিও নতুন সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে এটিকে অন্যতম প্রধান খাত হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল।

চিত্র ২.৬: কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে মোট বাজেট বরাদ্দ (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

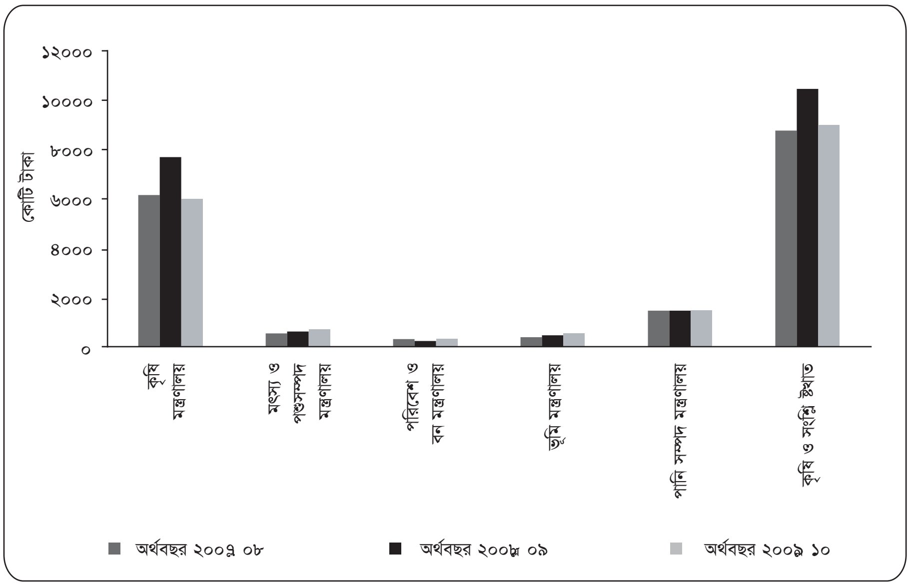

উৎস: বিভিন্ন অর্থবছরের বাজেট দলিল।

সারে ভর্তুকি

২০০৯ ১০ অর্থবছরে সার এবং কৃষি উপকরণে ভর্তুকি কমিয়ে ৩,৬০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ছিল ৫,৭৮৫ কোটি টাকা (চিত্র ২.৭)। ২০০৮ সালের জুলাই

চিত্র ২.৭: আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দর (ইউরিয়া, ডিএপি, টিএসপি এবং এমওপি): জুলাই ২০০৬ এপ্রিল ২০০৯

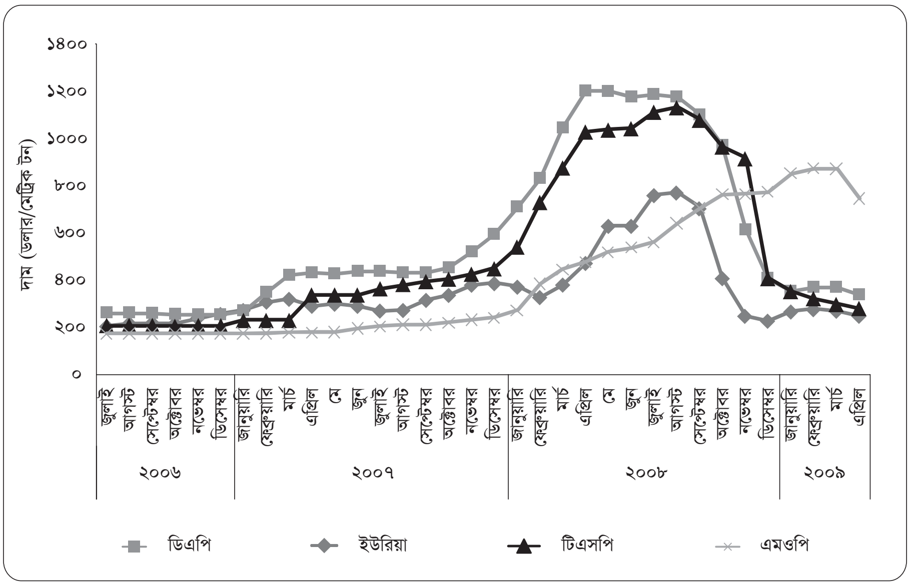

উৎস: কমোডিটি মার্কেট রিভিউ, বিশ্বব্যাংক।

থেকে ২০০৯ সালের এপ্রিলের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে ইউরিয়া, টিএসপি এবং ডিএপি সারের দাম কমেছে যথাক্রমে ৬৭ শতাংশ, ৭৫ শতাংশ এবং ৭২ শতাংশ (দাম কমে এপ্রিলে হয়েছে যথাক্রমে ২৪৫ ডলার, ২৭৮ ডলার এবং ৩৩৫ ডলার প্রতি টন)। অন্যদিকে, এই সময়কালে এমওপির দাম বেড়েছে ৩৩ শতাংশ (২০০৯ সালের এপ্রিলে প্রতি টন মূল্য হয়েছে ৭৪৫ ডলার)। ২০০৭ এবং ২০০৮ সালে ইউরিয়া, টিএসপি এবং ডিএপির দ্রুত ও উচ্চ হারে মূল্য বৃদ্ধির পর বর্তমানে এগুলোর মূল্য ২০০৬ সালের গতিধারায় ফিরে এসেছে। যদি আন্তর্জাতিক বাজারের বর্তমান মূল্য অব্যাহত থাকে তাহলে বরাদ্দকৃত ভর্তুকি দিয়ে সার বিতরণের পরিকল্পিত পরিমাণের চেয়ে বেশি সার সরবরাহ করা যাবে, এমনকি সারের দাম আরও হ্রাস করা যাবে।

টিএসপি, এমওপি এবং ডিএপির বর্তমান নির্ধারিত মূল্য যথাক্রমে ৪০ টাকা, ৩৫ টাকা এবং ৪৫ টাকা। যদি বর্তমান আন্তর্জাতিক দর বহাল থাকে এবং সরকার সারের দাম পরিবর্তন না করে তাহলে টিএসপি এবং ডিএপি বিক্রি থেকে সরকার কিছু মুনাফা পাবে। তবে ইউরিয়া এবং এমওপি আমদানিতে ভর্তুকির দরকার হবে। এই ক্ষেত্রে ২০০৯ ১০ অর্থবছরে পরিকল্পিত ২৯.৫১ লাখ টন ইউরিয়া, ৬.৭০ লাখ টন টিএসপি এবং ২.৬৩ লাখ টন এমওপি সরবরাহ করতে ভর্তুকি হিসেবে সরকারকে ১,০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। অন্যদিকে, যদি সরকার সার ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহে ভর্তুকির ২,৮৩৬ কোটি টাকা খরচ করে, তাহলে টিএসপি ও ডিএপির দর ৩০ টাকায় নামিয়ে আনা এবং কৃষকদের পর্যাপ্ত সার সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম সেচ এবং পানি নিষ্কাশন প্রকল্প

খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে বাজেটে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে; যেমন, দক্ষিণ অঞ্চলে ভূ পৃষ্ঠের উপরিভাগের পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, হাওড় এলাকায় পানি নিষ্কাশন পদ্ধতি উন্নয়নের মাধ্যমে চাষযোগ্য জমি বৃদ্ধি এবং বহুমুখী আবাদের সুযোগ সৃষ্টি। ২০০৯ ১০ অর্থবছরে সেচ এবং পানি নিষ্কাশন প্রকল্পে প্রস্তাবিত বরাদ্দ রয়েছে ৪,০০০ কোটি টাকা। এটি খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং এর ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের কৃষকেরা সরাসরি উপকৃত হবে। ফলশ্রুতিতে কৃষিপণ্যের বর্ধিত উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের পুষ্টি অবস্থার উন্নতি হবে।

বাজেটে বন্যামুক্ত এলাকা (৪০ হাজার হেক্টর) প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব করা হয়েছে এবং অন্যান্য এলাকায় (১৫ হাজার হেক্টর) সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ এবং সেচ খালের খনন ও পুনর্খনন, নির্মাণ এবং সেচ অবকাঠামো সংস্কারের প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বীজ উৎপাদনের জন্য তহবিল

প্রস্তাবিত বাজেটে উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাতের বীজ উৎপাদনে ২৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। বীজ সংরক্ষণ ক্ষমতা ৪০,০০০ টন থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ টনে উন্নীত করা হবে। সিপিডির বিবেচনায় এগুলো উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ। বর্তমানে বেসরকারি খাত এবং বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাতের বীজ উৎপাদন ও বিপণনের সঙ্গে জড়িত, যেখানে সর্বশেষ ছাড়কৃত জাতের বীজের প্রাপ্যতার সংকট রয়েছে। যদি বীজ উৎপাদনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হয় এবং বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনের জন্য আগ্রহী বেসরকারি কোম্পানি ও এনজিওদের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে তা সর্বশেষ প্রজাতির বীজের দ্রুত সম্প্রসারণে সাহায্য করবে।

কৃষি গবেষণা

২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি গবেষণা এবং পুনর্বাসন সহায়তার জন্য ১৮৫ কোটি ২১ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে এর মধ্যে কতটুকু কৃষি গবেষণার জন্য এবং কতটুকু পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

কৃষি ঋণ

কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের ৯,৩৭৯ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০৯ ১০ অর্থবছরে ১০,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রকৃত কৃষি ঋণ বিতরণ হয়েছে ৭,৭২৯ কোটি ৯ লাখ টাকা, যা ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার ৮২.৪ শতাংশ (চিত্র ২.৮)। এ আলোকে ২০০৯ ১০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবসম্মত বলেই মনে হয়।

চিত্র ২.৮: বিভিন্ন অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণের গতিধারা

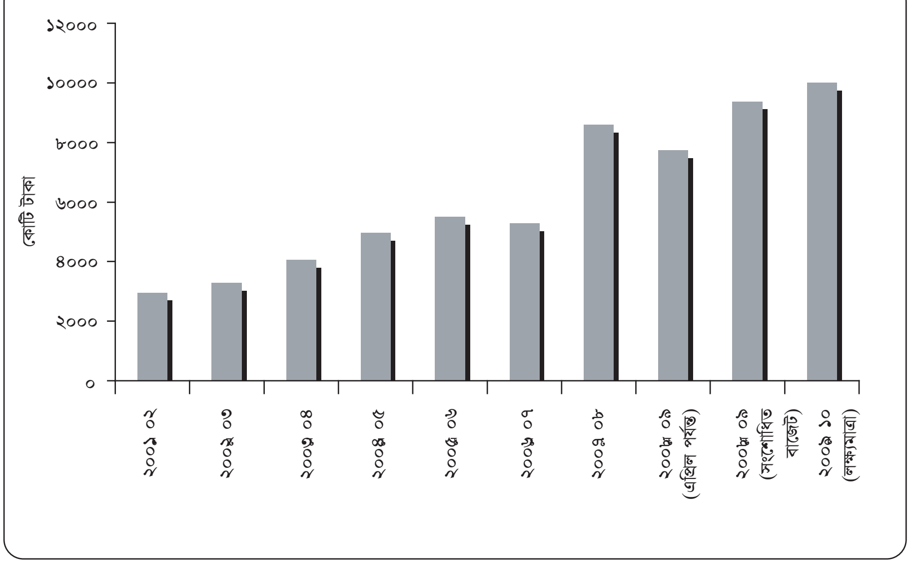

উৎস: বিভিন্ন অর্থবছরের বাজেট দলিল।

খাদ্যশস্য ক্রয়

বাজেটে ২০০৯ ১০ অর্থবছরে স্থানীয়ভাবে ১৬ লাখ টন বোরো চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। এটি একটি সঠিক কার্যক্রম। তবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং যৌক্তিক মূল্য ঘোষণা কৃষকদের মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত নয়। এই বছর সরকার ১২.৫ লাখ টন চাল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে (১১ লাখ টন চাল এবং ১.৫ লাখ টন ধান), যেখানে কেজি প্রতি ধানের দর ১৪ টাকা এবং চালের দর ২২ টাকা। দুঃখজনকভাবে, ধান ও চালের খামার পর্যায়ের প্রকৃত দাম সরকার ঘোষিত এই দাম এবং একই সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে অনেক কম। এই প্রস্তাবনার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য কিছু কৌশল উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল।

গুদাম স্থাপনের উদ্যোগ

বাজেটে উত্তরাঞ্চলে ১৩৭টি নতুন গুদাম (মোট ১.১ লাখ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) এবং দেশব্যাপী ৩৩৩টি গুদাম (মোট ২.৫৪ লাখ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) স্থাপনের উদ্যোগের উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি পুরোনো এবং ক্ষতিগ্রস্ত গুদামগুলোর সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটেও অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। সিপিডি তার বাজেট প্রস্তাবনায় খাদ্যশস্যের জন্য নতুন গুদাম স্থাপনের সুপারিশ করেছিল।

মৎস্য এবং পশুসম্পদ

পোল্ট্রি ও পশুসম্পদ উন্নয়নে গরু এবং পোল্ট্রির উৎপাদন ও সরবরাহে এবং হ্রাসকৃত মূল্যে মুরগী ও হাঁসের বাচ্চা সরবরাহে সরকার তার কর্মসূচিগুলো অব্যাহত রাখছে। এছাড়া সরকার মহিষ এবং ভেড়ার জন্য খামার প্রতিষ্ঠা এবং দুধ ও মাংসের উৎপাদন বাড়াতে ১২,০০০ কৃষককে প্রণোদনা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। পাশাপাশি, উৎপাদন পর্যায় থেকে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আরও জোরদার করা হবে।

মৎস্য উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন – জাটকা ধরা প্রতিরোধ, স্থানীয় প্রজাতির মাছ রক্ষায় অভয়ারণ্য সৃষ্টি, কমিউনিটি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদনের জন্য একটি ব্রুডস্টক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। অর্থমন্ত্রী এটি আগামী বাজেটে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন।

২.৫.২ শিল্প

শিল্প খাতে ২০০৮ ০৯ অর্থবছরে বেশ কিছু পরিবর্তন এবং চ্যালেঞ্জ লক্ষ্য করা গিয়েছে। শিল্প খাতে নিম্ন প্রবৃদ্ধি হার (২০০৮ ০৯ অর্থবছরে ৫.৯২ শতাংশ) এবং নিম্ন বিনিয়োগ জিডিপি অনুপাত (২৪.২ শতাংশ)

চিত্র ২.৯: নির্ধারিত কিছু শিল্পে উৎপাদনের পরিবর্তন: অর্থবছর ২০০৭-০৮ ও অর্থবছর ২০০৮-০৯ (জুলাই ফেব্রুয়ারি)

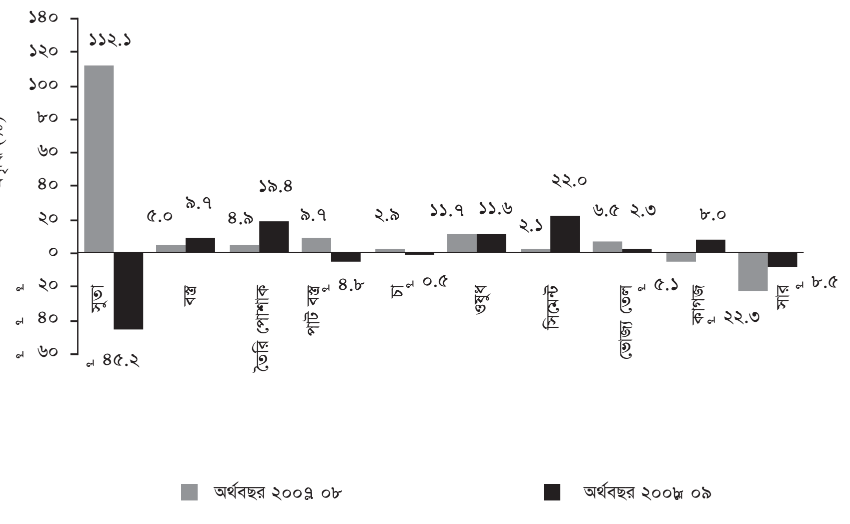

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

এর বড় বৈশিষ্ট্য, যেখানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রায় একই রকম অগ্রগতি হচ্ছে। ২০০৮ ০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বিশেষত উৎপাদন, রপ্তানি এবং বড় বড় শিল্প খাতের কর্মসংস্থানের ওপর বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে (চিত্র ২.৯)। এর আলোকে ২০০৯ ১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটকে শিল্প উৎপাদন, রপ্তানি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রণোদনা দিতে রাজস্ব উদ্যোগ ও বাজেট সহায়তা সংক্রান্ত নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে, যা ২০০৯ ১০ অর্থবছরের শিল্প প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটকে সরকারের সম্প্রতি গৃহীত শিল্পনীতি বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে দেখা উচিত।

স্থানীয় শিল্পে সহায়তা

বিশ্ব অর্থনীতির ধীরগতির আলোকে প্রয়োজনীয় রাজস্ব এবং বাজেট সহায়তার মাধ্যমে স্থানীয় বাজারকেন্দ্রিক শিল্পের প্রবৃদ্ধি টেকসই রাখা ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটের মূল নীতিগত অবস্থান বলে ধরে নেওয়া যায় (বাজেটে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ৬ থেকে ৬.৫ শতাংশ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে)। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে বিভিন্ন ধরনের আমদানিকৃত কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্য এবং প্রস্তুত পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বৃদ্ধি/হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা স্থানীয় শিল্প সংরক্ষণের কার্যকরী হার বাড়াতে পারে। তবে এসব পরিবর্তন সামগ্রিক কর ভারের ওপর তেমন কোন প্রভাব ফেলবে না; সিপিডির হিসাবে এক্ষেত্রে ১.৫ শতাংশ হ্রাস হবে।[১২] প্রস্তাবিত পরিবর্তনের আলোকে বিভিন্ন শিল্প, যেমন ফুটওয়্যার, সিরামিক, টাইলস, টেবিলওয়্যার, স্যানিটারিওয়্যার এবং অন্যান্য সিরামিক পণ্য, লিকুইড গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ ও অন্যান্য ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য এবং হার্ডবোর্ডের মতো শিল্প উপকৃত হবে। কিছু আমদানিকৃত পণ্য, যেমন পার্টিকেল বোর্ড, হার্ডবোর্ড, মধ্যম ঘনত্বের ফাইবার বোর্ড, প্লাইউড, চামড়াজাত পণ্য, মশার কয়েল, ইমিটেশন জুয়েলারি, করোগেটেড কার্টুনস এবং টুথব্রাশের সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। এসব উদ্যোগ আমদানি পরিপূরক শিল্পে সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

ভ্যাট প্রত্যাহারের কারণে স্থানীয় রেফ্রিজারেটর ও মোটর সাইকেল প্রস্তুতকারকেরা লাভবান হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বাজেটে অ্যালুমিনিয়াম, বিড়ি, ইউনানী, হারবাল ও আয়ুর্বেদিক, গ্লাস শীট, ফার্নিচার এবং মেশিনে তৈরি বিস্কুটের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহারের প্রস্তাব স্থানীয় শিল্পকে সহায়তা করবে। তবে বাণিজ্যিক এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রে টিভি অ্যাসেম্বলিং শিল্প প্রস্তাবিত একই শুল্কের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

প্রণোদনা প্যাকেজ

বৈশ্বিক আর্থিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পগুলোকে লক্ষ্য করে ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের বাজেটে সরকার ৩,৪২৪ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করে। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে ৫,০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ দিয়ে দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয় (সারণি ২.৯)। তবে এই থোক বরাদ্দের বিস্তারিত বিবরণ দলিলে উল্লেখ করা হয়নি। মনে হচ্ছে যে, ২০০৯ ১০ অর্থবছরের জন্য এই তহবিলের বিতরণ পূর্বে ঘোষিত (২০০৮ ০৯) প্রণোদনা প্যাকেজের নীতিমালার ওপর নির্ভর করবে।[১৩]

[১২] বর্তমান অধ্যায়ের ২.৩ অংশে বিস্তারিত দেখুন। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেট দলিল কাঁচামাল আমদানির সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু শুল্কের পরিবর্তনের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। শিল্পে ব্যবহৃত লবণের ওপর আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়; একই সঙ্গে ডেক্সট্রোজ হাইড্রোজের আমদানি শুল্ক বিলোপ করা হয়। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ গুঁড়ো দুধ আমদানিতে ২.৫ শতাংশ ভ্যাট নির্ধারণ করা হয়। সিগারেটের ওপর ভ্যাট প্রস্তাবিত ২৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৮ শতাংশে উন্নীত করা হয়। বৈদ্যুতিক তারের কাঁচামালের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়।

[১৩] ২০০৯ সালের ২০ জুন সিপিডি আয়োজিত বাজেট সংলাপে অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে ২০০৯ ১০ অর্থবছরে আগের বিতরণ পদ্ধতিই অনুসরণ করা হবে।

সারণি ২.৯: ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ

নির্দেশক	বিষয়	প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণার আগে এপ্রিল ২০০৯	প্রণোদনা প্যাকেজ	
			অর্থবছর ২০০৮-০৯	অর্থবছর ২০০৯-১০
মোট প্যাকেজ	৩৪২৪ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা		
মনোনীত খাতগুলোতে রাজস্ব সহায়তা				
পাট	রপ্তানি প্রণোদনা	৭.৫%	১০.০%	১০.০%
চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	রপ্তানি প্রণোদনা	১৫.০%	১৭.৫%	১৭.৫%
চিংড়ি এবং অন্যান্য মাছ	রপ্তানি প্রণোদনা	১০.০%	১২.৫%	১২.৫%
স্থানীয় ফেব্রিক	রপ্তানি প্রণোদনা	৫.০%	৫.০%	৫.০%
হোগলা, খড়, আখের ছোবড়া থেকে তৈরি পণ্য	রপ্তানি প্রণোদনা	১৫-২০.০%	১৫-২০.০%	১৫-২০.০%
সবজি ও ফলসহ কৃষি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য	রপ্তানি প্রণোদনা	২০.০%	২০.০%	২০.০%
তামাক	রপ্তানি প্রণোদনা	১০.০%	১০.০%	১০.০%
আলু	রপ্তানি প্রণোদনা	১০.০%	১০.০%	১০.০%
বাইসাইকেল	রপ্তানি প্রণোদনা	১৫.০%	১৫.০%	১৫.০%
ক্রাশড বোন	রপ্তানি প্রণোদনা	১৫.০%	১৫.০%	১৫.০%
হ্যাচিং ডিম এবং ১ দিনের মুরগীর বাচ্চা	রপ্তানি প্রণোদনা	১৫.০%	১৫.০%	১৫.০%
হালকা প্রকৌশল পণ্য	রপ্তানি প্রণোদনা	১০.০%	১০.০%	১০.০%
লিকুইড গ্লুকোজ (শুধুমাত্র ইপিজেড এলাকার জন্য)	রপ্তানি প্রণোদনা	২০.০%	২০.০%	২০.০%
হালাল মাংস	রপ্তানি প্রণোদনা	২০.০%	২০.০%	২০.০%
বাজেটীয় এবং নীতি সহায়তা				
এসএমই তহবিল	১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি	৫০০ কোটি টাকা	৬০০ কোটি টাকা	-
আইপিএফএফ			৪০০ কোটি টাকা	-
সমমূলধনী তহবিল		৩০০ কোটি টাকা	৩০০ কোটি টাকা	১০০ কোটি টাকা (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)
রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল	ঋণ সীমা ১ মিলিয়ন ডলার থেকে ১.৫ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত	১০০ মিলিয়ন ডলার	১৫০ মিলিয়ন ডলার	-
রপ্তানি ঋণ সুবিধা	কম সুদে (৭%) ঋণ সুবিধা; পরিশোধ মেয়াদের সম্প্রসারণ	সব রপ্তানি পণ্যের জন্য নয়	সব রপ্তানি পণ্য ১২০ দিন	সব রপ্তানি পণ্য ১২০ দিন
পোশাক শ্রমিকদের জন্য রেশন সহায়তা			বিদ্যমান	বিদ্যমান
নগদ সহায়তা পরিশোধের পদ্ধতি			৭০ শতাংশ ভর্তুকি তাৎক্ষণিক পরিশোধ	৭০ শতাংশ ভর্তুকি তাৎক্ষণিক পরিশোধ

উৎস: অর্থ বিভাগ।

এই প্যাকেজের অংশ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিমুখী শিল্প, যেমন – পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য এবং চিংড়ি শিল্পকে অতিরিক্ত সহায়তার জন্য (বিদ্যমান ১০-১৫ শতাংশ ভর্তুকির সঙ্গে ২.৫ শতাংশ যোগ করে) মনোনীত করা হয়। বস্ত্র শিল্পের পশ্চাদমুখী সংযোগ খাত, বাইসাইকেল,

হালকা প্রকৌশল পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যে বিদ্যমান নগদ সহায়তা বহাল থাকবে। পাশপাশি সরকার সময়মতো নগদ সহায়তার বিতরণ, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে বরাদ্দ বৃদ্ধি, হ্রাসকৃত হারে সুদ (৭ শতাংশ) সব খাতে রপ্তানি ঋণের সম্প্রসারণ এবং পোশাক শ্রমিকদের জন্য রেশন সুবিধাসহ রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য বিভিন্ন নীতি সহায়তার ঘোষণা করেছে।

বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম চাঙ্গা করতে সরকার ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজে বিশেষ অর্থায়ন স্কীম ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটিজ (আইপিএফএফ) স্কীমে ৪০০ কোটি টাকা, এসএমই তহবিলে ৬০০ কোটি টাকা, গৃহায়ণ তহবিলে ৫০০ কোটি টাকা এবং সমমূলধনী তহবিলে ৩০০ কোটি টাকা। তবে এসব তহবিলের একটি বড় অংশ অব্যবহৃত রয়েছে যা ২০০৯ ১০ অর্থবছরে ব্যবহারের জন্য থাকবে।

সিপিডি তার বাজেট প্রস্তাবনায় বিভিন্ন খাতে কারিগরি ও ব্যবহারিক দক্ষতা এবং পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে কয়েকটি তহবিলের সুপারিশ করেছিল। এসব প্রস্তাবের মধ্যে ছিল বড় বড় শিল্পের উন্নয়ন ও সহায়তায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন তহবিল, দেশের বিভিন্ন এলাকায় ক্লাস্টার নির্ভর শিল্প এলাকার উন্নয়নে ক্লাস্টার উন্নয়ন তহবিল এবং চিংড়ি উৎপাদন পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের জন্য তহবিল গঠন। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের এডিপির আওতায় এসব তহবিল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

২.৫.৩ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতের জন্য বর্ধিত বরাদ্দ এবং তার কার্যকর ব্যবহার ২০০৯ ১০ অর্থবছরে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেওয়ার জন্য ১,০০০ কোটি টাকার সমন্বয়ে তিনটি তহবিল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রণোদনা প্যাকেজের অংশ হিসেবে এসএমই তহবিলের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে, যার ফলে এই তহবিলের আওতায় বরাদ্দ বেড়ে ৬০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। সমমূলধনী তহবিল সংশ্লি ষ্টতথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নে বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এই অতিরিক্ত বরাদ্দের ইতিবাচক অবদান স্বীকার করার পরও বলা প্রয়োজন যে, এ খাতের উন্নয়নে আরও অনেক কিছু করার দরকার হবে। সনাতন নয় এমন কিছু খাত উৎপাদন, রপ্তানি এবং কর্মসংস্থানের বিবেচনায় তাদের সম্ভাবনা দেখাতে পেরেছে এবং এসব খাত সরকারের বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।[১৪] এ প্রেক্ষিতে প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণের সুদের হারের সীমা ১৩ শতাংশে বেঁধে দেওয়া সংক্রান্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত সঠিক পদক্ষেপ এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা উচিত। আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই সুদ হার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের সকল বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোকে কার্যকর সেবা প্রদানে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা শক্তিশালী করা দরকার। ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচি পরীক্ষামূলক পর্যায় থেকে এখনও বের হয়ে আসতে পারেনি। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে কোন বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত সংশ্লি ষ্টউন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনকে ফোকাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সঠিক উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এ প্রেক্ষিতে

[১৪]এই তহবিল থেকে অন্যান্য সম্ভাবনাময় শ্রমঘন শিল্প, যেমন – হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক, মেলামাইন এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্পে অর্থ বিতরণ করা হতে পারে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালনা, কারিগরি এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়নে লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

২০০৯ ১০ অর্থবছরের এডিপিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংশ্লি ষ্টকিছু প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত থাকলেও এসব প্রকল্পে কোন সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে পোশাক শিল্প পার্ক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (বিসিক) সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মঙ্গা কবলিত অঞ্চলের লোকদেরকে সহায়তা, বেনারসী পল্লী উন্নয়ন, বিসিক প্লাস্টিক এস্টেট, বিসিক অটোমোবাইল এস্টেট, তিনটি বিসিক এস্টেটের সম্প্রসারণ এবং একটি শিল্প পার্ক। প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে, এসব প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ করবে।

রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে বাংলাদেশে নারী উদ্যোগ এখনও যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি। নারী উদ্যোগকে লক্ষ্য করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অর্থায়ন দেশের নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। এরূপ সকল অর্থায়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দের অন্তত ১৫ শতাংশ নারী উদ্যেক্তাদেরকে প্রদানের মাধ্যমে ১০ শতাংশ সুদ হারের প্রস্তাব নারী উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

কুটির শিল্প

বাংলাদেশে কুটির শিল্পের উন্নয়ন আর্থিক, কারিগরি ও সংশ্লি ষ্টঅন্যান্য জটিলতার কারণে বাধাগ্রস্ত। কুটির শিল্পগুলো বর্তমানে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি পায়। এর পরিবর্তে এসব শিল্প মাত্র ৪ শতাংশ হারে টার্নওভার ট্যাক্স পরিশোধ করে, যার ফলে উৎপাদন ব্যয় কম হয়। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে কুটির শিল্পের জন্য ভ্যাট অব্যাহতি পাওয়ার উপযুক্ততা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ভ্যাট অব্যাহতির সীমা বড় কুটির শিল্প ইউনিটে প্ল ান্ট ও যন্ত্রপাতির মূল্য ১৫ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ লাখ টাকা করা হয়েছে (সারণি ২.১০)। কুটির শিল্প ক্যাটাগরির আওতায় সাব্ল কন্ট্রাকটিং শিল্পকে ভ্যাট নিবন্ধিত ইউনিটের বাইরে রাখার নিয়ম প্রত্যাহার করার ফলে বিদ্যমান সুবিধার উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়বে। এর পাশাপাশি কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে ভ্যাটের বার্ষিক টার্নওভারের সীমা ২৪ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০ লাখ টাকা করায় এই শিল্পের কর সংক্রান্ত ব্যয় কমবে বলে আশা করা যায়। সরকার আবগারি শুল্কমুক্তি ব্যাংক আমানতের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০,০০০ টাকায় উন্নীত করেছে, যা ক্ষুদ্র আমানতকারীদেরকে সঞ্চয়ে আরও উৎসাহিত করবে।

সারণি ২.১০: কুটির শিল্পের জন্য ভ্যাট অব্যাহতি

বিষয়	অর্থবছর ২০০৮ ০৯	অর্থবছর ২০০৯ ১০
ব্যবসা ইউনিটের ধরন	কোম্পানি নয়	কোম্পানি নয়
প্ল ান্ট ও যন্ত্রপাতির মূল্য	<টাকা ১৫ লাখ	<টাকা ২৫ লাখ
টার্নওভার	<টাকা ২৪ লাখ	<টাকা ৪০ লাখ
সাব্ল কন্ট্রাকটিং	অনুমোদিত নয়	অনুমোদিত

উৎস: বাজেট দলিলের আলোকে সিপিডির তৈরি।

যদিও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থায়নের ঘাটতি একটি বড় বাধা, তদুপরি এর উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরও বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা, যেমন – কার্যসম্পাদন, বিপণন, কার্যপ্রণালী এবং শুল্ক বহির্ভূত বাধাসমূহও বিদ্যমান রয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং কুটির শিল্পের পণ্য ও পণ্যের মানোন্নয়ন এবং বাজার সক্ষমতা অর্জনের জন্য কারিগরী সহায়তার প্রয়োজন, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে উল্লেখিত শিল্পসমূহকে প্রতিযোগিতাক্ষম করে তুলতে সাহায্য করবে।

২.৫.৪ সেবা সংশ্লিষ্ট শিল্প

যদিও সেবা খাত দেশের জিডিপিতে প্রায় অর্ধেক অবদান রাখে, কিন্তু এই খাত সরকারের রাজস্ব ও বাজেটীয় উদ্যোগে তুলনামূলক কম গুরুত্ব পায়। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে কিছু সেবা সম্পর্কিত শিল্প, বিশেষত মানবসম্পদ সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা এবং জনশক্তি রপ্তানি খাত সংকুচিত মূল্য ভিত্তিনির্ভর (truncated) পদ্ধতির মাধ্যমে (৩০ শতাংশ) ভ্যাটের আওতায় এসেছে। এর ফলে বিদেশ গমনেচ্ছুক অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য খরচ বাড়বে, যেখানে ভ্যাটের অতিরিক্ত ভার প্রক্রিয়াকরণ মূল্যের আকারে শ্রমিকদের ওপর পড়তে পারে।[১৫] বাজেটে ডাক্তারদের ফি থেকে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে এটা অস্পষ্ট যে, এই অব্যাহতি গরীব রোগীদের ফি কতটুকু কমাবে। কারণ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের ফি থেকে যে ভ্যাট আসতো তা কর কাঠামোতে সমন্বয় করা হয়নি।

বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে এডিপি বরাদ্দ ২০০৯ ১০ অর্থবছরে বাড়ানো (২০০ কোটি টাকা) হয়েছে। ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে এই মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৫ কোটি টাকা। এডিপিতে বরাদ্দ করা অর্থ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য, যেমন, টেকনাফ ও সেন্টমার্টিনে পর্যটন অবকাশ কেন্দ্র নির্মাণ এবং দেশের পাঁচটি ভিন্ন এলাকায় পর্যটন সুবিধা স্থাপনে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, তুলনামূলকভাবে অনুন্নত এলাকায় পর্যটন শিল্পে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এসব এলাকায় প্রধানত বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে সাধারণ সুযোগ্য সুবিধা নির্মাণের দরকার হবে।

২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে একটি "দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল" গঠনের প্রস্তাব করা হয়। সিপিডির বাজেট প্রস্তাবনায় এ ধরনের তহবিলের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেট অনুসারে এই তহবিল দেশের বাইরে শ্রম বাজারের সম্প্রসারণ, নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধানের জন্য গবেষণা, সম্ভাব্য শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং প্রত্যাগত অভিবাসীদের পুনঃপ্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হবে। যদিও এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ, তথাপি দেশের পূর্ণ ও অর্দ্ধ বেকার শ্রমিকদের সহায়তার জন্য আরও সম্পদ বরাদ্দ করা উচিত। কেননা অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ২০০৮ ০৯ অর্থবছরে অতিরিক্ত ৩ লাখ শ্রমিক দেশের স্থানীয় শ্রম বাজারে প্রবেশ করতে পারে।

২.৫.৫ পুঁজিবাজারের উন্নয়ন

সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক চাঙ্গাভাব থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে নানান কাঠামোগত দুর্বলতা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা বাড়ানো দরকার। বিশেষত বড় বড় কোম্পানির অংশগ্রহণ আরও উৎসাহিত করা প্রয়োজন। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন থাকা উচিত; বাজারের বিস্তৃতি বাড়াতে নতুন আর্থিক পণ্যের সূচনা করতে হবে। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানির অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে তালিকাভুক্ত এবং অ্ তালিকাভুক্ত কোম্পানির কর্পোরেট কর হারের মধ্যে ১০ শতাংশ পার্থক্য বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর উচ্চ কর হার বিবেচনায় সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট কর ৪৫ শতাংশ থেকে ২.৫ শতাংশ কমিয়ে তা ৪২.৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছে।

যদিও সরকার পুঁজিবাজার শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে, তবে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে তেমন অগ্রগতি হয়নি। রাষ্ট্রায়াত্ত কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংক মার্চেন্ট ব্যাংক হিসেবে নিবন্ধন করায়

[১৫]সরকার পরবর্তীতে তার অবস্থান পরিবর্তন করে; এর ফলে ২০০৯ সালের ৩০ জুন অনুমোদিত অর্থ বিলে জনশক্তি রপ্তানির ওপর ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়।

প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ আরও গভীর হবে, তবে এ জন্য এক্সচেঞ্জ কমিশনকে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও তদারকি ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর গ্রামীণফোনের প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের মাধ্যমে শেয়ার ছাড়ার প্রক্রিয়া বেশ সাড়া জাগিয়েছে।[১৬]

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে প্রতিষ্ঠিত "পুঁজিবাজার ইনস্টিটিউট" গবেষণা ও প্রশিক্ষণ জোরদার করতে, বিশেষত বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বাড়াতে সহায়তা করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন কোম্পানির ঝুঁকির ওপর নির্ভর করে তাদের শেয়ার শ্রেণীভুক্ত করার বাজারভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন এবং পুঁজিবাজারে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে একটি আলাদা বিচার প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা – এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা দরকার।

পুঁজিবাজারের ভিত্তি গভীর করতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার বাজারে ছাড়া একটি কার্যকর কৌশল হতে পারে। বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতার কারণে এর আগে ২১টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বাজারে ছাড়ার কাজটি ভালোভাবে এগোয়নি। রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে একটি নির্দিষ্ট সময়কেন্দ্রিক পরিচালন কৌশলের দরকার।

পিপিপির আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর জন্য পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের উদ্যোগ বাজারের ভিত্তি আরও গভীর করতে সহায়তা করবে। বন্ড ছাড়ার মাধ্যমে পদ্মা সেতু নির্মাণের তহবিলের একটি অংশ যোগাড় করা বাজার ভিত্তি গভীর করার ক্ষেত্রে কার্যকর কৌশল হতে পারে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জকে শক্তিশালী করতে *ডিএসই ভিশন ২০১৩* এর মাধ্যমে ট্রেডিং পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, নতুন আর্থিক পণ্যের সূচনা, ট্রেড নেটওয়ার্ক জোরদার এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরিবীক্ষণ কৌশলের উন্নয়ন প্রত্যাশা করা হয়েছে (সারণি ২.১১)।[১৭]

সারণি ২.১১: ডিএসই ভিশন ২০১৩ (৫বছর মেয়াদি পরিকল্পনা)

ইস্যু	ভিত্তি বছর (২০০৮)	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৩)
মুদ্রা সম্পর্কিত ইস্যু		
বাজার মূলধন বৃদ্ধি	১৩ বিলিয়ন ডলার	৩০ বিলিয়ন ডলার
জিডিপির অনুপাতে বাজার মূলধন বৃদ্ধি	১৯.৭৪%	৩৫%
প্রাত্যহিক লেনদেন বৃদ্ধি	৩০০ কোটি টাকা	২০০০ কোটি টাকা
মুদ্রা বহির্ভূত ইস্যু		
		দেশব্যাপী ট্রেডিং সুবিধা সম্প্রসারণ বুক বিল্ডিং পদ্ধতির সূচনা আর্থিক ব্যুৎপত্তির সূচনা নির্ধারিত আয়ের বিনিয়োগ বাজার চালু ইন্টারনেটে ট্রেডিং চালু ৩০ লাখ পরিবারকে ট্রেডিং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা মানব সম্পদের পেশাদারিত্ব আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কাঠামোর সম্প্রসারণ প্রকৃত অনলাইন ন্যাশনাল ক্লিয়ারিং হাউজ প্রতিষ্ঠা *ভিশন ২০১৩* এর সঙ্গে মানানসই প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন ও বিধি পর্যালোচনা বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা কার্যক্রম জোরদার

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, ২০০৮।

[১৬]গ্রামীণফোনের কিছু শেয়ার সম্প্রতি বাজারে ছাড়া হয়েছে।

[১৭]*ডিএসই ভিশন ২০১৩* এর আওতায় বাজার মূলধন ৩০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের জিডিপির ৩৫ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রয়েছে – দৈনন্দিন লেনদেন বর্তমানের ভিত্তি পর্যায়ে ৩০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,০০০ কোটি টাকা করা, বিভিন্ন পদ্ধতির সূচনা, বিদ্যমান নিয়ম কানুন ও বিধি পর্যালোচনা ইত্যাদি।

২.৫.৬ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠনে ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে খসড়া শিল্পনীতি ২০০৯ তে উল্লেখিত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে। বাজেট দলিল অনুসারে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান নিশ্চিত না করে সরকার ২০০৯ ১০ অর্থবছরে কোন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করবে না। উল্লেখ করা প্রয়োজন, সরকারের এই নীতি অবস্থান বেসরকারিকরণ আইন ২০০০, বেসরকারিকরণ নীতি ২০০৭ এবং পাটনীতি ২০০৫ এর মতো নানান খাতভিত্তিক নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এক্ষেত্রে একটি সমন্বিত নীতি প্রয়োজন।

২০০৯ ১০ অর্থবছরের এডিপিতে রাষ্ট্রীয় ম্যালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর আধুনিকায়ন এবং উন্নয়নের জন্য কিছু প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এসব প্রকল্পের বিপরীতে কোন সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা হয়নি। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে সাতটি চিনিকলে যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন, ফরিদপুর চিনিকলের ভারসাম্য আনয়ন, আধুনিকীকরণ ও প্রতিস্থাপনা সাধন, কেরুতে জৈবিক সার প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন চিনিকলে বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প, বিসিকের আওতায় ১০টি প্রকল্প, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতায় ছয়টি প্রকল্প এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর আওতায় একটি প্রকল্প।[১৮] তবে বড় অংকের পরিচালন লোকসান, ক্লু ঋণ এবং দুর্বল উৎপাদনশীলতার উত্তরণ না ঘটাতে পারলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক করা কঠিন হবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপকভাবে ঋণগ্রস্ত। তাদের খেলাপি ঋণ ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে দাঁড়ায় ১,০৫৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা যা তাদের মোট ঋণ স্থিতির ১৬.৭ শতাংশ। চিত্র ২.১০ এ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেশনের সামগ্রিক ঋণ স্থিতি এবং খেলাপি ঋণ পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে।

চিত্র ২.১০: কয়েকটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ঋণ স্থিতি এবং শ্রেণীকৃত ঋণের অবস্থা

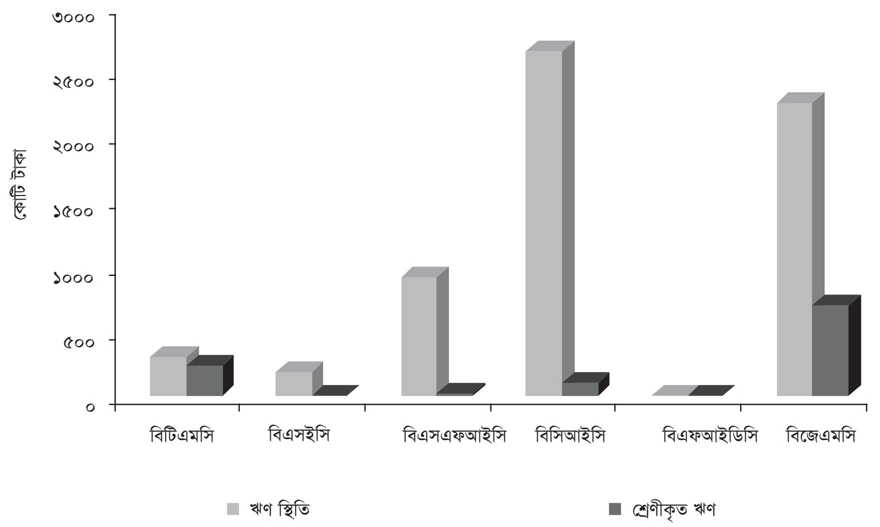

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮ ০৯।

দ্রষ্টব্য: বিটিএমসি: বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন; বিএসইসি: বাংলাদেশ স্টীল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন; বিএসএফআইসি: বাংলাদেশ সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন; বিসিআইসি: বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন; বিএফআইডিসি: বাংলাদেশ ফরেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন; বিজেএমসি: বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন।

[১৮] সম্প্রতি সরকার আগামী দুই বছরের মধ্যে ১৩টি বন্ধ পাটকল চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর বেসরকারিকরণের দায়িত্বে রয়েছে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন। বর্তমানে মোট ২৬টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ার আওতায় রয়েছে। যদিও সরকার এ ধরনের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সব দায় বহনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবে এসব দায় দেনা মেটাতে বাজেটে কোন নির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা হয়নি।

২.৫.৭ গৃহায়ণ এবং আবাসন

গৃহায়ণ এবং আবাসন খাতের উন্নয়নে ২০০৯–১০ অর্থবছরের বাজেটে নানান পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছে। সরকার জাতীয় গৃহায়ণ নীতি ১৯৯৯ সংশোধন এবং বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড ১৯৯৩ সংস্কারে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছে। ২০০৯–১০ অর্থবছরের বাজেটে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি সংস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ভূমির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

২০০৯–১০ অর্থবছরের বাজেটে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের শর্তে (ফ্ল্যাট/বাড়ির আকার অনুসারে) অর্থের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন ছাড়াই ফ্ল্যাট ক্রয় অথবা বাড়ি নির্মাণে বিনিয়োগ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ম আবাসন খাতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ নিতে বড় অঙ্কের অপ্রদর্শিত অর্থ এ খাতকে লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিতে পারে।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০০৯–১০ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে। ২০০৮–০৯ অর্থবছরে মোট এডিপি বরাদ্দ ছিল ৩১৯ কোটি ১২ লাখ টাকা, যা ৭০ শতাংশ বাড়িয়ে ২০০৯–১০ অর্থবছরে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৫৪৪ কোটি ৬১ লাখ টাকা। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিম্ন ও মধ্য আয়ের লোকদের জন্য ২২,৮০০ প্লট ও ২৬,০০০ অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণে তিন বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এগুলো আগের বছরে নেওয়া প্রকল্পগুলোর ধারাবাহিকতা। অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং ভাসমান লোকজনের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ভূমিহীন ও গরীব লোকদের মধ্যে খাস জমি বিতরণে একটি আলাদা নীতি প্রণয়ন আরেকটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

২.৫.৮ ভৌত অবকাঠামো

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

২০০৯–১০ অর্থবছরের বাজেটে এডিপির আওতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জন্য ৬৪টি প্রকল্পে ৫৪৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে। এটি ২০০৮–০৯ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দের (২৯৪ কোটি ৩১ লাখ টাকা) চেয়ে ৮৫ শতাংশ বেশি। তবে বিজ্ঞান ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য ১৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট এডিপি বরাদ্দের মাত্র ০.৪৭ শতাংশ।

২০০৯–১০ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের জন্য বাজেট প্রস্তাবনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত। সরকার কার্যকর ই-গভর্নেন্স নিশ্চিত করতে ফাইলনির্ভর প্রশাসনকে ডিজিটাল প্রশাসনে রূপান্তর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে আইসিটি রোডম্যাপ চূড়ান্ত হবে বলে আশা করা যায়। এর পাশপাশি ই-বিজনেস উৎসাহিত করতে সফটওয়্যার শিল্পে প্রণোদনা, প্রত্যন্ত এলাকায় ইন্টারনেট সেবার সম্প্রসারণ এবং ইন্টারনেট চার্জ কমানোর প্রতিশ্রুতি

দেওয়া হয়েছে।[১৯] এ সত্ত্বেও কিছু উদ্বেগ রয়েছে। কেননা ইন্টারনেট সংযোগের ব্যাপ্তি ও মূল্য নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

বিদ্যমান ৩০০ টাকা সুনির্দিষ্ট শুল্কের পরিবর্তে মূল্য ভিত্তিতে (অ্যাড ভেলোরেম) মোবাইল ফোন সেটের ওপর ২৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের ঘোষণায় বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া হবে। এর ফলে উচ্চমূল্যের সেটের ওপর উচ্চ শুল্ক এবং কম মূল্যের সেটের ওপর কম শুল্ক নির্ধারিত হবে। এদিকে নিম্নমূল্যের মোবাইল ফোনের ওপর আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশের পরিবর্তে ১২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতায় এই শিল্প যদি প্রভাবিত হয় তাহলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের জরুরি ব্যয় মেটাতে ১০০ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বরাদ্দ প্রয়োজনের সময় কাজে লাগবে।

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হলে মোবাইল ফোন অপারেটরদের জন্য ৩৫ শতাংশ কর্পোরেট কর নির্ধারণ একটি নতুন প্রস্তাব। গ্রামীণফোন ছাড়া অন্যান্য অপারেটরদের মধ্যে এই হ্রাসকৃত কর হারের সুযোগ নিতে এখনও দেখা যায়নি। ছয়টি বিভাগীয় প্রধান কার্যালয় সহ ২৩টি জেলায় নেটওয়ার্ক নির্মাণ আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব। এর ফলে ব্যবসা, শিক্ষা এবং অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশ অধিকতর সম্পৃক্ত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২.৫.৯ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বাজেটে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পুনঃলক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ (২০১৩ সালের মধ্যে ৪,১৬০ মেগাওয়াট), পিপিপির ওপর গুরুত্বারোপ, পিপিপির মাধ্যমে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সৌর শক্তির মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও কয়লা আমদানির উল্লেখ রয়েছে। চিত্র ২.১১ এ বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্যের খাতওয়ারী বিনিয়োগের পরিমাণ দেখা যায়।

চিত্র ২.১১: ২০০৯ সালের মধ্যে সমাপ্য বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্পগুলোতে বিনিয়োগ

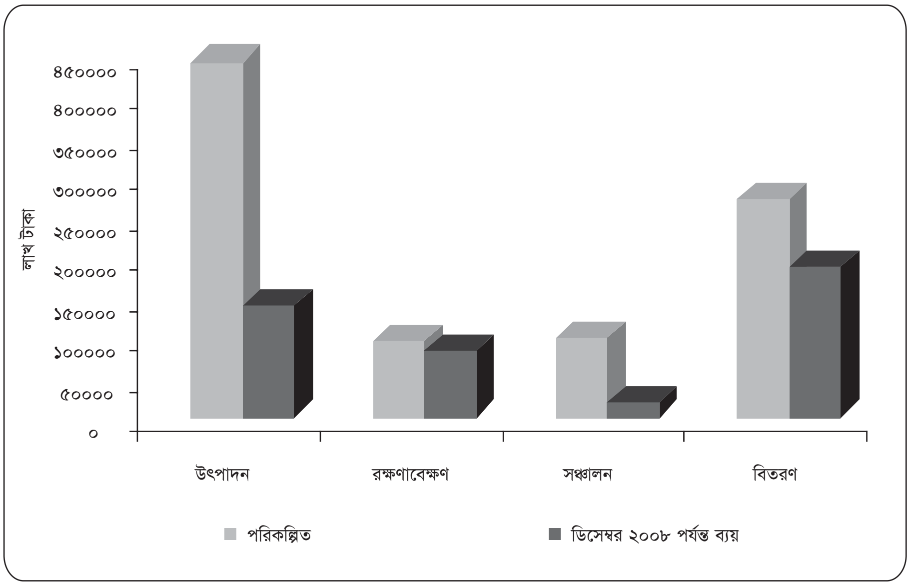

উৎস: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, বাংলাদেশ সরকার, ২০০৯।

[১৯] এটা ইতিবাচক এ কারণে যে সরকার শেষ পর্যায়ে এসে প্রস্তাবিত কম্পিউটার এবং এর যন্ত্রাংশের ওপর থেকে অগ্রিম আয়কর সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়।

২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে ৪,৩১০ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে, যা সংশোধিত বাজেটের চেয়ে প্রায় ৪৮ শতাংশ বেশি। এক্ষেত্রে এডিপি বরাদ্দ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির চেয়ে ৩৩.৫৪ শতাংশ এবং মূল এডিপির চেয়ে ২ শতাংশ বেশি।

২০০৯ সালের মধ্যে সমাপ্য বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্পগুলোর জন্য মোট বরাদ্দ রয়েছে ৯১৬ কোটি ৯০ লাখ টাকা, যার মধ্যে ৪২৯ কোটি ৭০ লাখ টাকা (৪৬.৮৭ শতাংশ) ছাড় দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সেক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ের মাত্র ৩১.৫ শতাংশ অর্থ ছাড় করা হয়েছে। যদিও ২০০৯ ১০ অর্থবছরের এডিপিতে কোন নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়নি, সরকারের এখন ২০০৮-০৯ অর্থবছরের এডিপির অসমাপ্ত কাজ শেষ করা দরকার।

দেখা গেছে, বড় বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে ধীরগতি খুবই প্রকট (সারণি ২.১২)। সকল প্রকল্পের একই ভাগ্য, অর্থাৎ নিম্ন বাস্তবায়ন হার। শিকলবাহা পাওয়ার প্ল ান্ট ২০১০ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা এক রকম শুরুই হয়নি (প্রকল্প বাস্তবায়ন হার মাত্র ০.১৬ শতাংশ) এবং সিলেট পাওয়ার প্ল ান্টের বাস্তবায়ন হার মাত্র ৫.৩৫ শতাংশ যা ২০১১ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। স্বতন্ত্র পাওয়ার প্ল ান্টগুলোর (আইপিপি) দরপত্র প্রক্রিয়ার জন্য কারিগরি সহায়তার প্রকল্প বাস্তবায়ন হার ৩৩.৩৩ শতাংশ, যা সর্বোচ্চ রেকর্ড। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পাওয়ার প্ল ান্ট রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পেরও নিম্ন বাস্তবায়ন হার লক্ষণীয় (১২.১১ শতাংশ)।

সারণি ২.১২: বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহের অবস্থা: ২০১০-২০১২

ক. বিনিয়োগ/প্রকল্প	পরিকল্পিত ব্যয় (লাখ টাকায়)	ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত ব্যয়	সমাপ্ত (শতাংশ)
উৎপাদন			
২০১০ সালের মধ্যে (শিকলবাহা ১৫০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্ল ান্ট)	৭৭৭৯৮	১২৪	০.১৬
২০১১ সালের মধ্যে (সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল ান্ট,	১০৩৭৪২	৫৫৫০	৫.৩৫
২০১২ সালের মধ্যে (হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল ান্ট)	৩২৭৮০৫	৪৯	০.০১
খ. কারিগরি সহায়তা			
বিদ্যুৎ খাতে সমতা উন্নয়ন কর্মসূচি (২০০৭-২০১০)	৩৯৯৯	২	০.০৫
আইপিপি প্ল ান্টের জন্য দরপত্র প্রক্রিয়ায় কারিগরি সহায়তা (২০০৭-২০১০)	৪৪৭	১৪৯	৩৩.৩৩
গ. জাপানের ঋণ মওকুফ তহবিল			
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পাওয়ার প্ল ান্ট রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত (কর্ণফুলী চতুর্থ ও পঞ্চম ইউনিটের সংস্কার) (২০০৫-২০১০)	২১৬৩৬	২৬২১	১২.১১

উৎস: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, বাংলাদেশ সরকার, ২০০৯।

দেশে এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ সংকট খুবই প্রকট এবং জরুরি ভিত্তিতে এর সমাধানের কথা বলা হচ্ছে। বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র ৩,৮০০ মেগাওয়াট, যার বিপরীতে বিদ্যুৎ চাহিদা ৫,০০০ মেগাওয়াট (জুন ২০০৯)। ২০২১ সালের মধ্যে এ চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে ২০,০০০ মেগাওয়াট। সরকার ২০১৩ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৫,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বাজেটে ২০০৯ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৯৪০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট আসবে সরকারি খাতের প্রকল্প থেকে এবং বেসরকারি খাতের প্রকল্প থেকে আসবে বাকি ৪৪০ মেগাওয়াট। এতে ২০১৩ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৪,১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে যার মধ্যে ১৩টি

সরকারি খাতের প্রকল্প থেকে আসবে ২,৮১০ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতের প্রকল্পগুলো থেকে আসবে ১,৩৫০ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য বাজেটে অতিরিক্ত ৮৩৭ কিলোমিটার পাওয়ার গ্রিড লাইন, ১৭টি সাব্ স্টেশন এবং ১৫,০০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে উল্লেখিত উৎপাদন ও বিতরণ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি।

বাজেটে খসড়া কয়লা নীতি চূড়ান্ত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সরকার কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর জন্য কয়লা আমদানির পরিকল্পনাও করছে। এজন্য জরুরি ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে; কেননা এটি সময়সাপেক্ষ কাজ এবং অবকাঠামোগত সুবিধা উন্নয়নে অনেক সময় লাগবে।

সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের জন্য কিছু রাজস্ব কার্যক্রম ঘোষণা করেছে। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে সৌর প্যানেলের ওপর ৩ শতাংশ আমদানি শুল্ক বিলোপ করা হয়েছে এবং আমদানি, স্থানীয় উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়েছে। বাজেটে অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের মাধ্যমে সৌরশক্তি প্ল্যান্ট স্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বাজেটে ফ্লোরেসেন্ট এনার্জি সেভিং বাল্বের যন্ত্রাংশ/কাঁচামালের ওপর ৭ শতাংশ আমদানি শুল্ক এবং ভ্যাট বাতিল করা হয়েছে। বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) প্রত্যন্ত অঞ্চলের গৃহস্থালীতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে যাবে। সৌর প্যানেলের ওপর শুল্ক হ্রাস এই উদ্যোগকে সহায়তা করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে সৌর প্যানেল স্থাপনে সহায়তা দেওয়ার জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি তহবিলও প্রতিষ্ঠা করেছে। বাজেটে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের ওপর নবায়ন ফি প্রত্যাহার করা হয়েছে যা সিপিডির প্রস্তাবনায় উল্লেখ ছিল। এছাড়া সরকার রূপপুরে সরকারি অর্থায়নে ১,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করছে। তবে এই প্রকল্পের সূচনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন বক্তব্য দেওয়া হয়নি।

গ্যাস

গ্যাস অনুসন্ধানের বিষয়ে বাজেটে পাঁচটি উন্নয়ন কূপ, চারটি ওয়ার্কওভার কূপ এবং চারটি উৎপাদন কূপ খননের কথা উল্লেখ করা হযেছে। এসব উদ্যোগের বাস্তবায়ন হলে অতিরিক্ত ২০৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তবে এডিপিতে এ বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। বাজেটে সমুদ্র উপকূলে গ্যাস অনুসন্ধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত দেওয়া দরকার। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানির (বাপেক্স) ক্ষমতা বাড়াতে বাজেটে একটি গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলো ভালো উদ্যোগ, তবে এক্ষেত্রে বাস্তবায়নই মূল চ্যালেঞ্জ হবে। বাজেটে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে গ্যাস আমদানির উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও পর্যন্ত জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি।

২.৫.১০ সামাজিক অবকাঠামো

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ

বাংলাদেশে রাজস্ব বরাদ্দের দিক থেকে ঐতিহ্যগতভাবে পরিবেশ একটি অবহেলিত বিষয়। পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি, বিশ্ব জলবায়ুর বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং বাংলাদেশের ওপর তার নেতিবাচক প্রভাবের কারণে বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশে পরিবেশ সচেতনতার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে প্রাকৃতিক দুর্যোগের

বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিরাপত্তা দিতে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলে বরাদ্দ ৩০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। এছাড়া, সরকার বুড়িগঙ্গা নদীকে দূষণ থেকে রক্ষা করতে এই এলাকায় যথাযথ বর্জ্য নির্গমন ব্যবস্থা ছাড়া শিল্প ইউনিট স্থাপনে বিধি নিষেধ আরোপ সহ বিশেষ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে।

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) পরিবেশ সম্পর্কিত দুর্যোগ মোকাবেলায় বাজেট সহায়তা হিসেবে ৪৯০ কোটি টাকা দিয়েছে। একই সঙ্গে জাপান জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় জাপান ঋণ মওকুফ তহবিলে ৭০০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। ট্রাস্ট ফান্ডে যুক্তরাজ্য এবং ডেনমার্ক সরকার ৯৭.৯ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট (ইটিপি) আমদানিতে মোট করভার প্রায় ২৪ শতাংশ। যদিও সিপিডি এই শুল্ক কমানোর পরামর্শ দিয়েছিল, তবে বাজেটে এ বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়নি। এটি মূলধনী যন্ত্রপাতির মতো সমানভাবে বিবেচনা করার দরকার রয়েছে।

স্বাস্থ্য

সার্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে দেশব্যাপী ১৩,৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এসব ক্লিনিক নতুন করে স্থাপিত হবে নাকি ইতিমধ্যে পরিচালিত ৮,৪৬৪ ক্লিনিক মিলিয়ে ওই সংখ্যা হবে তা স্পষ্ট করা হয়নি। আশা করা হচ্ছে পিপিপির ভিত্তিতে পরিচালিত এসব কমিউনিটি ক্লিনিক গ্রামীণ লোকজনের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষত মা ও শিশুর যত্ন, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, স্যানিটেশন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ডায়রিয়া প্রতিরোধ, পুষ্টি এবং যৌন রোগ সম্পর্কিত সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাজেটে অন্যান্য বড় প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৩৪টি উপজেলায় জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমের সম্প্রসারণের জন্য ১৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ, ৪৫টি উপজেলায় মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য সেবা ভাউচার কর্মসূচি সম্প্রসারণ (৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ) এবং উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতালগুলোর আধুনিকায়ন। তবে সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও বিতরণ পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য বাজেটে কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য অথবা বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে এডিপি বরাদ্দ রয়েছে ৩,৯১৪ কোটি ৫৫ লাখ টাকা, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৪০.৭২ শতাংশ বেশি। বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, যোগ্যতা বিবেচনায় নিবন্ধিত ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ অনুদান হিসেবে দেওয়া হবে। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সিপিডির প্রস্তাবনায় এসব উদ্যোগ বিবেচনা করার সুপারিশ ছিল।

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে তিনটি নতুন কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়ছে। এগুলো হচ্ছে – স্নাতক পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা; ছাত্রদের জন্য বৃত্তি; এবং মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন। তবে এসব নতুন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে কোন সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ অথবা নীতিমালার প্রস্তাব

করা হয়নি। ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ সৃষ্টিতে সরকার যথাক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১৩ সাল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০২১ সালের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সেবার ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের প্রস্তাব শিক্ষার্থীদের কাছে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে সহায়তা করবে। এগুলো প্রকৃতপক্ষে দূরদর্শী পদক্ষেপ যা দেশে প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির স্বপ্নপূরণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

জেন্ডার

এই বছরের বাজেটে তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতার মাত্রা বাড়াতে ইতিবাচক উদ্যোগ দেখা গেছে। প্রস্তাবিত বাজেটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জেন্ডার সমতা ব্যয় ২৬.৩ শতাংশ বলে দাবি করা হয়েছে যা ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের মতো একই রকম। প্রথমবারের মতো শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের জন্য নারী উন্নয়নে আলাদা বরাদ্দের কথা জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে। ওই তথ্য থেকে বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং সরকারি কর্মকাণ্ড থেকে তাদের সেবা গ্রহণের মাত্রা জানা যাবে। বাজেটে দরিদ্র প্রসূতি মাতাদের জন্য ভাতা ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে (সারণি ২.১৩)। এর জন্য ৩৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দের দরকার হবে, যা গত বছরের চেয়ে ১১ কোটি ১০ লাখ টাকা বেশি। একই সময়ে ‘শহর এলাকায় নিম্ন আয়ের কর্মজীবী প্রসূতি নারীর ভাতা’ নামে একই ধরনের আরেকটি নতুন কর্মসূচিতে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। বাজেটে উল্লেখিত এসব নতুন উদ্যোগগুলোতে ২২২ কোটি ২৮ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, আর এক্ষেত্রে উপকারভোগীর বড় অংশই হবে নারী শ্রমিক (সারণি ২.১৪)। আয়করের দিক থেকেও নারীদেরকে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে।

সারণি ২.১৩: জেন্ডার সমতা ও ক্ষমতায়নের আওতায় গৃহীত কর্মসূচিসমূহ

পদক্ষেপ	অর্থবছর ২০০৯	অর্থবছর ২০১০	পরিবর্তন (%)	সংশ্লেষ
জেন্ডার সমতা ব্যয়	মোট বাজেটে ২৬.৩%	পরিবর্তন উল্লেখ করা হয়নি	-	জেন্ডার সংবেদনশীলতা বাড়াতে সহায়ক হবে
দরিদ্র অসহায় সুযোগ বঞ্চিত এবং বিধবা নারীদের জন্য ভাতা	২৭০ কোটি টাকা; ২৫০ টাকা/মাস; লক্ষ্যমাত্রা: ৯০০,০০০ নারী	পরিবর্তন উল্লেখ করা হয়নি	-	মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনে ভূমিকা রাখবে
দরিদ্র প্রসূতি মাতাদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা	২১.৬ কোটি টাকা; ৩০০ টাকা/মাস; লক্ষ্যমাত্রা: ৬০,০০০ নারী	৩৩.৬০ কোটি টাকা; ৩৫০ টাকা/মাস; লক্ষ্যমাত্রা: পরিবর্তন উল্লেখ করা হয়নি	প্রকৃত বরাদ্দ ৫৫.৬% বৃদ্ধি	মাসিক ভাতা ১৬.৬৭% বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ
শহর এলাকায় নিম্নআয়ের মাতাদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা	২০ কোটি টাকা	২৫ কোটি টাকা	প্রকৃত বরাদ্দ ২৫% বৃদ্ধি	দরিদ্র নারী ও শিশুদের অবস্থান উন্নতি করতে আরেকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে
এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী নারী	১০ কোটি টাকা	এসিডদগ্ধদের জন্য ২ কোটি টাকা এবং বাকিটা প্রতিবন্ধীদের জন্য	প্রকৃত বরাদ্দ ৮০% হ্রাস	বাজেটের জেন্ডার সমতা বিধানের ক্ষেত্রে এ খাতে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে

উৎস: ২০০৮ ০৯ এবং ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেট দলিল।

সারণি ২.১৪: ২০০৯-১০ অর্থবছরে জেন্ডার বিষয়ক নতুন উদ্যোগসমূহ

উদ্যোগ	পদক্ষেপসমূহ
নারী ও মুক্তিযোদ্ধা আত্মকর্মসংস্থান তহবিল	২০ কোটি টাকা
খামারের জন্য সহায়তা	১০০ কোটি টাকা
দরিদ্রদের জন্য প্রকল্প	গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পে ১৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যেখানে দরিদ্র শ্রমিকদের নিয়োজিত করা হবে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুবিধার জন্য ৭৬ কোটি টাকা, উত্তরাঞ্চলে মঙ্গাক্রান্ত এলাকায় হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানে ১২ কোটি ৮৫ লাখ টাকা; চর এলাকার দরিদ্রদের পুনর্বাসন প্যাকেজের জন্য ৭৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা; এবং দরিদ্রদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ৫৭ কোটি ৮৩ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হবে; এসব কর্মসূচিতে অধিকাংশ শ্রমিকরা হবেন নারী
রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন	জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ১০০ তে উন্নীত করা হবে। এসব আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে
নারী উদ্যোক্তা	নারী উদ্যোগ উৎসাহিত করতে সরকার পৃথক ব্যাংকিং সুবিধা, নারীদের জন্য ঋণ এবং কারিগরি সুবিধা নিশ্চিত করবে। বাজেটে শুধুমাত্র ব্যবসার ক্ষেত্রেই জেন্ডার বৈষম্য নিরসনের কথা বলা হয়নি, সমস্ত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে শীর্ষ ব্যবস্থাপনার অবস্থানে অধিক সংখ্যক নারীকে নিয়ে আসার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে

উৎস: ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট দলিল।

২.৬ স্থানীয় সরকার এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের গুরুত্বের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যাপক মনোযোগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা মাথায় রেখে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে বাজেটে বেশ কিছু উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। আঞ্চলিক সমতা এবং উন্নত অবকাঠামো নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৩,৬২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা পরিবহন ও শিক্ষা খাতের পর খাতভিত্তিক বরাদ্দের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ (মোট প্রস্তাবিত এডিপির ১১.৮৯ শতাংশ)। এই বরাদ্দ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির চেয়ে ১.২১ শতাংশ এবং মূল এডিপির চেয়ে ৩ শতাংশ বেশি। ২০০৯-১০ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মিলিয়ে মোট খাতভিত্তিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮,৩২১ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের বরাদ্দের চেয়ে ২৪ শতাংশ বেশি। স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন সহায়তার জন্য মোট থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১,৭২৯ কোটি টাকা যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির তুলনায় ৩৪.৩ শতাংশ এবং মূল এডিপির তুলনায় ৯১.৫ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরে দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলের জন্য ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এই বরাদ্দ ২০০৯-১০ অর্থবছরে বহাল রাখা হয়নি।

বর্তমান অর্থবছরে "একটি বাড়ি-একটি খামার" নামক নতুন প্রকল্পে ২৯ লাখ গ্রামীণ লোকজনের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচি প্রকল্পের সময়কাল (জুলাই ২০০৯-জুন ২০১৪) জুড়ে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে। এর পাশপাশি যথাসম্ভব খাস জমি প্রদান করা হবে, যেখানে পুনর্বাসনের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১,২৪৬ কোটি টাকা। প্রথম অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৯২ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে গ্রাম উন্নয়নের মাধ্যমে মোট ৫.৮ লাখ গ্রামীণ পরিবার উপকৃত হবে। যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনে তা বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে।

গ্রামীণ অবকাঠমো উন্নয়নে ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে মোট ৩,৫৭৫ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) গ্রামীণ এলাকায় ১৩,৭০০ কিলোমিটার রাস্তা এবং ৫৪,২৬০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করবে। গ্রামীণ স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহেও বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল বিভাগ ৬,১১৪ আর্সেনিকমুক্ত পানির উৎস নির্মাণ করবে এবং আর্সেনিক সংক্রমণ আছে কি না তা জানতে ২০,০০০ পানি উৎস পরীক্ষা করবে। এগুলোর পাশাপাশি পরবর্তী বছরের মধ্যে ১০০ ভাগ স্যানিটেশন অর্জনের পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে, যা উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ।

সরকার ৪৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০৬টি নির্বাচিত উপজেলায় আধুনিক সরঞ্জামসহ একটি করে মডেল স্কুল নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চ মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আঞ্চলিক সমতা নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য।

আগত অর্থবছরে সরকার সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ ছাড়াই কিছু কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সম্ভবত থোক বরাদ্দের মাধ্যমে এগুলোর ব্যয় মেটানো হবে। এছাড়া সরকার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি জোরদার, গ্রামীণ এলাকায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ও গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন, আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে লোকজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, গ্রামীণ মানব পুঁজি উন্নয়ন এবং গ্রামীণ উন্নয়নে ফলিত গবেষণা উৎসাহিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সরকার শিল্প খাতে শ্রম বাজার; জনশক্তি রপ্তানিতে খারাপ অবস্থা মোকাবেলায় বিনিয়োগ এবং গ্রামীণ ও কৃষি খাতের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রান্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, সামাজিক ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাজেটে ইউনিয়ন এবং উপজেলাগুলোকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূলকেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণকে ক্ষমতায়নের কথাও বলা হয়েছে। এজন্য সমস্ত পৌর সুবিধাসহ ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রধান কার্যালয় এলাকায় গ্রামীণ টাউনশিপ উন্নয়ন করা হবে। সমস্ত উপজেলা পর্যায়ের প্রধান কার্যালয় এবং বাণিজ্য কেন্দ্রমূহকে আধুনিক সুযোগ্য সুবিধাসহ পৌর এলাকায় রূপান্তর করা হবে। ইউনিয়ন সেন্টার, গ্রোথ সেন্টার, বর্ধিত গ্রাম, মফস্বল শহর এবং মেট্রোপলিটন শহরের নিকটবর্তী উপশহরে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়ে তোলা হবে। এই উদ্যোগ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে কৃষি জমি এবং বড় বড় শহরের ওপর চাপ কমবে। নির্ধারিত এলাকায় টাউনশিপ নির্মাণে বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহকরণে সরকার নাগরিক সুবিধা ও অন্যান্য প্রণোদনা দেবে।

ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, আদিবাসী এবং পিছিয়ে পড়া এলাকার জনগণের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও আদিবাসীদের জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সুবিধা দিতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। উচ্চ শিক্ষায় আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনতে সরকার বরিশাল, রাঙ্গামাটি এবং গোপালগঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগ্রহ দেখিয়েছে। এগুলো সবই সদিচ্ছার প্রতিফলন যা সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অনুসরণ করার দরকার হবে।

২.৭ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার সরকারি নীতির প্রতি লক্ষ রেখে বাজেটে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সরকার বেশিরভাগ ভাতা কর্মসূচিতে জনপ্রতি ভাতা এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে। এটি একটি চলমান উদ্যোগ এবং এতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রাকৃতিক আঘাত থেকে প্রান্তিক

জনগোষ্ঠীকে রক্ষায় সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটেছে। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দরিদ্র ও সুযোগবঞ্চিতদেরকে সহায়তা করতে সরকার বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ২০০ কোটি টাকা পিকেএসএফ এর মাধ্যমে বিতরণ করবে। তবে এ বিষয়ে উদ্বেগ রয়েছে, কেননা নমনীয় পরিশোধ পদ্ধতি অথবা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি শক্তিশালীকরণের ওপর কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য দেওয়া হয়নি। সামাজিক সুরক্ষা এবং দরিদ্র লোকদের সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবিত কিছু নতুন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে:

- ৫.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ সম্বলিত প্রতিবন্ধী সেবা ও সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন;
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়ে বৃত্তি কর্মসূচি;
- আশ্রয়হীন পথশিশুদের কল্যাণে ৫ কোটি ৬৭ লাখ টাকা বরাদ্দ;
- অস্বচ্ছল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সহায়তায় ১৪৪ কোটি ৫৫ লাখ টাকা বরাদ্দ;
- নগরের আশ্রয়হীনদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং নিম্ন ও মধ্যআয়ের লোকদের জন্য গৃহায়ণ প্রকল্পের প্রস্তাব।

দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষায় সরকার অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ), টেস্ট রিলিফ (টিআর খাদ্য), গ্রাচুইশাস রিলিফ (জিআর খাদ্য) এবং চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির আকারে খাদ্য সহায়তার জন্য ৫,৮৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে সরকারি খাদ্য বিতরণের জন্য কোন বরাদ্দ বাজেটে নির্দিষ্ট করা হয়নি।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ইস্যু অনেক বিস্তৃত পরিসরে এসেছে। সরকার ৭ লাখ লোকের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে, যা শ্রমবাজারে নতুন আগমনকারী ১৮ লাখ লোকের প্রায় ৪০ শতাংশ। উল্লেখ্য, সুবিধাভোগীদের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিনের সমালোচনা এড়াতে জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেইজ ব্যবহার করে একটি নতুন তালিকা তৈরির প্রস্তাব করা হয়েছে; সিপিডি এ ধরনের কর্মসূচি হাতে নেওয়ার সুপারিশ করেছিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে চালু করা ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি সংশোধনের জন্য সরকার প্রস্তাব করেছে। এই কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায় এখন বাতিল করা হয়েছে। নতুন কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি,' যার মাধ্যমে ৪৯ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১,১৭৬ কোটি টাকা। তবে এই কর্মসূচির জন্য আঞ্চলিক লক্ষ্যমাত্রার ওপর বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) অথবা সমমানের গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে জাতীয় সেবা কর্মসূচির সূচনা একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বরগুনা ও কুড়িগ্রাম জেলায় পাইলট ভিত্তিতে এই কর্মসূচি শুরু হবে। উপকারভোগীরা তিন মাসের প্রশিক্ষণ পাবে এবং প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু'বছরের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এর বাইরে ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটে গ্রামীণ এলাকায় কিছু নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে দরিদ্র নারীরা অগ্রাধিকার পাবে (সারণি ২.১৫)। আশা করা হচ্ছে যে, এ ধরনের কর্মসূচি ওই সব নারীদেরকে দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে কৌশলগত এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সারণি ২.১৫: নারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থান সুবিধা

(কোটি টাকা)

প্রকল্প	২০০৯ ১০ অর্থবছরে বরাদ্দ
গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প	১৭০.০০
সরকারি সম্পদ রক্ষার জন্য গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুবিধা	৭৬.০০
উত্তরাঞ্চলে মঙ্গাক্রান্ত এলাকার হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১২.৮৫
চর এলাকায় কর্মসংস্থান	৭৫.৬০
পুনর্বাসন প্যাকেজ এবং দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন	৫৭.৮৩

উৎস: ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেট দলিল।

২.৮ সংস্কার এজেন্ডা

প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি সংস্কার

জাতীয় বাজেটে কাঠামোগত ও নীতি সংস্কারের গুরুত্ব চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব সংস্কারের বাস্তবায়ন হবে অন্যতম কঠিন চ্যালেঞ্জ। ২০০৯ ১০ অর্থবছরে সরকার এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। বিনিয়োগ চাঙ্গা করতে আর্থিক খাত সংস্কারে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকার বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে একীভূত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, সরকার ব্যাংকিং খাত পরিচালনায় উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও সেবার মান বাড়াতে ৫ বছর মেয়াদি কৌশলগত ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এছাড়া সরকার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০৯ কার্যকর করেছে, যার মাধ্যমে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মানি চেঞ্জার এবং বীমাগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়েছে। নারী উদ্যোগ উৎসাহিত করতে পৃথক ব্যাংকিং ব্যবস্থা, ঋণ ও কারিগরি সহায়তাও ঘোষণা করা হয়েছে। দেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে সরকার বাংলাদেশ বেটার বিজনেস ফোরাম (বিবিবিএফ) বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা একটি বিজ্ঞ পদক্ষেপ। তবে বাজেটে রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন (আরআরসি) সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি।[২০] সরকার বাজেটে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকার (ইপিজেড) পরিবর্তে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। তবে এর জন্য কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি।

অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে কৃত্রিম বিভাজন এড়াতে একটি একীভূত বাজেট উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ব্যয়ের ধরন বিশ্লেষণে অসমন্বিত পর্যায়ে মূলধন এবং চলতি ব্যয়ে বাজেট বরাদ্দ ভাগ করা হবে। এছাড়া তিন বছরের মধ্যমেয়াদি বাজেটীয় কাঠামো পরিকল্পনা পাঁচ বছরের উর্ধ্বে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাজেটে জেন্ডার ইস্যু আলাদাভাবে মোকাবেলায় মধ্যমেয়াদি বাজেটীয় কাঠামোতে সরকার জেন্ডার ও দারিদ্র্য সম্পর্কিত অসমন্বিত উপাত্ত সংযুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। অধিকতর সমন্বিত উন্নয়ন লক্ষ্য এবং সুনির্দিষ্ট মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সরকার ৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা (২০১০ ২০১৫) পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন বার্ষিক উপাদানের এডিপি এবং এর লক্ষ্যমাত্রা উভয়ই বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জিং হবে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।

[২০]সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে একটি অধিকতর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি রিফর্মস কমিশনের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

সরকারি ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনতে ২০১০_১১ অর্থবছর থেকে জেলা পর্যায়ের বাজেট প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক বিভাগের একটি জেলায় এই বাজেট প্রণীত হবে। সংসদ সদস্য এবং উপজেলা চেয়ারম্যানদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ কার্যকর হয়েছে। এই আইনের আওতায় একটি পৃথক বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হবে এবং উপজেলা প্রশাসনকে ওই বরাদ্দ ব্যবহার ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হবে। স্থানীয় প্রশাসনকে শক্তিশালী করতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করতে ইউনিয়ন এবং উপজেলা পরিষদকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হবে।

সরকারি প্রকল্পগুলোতে দুর্নীতি কমাতে ক্রয়, মনোনয়ন, দরপত্র প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন এবং প্রকল্প তদারকি প্রক্রিয়ায় সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ঋণ খেলাপি সংস্কৃতি থেকে মুক্তি পেতে এবং বেসরকারি খাতে ঋণ পুনঃতফসিল তদারকি করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। যদিও সরকার দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধনের ঘোষণা দিয়েছে তবে সংশোধানের ধরন সম্পর্কে স্পষ্ট করে কোনো কিছু বলা হয়নি।

ডিজিটাল বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যেতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে, বিশেষত আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, এবং ভূমি ও কর প্রশাসনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। ভূমি নিবন্ধন দলিল সরবরাহের সময়সীমা আপাতত ১৫ দিনে কমিয়ে আনা হবে, যা ভবিষ্যতে ২ থেকে ৭ দিনে নামিয়ে আনা হবে।

সরকার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ কার্যকর করেছে যা নাগরিক অধিকার রক্ষায় সহায়তা করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এছাড়া সরকার সম্প্রতি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর করেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ এর আওতায় প্রসিকিউটরের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাজেটে পশ্চাদমুখী সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মোকাবেলার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে ধর্ম ও জাতিসত্তা নির্বিশেষে সমাজের অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এখন সরকারের সংকল্পগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করাই হবে সরকারের সক্ষমতার পরীক্ষা।

২.৯ বাস্তবায়নের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ

এ অধ্যায়ের আলোচনায় ২০০৯_১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সরকারের বিভিন্ন প্রস্তাবনার ওপর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রস্তাবিত বাজেটে প্রবৃদ্ধির গতিধারা বজায় রাখা, আয় বৃদ্ধি করা, আঞ্চলিক বৈষম্য কমানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য কমিয়ে আনা এবং সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ_ এ বিষয়গুলোতে নতুন সরকারের আগ্রহের কথা বলা হয়েছে। এসব লক্ষ্য অর্জন নির্ভর করবে বাস্তবায়নের বিভিন্ন কৌশলের দক্ষতার ওপর, যার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির সংস্কার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তৈরির দরকার হবে। নিম্নে এ ধরনের কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে সরকারের দৃষ্টি দিতে হবে বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা বাজেট বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার দায়িত্ব সরকারের। বস্তুত, বাজেট বাস্তবায়ন এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে শুধু বাজেট প্রক্রিয়ার ওপর তা ছেড়ে দেওয়া যায় না। এ প্রেক্ষিতে ২০০৯_১০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করতে হবে।

উদ্বৃত্ত জাতীয় সঞ্চয়, ব্যাংকিং খাতে অতিরিক্ত তারল্য এবং পাইপলাইনে থাকা বৈদেশিক সহায়তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশে জাতীয় সঞ্চয়ের হার (জিডিপির ৩২.৩৬ শতাংশ) মোট বিনিয়োগ হারের (জিডিপির ২৪.১৪ শতাংশ) চাইতে বেশি, যা থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ রয়েছে।[২১] জাতীয় সঞ্চয় হার এবং বিনিয়োগ হারের মধ্যকার পার্থক্য প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা (জিডিপির প্রায় ৮ শতাংশ)। এটি সরকারের নিম্ন পর্যায়ের বাস্তবায়ন সক্ষমতা এবং বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ সম্ভাবনার বিষয়টিই তুলে ধরে।

ভারত এবং ভিয়েতনাম সাম্প্রতিক সময়ে বিনিয়োগ সক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে, যার তুলনায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি দুর্বল। এ দুটি দেশ তাদের জাতীয় আয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ বিনিয়োগ করে। অবকাঠামো ও জ্বালানিতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের জন্য সরকারি খাতের সক্ষমতা বাড়ানো দরকার যা বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারে।[২২] বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের কারণে বিনিয়োগ চাহিদার অভাবে ব্যাংকিং খাতে অতিরিক্ত তারল্য সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের জন্য বাজেট ঘাটতির যে প্রাক্কলন রয়েছে, ব্যাংকিং খাতে বিদ্যমান অতিরিক্ত তারল্যের কারণে তার জন্য সম্পদ যোগান দেওয়া সহজ হবে এবং বেসরকারি খাতের জন্য সম্পদের প্রাপ্যতার প্রেক্ষিতেও তেমন কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। এর আগে কিছু গবেষণায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ক্রাউডিং আউট প্রভাবের সম্ভাবনা বাতিল করা হয়েছে। প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সহায়তার সময়মতো বিতরণ নিশ্চিত করা, প্রত্যাশিত অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় ঋণ চাহিদার সহজলভ্যতা এবং সামগ্রিকভাবে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজস্বনীতি এবং মুদ্রানীতির পরিপূরকতা রক্ষা

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় ২০০৯ ১০ অর্থবছরের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রাগুলোর জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ শতাংশের আলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির এই লক্ষ্যমাত্রা গত ছয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের জন্য বিনিয়োগ হারের (জিডিপির শতকরা অংশ হিসেবে) লক্ষ্যমাত্রাও কিছুটা কম ধরা হয়েছে এবং মূলধনের উৎপাদনশীলতায় কিছুটা অবনতি নির্দেশ করেছে। গত পাঁচ বছরে গড় বর্ধিত মূলধন্ন উৎপাদন অনুপাত বা আইকর ৩.৯ এর বিবেচনায় বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা (জিডিপির ২৩.৭ শতাংশ) অর্জন প্রায় ৬ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির পথ নির্দেশ করবে। প্রক্ষেপিত এডিপি লক্ষ্যমাত্রা (জিডিপির ৪.৪ শতাংশ) দেখে মনে হয় বাজেটে উচ্চ বেসরকারি বিনিয়োগের ব্যাপারে পূর্বানুমান করা হয়নি। বাজেটে উচ্চ বেসরকারি বিনিয়োগের বিষয়ে যে প্রত্যাশা করা হয়েছে তার সঙ্গে এরূপ অনুমান বিরোধপূর্ণ অথবা এর মানে এডিপির পুরো বাস্তবায়ন হবে না, এটি আগে থেকেই মেনে নেওয়া। প্রস্তাবিত রাজস্ব কাঠামো বিবেচনায় প্রবৃদ্ধি বিনিয়োগ যোগসূত্রটি জটিল মনে হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষিতে একটি সম্প্রসারণমুখী রাজস্ব অবস্থান প্রত্যাশা করা হয়েছিল। যেখানে রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের প্রক্ষেপণ আগের প্রবণতা অনুযায়ীই রয়েছে, সেখানে বাজেটের লক্ষ্যমাত্রাসমূহের অর্জন এডিপি বাস্তবায়নের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করবে। প্রস্তাবিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় উচ্চ সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির পক্ষে সমর্থন দেওয়া এবং একই সঙ্গে উচ্চ সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা প্রক্ষেপিত বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি যোগসূত্রের সঙ্গে হিসাবে মেলে না। অন্যদিকে মুদ্রা সম্প্রসারণের যে প্রত্যাশা

[২১]উদ্বৃত্তের হিসাব নিয়ে একটি বিতর্ক আছে। প্রবাসী আয়ের ঠিক কতটুকু সঞ্চিত হচ্ছে এবং জাতীয় সঞ্চয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

[২২]চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বাস্তবায়নের দিক আলোচনা করা হয়েছে।

করা হয়েছে তা একটি রক্ষণশীল মুদ্রা সরবরাহকেই ইঙ্গিত করে। আবার বেসরকারি খাতে ঋণ বৃদ্ধির যে চেষ্টা নেওয়া হয়েছে, তা সরকারি খাতে ঋণ কমে যাওয়ার সম্ভাবনাকেই নির্দেশ করে। এ ধরনের দিকগুলো প্রস্তাবিত সামষ্টিক অর্থনীতির কাঠামোয় রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি ভঙ্গির মধ্যে অসামঞ্জস্যতা তৈরি করতে পারে। মনে করা হচ্ছে যে, প্রস্তাবিত রাজস্বনীতির সঙ্গে সমন্বয় নিশ্চিত করতে পরিমিত মুদ্রানীতি অনুসরণ করাই হবে যুক্তিযুক্ত।

সরকারি অর্থায়ন কাঠামো ঠিক রাখা এবং রাজস্ব শৃঙ্খলা বজায় রাখা

ব্যয়ের চেয়ে আয়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে না পারার সাম্প্রতিক প্রবণতা রাজস্ব কাঠামোতে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে। পর্যায়ক্রমে এটি ভবিষ্যতে উচ্চ বাজেট ঘাটতি ঘটাতে পারে এবং সুদ পরিশোধের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সুদ পরিশোধ ইতিমধ্যে মোট রাজস্ব বাজেটের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে একটি ব্যতিক্রমধর্মী পরিবেশের আলোকে উচ্চ বাজেট ঘাটতির প্রয়োজন রয়েছে, তবে বাজেট ঘাটতির মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির ৩ শতাংশে নামিয়ে আনা উচিত। এর জন্য স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহে করভিত্তি সম্প্রসারণের দরকার হবে। এডিপির নিম্ন বাস্তবায়নের ফল হিসেবে নিম্ন বাজেট ঘাটতি থাকা উচিত নয়। কর ফাঁকিবাজ ও করযোগ্য আয় সত্ত্বেও কর দেয় না এমন লোকদের জন্য করজাল বিস্তৃত করা এবং ভ্যাটের আওতা বাড়ানোর বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাজেট সহায়তা হিসেবে ঋণের চাইতে বেশি অনুদান প্রাপ্তির চেষ্টা করা উচিত।

বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি

যেকোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সময়মতো প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ এবং যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ – এ দুটি বিষয় অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বাংলাদেশে সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবের জন্য নয়, বরাদ্দকৃত তহবিল ব্যবহারের অযোগ্যতা নিয়েও সমালোচিত। এ সমস্যা সমাধানে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের দায়দায়িত্বের দিক থেকে দক্ষ ও কার্যকর নেতৃত্ব দরকার। এই বাস্তব সমস্যা মোকাবেলায় যথাযথ প্রণোদনা কৌশল গ্রহণের দরকার হবে। এছাড়া আর্থিক ও মানবসম্পদ উভয়ের উন্নতির জন্য ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে প্রত্যেক বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের সম্পদের ওপর ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা কৌশল গ্রহণ করা দরকার। উচ্চ হারে এডিপি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের গুণগত মান এবং বাস্তবায়ন দক্ষতা উন্নয়নে কৌশলগত পরিকল্পনা দরকার। জনপ্রশাসনে সুনির্দিষ্ট দক্ষতা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গুচ্ছ মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা (Clustering Ministries) আরেকটি পদক্ষেপ হতে পারে, যা বিভিন্ন দেশে সফলভাবে চর্চা হয়েছে।

রাজস্ব ও আর্থিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা

উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে বিশেষত অবকাঠামো এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বেসরকারি খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে কার্যকর অংশীদারিত্ব উৎসাহিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দরকার। বাজেটে কাঠামোর মধ্যে পিপিপির অর্ন্তভুক্তি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের সম্পদ ব্যবহারের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে অর্থায়ন অংশীদারিত্ব যে শুধু বড় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পদের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সহায়তা করে তা নয়, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে মুক্ত করে বাস্তবায়ন হার বাড়াতেও সহায়তা করে। তবে এ ধরনের অংশীদারিত্বের জন্য কার্যকর কাঠামোর ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান সহ অংশীদারিত্ব পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে। বেসরকারি খাতের উদ্যোগ সহযোগে সরকারি খাতের ভূমিকা সাবলীল করলে তা পিপিপি কাঠামোর মধ্যে

শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে পারবে। এক্ষেত্রে ভারতের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা সহায়ক হতে পারে। এ ধরনের অংশীদারিত্বের সাফল্য নিশ্চিত করতে মুনাফা ভাগাভাগি, মালিকানা এবং হস্তান্তরের মতো বিষয়গুলো অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নিস্পত্তি করার দরকার হবে।

যথাযথ নিয়ন্ত্রণসহ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা জোরদার

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চলমান বৈশ্বিক আর্থিক সংকট থেকে শিক্ষা নিতে হবে। বাজার অর্থনীতির সুযোগ নিতে বেসরকারি খাতকে সুযোগ প্রদান এবং যথাযথ আইনী কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য আনার দরকার হবে। যথাযথ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসহ প্রতিযোগিতামূলক বাজার আচরণ বাজেটের লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সফল বাস্তবায়নের অন্যতম চাবিকাঠি।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব

বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র লোকদেরকে সংগঠিত করা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দরিদ্র ও সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে বেসরকারি সংস্থা এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইতিমধ্যে পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প পরিচালনায় সরকার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কাজ করছে। এ ধরনের অংশীদারিত্ব স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো পুনরায় সক্রিয় করতে সরকারের আগ্রহকে ইতিবাচকভাবে দেখা যেতে পারে। তবে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (পিএফডিএস) মত সামাজিক সেবা এবং দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন দক্ষতা ও কৌশল নিয়ে বিস্তর সমালোচনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বেসরকারি সংস্থাগুলোর দক্ষতা যথাযথ ব্যবহারের জন্য কৌশল নির্ধারণের দরকার হবে, যাতে কমিউনিটি ক্লিনিক, কারিগরি শিক্ষা ও অন্যান্য কর্মসূচিগুলো দরিদ্রদের প্রয়োজনীয় সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের তুলনামূলক জোরালো অবস্থানের সুবিধাগুলো নিতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার জোরদার

সাম্প্রতিক অতীতে গৃহীত নানা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার জনপ্রশাসনে সুশাসনের দক্ষতা বাড়াতে অবদান রেখেছে। উন্নয়ন প্রশাসনের দক্ষতা বাড়াতে এরূপ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। বাজেট প্রক্রিয়ার রূপরেখা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকিতে স্থানীয় প্রশাসনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নের মূল চাবিকাঠি হবে। নিয়ন্ত্রণমূলক বাধ্যবাধকতা আরও সহজ করতে রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন এবং বাংলাদেশ বেটার বিজনেস ফোরামের সক্ষমতা ব্যবহার করা দরকার; কেননা নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মকানুন অনেক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিকূল হয়। তাছাড়া নিয়মকানুন ও বিধির সহজ ও স্বচ্ছ বাস্তবায়ন দুর্নীতি প্রতিরোধে শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এ দুই সংস্থার কিছু সুপারিশ ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে যার ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া আরও কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নাধীন পর্যায়ে রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান বর্তমানের আদলে চালু রাখা হবে কিনা তা সরকারের বিষয়, কিন্তু এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সরকারের শক্তিশালী সহযোগী হতে পারে যা সবার মাঝে সুশাসন পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে। আশা করা হচ্ছে যে, নিয়মকানুন ও বিধিমালার সংস্কার সরকারের চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে অব্যাহত থাকবে, কেননা বাজেটের অনেক লক্ষ্যমাত্রার সফল বাস্তবায়নে এটি মূল ভূমিকা পালন করবে।

অধ্যায় ৩

২০০৯ ১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট

সিপিডির সুপারিশমালা

৩.১ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো

সাম্প্রতিককালীন প্রেক্ষাপটে নবনির্বাচিত সরকারের পেশ করা প্রথম বাজেট হিসেবে ২০০৯১ ০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করা যায়, এ বাজেট ক্ষমতাসীন মহাজোটের প্রধান দলের নির্বাচনী ইশতেহার দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং বাজেট বরাদ্দে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটবে।

অন্যদিকে আসন্ন বাজেট প্রণীত হচ্ছে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা কাঠামোর মধ্যে, যা বেশ উচ্চাভিলাষী। যেহেতু বর্তমান সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে (সম্ভবত ২০১১ সাল থেকে) সেহেতু দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের (পিআরএসপি) নির্দেশনাসমূহ (২০০৮ সালে সংশোধিত) আগামী বাজেটের মানদণ্ড হবে কিনা, তা নিশ্চিত নয়।

যেহেতু বিশ্ব আর্থিক সংকট ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হচ্ছে এবং স্বল্পমেয়াদি নানা প্রাক্কলনে হতাশাজনক চিত্রই পাওয়া যাচ্ছে, ২০০৯১০ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নে এ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চলমান বৈশ্বিক সংকটের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সরকার ইতিমধ্যে একটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। আশা করা যায়, আসন্ন বাজেটে প্যাকেজ ঘোষিত পদক্ষেপগুলোর বিস্তৃতি ঘটবে।

এ ধরনের প্রেক্ষাপটে এটি নিশ্চিত যে, একটি পরিমিত সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতির সহায়তায় জাতীয় বাজেটের সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি হবে চক্রের বিপরীতমুখী (কাউন্টার সাইক্লিক্যাল) রাজস্ব পদক্ষেপ। শেষ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ে পরিমিত প্রবৃদ্ধির মুখে উচ্চ বাজেট ঘাটতির সম্ভাবনা মাথায় রেখে সরকারকে বড় আকারের ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আসন্ন বাজেটের সম্ভাব্য রাজস্ব কাঠামো প্রস্তুত করেছে (সারণি ৩.১)। এ কাঠামোর তেমন কোনো নাটকীয় পরিবর্তন থাকবে না বলেই আশা করা যায়। জ্বালানি তেল আমদানি বিল (ভর্তুকি) কমে যাওয়া এবং খাদ্য ভর্তুকিতে নিট সঞ্চয় মিলে ৭,৫০০ কোটি টাকার রাজস্ব ব্যয় কমবে বলে মনে হয়। বস্তুত সাম্প্রতিক নিম্ন মূল্যস্ফীতির হার (প্রায় ৫ শতাংশ) সামষ্টিক অর্থনীতির প্রত্যাশিত অবস্থার জন্যও সহায়ক হবে।

সারণি ৩.১: বাজেটের রাজস্ব কাঠামো: অর্থবছর ২০০৭ ০৮ থেকে অর্থবছর ২০০৯ ১০

(কোটি টাকা)

বিষয়	অর্থবছর ২০০৭০৮ (প্রকৃত)	অর্থবছর ২০০৮০৯ (বাজেট)	অর্থবছর ২০০৯১০ (প্রাক্কলিত)
জিডিপি চলতি মূল্যে	৫৪১২৬২.৫	৬১৩১১১.০	৬৭৭৭৩৩.০
রাজস্ব আয়	৫৮১৭০.০	৬৯৩৩৮.০	৭৮২০০.০
জিডিপির অংশ হিসেবে	১০.৭	১১.৩	১১.৫
রাজস্ব ব্যয়	৫১৪৫৩.২	৬১৪৬৮.৯	৭৯৫০০.০
জিডিপির অংশ হিসেবে	৯.৫.০	১০.০	১১.৭
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	১৮৪৯২.০	২৫৬০০.০	৩০৫০০.০
জিডিপির অংশ হিসেবে	৩.৪	৪.২	৪.৫
মোট বাজেট	৮৬০৮৫.০	৯৯৯৬২.০	১১০০০০.০
জিডিপির অংশ হিসেবে	১৫.৯	১৬.৩	১৬.২
ঘাটতি	২৫৫৪৬.০	৩০৫৮০.০	৩১৮০০.০
জিডিপির অংশ হিসেবে	৪.৭	৫.০	৪.৭
জিডিপির অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৩	২.৮	-
জিডিপির অংশ হিসেবে বৈদেশিক অর্থায়ন	২.৫	২.২	-
ঘাটতির অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৪৮.৫	৫৫.৬	-
ঘাটতির অংশ হিসেবে বৈদেশিক অর্থায়ন	৫১.৫	৪৪.৪	-

উৎস: সিপিডিআইআরবিডি ডাটা বেইজ।

দ্রষ্টব্য: ২০০৯১০ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) হিসাব করা হয়েছে বর্তমানের পয়েন্টটুপ য়েন্ট মূল্যস্ফীতি ৫.০৪ শতাংশ এবং প্রাক্কলিত ৫.৫ শতাংশ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি বিবেচনায়।

১. ২০০৯১০ অর্থ বছরের সামগ্রিক সরকারি ব্যয়ে জিডিপির অংশ হিসেবে উলেখযোগ্য কোন প্রবৃদ্ধি নাও ঘটতে পারে (১৬.২ শতাংশ)।

২. রাজস্ব আদায়ের সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা (এমনকি পুরোপুরি আদায় হলেও) ২০০৯১০ অর্থ বছরে করজিডিপি অনুপাত পরি স্থিতির খুব একটা উন্নতি হবে না (১১.৫ শতাংশ)।

৩. প্রস্তাবিত এডিপির আকার বৃদ্ধি সত্ত্বেও এটি অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির অংশ হিসেবে স্থির রয়েই গিয়েছে (৪.৫ শতাংশ)। যদিও উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের পার্থক্যের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বাড়ছে।

৪. ২০০৯১০ অর্থ বছরে অনুমিত বাজেট ঘাটতি নির্দেশ করে যে, এটি ভালোভাবেই সাম্প্রতিক লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যেই থাকবে।

৫. ঘাটতি অর্থায়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক উৎস থেকে যথাসম্ভব অর্থায়ন (বিশেষত অনুদান খাতে) প্রাপ্তির সক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে যেখানে অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের কারণে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ চাহিদাকে বাধাগ্রস্ত করা উচিত হবে না।

এডিপি বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধিই হবে আগামী বাজেটের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। অন্যথায় অর্থনীতি অতি প্রয়োজনীয় রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা থেকে বঞ্চিত হবে এবং এর ফলশ্রুতিতে সরকার স্বল্প বাজেট ঘাটতি দিয়ে অর্থবছর শেষ করবে।

বাজেটের উলেখযোগ্য দিক হবে, পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাথে সাথে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কতটা নমনীয়শীল হতে পারবে। একটি পরিশীলিত তদারকি কৌশল বাজেটের যথাযথ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে পারবে।

এই অধ্যায়ের পরের অংশগুলোতে ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেটের সামগ্রিক রাজস্ব পদক্ষেপ এবং নির্দিষ্ট খাতগুলো সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ থাকবে। এডিপি বাস্তবায়ন এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) সম্পর্কিত বিষয়ে সুপারিশমালাও এখানে আলোচিত হবে। এসব সুপারিশ সিপিডির নিজস্ব গবেষণা এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ দলের সাথে বিস্তারিত পরামর্শের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

৩.২ রাজস্ব পদক্ষেপ

৩.২.১ ব্যক্তিগত আয়কর

- ২০০৮ সালের জুন থেকে পয়েন্টটুপ্ য়েন্ট মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ১০ শতাংশের বেশি। এটি বিবেচনায় রেখে করমুক্ত আয়ের সীমার বর্তমান স্তর ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- নারী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী নাগরিকদের করমুক্ত আয়সীমা বর্তমানের ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ লাখ টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের বয়সসীমা বিদ্যমান ৭০ বছর থেকে কমিয়ে ৬৫ বছরে নামিয়ে আনা যেতে পারে (যেহেতু বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসর বয়স ৫৭ বছর)।
- বিগত বাজেটে মোট আয়ের ২৫ শতাংশ (সর্বোচ্চ সীমা ৫ লাখ টাকা) বিনিয়োগ ভাতা নির্ধারণ করে ১০ শতাংশ আয়কর ছাড় দেওয়া হয়। বিনিয়োগ উৎসাহিত করার উদ্দ্যেশ্যে ছাড়ের এই হার ১৫ শতাংশে পুনর্নির্ধারণ করা যেতে পারে (সর্বোচ্চ সীমা ৬ লাখ টাকা করা যেতে পারে)।
- বাড়ি ভাড়া বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে করমুক্ত বাড়ি ভাড়া ভাতার সীমা মূল বেতনের ৬০ শতাংশে পুনর্নির্ধারণ করা যেতে পারে (বর্তমানে ৫০ শতাংশ অথবা ১৫ হাজার টাকার মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম)। অন্যদিকে সর্বোচ্চ সীমা ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই পদক্ষেপের ফলে মোট অতিরিক্ত ভাতার সীমা ২ লাখ ৬০ হাজার টাকায় নির্ধারণের দরকার হবে।
- প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র, বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র এবং ত্রৈমাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্রের সুদের ওপর কর প্রত্যাহার করা উচিত।
- অধ্যায় ১৬ডি: লভ্যাংশ বিতরণ কর পুনরায় চালু করা যেতে পারে।

৩.২.২ কর্পোরেট কর

- তালিকাভুক্ত কোম্পানির জন্য কর্পোরেট কর ২০০৯১০ অর্থবছরেও ২৭.৫ শতাংশ অব্যাহত রাখা যেতে পারে। বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানির কর্পোরেট কর বিদ্যমান ৩৭.৫ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশে নামিয়ে আনা যেতে পারে।
- ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সর্বোচ্চ কর্পোরেট কর (৪৫ শতাংশ) অন্যান্য উচ্চ মুনাফা অর্জনকারী সেবা শিল্পে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) সহ এবং কৃষি খাতে বিতরণ করা ঋণ থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর ব্যাংকগুলোকে কিছুটা কর ছাড় দেওয়া যেতে পারে।
- বার্ষিক টার্নওভার ২৪ লাখ টাকার নিচের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এসএমই আখ্যা দিয়ে ২০০৮০৯ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতকে আয়কর অব্যাহতি দেওয়া হয়। রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ খাতের বর্ধিত ভূমিকা এবং সাম্প্রতিক উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় টার্নওভার সীমা ৩০ লাখ টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৩.২.৩ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)

- সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে ভ্যাট সংযুক্ত করার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট তহবিল বরাদ্দ করা প্রয়োজন।
- বিভাগ ও জেলা শহরে অবস্থিত সকল বড় ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ভ্যাট আদায় বাড়াতে ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টারের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা উচিত।

৩.২.৪ আমদানি এবং সম্পূরক শুল্ক

- চলমান বৈশ্বিক মন্দা এবং অভ্যন্তরীণ শিল্পে এর প্রভাব বিবেচনায় সরকার সাময়িকভাবে শুল্ক স্তরগুলোর পুনর্বিন্যাস করতে পারে।

  ■ অন্তত এক বছরের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি, এর যন্ত্রাংশ এবং কাঁচামাল আমদানির শুল্কহার বিদ্যমান ৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য শুল্ক করা যেতে পারে। একই সঙ্গে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির (রপ্তানির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত) ওপর আরোপিত ১ শতাংশ শুল্কের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হতে পারে।

  ■ আবার শূন্য শুল্ক আরোপ করলে স্থানীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরকম একটি স্পর্শকাতর পণ্যের তালিকাও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) তৈরি করতে পারে। এক্ষেত্রে একটি উলেখযোগ্য উদাহারণ হচ্ছে সুতা, যা স্থানীয়ভাবেও উৎপাদিত হয়। এ ধরনের স্পর্শকাতর পণ্যের ওপর বিদ্যমান শুল্ক হার বহাল রাখা যেতে পারে।

  ■ রাজস্ব ঘাটতি পূরণ করতে নির্ধারিত কিছু তৈরি পণ্যে (প্রধানত বিলাসদ্রব্য) শুল্ক হার বাড়ানো যেতে পারে। বিলাসদ্রব্য (যেমন ১৫০০ সিসির উর্ধ্বে বিলাসবহুল গাড়ি) এবং সব ধরনের অ্যালকোহল (ওষুধ শিল্পে ব্যবহারকৃত ছাড়া) আমদানিতে আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো যেতে পারে।
- স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং পরিবেশ দূষণ কমাতে সিগারেট ও সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো যেতে পারে (কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ৬০ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ এবং প্যাকেজিংয়ের জন্য ব্যবহৃত কাগজ আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে উন্নীত করা যেতে পারে)।
- কর অবকাশ সুবিধাপ্রাপ্ত কোম্পানি/খাতগুলোকে আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম আয়কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত।
- আর্থিক সংকট বিবেচনায় রপ্তানির জন্য বস্ত্র খাতে সব ধরনের রং, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য কাঁচামাল আমদানিতে ৫ শতাংশের বেশি আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করা উচিত হবে না।
- মধ্যবর্তী আমদানি পণ্যের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি শুল্ক হারের পার্থক্য সাধারণভাবে বিদ্যমান পার্থক্যের চেয়ে অনেক কমিয়ে আনা উচিত (বিদ্যমান ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশ)। তবে এটিকে সাময়িক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা উচিত।

৩.২.৫ সাধারণ রপ্তানি সহায়তা পদক্ষেপ

- বর্তমানে নির্ধারিত কিছু রপ্তানি খাত ৫ শতাংশ হারে কর দেওয়ার শর্তে সরকারের ভর্তুকি পেয়ে থাকে। এই কর আগামী অর্থবছরের জন্য প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

- বিশেষ কর প্রণোদনা দিয়ে কৌশলগত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

৩.২.৬ আমদানি পরিপূরক এবং স্থানীয় শিল্প সহায়তায় সাধারণ পদক্ষেপসমূহ

- শিল্প কার্যক্রমে আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্সের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ ব্যয়, গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়, এবং নমুনায়ন খরচ বাদ দেওয়া যেতে পারে।
- সরকার একটি সমন্বিত টেক্সটাইল পার্ক স্থাপনে তহবিল বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। উদ্যোক্তাদেরকে টেক্সটাইল ইউনিট স্থাপনে পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা দেওয়া এই পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য হতে পারে।
- ২০০৮০৯ অর্থ বছরের বাজেটের সমমূলধনী তহবিল তথ্যপ্রযুক্তি সংশিষ্ট শিল্পের প্রতি বেশি দৃষ্টি দেয়। ২০০৭০৮ অর্থ বছরে এ তহবিলের বরাদ্দ কৃষিভিত্তিক শিল্পকে লক্ষ্য করে দেওয়া হয়। কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পকে উৎসাহিত করতে ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে সরকার সমমূলধনী তহবিলের বরাদ্দ এ খাতমুখী করতে পারে।
- জাহাজ নির্মাণ খাতের উন্নয়নে সরকার বন্ডেজ ওয়্যারহাউজ সুবিধা এবং কাঁচামাল আমদানিতে কর অব্যাহতি দিতে পারে। এছাড়া পরবর্তী রপ্তানি নীতিতে সরকার এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত (থ্রাস্ট সেক্টর) ঘোষণা দিতে পারে।
- পশ্চাদসংযোগ (ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ) শিল্পের উন্নয়নে (বিশেষত তৈরি পোশাক, বস্ত্র, চামড়া, পাট এবং অন্যান্য নির্ধারিত শিল্পে) একটি প্রযুক্তি উন্নয়ন তহবিল (৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে) গঠন করা যেতে পারে। এই স্কীমের আওতায় ছাড়কৃত সুদে ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে এসব শিল্পে প্রযুক্তিগত সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

৩.২.৭ বিশেষ কর সুবিধা

- অপ্রদর্শিত আয়ের (আগে যার ওপর কর পরিশোধিত হয়নি) ঘোষণা করলে ৭ শতাংশ জরিমানা এবং নিয়মিত কর প্রদানের মাধ্যমে বৈধ করার বিধান ২০০৯১০ অর্থবছরেও বহাল রাখা যেতে পারে।
- অপ্রদর্শিত আয়ের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, প্রত্যেক বছর একটি নির্দিষ্ট হারে জরিমানার মাধ্যমে এ ধরনের অর্থ বৈধ করার ক্রমাগত সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও অতীতের অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি এবং উলেখযোগ্য পরিমাণ কর আদায় হয়নি। পাশপাশি এই সুযোগ সৎ এবং নিয়মিত কর দাতাদের নিরুৎসাহিত করেছে। এই পদক্ষেপ তার সামর্থ্য হারিয়েছে এবং ২০০৯১০ অর্থ বছরের পরে এটি অব্যাহত রাখা উচিত হবে না।

- পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য (২০০৯১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৩১৪ অর্থ বছর) কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর অবকাশ দেওয়া যেতে পারে।
- সরকার কিছু সম্ভাবনাময় নতুন শিল্পে কর অবকাশ সুবিধা সম্প্রসারণ করতে পারে। খসড়া শিল্পনীতি ২০০৯এ প্রস্তাবিত অগ্রাধিকার খাত (থ্রাস্ট সেক্টরগুলো) থেকে এসব নাম বাছাই করা যেতে পারে। উদাহারণস্বরূপ, ওষুধশিল্পের কাঁচামাল, পলিমার উৎপাদন শিল্প, চামড়াজাত পণ্য, প্রসাধন সামগ্রী, আসবাবপত্র ইত্যাদি নাম উলেখ করা যায়।
- গত বাজেটে সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভ্যাট আরোপের জন্য টার্নওভার সীমা ২০ লাখ থেকে ২৪ লাখ টাকায় উন্নীত করেছিল। এসএমই খাতে উচ্চ মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থানীয় বাজারে উলেখযোগ্য সম্পৃক্ততা বিবেচনায় টার্নওভারের এই সীমা ৩০ লাখে উন্নীত করার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করতে পারবে।

৩.২.৮ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অবসরের বয়স এবং বেতন কাঠামো

- সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অবসরের বয়স ৫৭ বছর থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করা উচিত।
- বেতন কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

৩.২.৯ বিবিধ

- অলাভজনক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর কর অব্যাহতি দেওয়া উচিত কেননা এ ধরনের কর জ্ঞানের ওপর করারোপের শামিল।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি যাদের একটি সন্তান রয়েছে একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর তাদের জন্য একটি আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ দেওয়া যেতে পারে।

৩.২.১০ কর প্রশাসনে সংস্কার

- কর আদায়ের সুযোগ বাড়াতে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের আওতা সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। বর্তমানে ৫১টি ব্যাংক, ৬১টি বীমা কোম্পানি, ৩৩টি বিনিয়োগ ও লিজিং কোম্পাানি, ছয়টি মোবাইল ফোন অপারেটর, নয়টি সিমেন্ট কোম্পানি, ১১টি ওষুধ কোম্পানি, ১০৭টি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, চারটি সংবাদপত্র এবং উলেখিত কোম্পানিগুলোর ৭৬ জন পরিচালক বৃহৎ করদাতা ইউনিটের আওতায় রয়েছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি যথাযথ তদারকি ব্যবস্থা চালু করা গেলে আমদানি শুল্ক ফাঁকি উলেখযোগ্য হারে কমানো যেতে পারে। রাজস্ব বোর্ড এবং শুল্ক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে অনলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা গেলে নিয়মিত ভিত্তিতে রাজস্ব আদায়ের তথ্য এই মনিটরিং সেলে পাঠানো যেতে পারে।
- চার স্তরবিশিষ্ট শুল্কের পরিপ্রেক্ষিতে শুল্ক হারগুলোর মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে আনা উচিত। এর ফলে কর ফাঁকি এবং কর কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ কমবে।
- কর পরিশোধে খেলাপি হলে খেলাপি হওয়া করের পরিমাণের ওপর উপকর কমিশনার জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা রাখেন। এক্ষেত্রে খেলাপি হওয়া করের জরিমানায় নির্দিষ্ট অঙ্ক নির্ধারণ করা গেলে কর কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার সম্ভাব্য অপব্যবহারের পরিধি কমবে।
- কর অবকাশ সুবিধা এবং এর পরিবর্তে অন্যান্য বিকল্প পদক্ষেপগুলোর (যেমন – সম্প্রসারিত অবচয় চার্জ অথবা সমন্বিত হ্রাসকৃত কর হার) মধ্যে তুলনামূলকভাবে কোনটি উত্তম তার ওপর সরকারের একটি মূল্যায়ন করা উচিত এবং সে অনুযায়ী পরিবর্তন আনা যেতে পারে।
- কিছু ব্যতিক্রম, যেমন – প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য জরুরি অবস্থা ছাড়া এসআরওএর মাধ্যমে শুল্ক হারে মধ্যমেয়াদি পরিবর্তনের চর্চা সীমিত করার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করতে পারে।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১০৮ ধারা অনুযায়ী একজন নিয়োগদাতাকে বেতন পরিশোধ এবং উৎসে কর কর্তন সম্পর্কে তথ্য সংশিষ্ট উপকর কমিশনার কার্যালয়ে দাখিল করতে হয়। এ ধারার কঠোর বাস্তবায়নে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে প্রত্যেক উপকর কমিশনার কার্যালয় প্রতি অর্থবছরের শুরুতে এসব প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা তৈরি/হালনাগাদ করতে পারে এবং রিটার্ন দাখিলের সময়সীমার মধ্যে কেউ তা দাখিল না করলে তাকে নোটিশ দিতে পারে।
- ট্রেড লাইসেন্স (অথবা অন্য যেকোন লাইসেন্স) নবায়নের সময় কর নির্ধারণী সনদ জমা দেওয়া নিশ্চিত করা দরকার।
- বর্তমানের এক বছরের পরিবর্তে ভ্যাট সম্পর্কিত আপিল নয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা উচিত।

৩.৩ কৃষি, পল্লী উন্নয়ন এবং অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন

৩.৩.১ কৃষি

শস্য খাত

- **উপকূলীয় এলাকায় বোরো চাষ উৎসাহিতকরণ:** ভূমি কর্ষণ ও সেচ সুবিধা সৃষ্টি করা গেলে শুষ্ক মৌসুমে (বোরো ও আউস) উপকূলীয় এলাকাগুলোতে অতিরিক্ত ১০ লাখ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনা যেতে পারে। এছাড়া উপকূলীয় এলাকায় উচ্চ ফলনশীল আমন চাষের পরিধি বাড়ানো সম্ভব। পাশাপাশি এডিপির আওতায় বিশেষ প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে অথবা উপকূলীয় এলাকায় ওই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে (ডিএই) বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়ার জন্য বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে।
- **শুষ্ক মৌসুমে বরেন্দ্র অঞ্চলে ধান ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন উৎসাহিতকরণ:** উত্তরাঞ্চল বিশেষত বরেন্দ্র এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির অভাব দিন দিন তীব্র হচ্ছে। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে সামনের দিনের পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। এসব এলাকায় রবি মৌসুমে সেচ কম লাগে এমন শস্য (ডাল, পেঁয়াজ, ভুট্টা) চাষ উৎসাহিত করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের উদ্যান ফসল (আম, পেয়ারা ও অন্যান্য ফল) চাষও লাভজনক হতে পারে। এছাড়া কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিনামূল্যে বীজ ও চারা বিতরণ করা উচিত। বড় পরিসরে এসব কর্মসূচি নিতে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন।
- **উন্নত বীজ উৎপাদন ও বিতরণের জন্য "বীজ উৎপাদন তহবিল" করে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ:** এই তহবিলের মাধ্যমে: (১) বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রতি ছাড়কৃত নানা ধরনের উচ্চফলনশীল জাতের বীজ উৎপাদন করে সেগুলো বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বেসরকারি বীজ কোম্পানি এবং এনজিওদেরকে ভর্তুকি মূল্যে বিতরণ করা যেতে পারে, যা কৃষকদের চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে; (২) গুণগতমানসম্পন্ন বীজ ক্রয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে বিশেষত যেগুলো সাম্প্রতিক সময়ে ছাড় করা হয়েছে। যেমন – ব্রিধান৪৭ বোরো মৌসুমে এবং ব্রিধান৪০ এবং ব্রিধান৪১ আমন মৌসুমে লোনাপানির এলাকায় চাষের জন্য উপযোগী। এ পদক্ষেপ নিলে তা আধুনিকজাতের গুণগতমানসম্পন্ন বীজ সরবরাহে সরকারি খাতের সক্ষমতা বাড়াবে; (৩) সরকারি সংস্থা যেমন – বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিআরআরআই), বাংলাদেশ পারমানবিক কৃষি ইন্সটিটিউট (বিআইএনএ) ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং বীজ উৎপাদন ও বিপণনের সঙ্গে জড়িত বেসরকারি কোম্পানি এবং এনজিওদের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ধানবীজ উৎপাদনের জন্য এর প্যারেন্টাল লাইন বিতরণ করা যেতে পারে; এবং (৪) পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, আলু ও ছোলার উন্নত বীজ উৎপাদন এবং উচ্চ ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে এমন এলাকায় তা ভর্তুকি মূল্যে বিতরণ করা যেতে পারে।
- **সারে ভর্তুকির জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ:** প্রায়ই দেখা যায় যে, কৃষি মন্ত্রণালয় সারের যে চাহিদা নিরূপণ করে থাকে তা বাস্তবের তুলনায় কম। বিশেষত উচ্চফলনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) কর্তৃক সুপারিশকৃত মাত্রায় ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমওপির প্রকৃত চাহিদা অনেক বেশি। সারের প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ করে সারের ভর্তুকির জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া উচিত।
- **সেচের জন্য ভর্তুকি অব্যাহত রাখা এবং বিদ্যুৎ চালিত আধুনিক সেচ ব্যবস্থা উৎসাহিত করা:** সেচের জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুতের ওপর ২০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়ার বিদ্যমান সুবিধা অব্যাহত রাখা উচিত।

বর্তমানে মোট সেচকৃত এলাকায় একচতুর্থাংশ বিদ্যুৎ চালিত ব্যবস্থার আওতায় রয়েছে। ডিজেল চালিত সেচ ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশের সেচ ব্যয় (প্রতি হেক্টরে প্রায় ১০ হাজার টাকা) ভারত (পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ), থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামের চাইতে দুইতিন গুণ বেশি। সেচের জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ সেচ ব্যয় কমাতে এবং গ্রাম এলাকায় অর্থনৈতিক কার্যক্রম টেকসই করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি সেচ কার্যে বিকল্প জ্বালানির উৎসগুলোকে (যেমন সিএনজি) গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিতে হবে।

- **কৃষক এবং কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ বরাদ্দ:** কৃষক এবং উপজেলা ও বক পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট সহায়তা দিয়ে কেন্দ্রীভূত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া যেতে পারে। টোলমুক্ত মোবাইল ফোন, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন কৌশলের ওপর টিভি চ্যানেলগুলোতে বিশেষ অনুষ্ঠানের মতো কর্মসূচি হাতে নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সম্প্রসারিত ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা যেতে পারে। এজন্য আসন্ন বাজেটে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসএর অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে।
- **কৃষি গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ এবং সহায়তা:** কীটপতঙ্গের আক্রমণ ও রোগ এবং খরা, লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সহিষ্ণু প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন খুব জরুরি। অবকাঠামো উন্নয়ন ও জীবপ্রযুক্তি উন্নয়ন, রিমোট সেন্সিং এবং ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থার (জিআইএস) জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ দরকার। ২০০৭০৮ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি গবেষণার জন্য এনডাউমেন্ট তহবিল হিসেবে ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল যা প্রক্রিয়ার অভাবে ব্যবহার করা হয়নি।
- **উৎপাদন ব্যয়ের ওপর পর্যাপ্ত সহায়তা দিয়ে সর্বনিম্ন দর নিশ্চিতকরণ:** শস্য উৎপাদনে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে এই ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। এক্ষেত্রে সরকারের ক্রয়মূল্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সম্প্রতি অনেক এলাকায় ধান ও চালের বিক্রিত মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের থেকেও কম ছিল। এ প্রেক্ষিতে সরকার ধানের কেজি ১৪ টাকা এবং চালের কেজি ২২ টাকা সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ ও ঘোষণা করেছে। খসড়া হিসেবে এই দাম উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি এবং এটিকে যৌক্তিক মূল্য মনে করা যায়। চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১২ লাখ টন নির্ধারণ করা হয়েছে। বাজারদরের ওপর প্রভাব ফেলতে হলে এ লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করা দরকার হবে।
- **চাল আমদানিতে শুল্ক আরোপ:** গত কয়েক বছর ধরে অভ্যন্তরীণ চাল উৎপাদন ছিল প্রশংসনীয়। তবে এর ফলে স্থানীয় বাজারে চালের দাম কমে উৎপাদন খরচের নিচে চলে যায়। বর্তমানে ভারত চাল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে যা শিগগিরই উঠে যেতে পারে। ভারতীয় কৃষকদেরকে বড় আকারের ভর্তুকি দেওয়ার কারণে ভারতে চাল উৎপাদন ব্যয় বাংলাদেশের তুলনায় কম। ভারতে বর্তমানে সরকারি খাদ্য মজুদ তাদের নিয়মিত বাফার স্টকের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। এ অবস্থায় বাংলাদেশে চাল আমদানি নিরুৎসাহিত করতে এর আমদানির ওপর ১৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক পুনরায় আরোপ করা দরকার।
- **পাওয়ার পাম্পের শুল্কমুক্ত আমদানি:** বর্তমানে পাওয়ার পাম্প আমদানিতে ৩ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতে হয়। এটি কমিয়ে শূন্য শুল্ক করা উচিত।
- **ট্রাক্টরের ওপর থেকে শুল্ক হ্রাস:** কৃষি কাজে ব্যবহৃত ট্রাক্টরের ওপর আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ এবং এর সঙ্গে ৩ শতাংশ অগ্রিম আয়কর এবং ১ শতাংশ জাহাজীকরণের পূর্বে পরিদর্শন (পিএসআই) চালু রয়েছে। অন্যদিকে রোড ট্রাক্টর আমদানিতে আমদানি শুল্ক মাত্র ৫ শতাংশ। কৃষি ট্রাক্টরের আমদানি শুল্ক কমিয়ে ৫ শতাংশ এবং অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার করা দরকার।

পশুসম্পদ এবং পোল্ট্রি

- **বার্ড ফ্লু, ক্ষুরা রোগের মতো ছোঁয়াচে রোগের বিস্তার রোধকল্পে বিশেষ প্রকল্প:** বার্ড ফ্লু, ক্ষুরা রোগের মতো মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব পশুসম্পদ ও পোল্ট্রি শিল্পে প্রবৃদ্ধির পথে বড় বাধা। মহামারীর সম্ভাবনা কমানোর উদ্দেশ্যে পোল্ট্রি পাখির টিকাদানের জন্য সরকারের বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়ার দরকার। বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং তা আরও শক্তিশালী করা দরকার। পরিস্থিতি মোকাবেলায় চলমান কার্যক্রম অপর্যাপ্ত (দুটি প্রকল্পের আওতায় ৪০ কোটি টাকা), বিশেষ করে সোয়াইন ফ্লুর মতো অন্যান্য ঘাতক ব্যাধি বিবেচনায় যা বিশ্ব জুড়ে বহু দেশে সংক্রামিত হয়েছে।
- **দুগ্ধ খামার এবং পোল্ট্রি উন্নয়নে চিকিৎসা সেবার প্রসার:** সাম্প্রতিক অতীতে সব ধরনের পশুসম্পদ এবং পোল্ট্রি পণ্য, যেমন – মাংস, দুধ এবং ডিম উৎপাদন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দ্রুত সম্প্রসারণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পশুসম্পদ ও পোল্ট্রি খাতের জন্য সেবা প্রদান করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে পশু এবং পোল্ট্রি খামার অধ্যুষিত এলাকা গাজীপুর, নরসিংদী, সাভার, দাউদকান্দির (কুমিল্লা) মতো জেলাউপ জেলায় সেবা দান কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং আরও পশুসম্পদ কর্মকর্তা ও পশু চিকিৎসক নিয়োগ দিতে বাজেটে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
- **গুঁড়ো দুধ আমদানিতে শুল্ক বাড়ানো:** স্থানীয় দুধ উৎপাদনকারীরা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আসা ভর্তুকিপ্রাপ্ত দুধ রপ্তানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা টিকে থাকতে সক্ষম নন। এ জন্য স্থানীয় উৎপাদনকারীদের স্বার্থ রক্ষায় এবং স্থানীয় উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সরকার গুঁড়ো দুধের (এইচএস কোড ০৪০২.১০.৯০ এবং ০৪০২.২১.৯০) ওপর আমদানি শুল্ক ১২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।
- দুগ্ধ এবং পোল্ট্রি ফিডের কাঁচামাল, ওষুধ, অন্যান্য মেডিকেল সামগ্রী এবং পশুসম্পদ ও পোল্ট্রি খাতে ব্যবহৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে সব ধরনের শুল্ক ও কর অব্যাহতি দেওয়ার বিদ্যমান নীতি বহাল রাখা প্রয়োজন।
- পোল্ট্রি পণ্য (বিশেষত ডিম ও মাংস) আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক (২৫ শতাংশ) বহাল রাখা দরকার।
- দুধের ন্যূনতম দাম (উৎপাদন খরচের চেয়ে ২০ শতাংশ বেশি) নিশ্চিত করা সম্ভব হলে দুগ্ধ উৎপাদন উলেখযোগ্য হারে বাড়ানো যেতে পারে। বর্তমানে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণে বেশ কয়েকটি কোম্পানি জড়িত। এসব কোম্পানিগুলোকে কিছু প্রণোদনা যেমন – কম সুদে ঋণ, দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যয়ের ওপর ২০ শতাংশ মূল্য বাড়িয়ে ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণের নিশ্চয়তা প্রদানের শর্তে আয়কর অব্যাহতির মতো সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

মৎস্য সম্পদ

- **প্রজনন ব্যাংক স্থাপন:** সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পুকুরে মাছ চাষ ব্যাপকভাবে বেড়েছে। তবে ভালো মানের মাছের পোনার ঘাটতি এ খাতের প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে। ভালো মানের পোনার উৎপাদন মা মাছের ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন ধরনের মাছ যেমন – রুই, কাতলা, তেলাপিয়া, স্বচ্ছ পানির চিংড়ি মাছের জন্য একটি প্রজনন ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে মা মাছের চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে। বেসরকারি খাতে এ জাতীয় উদ্যোগের মাধ্যমে সুষ্ঠু সুবিধা না পেলে কোম্পানির পক্ষে লাভবান হওয়া বেশ কঠিন কাজ। মাছের প্রজনন ব্যাংক স্থাপনে বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ রাখা জরুরি।
- **পানি পরিবেশের উন্নয়ন এবং উন্মুক্ত উৎসগুলোতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিতে হবে:** পরিবেশ দূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে গত তিন দশকে নদী ও খালবি লে মাছ চাষ ব্যাপকভাবে কমেছে।

- **দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর আরোপের মাধ্যমে পানির গুণগত মানের উন্নতি:** নদীর তীরে স্থাপিত দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অপরিকল্পিত শিল্পবর্জ্য এবং রাসায়নিক দ্রব্যের কারণে মাছের উন্মুক্ত জলাশয় দূষণের কবলে পড়েছে। শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (ইটিপি) স্থাপন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা এবং নিয়মভঙ্গকারীদের জন্য অবশ্যই দূষণ কর চালু করতে হবে।
- **চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের রোগ প্রতিরোধে বিশেষ কর্মসূচি:** উপকূলীয় এলাকায় বর্তমানে ক্ষুদ্র পরিসরে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ চাষ হচ্ছে। অনেক পুকুরের মালিকানা ক্ষুদ্র খামারিদের হাতে। খুব কম ক্ষেত্রেই ছোট মাছ চাষীরা মাছের রোগ মোকাবেলা করতে পারে যা তাদের ব্যবসা চালু রাখার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বিশেষ কর্মসূচি নিয়ে ক্ষুদ্র মাছ চাষীদের প্রয়োজন মেটানো এবং মাছ উৎপাদনে টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়তা করা জরুরি প্রয়োজন।
- মৎস্য খাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য দরকার মানসম্মত পরিসেবা। নিবিড়ভাবে মাছ চাষ হয় এমন এলাকা, যেমন – বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভালুকা, মুক্তাগাছা এবং দাউদকান্দিতে আরও মৎস্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শূন্য পদ পূরণ এবং নতুন পদ সৃষ্টির জন্য বাজেট বরাদ্দ দরকার হবে।

সামগ্রিক কৃষি উন্নয়ন

- **উৎপাদন ব্যয় ও মূল্যের জন্য কমিশন গঠন:** বিভিন্ন ধরনের কৃষি পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহে এবং সরকার যা কিনতে চায় তার ক্রয়মূল্য সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এই কমিশন কাজ করতে পারে।
- **চিংড়ি মাছ, শাকসবজি এবং ফলমূল রপ্তানি উৎসাহিত করতে এসপিএস কমপ্লায়েন্ট সুবিধা স্থাপন:** চিংড়ি, মৎস্য পণ্য, শাকসবজি, ফলমূল ও অন্যান্য কৃষি পণ্য রপ্তানি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়েছে। তবে স্যানিটারি অ্যান্ড ফাইটোস্যানিটারি (এসপিএস) কমপায়েন্ট সুবিধা এবং সার্টিফিকেশন পদ্ধতির অভাবে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ মান পরীক্ষণ ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই), কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যেগে এ ধরনের পদ্ধতি চালু করতে বাজেটে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
- **কৃষি ঋণের সরবরাহ বাড়ানো:** শস্য, পশুসম্পদ, পোল্ট্রি এবং মৎস্য উৎপাদনের জন্য চলতি মূলধনের ঘাটতি পূরণে সরকারের একটি সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এ উদ্যোগের আওতায় কৃষি ব্যাংক, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক এবং ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। ২০০৮০৯ অর্থ´বছরে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯,০০০ কোটি টাকা কিন্তু অর্থবছরের জুলাইমার্চ´ সময়কালে বিতরণ করা হয়েছে ৬,৯০৭ কোটি টাকা। আগামী বাজেটে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
- **মুনাফার ব্যাপ্তি এবং বিপণন সুবিধা ওপর কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল:** গ্রামীণ এলাকায় সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং কৃষকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৃষি বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেওয়া উচিত। নিবিড় চাষ হয় এমন এলাকায় (যেমন, আলুর জন্য মুন্সিগঞ্জ, সবজির জন্য যশোর ও কুমিল্লা, ফলের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ) কৃষি বাজার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।
- **প্রয়োজনীয় উপাদান আমদানিতে শূন্য শুল্ক অব্যাহত রাখা:** বিভিন্ন ধরনের বীজ, প্রজননের জন্য প্রাণী ও মাছ আমদানিতে শূন্য শুল্ক বা কম শুল্ক অব্যাহত রাখা উচিত। এছাড়া শুল্কমুক্ত সার আমদানিও অব্যাহত রাখা উচিত। পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পের জন্য ভিটামিন এবং পুষ্টিদায়ক পণ্য আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

৩.৩.২ আঞ্চলিক উন্নয়ন

- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রকাশিত দারিদ্র্য মানচিত্র দেশের বেশিরভাগ দারিদ্র্যপ্রবণ উপজেলাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রধানত কুড়িগ্রাম, রংপুর, লালমনিরহাট, ময়মনসিংহ, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা এবং বান্দরবান জেলায় বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সুবিধার জন্য পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে বিশেষ প্রণোদনার আওতায় পর্যাপ্ত অবকাঠামোসহ উপযোগ, সেবা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা দরকার। যদিও নীতিনির্ধারকরা আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এ ইস্যু মোকাবেলায় কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন তথাপি সরকারি ব্যয়ে তা প্রতিফলিত হয় না। ২০০৭০৮ অর্থবছরে সরকারের জেলাওয়ারি উন্নয়ন ব্যয় এবং অনুন্নয়ন ব্যয়ের পর্যালোচনায় দেখা যায়, চরম দারিদ্র্যপ্রবণ শীর্ষ তিনটি বিভাগ (খানা আয়ব্যয় জরিপ ২০০5 অনুসারে বরিশাল, রাজশাহী ও খুলনা) প্রকৃত পক্ষে জনপ্রতি সরকারি বরাদ্দ ছিল সবচেয়ে কম (যথাক্রমে ৫,৮০০ টাকা, ৫,৬০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকা)।
- ছোট শহরগুলোর উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার যা উলেখিত এলাকার শহরগুলোকে অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে। এটি পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোতে প্রবৃদ্ধির সুষম বিভাজন এবং অনুন্নত এলাকাগুলোর প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সহায়ক হবে।
- দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নে আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর জন্য মংলা বন্দরের সক্রিয়করণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তির দুর্বলতা এবং ফেরি সার্ভিসসহ অনুন্নত হাইওয়ে করিডর মংলা বন্দরের উন্নয়নে বড় বাধা। এডিপির আওতায় মংলা বন্দরের প্রবেশপথে (৮৫ কিমি) পশুর নদী খননের একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া যেতে পারে।
- বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমিয়ে আনার জন্য প্রবাসী আয় অন্যতম চালিকা শক্তি। পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলো থেকে অধিক সংখ্যক লোককে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এ লক্ষ্যে বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন ও ঋণ সহায়তা কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। পলী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) নেওয়া এ সম্পর্কিত উদ্যোগ সম্প্রসারণ করা উচিত।
- নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, ভৈরব, কুমিলা ও অন্যান্য এলাকায় কৃষি কাজ এবং বিভিন্ন মেট্রোপলিটন শহরে অকৃষি কাজে মৌসুমী অভিবাসিত শ্রমিকরা নিয়োজিত থাকে। সরকার এসব শ্রমিকদেরকে তাদের পরিবারের কাছে কম খরচে অর্থ পাঠানোর জন্য ডাকঘর পদ্ধতির আওতায় একটি বিশেষ সেবা চালু করতে পারে।
- কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে সরকার প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দ দিতে পারে।

৩.৪ শিল্প, পুঁজিবাজার, আবাসন এবং অন্যান্য খাতভিত্তিক উদ্যোগ

৩.৪.১ খাতভিত্তিক সুপারিশসমূহ

তৈরি পোশাক

- ডিউটি ড্র ব্যাক সুবিধার জন্য রপ্তানিকারকদের দাবী দাখিলের সময়সীমা বাড়ানো যেতে পারে। বর্তমানে এই সময়সীমা ছয় মাস।
- ২০০৯১০ অর্থবছরের এডিপির আওতায় তৈরি পোশাক শিল্পে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য তহবিল বরাদ্দ করা যেতে পারে। গবেষণা ও উন্নয়ন সুবিধা রয়েছে এমন তৈরি পোশাক শিল্প ইউনিটে এই তহবিল থেকে হ্রাসকৃত হারে অর্থ দেওয়া যাতে পারে।

- বিভিন্ন তৈরি পোশাক কারখানা অঞ্চলে উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি এবং বিশেষ সেবা সুবিধা বাড়াতে একটি গুচ্ছ উন্নয়ন তহবিল (ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড) গঠন করা যেতে পারে।

বস্ত্র শিল্প

- সরকার বস্ত্র খাতের পশ্চাদসংযোগ শিল্প এবং সুতা উৎপাদনকারী শিল্পে নগদ সহায়তা (বর্তমানে ৫ শতাংশ) বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।
- পরিবেশের আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট আমদানির ওপর আমদানি শুল্ক বিদ্যমান ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য শতাংশ নির্ধারণ করা যেতে পারে।

পাট শিল্প

- পাট শিল্পে টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে স্থানীয় পর্যায়ে পাটজাত পণ্যের ব্যাপক ব্যবহারের জন্য আইন প্রণয়ন সহ এই শিল্পের জন্য সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। টেক্সটাইল কলেজগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর আওতায় পাটজাত পণ্যের উৎপাদন এবং বৈচিত্র্য সম্পর্কিত পৃথক একাডেমিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা/সম্প্রসারণ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

হিমায়িত খাদ্য

- চিংড়ি মাছে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কার্যক্রম হাতে নিতে বিশেষ বরাদ্দ দরকার। এই তহবিল চিংড়ি উৎপাদন পর্যায়ে প্রতিষেধক এবং ল্যাবরেটরি পরীক্ষণের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প

- খসড়া শিল্পনীতি ২০০৯ এ জাহাজ নির্মাণ খাতকে থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ শিল্পের জন্য কর অবকাশ এবং স্বল্প সুদে ঋণ সহ বিশেষ সুবিধা দেওয়া উচিত। রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে এ শিল্পের অগ্রাধিকার থাকা উচিত যেখানে ১ মিলিয়ন থেকে ১.৫ মিলিয়ন ডলারের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে।

হাই-টেক শিল্প

- কালিয়াকৈরে হাই-টেক পার্কের (প্রথম পর্যায়) মৌল অবকাঠামো নির্মাণ যত দ্রুত সম্ভব শেষ করা উচিত। ২০০৭০৮ এবং ২০০৮০৯ অর্থবছরে এখানে তহবিল বরাদ্দ এবং ছাড় সন্তোষজনক ছিল না। ২০০৯১০ অর্থবছরে হাই-টেক পার্কের জন্য এডিপি বরাদ্দ বাড়ানো দরকার এবং স্বল্পতম সম্ভাব্য সময়ে এর কাজ শেষ করা উচিত।
- একটি সমন্বিত সফটওয়্যার প্রযুক্তি পার্ক স্থাপনে এডিপিতে বরাদ্দ রাখা উচিত।
- তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশে সফটওয়্যার এবং এ সেবার জন্য কর অবকাশ সুবিধা আরও পাঁচ বছর বাড়ানো উচিত।
- গ্রামীণ এলাকায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযুক্ত সার্ভিস সেন্টার স্থাপনে এবং একটি স্কীমের আওতায় দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য সরকার এডিপিতে বরাদ্দ দিতে পারে।

- সরকার ২০০৮০৯ অর্থ বছরের বাজেটে ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনকারী শিল্প পার্ক স্থাপনের জন্য ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছিল। এ ধরনের পার্ক স্থাপনের বড় অঙ্কের অর্থ (২১৩ কোটি টাকা) প্রয়োজন বিধায় ওই তহবিলের সীমা বাড়ানো উচিত।

শ্রমিক সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ

- উলেখ করা যেতে পারে, সরকার চারটি প্রধান এলাকায় তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ২০০৯ সালের এপ্রিল থেকে ভর্তুকি মূল্যে চাল বিতরণ কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে। এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং অন্যান্য এলাকায় পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।
- ২০০৮০৯ অর্থ বছরে সরকার তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত নিম্ন আয়ের নারী শ্রমিকদের বিশেষতঃ মায়েদের সহায়তায় ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। পরবর্তী অর্থবছরেও এই কর্মসূচি বহাল রাখা উচিত।

৩.৪.২ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সম্পর্কিত বাজেট প্রস্তাবনা

- সরকার সমমূলধনী তহবিল ৩০০ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। অতিরিক্ত এই তহবিলের বড় অংশ কৃষিভিত্তিক শিল্পে বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে, কেননা এ খাতের জন্য সমমূলধনী তহবিলের বরাদ্দ সীমা ইতিমধ্যে অতিক্রম করেছে।
- সমমূলধনী তহবিলের আওতায় কৃষি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রকল্পের বাইরে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। অন্যান্য সম্ভাবনাময় শ্রমঘন শিল্প, যেমন – হালকা প্রকৌশল, পাস্টিক মেলামাইন এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্পে এই তহবিল থেকে বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে।
- সরকার ইতিমধ্যে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এসএমই তহবিলে বরাদ্দ ৫০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০০ কোটি টাকায় উন্নীত করেছে যা একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। তবে এই তহবিল যেন দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছায় সেজন্য সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
- বাণিজ্যিক ঋণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের প্রবেশ নিশ্চিত করতে বিশেষ বাজেট দরকার। এ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের বরাদ্দ বিদ্যমান ১০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৩০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা উচিত।
- স্থানীয় শিল্পের সহায়তার জন্য স্থানীয় বাজারভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা ধরনের শুল্ক রপ্তানিমুখী শিল্পের সমান পর্যায়ে নিয়ে আসা উচিত।
- খসড়া শিল্পনীতি ২০০৯এর স ঙ্গে সঙ্গতি রেখে সকল বিসিক এলাকায় অবকাঠামো সুবিধা উন্নয়নে সরকারের বরাদ্দ দেওয়া উচিত।
- ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রামের আওতায় ঋণ বিতরণ সহ দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে নানা সুযোগ দিতে এসএমই ফাউন্ডেশনকে কার্যকর এবং সক্রিয় করা দরকার।

৩.৪.৩ পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বাজেট প্রস্তাবনা

- ২০০৮০৯ অর্থ বছরের বাজেটে সরকার ২১টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের (বিদ্যুৎ খাতে ৯টি, শিল্প খাতে ১০টি এবং টেলিযোগাযোগ খাতে ২টি) শেয়ার বাজারে ছাড়ার ঘোষণা দেয়। প্রশাসনিক ও অন্যান্য জটিলতার কারণে সময়মতো সব শেয়ার বাজারে ছাড়ার বিষয়টি সম্পন্ন হয়নি। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার বাজারে ছাড়ার জন্য সরকারের উচিত একটি সময়সীমা নির্ধারণ এবং নির্ধারিত সময়ে তার বাস্তবায়ন।

- পদ্মা সেতু নির্মাণে বড় অঙ্কের তহবিলের প্রয়োজন। সরকার প্রয়োজনীয় এ তহবিলের একটি অংশ পুঁজিবাজারে বন্ড ছেড়ে যোগাড় করতে পারে।
- গ্রামীণফোনের শেয়ার ছাড়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি অন্যান্য টেলিকম কোম্পানির নির্দিষ্ট অঙ্কের শেয়ার পুঁজিবাজারে আনতে সরকারের উৎসাহ দেওয়া উচিত।
- তালিকাবহির্ভূত কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির জন্য উৎসাহ দিতে তালিকাভুক্ত এবং তালিকাবহির্ভূত কোম্পানির কর হারে পার্থক্য অব্যাহত রাখা উচিত।

৩.৪.৪ আবাসন, নির্মাণ ও গৃহায়ণ খাত সম্পর্কিত বাজেট প্রস্তাবনা

- অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি বা হস্তান্তরের ওপর স্ট্যাম্প ডিউটি এবং অন্যান্য অ্যাড ভেলোরেম কর ও চার্জ কমিয়ে আনার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করতে পারে।
- এ খাতে রিকন্ডিশন্ড মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং নতুন রিকন্ডিশন্ড মূলধনী যন্ত্রপাতি আদানিতে শুল্ক কমানো যেতে পারে।
- নির্মাণ খাতের সকল সংযোগ শিল্প, যেমন – ইট, সিমেন্ট, রড, ফার্নিচার, রং ও টাইলস উৎপাদন শিল্পকে নানান নীতি সহায়তা দেওয়া উচিত। ইট এবং লৌহ/ইস্পাতের উৎপাদন ব্যয় কমাতে এগুলোর ওপর অগ্রিম আয়কর এবং অগ্রিম বাণিজ্য ভ্যাট প্রত্যাহার করা উচিত। উলেখ করা যেতে পারে যে, ভারত সিমেন্ট শিল্পকে চাঙ্গা করতে বাল্ক সিমেন্টের ওপর ২ শতাংশ এক্সাইজ ডিউটি কমিয়েছে।
- এলাকাভেদে পার্থক্য রেখে সরকার জমির মূল্য নির্ধারণে নীতিমালা জারি করতে পারে। বিভিন্ন এলাকার বাজারমূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিদ্যমান মূল্য বাড়িয়ে জমির মূল্য যৌক্তিকীকরণ করা দরকার। এছাড়া সরকার কর ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে বর্তমান বাজারমূল্য এবং এলাকাভেদে ফ্ল্যাট ও অ্যাপার্টমেন্টের সর্বনিম্ন দর যৌক্তিকীকরণ এবং নিবন্ধনী ফি কমাতে পারে।
- বিভিন্ন এলাকায় (যেমন – ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং পাবনা) সীমিত আয়ের লোকদের জন্য গৃহায়ণ সেবার উন্নয়নে ২০০৭০৮ অর্থবছরে সরকার কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেয়। এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য এলাকায় নতুন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ দেওয়া উচিত।
- ২০০৮০৯ অর্থবছরের বাজেট বক্তব্য অনুসারে ২০০৭০৮ অর্থবছরে বস্তিবাসী ও নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য ১,০০০ ফ্ল্যাট এবং সুবিধাবঞ্চিত লোকদের জন্য ৫,০০০ ফ্ল্যাট ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০০৯১০ অর্থবছরেও এ ধরনের উদ্যোগে তহবিল বরাদ্দ রাখা উচিত।

৩.৫ জ্বালানি, অবকাঠামো এবং যোগাযোগ

৩.৫.১ জ্বালানি

বিদ্যুৎ

- লোডশেডিং সমস্যা মোকাবেলায় অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিজস্ব ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন সুবিধা স্থাপন করেছে। তবে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টে জেনারেটর ব্যবহারের জন্য ৫ লাখ টাকার নিবন্ধন নবায়ন ফি রয়েছে যা উৎপাদন ব্যয় বাড়ায় এবং অন্যান্য ক্যাপটিভ প্ল্যান্টে পুনর্বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত করে। নবায়ন ফি মওকুফ করার মাধ্যমে সরকার উদ্যোক্তাদেরকে ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে পারে।

- বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র খুব পুরোনো এবং জীর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং কার্যকর মাত্রায় এগুলো কাজ করে না (১,২৫২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন অন্ততঃ ৪০টি কেন্দ্র ২০ বছরের চেয়ে বেশি পুরোনো)। এর ফলে এসব কেন্দ্রে উৎপাদন কার্যক্রমে বড় অঙ্কের গ্যাস নষ্ট হচ্ছে। এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতিসমূহ পরিপূর্ণভাবে পরীক্ষা করার উদ্যোগ নিতে হবে। জীর্ণ যন্ত্রাংশগুলো মেরামত করতে ২০০৯১০ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে। জীর্ণ মেশিনারিগুলো সংরক্ষণ, মেরামত এবং পুনর্নির্মাণের জন্য পর্যায়ক্রমে এটা করা যেতে পারে। অন্যান্য বিদুৎ কেন্দ্র মেরামতের জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া দরকার। গ্যাস সংকটের কারণে ভেড়ামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। পুরোনো ও জীর্ণ কিছু পাওয়ার প্ল্যান্ট বন্ধ করে ভেড়ামারা কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ চালু করা যেতে পারে।
- আইপিপি প্রকল্প অথবা ভাড়ায় চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে স্থানীয়ভাবে সরবরাহকৃত ফিনিশড্ পণ্য "প্রচ্ছন্ন রপ্তানি" হিসেবে বিবেচনা অথবা ওই ফিনিশড্ পণ্য তৈরিতে আমদানি করা কাঁচামালের ওপর শূন্য শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে। সরকার জেনারেটর আমদানিতে ১.৫ শতাংশ অগ্রিম বাণিজ্য ভ্যাট প্রত্যাহার করতে পারে। আইপিপি এবং ভাড়াভিত্তিক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যমান দেশিবি দেশি কোম্পানিগুলো ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আমদানিতে শূন্য শুল্ক সুবিধা পেয়ে থাকে। অন্যদিকে এসব প্রকল্পে যে সকল দেশি কোম্পানি উলেখিত সামগ্রী সরবরাহ করে তারা একই রকম সুবিধা পায় না। ভারতে আইপিপি সম্পর্কিত কোম্পানিতে পণ্য সরবরাহে স্থানীয় কোম্পানিগুলো শূন্য শুল্ক সুবিধা পেয়ে থাকে এবং তা প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হয়। ভারতে পাওয়ার প্ল্যান্ট সংস্কার ও আধুনিকায়নেও প্রচ্ছন্ন রপ্তানির সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

- সৌর প্যানেলের ওপর ৩ শতাংশ আমদানি শুল্ক এবং ১.৫ শতাংশ অগ্রিম বাণিজ্য ভ্যাট প্রত্যাহার করা যেতে পারে।
- জনস্বার্থে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে সব ধরনের শুল্ক ছাড় দেওয়া উচিত। স্থানীয়ভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও বিতরণে সরকার সহায়তা দিতে পারে।

পারমানবিক শক্তি

- পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ওপর কারিগরি সমীক্ষার জন্য বিশেষ তহবিল বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে।
- আমদানিকৃত ইউরেনিয়াম ও থেরিয়াম নিরাপদে সংরক্ষণের কৌশল নির্ধারণ এবং সম্ভাবনাময় স্থানে উৎপাদনের আর্থপ্র্‌ যুক্তিগত সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ওপর সমীক্ষা চালানো যেতে পারে।

কয়লা

- কয়লা অনুসন্ধান, সঞ্চালন এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করার জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান দরকার। তাই দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের আওতায় কোল বাংলা (খনি বাংলা) প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা যেতে পারে। কয়লা নীতি যেহেতু চূড়ান্ত করা হয়েছে সেহেতু এটি দ্রুত কার্যকর করা উচিত। কয়লা অনুসন্ধান এবং ২,০০০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে ৫১০ বছরের একটি মাস্টার প্ল্যন (কয়লানীতি মাস্টার প্ল্যানে উলেখ ছিল) তৈরি করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণসহ কিছু কাজ শেষ করা উচিত।

গ্যাস

- গ্যাস অনুসন্ধান, সঞ্চালন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য এডিপিতে নতুন বরাদ্দ দেওয়া দরকার। সর্বশেষ ২০০৬ সালের মে মাসে বাঙ্গুরায় মাত্র ০.৪৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আবিষ্কৃত হয়। ১৯৯৮ সাল থেকে গ্যাস অনুসন্ধানে তেমন কোন প্রচেষ্টা নেই এবং ফলশ্রুতিতে গ্যাস আবিষ্কৃত হয়নি। দুঃখজনকভাবে গত বছরের এডিপিতে গ্যাস অনুসন্ধানকেন্দ্রিক কোনো প্রকল্পের কথা উলেখ করা হয়নি।
- চাপ বাড়ানোর জন্য গ্যাস পরিবহন পাইপ লাইনের বিভিন্ন পয়েন্টে কমপ্রেশরস্ স্থাপন জরুরি। এ উদ্যোগ নিলে তা পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ থাকবে। কেয়ার্নসএর ম তে, একটি কমপ্রেশর স্থাপনের ফলে গ্যাস ক্ষেত্রের স্থায়িত্ব আরও ১৫ বছর বাড়বে।
- সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় সম্পদ গবেষণা বিভাগে একটি আলাদা সেল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। ২০০৯১০ অর্থ বছরে এই গবেষণা সেলের জন্য বিশেষ বরাদ্দ ঘোষণা করা যেতে পারে। তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধানে সহায়তা করতে এবং দেশের প্রাকৃতিক রিজার্ভ পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে ভৌগোলিক উপরিভাগের ওপর থ্রিডি সিসমিক গ বেষণা (3D Seismic Readings) এই সেলের প্রধান উদ্দেশ্য হতে পারে।

৩.৫.২ অবকাঠামো ও যোগাযোগ

- ‘কয়লা পরিবহনে সমন্বিত চট্টগ্রাম বন্দর আধুনিকায়ন’ প্রকল্পে এডিপিতে নতুন বরাদ্দ প্রয়োজন।
- কয়লা আমদানির বিষয়টি সরকারের আরও উন্মুক্তভাবে বিবেচনা করা উচিত। এটা করতে চট্টগাম বন্দরের চ্যানেলের (গভীরতা এবং বিস্তৃতি) উন্নতি দরকার যাতে ভারি মালামাল বহনকারী জাহাজ বন্দরে নোঙর ফেলতে পারে। বন্দরমুখী প্ল্যান্ট স্থাপন, জমি নির্ধারণ, কনভেয়ার বেল্টের মতো কয়লা খালাস সুবিধা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ একটি সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় হওয়া উচিত। নির্ধারিত সময়ের জন্য ইন্দোনেশিয়া অথবা অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়লা আমদানির মাধ্যমে ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি সরকার বিবেচনা করতে পারে এবং এই সময়ের মধ্যে দেশের সম্ভাবনাময় কয়লা সম্পদ ব্যবহারের জন্য অনুসন্ধানের সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে কৌশল নির্ধারণ করা উচিত।
- মংলা বন্দরের মাধ্যমে রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করতে এডিপিতে বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে। এই রেল যোগযোগ দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে ভারত ও নেপাল এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে যা পর্যায়ক্রমে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে উৎসাহিত করবে। যেহেতু পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প ইতিমধ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে সেহেতু ভবিষ্যতে এই দুটি উদ্যোগ এক সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে হিমাগার সুবিধার আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ খুবই জরুরি। অপর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজের কারণে বিমানবন্দরে রপ্তানির জন্য রাখা দ্রুত পচনশীল পণ্য, জরুরি জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্যের রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকেরা সময়মতো শিপমেন্ট সম্পন্ন করতে সমস্যায় পড়ছেন।
- যদিও কিছু চলমান অবকাঠামো প্রকল্পে (যেমন, চার লেন বিশিষ্ট ঢাকাচ ট্টগ্রাম এক্সপ্রেস হাইওয়ে, যশোর-বেনাপোল হাইওয়ে, গুলিস্তানযা ত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার ইত্যাদি) এডিপি তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে তথাপি এসব তহবিলের বাস্তবায়ন জোরদার করা দরকার।

৩.৬ সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিবেশ

৩.৬.১ সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী

ভাতা কর্মসূচি

- চলমান বিশ্ব আর্থিক সংকটের নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাড়ছে। এই সংকটের প্রভাব বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ওপর একেক রকমভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে দরিদ্র বয়স্ক নাগরিক, বিধবা ও সুযোগবঞ্চিত নারী, দরিদ্র গর্ভধারিণী মা, এতিম শিশু এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার লোকজনদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ভাতা বাড়ানো দরকার। জনপ্রতি বিদ্যমান ভাতা ২০৩০ শতাংশ ব ৃদ্ধি এবং আওতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসব কর্মসূচি আরও জোরদার করা যেতে পারে।
- ২০০৫ সালের নতুন দারিদ্র্য মানচিত্র বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দারিদ্র্যপ্রবণ ভৌগলিক এলাকা চিহ্নিত করেছে। এসব এলাকায় সুযোগবঞ্চিত গোষ্ঠীর সহায়তায় অধিকতর সামাজিক সুরক্ষা ভাতা প্রয়োজন। নতুন দারিদ্র্য মানচিত্র ব্যবহার করে এসব গোষ্ঠীর জন্য ২০০৯১০ অর্থ বছরে নতুন সহায়তা কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে। এ ধরনের কর্মসূচির জন্য বাজেটে নির্দিষ্ট বরাদ্দ দেওয়া উচিত।
- বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা জাল ও ভাতা কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরিতে স্থানীয় জাতীয় রাজনীতির প্রভাব এবং পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। এ ধরনের নৈতিক ঝুঁকি এড়াতে সরকার প্রকৃত সুযোগসুবিধা ব ঞ্চিত লোকজনের সহায়তার জন্য নতুন এবং হালনাগাদ সুবিধাভোগী তালিকা তৈরির উদ্যোগ নিতে পারে। নতুন তালিকা তৈরিতে বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেওয়ার দরকার। এই পদ্ধতি সহজ, দ্রুত এবং স্বজনপ্রীতি মুক্ত করতে সরকার জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করতে পারে।

খাদ্য নিরাপত্তা

- সরকার তার খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত শরণার্থীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।
- বিতরণে স্বচ্ছতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সংসদ সদস্যদের পরিবর্তে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত টেস্ট রিলিফ বিতরণ করা দরকার।
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। এ প্রেক্ষিতে সরকার উপজেলা পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি অথবা সরকারদাতা যৌথ উদ্যেগে শস্য সংরক্ষণাগার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।
- সরকার ভালনারেবেল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) কর্মসূচি সম্প্রসারণের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের গোবাল ফুড ক্রাইসিস রেসপন্স প্রোগ্রাম (জিএফআরপি) থেকে তহবিল পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে।

ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতায়ন

- পিকেএসএফ পরিচালিত সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং এনজিও ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে সামাজিক সহায়তা ও লক্ষ্যভিত্তিক গোষ্ঠীর প্রতি আরও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সহজতর পরিশোধ সময়সীমা এবং সর্বোচ্চ সুদ হার নির্ধারণ (সম্ভাব্য উপকারভোগীদের দারিদ্র্যের পর্যায় বিবেচনায় যা ০৫ শতাংশ হওয়া উচিত) ক রে উলেখিত সংস্থাগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সংশোধন করা উচিত।

- দরিদ্রদের জন্য নানা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সফলভাবে পরিচালনায় সরকারের জনবলের অভাব এবং সীমিত ভৌত অবকাঠামো রয়েছে। এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য (যেমন – নতুন জনবল নিয়োগ) ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকা উচিত।

বিশেষ কর্মসূচি

- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকার তহবিল কার্যকরভাবে ব্যবহার করা দরকার। জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনার আওতায় ১৮টি মন্ত্রণালয়ে ২৭টি খাতে সঠিকভাবে এই তহবিল বরাদ্দ দেওয়া উচিত।
- অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারের ওপর বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের নেতিবাচক প্রভাবের প্রেক্ষাপটে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ কর্মসূচি পুনরায় চালু করা যেতে পারে। ২০০৯১০ অর্থ বছরে এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া দরকার।
- যেসব নারীরা পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তাদের জন্য পৃথক কর্মসংস্থান স্কীম চালু করা উচিত।
- এদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী নির্যাতন একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। নির্যাতনের শিকার নারীদের চিকিৎসা ও আইনগত সহায়তার জন্য সরকারের পৃথক তহবিল গঠন করা উচিত।
- অতীতে সরকার তৈরি পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের কল্যাণে তহবিল বরাদ্দ করেছে যা অব্যবহৃত থাকতে দেখা গিয়েছে। সরকার এবং সংশিষ্ট কোম্পানির সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে তৈরি পোশাক শ্রমিকদের জন্য কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করা যেতে পারে। এ তহবিলের আওতায় কোম্পানির পরিশোধিত অর্থ করমুক্ত রাখা যেতে পারে।

৩.৬.২ স্বাস্থ্য

- যদিও নগরায়ন উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক, তথাপি তা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত বর্ধনশীল শহরে বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যেখানে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, বিশেষত নিরাপদ পানীয় জল, পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল। বড় বড় শহরে বস্তিবাসীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন তহবিল/মেডিকেল সেন্টারের বিষয়টি সরকারের বিবেচনা করা দরকার।
- জনস্বাস্থ্য সেবা, বিশেষত গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং বিতরণ পদ্ধতি খুবই দুর্বল। দেশের প্রায় সকল সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কমপেক্সে যোগ্য ডাক্তার, স্বাস্থ্য সহকারী, প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী, শয্যা এবং মেডিক্যাল যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। সরকারি হাসপাতাল এবং থানা/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন ও সংস্কার এবং সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া উচিত।
- প্রশিক্ষিত আধুনিক ডাক্তারের সংখ্যা স্বাস্থ্য খাতে মোট জনশক্তির খুবই সামান্য অংশ এবং শুধুমাত্র শহরাঞ্চলের মূল কেন্দ্রগুলোতে তাদের নাগাল পাওয়া যায়। কিছু দাতব্য কার্যক্রম ছাড়া গ্রামের লোকজন গুণগত মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। গ্রামীণ এলাকায় যোগ্য ডাক্তারদের সেবা পৌঁছে দিতে সরকারের অতিরিক্ত প্রণোদনা (আর্থিক এবং অআর্থিক) দেওয়া উচিত।
- প্রতিবন্ধীদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির (যেমন - হুইল চেয়ার) জন্য কর মওকুফ সুবিধা এখনও সীমিত। সরকার এসব পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

- প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ব্যয় কমাতে তাদের জন্য মনোচিকিৎসা (সাইকোথেরাপি) সেবার ওপর ভ্যাট মওকুফ করা যেতে পারে।

৩.৬.৩ শিক্ষা

- সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন কাঠামো বাড়ানো উচিত। এজন্য দুটি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে: (১) নির্দিষ্ট যোগ্যতা রয়েছে এবং চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন প্রধান শিক্ষকদের উচ্চ বেতন কাঠামো ও বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া; এবং (২) সাধারণ শিক্ষকদের জন্য যোগ্যতা ও উপযুক্ততার শর্ত সাপেক্ষে বেতন বাড়ানো (বিদ্যমান গ্রেড১২ থেকে বাড়িয়ে গ্রেড১৫) যেতে পারে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে অঙ্ক, বিজ্ঞান এবং ইংরেজি বিষয়ে যোগ্য শিক্ষকের মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে। নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং যথাযথ পরীক্ষার মাধ্যমে (পাইলট ভিত্তিতে নির্ধারিত ২০০ গ্রামীণ স্কুলে) শিক্ষক নিয়োগের জন্য বাজেটে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যোগ্য লোক আকর্ষণে পর্যাপ্ত উচ্চ বেতন দিয়ে ৫ বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। এরকম সম্ভাবনাময় শিক্ষক খণ্ডকালীন ভিত্তিতেও (যেমন – এক সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা) নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে এবং অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত অথবা অবসরপ্রাপ্ত লোকদের জন্যও এই সুযোগ উন্মুক্ত করা যেতে পারে।
- এদেশের কলেজগুলোতে শিক্ষার গুণগতমান খুবই দুর্বল। অন্যদিকে, যেহেতু এসব কলেজ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সম্ভাব্য শিক্ষকদের শিক্ষা দিয়ে থাকে, তাই এ কলেজগুলোতে শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে কার্যকর মনোযোগ দেওয়া দরকার। শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রশি ক্ষক অনুপাত, লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি, শ্রেণীকক্ষ, ছাত্রাবাস প্রভৃতির উন্নয়নে পর্যায়ভিত্তিক কর্মসূচি চালু করতে বাজেটে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। এই বছরে অন্ততঃ ১০০ নির্ধারিত কলেজে এ ধরনের কর্মসূচি চালু করা উচিত। এই অভিজ্ঞতার কার্যকর মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে পরবর্তী ৩-৫ বছরে সকল কলেজে এই কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।
- দারিদ্র্যপ্রবণ এবং ভৌগলিকভাবে অনগ্রসর এলাকায় সামগ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির গুণগত মান খুবই দুর্বল। প্রত্যন্ত অঞ্চল, যেমন – হাওর ও চর এলাকায় বিশেষ প্রয়োজন মোকাবেলায় অঞ্চলভিত্তিক বিশেষভাবে প্রণীত শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে।
- সরকারি অধিকাংশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা সুবিধা সেকেলে। বাংলাদেশকে যদি আন্তর্জাতিক বাজারে জনশক্তি রপ্তানির জন্য প্রতিযোগিতায় নামতে হয় তাহলে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। এজন্য এ প্রতিষ্ঠানগুলোর আধুনিকায়ন এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনশক্তির চাহিদা বিবেচনায় এ ধরনের আরও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় সরকারের পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ দেওয়া দরকার।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে দিনের মধ্যভাগে পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার জন্য ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেটে নির্দিষ্ট তহবিল বরাদ্দ দেওয়া উচিত। পরবর্তী ২-৩ বছরে দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রত্যেক বিভাগের নির্ধারিত কিছু এলাকায় প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে।
- প্রতি বছর মাসিক পেঅর্ড ার (এমপিও) স্কীমের আওতায় অনেক স্কুল আসছে। তবে এই স্কীমের শর্তাবলীর সঙ্গে এমপিও সুবিধাপ্রাপ্ত স্কুলগুলো কমপায়েন্ট কিনা তা নিয়ে কোন মূল্যায়ন হয় না। ছয় মাসের মধ্যে এমপিও সুবিধাভুক্ত প্রত্যেকটি স্কুলকে সঠিক মূল্যায়নের আওতায় এনে ননকমপ ায়েন্ট স্কুলগুলোর জন্য ওই সুবিধা বাতিলের জন্য বাজেটে পদক্ষেপ থাকা উচিত।
- শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্যপ্র যুক্তিকে সমন্বয় এবং গুরুত্ব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় একটি ইএডু কেশন সেল গঠন করা যেতে পারে। এই সেল সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর ফোকাল পয়েন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

- শিশুদেরকে সময়মতো পাঠ্যবই বিতরণে জটিলতা এড়াতে ওয়েবসাইটে সকল পাঠ্যবই প্রকাশ করতে সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বই অধিপ্তরকে (এনসিটিবি) নির্দেশনা দিতে পারে। এই পদক্ষেপ নিলে ওয়েবসাইট থেকে সংশিষ্ট পাঠ্যবইয়ের প্রাথমিক অধ্যায়গুলো ছাপিয়ে নিয়ে যথাসময়ে ক্লাস শুরু করা যেতে পারে। এর ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বই ছাপতে ও বিতরণ করতে বই প্রকাশকদের ওপর চাপ সৃষ্টি হবে।
- নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বৃত্তি কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে।
- সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মধ্যে যারা নিম্ন পর্যায়ের ৭টি গ্রেডে বেতন পান তাদের দুটি সন্তান পর্যন্ত প্রতি সন্তানের জন্য বাজেটে ২৫০ টাকার একটি বৃত্তি প্রকল্প চালু করা যেতে পারে। এসব শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ওই বৃত্তি দেওয়া যেতে পারে।

৩.৬.৪ পরিবেশ

- বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্টের বিভিন্ন অংশ পৃথক উপাদান হিসেবে ধরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রত্যেক অংশের ওপর আলাদা ও স্বতন্ত্র শুল্ক আরোপ করে। ফলে এ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যয় বেড়ে যায়। প্ল্যান্টের সমস্ত অংশ একত্রে আমদানি এবং ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে আমদানির ক্ষেত্রে অংশগুলোকে পুরো মেশিনের অবিচ্ছেদ্য উপাদান বিবেচনা করে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন।
- কার্বন নির্গমনকারী পুরোনো যানবাহনগুলোকে জরিমানা করা উচিত। কার্বন করারোপ এসব যানবাহনকে রাস্তায় চলাচল নিরুৎসাহিত করতে পারে।
- দূষণকারী এবং ননকমপ য়েন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা একটি কার্যকর কৌশল হতে পারে। রাসায়নিক বর্জ্য উৎপাদনকারী শিল্প, বিশেষত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধন প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের ওপর ৫ শতাংশ দূষণ কর অথবা গ্রীন ট্যাক্স আরোপ করা যেতে পারে।
- যেসব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান তহবিলের অভাবে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন কৌশল নিতে পারছে না তাদের এ কাজে উৎসাহিত করতে সরকার তহবিল বরাদ্দ করতে পারে।
- বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় তহবিল গ্রহণকারীদের জন্য প্রাপ্ত অর্থের পরিবেশসম্মত ব্যয় বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৩.৭ উন্নয়ন প্রশাসন ও বিতরণ কৌশল

এডিপি: আকার এবং বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশে বিনেয়াগের বড় উৎস হচ্ছে এডিপি। এটি সত্য যে, এডিপির গুণগত ও পরিমাণগত উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি ব্যয় বাড়ানো হয় না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এডিপির বাস্তবায়ন গতি এবং বাস্তবায়নের গুণগত মান নিবিড় পর্যবেক্ষনের আওতায় এসেছে। বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের উচ্চ হার নিশ্চিত করতে এডিপির আকার কম রাখা এবং এডিপির আকার তুলনামুলকভাবে বড় রেখে কম অর্থ ছাড়ের ঝুঁকি -এ দুই য়ের মাঝে সব সময় একটি দুশ্চিন্তা থাকে। চলমান বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ চাঙ্গা করতে এই বছর বড় ধরনের সরকারি বিনিয়োগের দরকার রয়েছে। যদিও অপেক্ষাকৃত বেশি বাজেট ঘাটতি হতে পারে তারপরও ২০০৯১০ অর্থ বছরে এডিপির জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি এডিপির অর্থ ছাড়ের গতি এবং গুণগত মান বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে। এটা সাফল্যের সঙ্গে শেষ করা চ্যালেঞ্জিং কাজ হবে। এর জন্য নিম্নোক্ত কৌশল নেওয়া যেতে পারে:

- সকল চলমান প্রকল্প সময়মতো শেষ করার জন্য প্রকল্পভিত্তিক সুবিবেচিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এসব কর্মপরিকল্পনা সংশিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষের তৈরি এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া উচিত। এসব প্রকল্প যেহেতু যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে সেহেতু তা জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) অথবা পরিকল্পনা কমিশনের মতো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের দরকার হওয়া উচিত নয়।
- এসব কর্মপরিকল্পনার আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে এবং সম্পদের প্রাপ্যতাসহ প্রকল্পের বাকি সময়ে কতটুকু অর্জন সম্ভব তার ওপর বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা থাকতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতার ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।
- পরিকল্পনার আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক তদারকযোগ্য কার্যক্রম এবং কর্তৃপক্ষের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে। যেসব কাজ প্রকল্পকালীন সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বা উচ্চ অগ্রাধিকারভুক্ত নয়, তার জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদ আলাদা করে রাখা যেতে পারে।
- পরিকল্পনার আওতায় পণ্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ থাকতে হবে এবং প্রকল্পের ক্রয় চাহিদা মেটানোর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে।
- উন্নয়ন প্রস্তাব অনুসারে প্রকল্পসমূহের জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। শূন্য পদগুলো বিশেষত প্রকল্প পরিচালক পদে নিয়োগ দ্রুত শেষ করতে হবে। প্রস্তাবে খণ্ডকালীন পরিচালক নিয়োগের সুযোগ না থাকলে সকল প্রকল্পের জন্য পূর্ণকালীন পরিচালক নিয়োগ করতে হবে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সংযুক্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ পক্ষের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে সংশিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষসমূহকে প্রতিটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এছাড়া এসব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে যতদূর সম্ভব স্থানীয় প্রশাসনের সম্পৃক্ততা বাড়ানোও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।
- উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় সরকারের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল অর্থবছরের প্রথম দিকে একবারে ছাড় করা যেতে পারে, যাতে এসব প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়ে বছরের প্রথম প্রান্তিকেই বাস্তবায়ন শুরু করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার মাধ্যমে তৈরি করা উচিত। এ ধরনের প্রকল্প উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া উচিত এবং ঢাকা অথবা জেলা সদর দপ্তরের কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের দরকার হওয়া উচিত নয়।
- কর্মপরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়ন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিশেষত অর্থবছরের প্রথম থেকে শুরু করা উচিত। এসব কর্মপরিকল্পনার সময়মতো বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বাস্তবসম্মত তদারকি কৌশল প্রণয়ন করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সহ প্রকল্পের বাইরের সুবিধাভোগীদের এই তদারকি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

এসব কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ প্রাপ্যতার সমস্যা হবে না কেননা অনুমোদিত চলমান প্রকল্পগুলোর সম্পদ ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুত এবং অনেক ক্ষেত্রেই মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় (এমটিবিএফ) এগুলো প্রণীত হয়েছে। যা দরকার তা হলো, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের শক্তিশালী মালিকানা। সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের দেখা উচিত যে, এ ধরনের মালিকানা আছে কি না।

- ক্রয়নীতি ২০০৬এ অ নেক গুরুত্বপুর্ণ বিষয় থাকলেও কমপায়েন্স সংশিষ্ট বিষয়ে দীর্ঘসূত্রিতার জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এটি ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে। সরকার দেশে সরকারি ক্রয়নীতির উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ক্রয় কারিগরি ইউনিট স্থাপন করেছে। ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করতে সরকার বর্তমানে ক্রয়নীতি পর্যালোচনা করছে। যাই হোক, আগের পদ্ধতির দুর্বলতাসমূহ (যেমন – দুর্বল সুনির্দিষ্টিকরণ, মনোন্নয়ন মানদণ্ড উন্মোচন না করা এবং প্রযোজ্য কারণ ছাড়া পুনঃদরপত্র) বাদ না দিয়ে এটা করা উচিত হবে না।

- তহবিল ছাড়ে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয়করণ এবং বাধাসমূহ সুরাহা করা দরকার হবে। একটি সাধারণ নীতি হতে পারে যে, এডিপিতে একবার অন্তর্ভুক্ত হলে সেই প্রকল্পগুলোর জন্য অন্যান্য সংস্থার আর অনুমতির দরকার হবে না।
- বিদ্যুৎ উৎপাদনের গুরুত্ব বিবেচনায় এখানে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। বাজেটে এক্ষেত্রে সঠিক বরাদ্দ দেওয়ার দরকার হবে। এই খাতের জন্য বিশেষ তদারকি কৌশল তৈরি করতে হবে। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপের সমন্বয়সাধন গুরুত্বপূর্ণ। কয়লা নীতি চূড়ান্তকরণ, কয়লা সম্পদের ব্যবহার এবং কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। একটি সহায়তাভিত্তিক কর্মসূচি নেওয়া যেতে পারে যেখানে প্রকল্প বাস্তবায়নে সফল বিভাগগুলোকে তহবিল বরাদ্দে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় বিচারে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যাপ্তভাবে তদারক নিশ্চিত করতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগকে (আইএমইডি) ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করা উচিত। বর্তমানে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং জাপান সরকারের সহায়তায় এ বিভাগকে শক্তিশালী করতে একটি কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের অংশ হিসেবে ফলাফলনির্ভর তদারকি এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনার ধারণা প্রতিষ্ঠা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণাসহ মানবসম্পদ অধিকতর শক্তিশালী করার বিষয়টি আলোচনা হচ্ছে। ফলাফলনির্ভর তদারকি আইএমইডি কার্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত। এই তদারকির আওতায় মূল মন্ত্রণালয়ের সংশিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।
- প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করতে পদ্ধতি নির্ধারণ করা উচিত। মূল ফলাফল এলাকাগুলোতে বাস্তবায়নের গুণগতমান তদারকি এবং সময়মতো বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মকর্তা, সুবিধাভোগী এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।
- ভূমি অধিগ্রহণ, স্থানচ্যুতি, পুনর্বাসন এবং পুনঃনিষ্পত্তির (resettlement) কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হয়। উন্নয়নের জন্য ভূমির প্রয়োজনীয়তা এবং যাদের ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় তাদের পুনর্বাসন – এ দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা দরকার। এ জন্য পর্যাপ্ত পুনর্বাসন প্যাকেজ এবং স্থানচ্যুতির বিকল্প রেখে একটি নীতি থাকা দরকার।

৩.৮ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)

এদেশে সবসময়ই বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন এবং উন্নয়ন শুধুমাত্র সরকারেরই প্রাথমিক দায়দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। তবে অবকাঠামোর জন্য চাহিদা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা বেড়ে যাওয়ায় অবকাঠামো প্রকল্পে অর্থায়ন, উদ্ভাবনীমূলক চর্চা এবং কারিগরি দক্ষতার জন্য বেসরকারি খাতের দিকে সরকার ঝুঁকছে। এই অর্থবছরের বাজেটে পিপিপি চালু হবে বলে অর্থমন্ত্রী ধারণা দিয়েছেন এবং সম্প্রতি ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজেও এই ধারণার উলেখ করা হয়েছে। যদিও বাজেটে পিপিপি বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন প্রত্যয় হবে তবে পিপিপির মাধ্যমে অবকাঠামো প্রকল্প বিশেষত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প (যেমন, বিবিয়ানায় ৩৩০৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট) ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। বেশ কিছু দেশে পিপিপি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের ৩০টিরও বেশি দেশে এ ধরনের অংশীদারিত্ব রয়েছে যার অধিকাংশই উন্নত দেশ। অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশ, যেমন – চীন, ব্রাজিল, চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কিছু ক্ষেত্রে ভারতও এ ধরনের উদ্যোগের সঙ্গে সংযুক্ত।

সাধারণত যে সকল খাতে এ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পিপিপির আওতায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে:
■ পরিবহন, ■ রাস্তা, সেতু ও রেলপথ; ■ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি; ■ টেলিযোগাযোগ; ■ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও উন্নয়ন; ■ পানি সম্পদ; ■ বেসামরিক বিমান চলাচল।

বেশিরভাগ দেশে এ ধরনের অংশীদারিত্ব প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবহন এবং পরিবহন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোর দিকে মনোযোগ দিয়েছে। পরিবহন অবকাঠামো দিয়ে শুরু করে কোরিয়া এই অংশীদারিত্ব পরবর্তীতে স্কুল, হাসপাতাল এবং গৃহায়ণ প্রকল্পে বিস্তৃত করেছে। স্পেনে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবহন অবকাঠামো কেন্দ্রিক (স্পেনে ২০০৫২০ সময়কা লে পরিবহন পরিকল্পনার মূল উপাদান হচ্ছে পিপিপি)। ফ্রান্স সরকার সে দেশের উত্তরপশ্চিম এলাকায় ১২৫ কিলোমিটার মোটরপথ তৈরি, অর্থায়ন ও পরিচালনার জন্য এএলআইএস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ৬২ বছরের একটি কনসেশন চুক্তি করেছে। এই মোটরপথ ২০০৫ সালের শেষ দিকে চালু হয়। এর পাশাপাশি ফ্রান্স সরকার পরিবহন, স্বাস্থ্য, কারাগার, চিড়িয়াখানা এবং অন্যান্য সরকারি সেবা খাতের জন্য ৩৫টি পিপিপি প্রকল্প ঘোষণা করেছে। পর্তুগাল বিভিন্ন খাতে এ ধরনের অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করেছে। পর্তুগালের পিপিপিজিডিপি অনুপাত ১.২ শতাংশ থেকে ১.৩ শতাংশের মধ্যে, যা ইউরোপের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং যুক্তরাজ্যের প্রায় দ্বিগুণ। বড় বড় পরিবহন প্রকল্পে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি পর্তুগালে পানি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পিপিপি প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পিপিপির আওতায় আয়ারল্যান্ডে বেশ কিছু পানি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প রয়েছে। এছাড়া আইরিশ সরকার কারাগার, আদালত, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতেও পিপিপি প্রকল্পের ঘোষণা দিয়েছে। ইতালিতে পরিবহনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলেও স্বাস্থ্য, পানি এবং কেন্দ্রীয় বাসস্থানের ওপর তাদের পিপিপি প্রকল্প রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়াতে পিপিপি ভিত্তিতে বড় টোল সড়ক নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে মেলবোর্নে ৪০ কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে। অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে সিডনি হারবার টানেল, এম ২, এম ৪ এবং এম ৫ মোটরপথ, ইস্টার্ন ডিস্ট্রিবিউটর, ওয়েস্টার্ন সিডনি অরবিট্যাল এবং লেন কোভ টানেল। তুরস্কে পিপিপি বাস্তবায়নে কিছু প্রতিবন্ধকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর কারণ, সে দেশের সংবিধানে একটি ধারা রয়েছে যা প্রাকৃতিক সম্পদের যেকোন হস্তান্তর প্রতিরোধ করে। অপর্যাপ্ত আইনি কাঠামো এবং রাজনৈতিক সহায়তার অভাব তুরস্কে পিপিপি বাস্তবায়নের অন্যতম বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারত কিছু কার্যক্রমে বিশেষত অবকাঠামো এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পে পিপিপি ব্যবহার করেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতি কাঠামো

যেকোন সরকার গৃহীত পিপিপির অন্যতম সাধারণ উপাদান হচ্ছে একটি আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা যাতে প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগত কাঠামো থাকবে। সাধারণ অভিজ্ঞতা হলো যথাযথ মন্ত্রণালয়গুলো পিপিপির উদ্যোগ নিয়ে থাকে। তবে পিপিপি সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতার জন্য বেশ কিছু দেশ নিবেদিত কেন্দ্র অথবা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনকি এশিয়া অঞ্চলেও কিছু পিপিপি কেন্দ্রের অস্তিত্ব রয়েছে। যেমন –

- ফিলিপাইনে বিওটি কেন্দ্র
- কোরিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান সেটেলমেন্টস্‌এ স্থাপিত পিআইসিকেও।

পিপিপি কর্মসূচি তৈরির ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে এ থেকে কী অর্জিত হবে তা সরকারকে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া সরকারকে অনিবার্য পরিণতি মেনে নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ পিপিপি বিভিন্ন ধরনের সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকায় পরিবর্তন আনবে। তবে এর ফলে নাগরিকেরা যেহেতু অধিকতর ভালো সেবা পাবে সেহেতু চূড়ান্ত পর্যালোচনায় রাজনৈতিক লাভ সরকারের দিকেই যাবে।

সরকারের পিপিপি পরিকল্পনা নিম্নলিখিত লক্ষ্য কাঠামোর আওতায় প্রণীত হওয়া উচিত:

- সেবা/অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব বেসরকারি খাতে স্থানান্তরের মাধ্যমে এক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় ও ঝুঁকি কমানো;
- সেবা/অবকাঠামো সুবিধা পৌঁছানোর গুণগত মান তদারকি;
- বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করতে পিপিপি অবশ্যই আর্থিক মুনাফার ওপর গুরুত্ব দেবে; এবং
- পিপিপি যে জনস্বার্থের জন্যই এটা নিশ্চিত করতে হবে।

আইনগত কাঠামো

পিপিপিকে কার্যকর করতে এবং দীর্ঘমেয়াদে ক্রিয়াশীল রাখতে এর আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা দরকার। বেসরকারি খাতকে পিপিপি প্রকল্পে অর্থায়ন, নির্মাণ, পরিচালনা ও টোল আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সুবিধা দিতে যথাযথ আইন দরকার হবে। উদাহারণ হিসেবে বলা যায় কোরিয়ার কথা, যারা অবকাঠামো খাতে বেসরকারি অংশীদারিত্ব (২০০২) শীর্ষক আইন করে আইনি সহায়তা দিয়েছে। আয়ারল্যান্ডও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এই আইনগত সুবিধা দিয়েছে।

যথাযথ ও পর্যাপ্ত আইনি কাঠামো পিপিপির সফল বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত। পিপিপি উদ্যোগে যথাযথ আইনি কাঠামোর অভাবে অনেক দেশে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যায়নি। চীন এবং তুরস্ক এ ধরনের জটিলতার মুখোমুখি হয়েছে এবং এসব সমস্যা থেকে উত্তরণে তাদের সরকার উদ্যোগ নিয়েছে।

পিপিপি এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট

বিভিন্ন দেশে পিপিপি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পর্যাপ্ত আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সফল অংশীদারিত্বের পূর্বশর্ত। এছাড়াও সরকার নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করতে পারে:

- পিপিপি বাজেটে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর সহায়তায় আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (যেমন পিপিপি কর্তৃপক্ষ) প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। এ জন্য ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ দেওয়া উচিত।
- পিপিপি বাজেট বাস্তবায়নে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বসহ একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা যেতে পারে।
- ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলেটেশন সেন্টার (আইআইএফসি) সরকারকে সম্ভাবনাময় প্রকল্প চিহ্নিতকরণ এবং প্রত্যেকটি প্রকল্পের জন্য পিপিপি কাঠামো তৈরির কাজে সহায়তা করতে পারে।

পরীক্ষামূলকভাবে ছোট বাজেটের মাধ্যমে পিপিপি শুরু করাই ভালো বলে মনে করা হয়। প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং প্রকল্প কার্যক্রমে প্রক্রিয়াগত নির্দেশনার জন্য দলিলপত্র তৈরি করার দরকার হবে। যেহেতু প্রত্যকটি প্রকল্পের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেহেতু নির্দিষ্ট প্রমিত মান নির্ধারণ সম্ভব নয় এবং সকল পিপিপির ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যাবে না। এ জন্য ন্যূনতম তথ্যের পরিমাণ ও ধরন নির্ধারণ করা দরকার যা প্রত্যেকটি পিপিপি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি গুণগত মানসম্পন্ন পিপিপি কন্ট্রাক্ট ম্যাট্রিক্স তৈরি করা যেতে পারে। এটি প্রকল্প উন্নয়নের সময় ও গুণগত খরচ কমাবে। অন্যান্য মান সংক্রান্ত দলিলাদি তৈরির সম্ভাবনা পরীক্ষা করা যেতে পারে। এসব দলিল একবার তৈরি করলে তা একটি রেফারেন্স হিসাবে কাজ করতে পারে।

৩.৯ বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা

- ঘাটতি অর্থায়ন উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক হতে পারে। যদিও এর বিনিময়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনা রয়েছে। বৈশ্বিক আর্থিক ধীরগতির পরিণতি হিসেবে ২০০৯১০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির সম্ভাব্য হ্রাস মোকাবেলায় সরকারকে বর্তমানে মূল্যস্ফীতি কমে আসার সুযোগ নিয়ে (যা নিকট ভবিষ্যতেও টেকসই থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে) উচ্চ বাজেট ঘাটতির (যা জিডিপির ৫ শতাংশের কাছাকাছি হতে পারে) জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে সরকার বাজেট ঘাটতির উৎস হিসেবে বৈদেশিক অর্থায়নকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করতে পারে, কেননা এ ধরনের অর্থায়ন মূল্যস্ফীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে না (২০০৮০৯ অর্থবছরে বাজেটে ঘাটতি অর্থায়নের জন্য বৈদেশিক ও স্থানীয় অর্থায়নের অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৪৪.৪ শতাংশ এবং ৫৫.৬ শতাংশ)। সরকার যদি স্থানীয় উৎস থেকে অধিক ঋণ নেয় তাহলে বেসরকারি খাতের জন্য ঋণের সহজলভ্যতা বিঘ্নিত হতে পারে যা অর্থনৈতিক ধীরগতির সময়ে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাড়াতে সরকারের প্রচেষ্টার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।
- সরকার ২০০৮০৯ অর্থবছরে রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য ১,০৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের বাইরেও নগদ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৪৫০ কোটি টাকার অতিরিক্ত সহায়তা ঘোষণা করে। এই প্যাকেজের আওতায় অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত নগদ সহায়তা পাবে: পাটপণ্য (১০ শতাংশ), চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য (১৭.৫ শতাংশ), চিংড়ি ও হিমায়িত মাছ (১২.৫ শতাংশ)। এসব সুবিধা ২০০৯১০ অর্থবছরেও বহাল থাকবে। সকল ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পের রপ্তানিকারকদের জন্য এসব সুবিধা সময়মতো পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত।
- রপ্তানি সচল রাখার জন্য একটি তহবিল গঠন করা যেতে পারে যার একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকবে এবং যার মাধ্যমে সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলোতে ঋণ সহায়তা দেওয়া হবে। স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান নিশ্চিত করতে এবং পরিশোধের সময়কাল বাড়ানোর জন্য যেকোন তহবিল কঠোর তদারকির ব্যবস্থা রেখে গঠন করা উচিত। এক্ষেত্রে পরিশোধের মেয়াদ না বাড়ান এবং পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে ঋণগ্রহীতাদের আদালতের আশ্রয় নেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে নিয়মকানুন করা উচিত।
- অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনায় (কর্মসংস্থান এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে) বৈশ্বিক আর্থিক সংকট মোকাবেলায় এ খাতের জন্য একটি সংকট ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন করা যেতে পারে। এটি বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত ৫০০ কোটি টাকার এসএমই তহবিলের অতিরিক্ত হিসেবে গঠন করতে হবে।
- ২০০৮০৯ অর্থবছরের বাজেটে রপ্তানি ভর্তুকি হিসেবে ১৩টি রপ্তানিমুখী শিল্প পণ্যের জন্য ১,০৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যবসাবাণি জ্যে ব্যয় কমাতে এই নগদ ক্ষতিপূরণ স্কীম ২০০৯১০ অর্থবছরেও বহাল রাখা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও সম্প্রসারণ করা উচিত। এই বিবেচনায় স্থানীয় সুতা উৎপাদনকারীরা ভারতীয় সুতার সঙ্গে বর্ধিত প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছে। স্থানীয় পশ্চাদ সংযোগকারী বস্ত্র শিল্পে নগদ সহায়তা ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা যেতে পারে। এই পদক্ষেপ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পকেও সহায়তা করবে।
- একই সঙ্গে এ সকল ভর্তুকির সময়মতো ছাড় নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রণোদনা প্যাকেজের প্রেক্ষাপটে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বকেয়া নগদ সহায়তা দ্রুত ছাড় করা প্রয়োজন।
- ভারতের উদাহরণ অনুসরণ করে রপ্তানিকারকদের নতুন বাজারে (যেমন – জাপান, পূর্ব ইউরোপ) অতিরিক্ত রপ্তানির জন্য সহায়তা দেওয়া যেতে পারে (এক্ষেত্রে অতিরিক্ত রপ্তানির একটি নির্দিষ্ট শতাংশ সহায়তা হিসেবে দেওয়া যেতে পারে)।

- বিদেশ থেকে ফেরত আসা শ্রমিকদেরকে এই মন্দা পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে ঋণ বিতরণ ও নতুন ব্যবসা শুরু করতে প্রবাসী কর্মী কল্যাণ তহবিলের আওতায় সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া 'প্রবাসী ব্যাংক' স্থাপনের উদ্যোগ ত্বরান্বিত করা উচিত।
- বাংলাদেশ যাতে উন্নত দেশগুলোতে অভিবাসী শ্রমিকদের নতুন বাজারের (যেমন – কেয়ারিং সার্ভিস, নার্সিং, মেডিকেল টেকনিশিয়ান প্রভৃতি) চাহিদা মেটাতে পারে তার জন্য প্রচেষ্টা জোরদার করা উচিত। সবশেষে, একটি নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা নেওয়া উচিত যাতে বিদেশে কাজের জন্য যেতে ইচ্ছুক শ্রমিকরা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়। বিশ্ব পরিস্থিতির পুনরুদ্ধার (২০১০ সালের শেষার্ধে এটি হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে) এবং তার পরিণতিতে অভিবাসী শ্রমিকদের চাহিদা বৃদ্ধির সুযোগ নিতে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়ন দরকার। শিক্ষার্থীদের বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্যও ঋণ গ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত।

মে ২০০৯

অধ্যায় ৪

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন

গুরুত্বপূর্ণ করণীয়সমূহ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
মোঃ আশিক ইকবাল
তৌফিকুল ইসলাম খান

৪.১ সূচনা

চলমান প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, পণ্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের প্রভাব মোকাবেলা – এই উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখে নতুন নির্বাচিত সরকার ২০০৯ সালের ১১ জুন তার প্রথম বাজেট ঘোষণা করে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) তার বাজেট প্রতিক্রিয়ায় এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কিছু জরুরি উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। তবে প্রস্তাবিত এ সকল উদ্যোগের কর্মদক্ষতার ওপরই বহুলাংশে নির্ভর করবে এর সফল বাস্তবায়ন (CPD ২০০৯a)। একই সাথে এজন্য সকল সরকারি প্রশাসন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত অন্যান্য সকলের সমন্বিত, সঙ্গতিপূর্ণ এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাও অতি আবশ্যক। তবে আশার কথা এই যে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এর গুরুত্ব অনুধাবন করে বিশেষকদের সঙ্গে একমত পোষণ করেন যে, সফল বাস্তবায়নই হবে এই বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। ১২ জুন ২০০৯ এ অর্থমন্ত্রী তার বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে উলেখ করেন যে, "বাজেট প্রণয়নের সময়ই আমরা জানতাম যে এর বাস্তবায়ন আমাদের জন্য এক বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হবে" (The Daily Star ২০০৯)।

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান অধ্যায়ে ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত উদ্যোগ ও এর চলমান তদারকি প্রক্রিয়াকে বিশেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। মাধ্যমিক উপাত্তের বিশেষণ, সরকারের নীতিসংক্রান্ত দলিলপত্র ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে বর্তমান প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক বিশদ পরিজ্ঞানের জন্য অভিজ্ঞ লোকজনের সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই বিশেষণকে সুসংহত করার জন্য ইকোনোমেট্রিক বিশেষণ এবং প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রবন্ধের পর্যালোচনা ব্যবহার করা হয়েছে।

একদিকে যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করাই বাজেট বাস্তবায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, অন্যদিকে আবার প্রবৃদ্ধি নিজেই সফল বাজেট বাস্তবায়নের অন্যতম অনুঘটক। এ প্রেক্ষাপটে এই প্রতিবেদন ২০০৯১০ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি এবং বাজেট বাস্তবায়নের সঙ্গে এর সংযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করেছে। বাজেট কাঠামোর দুটি প্রধান অংশের একটি হচ্ছে সম্পদ সংগ্রহ। এ কারণে অধ্যায়ের পরবর্তী দুই অংশে অভ্যন্তরীণ উৎসের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ এবং বৈদেশিক সহায়তার অন্তর্মুখী প্রবাহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অন্যদিকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি) বাস্তবায়নের পর্যালোচনার পাশাপাশি রাজস্ব ব্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নির্ধারিত কিছু ব্যয় বিষয়ক পরীক্ষানিরী ক্ষা করা

হয়েছে। এবারের বাজেটে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) মূলধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিধায় অধ্যায়ের একটি বিশেষায়িত অংশে পিপিপির সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যয়ের দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বাজেট ঘাটতি ও এর অর্থায়নের সঙ্গে সংশিষ্ট বিষয়গুলোও আলোচনা করা হয়েছে, এবং সবশেষে কিছু সমাপনী পর্যবেক্ষণসহ সম্ভাব্য কিছু দৃশ্যপটের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৪.২ প্রবৃদ্ধি এবং বাজেট বাস্তবায়ন

৪.২.১ সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি

গণতন্ত্রে উত্তরণের সময়কালে নীতি নির্ধারণ এবং নীতি ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে অস্থিরতা এবং বৈশ্বিক আর্থিক সংকট সত্ত্বেও ২০০৮০৯ অর্থ বছরে ৫.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় এই প্রবৃদ্ধিকে একটি সম্মানজনক অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কৃষি খাতের শক্তিশালী অবদান (কৃষি খাত ও শস্য খাতে প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৪.৭ শতাংশ এবং ৫.২ শতাংশ) এবং উচ্চ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের এই প্রবৃদ্ধির পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে। বিশ্বমন্দার বিলম্বিত প্রভাব থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির উত্তরণও বিলম্বিত হবে -এই আশ ঙ্কায় ২০০৯১০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা প্রাথমিকভাবে ৫.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। ২০০৮০৯ অর্থ বছরের মতো অস্থির সময়েও প্রায় ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন, বিশ্ব অর্থনীতির দিগন্তে রূপালী রেখার উদ্ভব এবং প্রস্তাবিত চক্র বিপরীতমুখী (counter-cyclic) সম্প্রসারণমূলক রাজস্বনীতির বিবেচনায় ২০০৯১০ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাকে তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল বলে সিপিডি তার বাজেট প্রতিক্রিয়ায় উলেখ করে। এছাড়া ক্ষমতাসীন জোটের নির্বাচনী ইশতেহারে যে উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য ছিল, তার বিবেচনায়ও এই প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাকে রক্ষণশীলই বলা যায়। তবে বাজেট পরবর্তী ১২ই জুন ২০০৯ তারিখের সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী ২০০৯১০ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি ৫.৫ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে উলেখ করেছিলেন (The Daily Star ২০০৯)। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতিতেও ৫.৫ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশের প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলনকে রক্ষণশীল হিসেবে অভিহিত করে এবং আশা করা হয় যে, অভ্যন্তরীণ এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন হলে প্রবৃদ্ধি এর চেয়ে বেশিও হতে পারে (Bangladesh Bank ২০০৯)। সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধির এরূপ পুনর্মূল্যায়ন প্রশংসনীয়।

৪.২.২ খাতভিত্তিক বিন্যাস

মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) কাঠামোগত বিন্যাস বিবেচনায়, বাংলাদেশের জন্য ৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সাধারণত ব্যতিক্রমধর্মী কোনো অবদানের দরকার হয় না (CPD ২০০৯a)। তবে ৬ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনীতির খাতগুলোর গড় অবদান সাধারণের তুলনায় একটু বেশি হওয়াটাই জরুরি। দুর্ভাগ্যবশতঃ ২০০৯১০ অর্থ বছরের জন্য খাতভিত্তিক জিডিপি লক্ষ্যমাত্রার সরকারি কোন প্রক্ষেপণ নেই। সারণি ৪.১এ ৬ শতাংশ সমন্বিত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার আলোকে খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা প্রক্ষেপণের চেষ্টা করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার সাম্প্রতিক মুদ্রানীতি সংক্রান্ত বিবৃতিতে উলেখ করেছে যে, এ মুদ্রানীতির মাধ্যমে কৃষি খাতে ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সহায়তা করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্য। সাম্প্রতিককালে কৃষি খাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধির (২০০৮০৯ অর্থ বছরে ৪.৭ শতাংশ) আলোকে চলতি অর্থবছরে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন মোটামুটি কঠিন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আমন মৌসুম খরার প্রভাবমুক্ত থাকলে, শস্য খাতে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে এবং সরকারি নীতি সহায়তা অব্যাহত থাকলে কৃষি খাতে ৩.৫ শতাংশের কাছাকাছি প্রবৃদ্ধি অর্জন বাস্তবসম্মত হতে পারে।

সারণি ৪.১: খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার প্রক্ষেপণ

(শতাংশ)

খাত	অর্থবছর ২০০৮০৯	অর্থবছর ২০০৯১০*
কৃষি	৪.৭	৩.৫
শিল্প	৫.৯	৬.৫৭.০
সেবা	৬.৩	৬.৫
জিডিপি	৫.৯	৬.০৬.৩

উৎস: লেখকবৃন্দের প্রক্ষেপণ এবং অর্থ মন্ত্রণালয় (২০০৯a)।
দ্রষ্টব্য: খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধির হার জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

বর্তমান দশকে (অর্থবছর ২০০০০১ থেকে অর্থবছর ২০০৮০৯) শি ল্প খাতে[১] গড় প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫ শতাংশের কাছাকাছি অর্জিত হয়েছে। ধারণা করা যেতে পারে যে, ২০০৮০৯ অর্থ ́বছরে এ খাতে নিম্ন প্রবৃদ্ধি (৫.৯ শতাংশ) অর্জন চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধেও অব্যাহত থাকবে। বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে এসে এ খাত প্রবৃদ্ধির প্রথাগত ধারায় ফিরে আসতে পারে। অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ পরিস্থিতি উৎসাহব্যঞ্জক না হওয়ায় অর্থবছরের শেষের দিকে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকতে পারে, তবে গত অর্থবছরের চেয়ে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। ধারণা করা যায়, ২০০৯১০ অর্থ ́বছরে এই খাতে প্রবৃদ্ধি ৬.৫ থেকে ৭ শতাংশের মধ্যে হতে পারে। শিল্প খাতে এ রকম প্রবৃদ্ধি হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫.৫ শতাংশের ওপরে যাওয়ার পথ সহজ হবে বলে আশা করা যায়।

সাম্প্রতিককালের প্রবৃদ্ধি কাঠামো বিশেষণ করলে দেখা যায়, প্রকৃত খাতগুলোর মাঝারি ধরনের প্রবৃদ্ধি অর্জনে সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সেবা খাতে ২০০০০১ অর্থ ́বছর থেকে ২০০৮০৯ অর্থ ́বছর সময়কালে গড়ে ৬.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। কৃষি ও শিল্প খাতে প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি হলে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি অর্জনও সম্ভব হবে, এবং সেক্ষেত্রে সার্বিকভাবে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হতে পারে বলে আশা করা যায়।

৪.২.৩ প্রবৃদ্ধি-বিনিয়োগ সম্পর্ক

সিপিডির বাজেট বিশেষণে ২০০৯১০ অর্থ ́বছরে বিনিয়োগের ধারা পুনরুজ্জীবিত করাকে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে (CPD ২০০৯b)। বিনিয়োগের হার (জিডিপির শতকরা হিসেবে) ২০০৮০৯ অর্থ ́বছরের ২৪.২ শতাংশ থেকে কমে ২০০৯১০ অর্থ ́বছরে ২৩.৬ শতাংশ হবে বলে বাজেটে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ৪.২)। ২০০৯১০ অর্থ ́বছরে সরকারি বিনিয়োগ উলেখযোগ্য বৃদ্ধির (এডিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী) পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নযোগ্য ধরে নিলে বেসরকারি বিনিয়োগ (জিডিপির শতকরা হিসেবে) গত অর্থবছরের তুলনায় কমে যাবে বলে আশঙ্কা করা যায়, যা বিনিয়োগ পরিস্থিতির হতাশাজনক চিত্র তুলে ধরে। ফলে, এটা বাজেটে উলেখিত প্রত্যাশিত বেসরকারি বিনিয়োগের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা এডিপির পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ার আগাম আশঙ্কা বলে ধরা যায়।

বাজেটে প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা (৫.৫ শতাংশ) অনুযায়ী বর্ধিত মূলধনউৎপাদন অনুপাত (আইকর) ২০০৯১০ অর্থ ́বছরে বেড়ে ৪.৩ হবে। অর্থাৎ মূলধন উৎপাদনশীলতা আগের তুলনায় কমে আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একইভাবে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক রেখে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে মূলধনের উৎপাদনশীলতা ৩.৯ হতে হবে। ফলে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সরকারি

[১]এর মধ্যে খনিজ ও খনন, শিল্পোৎপাদন (ম্যানুফ্যাকচারিং), বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি এবং নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত।

সারণি ৪.২: ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি-বিনিয়োগ কাঠামো

নির্দেশক	অর্থবছর ২০০৯ (সাময়িক)	অর্থবছর ২০১০ (প্রক্ষেপিত)
প্রকৃত জিডিপির প্রবৃদ্ধি (%)	৫.৯	৫.৫৬.০
মোট বিনিয়োগ (জিডিপির শতকরা হিসেবে)	২৪.২	২৩.৬
বর্ধিত মূলধনউৎপাদন অনুপাত	৪.১	৩.৯৪.৩
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (জিডিপির শতকরা হিসেবে)	৩.৭	৪.৪

উৎস: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর (এমটিএমএফ) ভিত্তিতে লেখকবৃন্দের নিজস্ব হিসাব।

ও বেসরকারি উভয় বিনিয়োগ উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। আর পর্যাপ্ত বিনিয়োগ প্রবাহের ঘাটতি থাকলে অধিকতর সক্ষমতা ব্যবহার এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে মূলধনের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। ২০০৯১০ অর্থ বছরের প্রবৃদ্ধিবিনি য়োগ কাঠামো রাজস্ব আহরণের ফলাফলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৪.২.৪ অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের ধারণা

শুধুমাত্র বাজেটের ব্যয়ের দিকটিই জিডিপি প্রবৃদ্ধির মতো সামগ্রিক অর্থনৈতিক ফলাফলকে প্রভাবিত করে না, জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহকেও অনেকাংশে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের সামগ্রিক কর রাজস্ব পরিস্থিতি অনুধাবনের লক্ষ্যে একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশেষণ করতে গিয়ে ১৯৮০৮১ হতে ২০০৭০৮ অর্থ বছর সময়কালকে বিবেচনায় রেখে সামগ্রিক কররাজ স্ব অনুপাতকে নির্ভরশীল চলক হিসেবে বিবেচনা করে একটি টাইম সিরিজ রিগ্রেশন পরিচালন করা হয়েছে। সম্পদ সংগ্রহের মৌলিক নির্ধারকের (যেমন: মাথাপিছু আয়) বাইরে রাজস্ব আদায় প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের প্রভাব জানতে এই অনুশীলনে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং বৃহৎ করদাতা ইউনিটের (এলটিইউ) জন্য দুটি ডামি চলক বিবেচনা করা হয়েছে। যদিও ডারবিনওয়াটসন টেস্ট অনুযায়ী কোন সিরিয়াল অটো কোরিলেশন পাওয়া যায়নি, তথাপি এক্ষেত্রে প্যারিসউইন স্টেন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে টাইম সিরিজ বিশেষণের স্ট্যান্ডার্ড প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। কোন টাইম সিরিজে লিনিয়ার রিগ্রেশন মডেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে অটো কোরিলেশনের উপস্থিতি থাকলে প্যারিসউইন স্টেন পদ্ধতি জেনারালাইজড লীস্ট স্কয়্যার রীতি ব্যবহার করে প্যারামিটারের শুদ্ধ মান হিসাব করে অবশ্য বিবেচ্য ক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়ার ফলাফলে উলেখযোগ্য কোন পরিবর্তন পাওয়া যায়নি।

সারণি ৪.৩এ উ লেখিত টাইম সিরিজ রিগ্রেশনের ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়:

(ক) বাংলাদেশে সম্পদ সংগ্রহের ওপর মাথাপিছু আয়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। উলেখিত বিশেষণ অনুযায়ী মাথাপিছু আয় ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে তা প্রায় ০.৮ শতাংশ কর আদায় বৃদ্ধি করে। অন্যান্য কিছু গবেষণার ফলাফল থেকেও (আন্তঃদেশ ও দেশভিত্তিক উভয় ক্ষেত্রেই) অনুরূপ ফলাফলই পাওয়া যায়; (Bahl ১৯৭১; Chelliah ১৯৭১; এবং Rasheed ২০০৬)।

(খ) বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ আমদানির সঙ্গে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত এবং অর্থনীতির আধুনিক খাতগুলোর ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বিবেচনায় না নিয়ে রাজস্ব সংগ্রহের নির্ধারক হিসেবে শুধুমাত্র সরকারি বিনিয়োগকেই বিবেচনা করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশে সরকারি খাতের বিনিয়োগ কর রাজস্ব আদায়কে প্রভাবিত করে।

সারণি ৪.৩: বাংলাদেশে রাজস্ব সংগ্রহের নির্ধারকসমূহ

চলক	মডেল১ ওএলএস (OLS)	মডেল২ প্যারিসউইন স্টেন
মাথাপিছু আয় (লগ)	০.৭৮***	০.৭৬***
	(০.০১)	(০.১৯)
জিডিপির অংশ হিসেবে সরকারি বিনিয়োগ	০.১৭*	০.১৮**
	(০.০৯)	(০.০৮)
আমদানি (লগ)	০.১৫*	০.১৩*
	(০.০৮)	(০.০৭)
জিডিপিতে আধুনিক খাতের অংশ	০.০১	০.০২
	(০.০২)	(০.০২)
মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট), ডামি (১=ভ্যাট চালু হয়েছে; ০=অন্যথায়)	০.২৪***	০.২৫***
	(০.০৪)	(০.০৪)
বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ) ডামি (১=এলটিইউ চালু হয়েছে; ০=অন্যথায়)	০.০৯**	০.১০***
	(০.০৪)	(০.০৪)
ধ্রুবক (Constant)	২.৬০***	২.৬৪***
	(০.৮৩)	(০.৭৮)
আর-স্কয়্যারড (R^2)	০.৯৯	০.৯৯
ডারবিনওয়াটসন স্ট্যাটিস্টিক্স	১.৯৬	১.৯০
উপাত্ত সংখ্যা	২৮	২৮

উৎস: লেখকবৃন্দের নিজস্ব হিসাব।
দ্রষ্টব্য: ১. ***, ** এবং * যথাক্রমে ১ শতাংশ, ৫ শতাংশ ও ১০ শতাংশ সিগনিফিকেন্স লেভেল নির্দেশ করে।
২. বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এরর।

(গ) এই বিশ্লেষণ হতে কর রাজস্ব আদায় এবং আমদানির মধ্যকার ইতিবাচক সম্পর্ক দেখা গেছে। আমদানি সম্পর্কিত উৎসগুলোর ওপর কর আদায়ের অধিক নির্ভরশীলতাকেও এটি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে;

(ঘ) অর্থনীতি কাঠামোর প্রক্সি হিসেবে আধুনিক খাতের ইতিবাচক প্রভাব পাওয়া গেলেও তা পরিসংখ্যানিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

(ঙ) বিভিন্ন সময়ে সরকারের নেওয়া নানা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ রাজস্ব আদায়ের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তবে ১৯৯০৯১ অর্থ বছরে ভ্যাট প্রচলন ২০০২০৩ অর্থ বছরের বৃহৎ করদাতা ইউনিট প্রচলনের তুলনায় রাজস্ব আহরণে বেশি ভূমিকা রেখেছে।

সুতরাং, একদিকে যেমন জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাজেট বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, অন্যদিকে টাইম সিরিজ বিশ্লেষণ নিশ্চিত করে যে, সামগ্রিক অর্থনীতির ফলাফলও ব্যাপকভাবে প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে। বস্তুত, এই ফলাফল থেকে রাজস্ব খাতের প্রেক্ষাপটে একটি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আর্থিক ব্যবস্থায় যথেষ্ট অতিরিক্ত তারল্য থাকার সাপেক্ষে বাংলাদেশে সরকারি বিনিয়োগ বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে (Majumder ২০০৭)। বেসরকারি ও সরকারি বিনিয়োগ উভয়ই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অধিকতর সরকারি বিনিয়োগ

ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। একইভাবে, বর্ধিত রাজস্ব উন্নয়ন অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা যায়। এই “বিনিয়োগপ্রবৃদ্ধিসরকারি অর্থায়ন চক্রের” গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে (চিত্র ৪.১)। এ থেকে বোঝা যায় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে, রাজস্ব সংগ্রহের দিক বিবেচনা করলেও বাজেট বাস্তবায়নে বিনিয়োগ সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ৪.১: বিনিয়োগ-প্রবৃদ্ধি-সরকারি অর্থায়ন চক্র

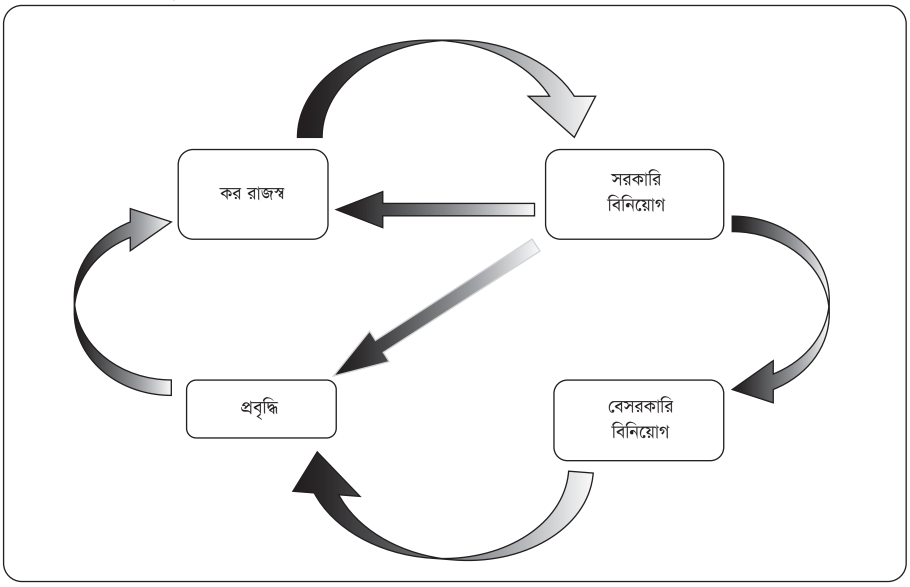

উৎস: লেখকবৃন্দ।

৪.৩ অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ

৪.৩.১ সামগ্রিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা

মোট রাজস্ব

২০০৯১০ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫.৭ শতাংশ এবং রাজস্ব আহরণের তিনটি মূল ক্ষেত্র, অর্থাৎ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর[২], এনবিআরবহির্ভূত কর[৩], এবং করবহির্ভূত রাজস্বের[৪] ওপর এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নির্ভর করবে। ২০০৭০৮ অর্থবছর ব্যতীত গত ১৭ বছরে এ ধরনের প্রবৃদ্ধি কখনও অর্জিত হয়নি (সারণি ৪.৪)। উলেখ্য যে, রাজস্ব আদায়ের জন্য ২০০৭০৮ অর্থবছর ছিল ব্যতিক্রমধর্মী একটি বছর; এ বছর রাজস্ব আহরণের তিনটি ক্ষেত্রেই উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। ২০০১০২ থেকে ২০০৫০৬ অর্থবছরে গড়ে ১৩.৮ শতাংশ রাজস্ব প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ২০০৭০৮ অর্থবছরে ২৪.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়।

[২] এর মধ্যে আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক কর, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য অন্তর্ভুক্ত।
[৩] এর মধ্যে নেশাজাতীয় দ্রব্য, গাড়ি, ভূমি ও স্ট্যাম্প অন্তর্ভুক্ত।
[৪] এর মধ্যে লভ্যাংশ, পোস্ট অফিস ও রেলওয়ে, সুদ/ফি/শুল্ক ও অন্যান্য প্রাপ্তি অন্তর্ভুক্ত।

সারণি ৪.৪: রাজস্ব আদায়ে গত দুই দশকের গতিধারা

(শতাংশ)

উপাদান	অর্থবছর ৯২ - অর্থবছর ৯৬	অর্থবছর ৯৭ - অর্থবছর ০১	অর্থবছর ০২ - অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ২০০৭	অর্থবছর ২০০৮	অর্থবছর ২০০৯*	অর্থবছর ২০১০ (বাজেট)
মোট রাজস্ব	১৪.১	৮.৫	১৩.৮	৮.৬	২৪.৯	১৪.৮	১৫.৭
মোট কর	১৩.২	১০.৪	১২.৫	১০.০	২৭.৩	-	১৬.২
এনবিআর কর	১৩.২	১০.৮	১২.৭	৯.৫	২৭.৪	১০.৭	১৬.১
এনবিআর-বহির্ভূত কর	১৩.৫	৫.০	৯.০	২১.৬	২৪.৬	১৭.৩	১৭.০
করবহিভ´ূত রাজস্ব	১৮.৮	৫.৩	২০.৯	২.৭	১৪.১	৯.৭	১৩.৬

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপাত্তের ভিত্তিতে লেখকবৃন্দের হিসাব।[৫]

দ্রষ্টব্য: *২০০৮০৯ অর্থ´বছরের প্রবৃদ্ধি হার জুলাইমার্চ´ সময়ের জন্য (এনবিআর করের জন্য জুলাইজুন)।

পূর্ববর্তী বছরগুলোর প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, ২০০৯১০ অর্থ´বছরে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, কিন্তু তা ২০০৭০৮ অর্থ´বছরের তুলনায় অনেকাংশেই কম। এই সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওপরই বহুলাংশে নির্ভর করবে, কেননা মোট বর্ধিত রাজস্বের ৭৮.৮ শতাংশই এই খাত থেকে আসতে হবে। অবশিষ্ট রাজস্ব এনবিআরবহিভ´ূত কর (৪ শতাংশ) এবং করবহিভ´ূত রাজস্ব (১৭.২ শতাংশ) উপাদান থেকে আসবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে ২০০৮০৯ অর্থ´বছরে তুলনামূলক অবদান অনেক বেশি সুষম ছিল (চিত্র ৪.২)।

চিত্র ৪.২: উৎসভিত্তিক রাজস্ব আদায়ে বর্ধিত অবদান: অর্থবছর ২০০৮-০৯ ও অর্থবছর ২০০৯-১০

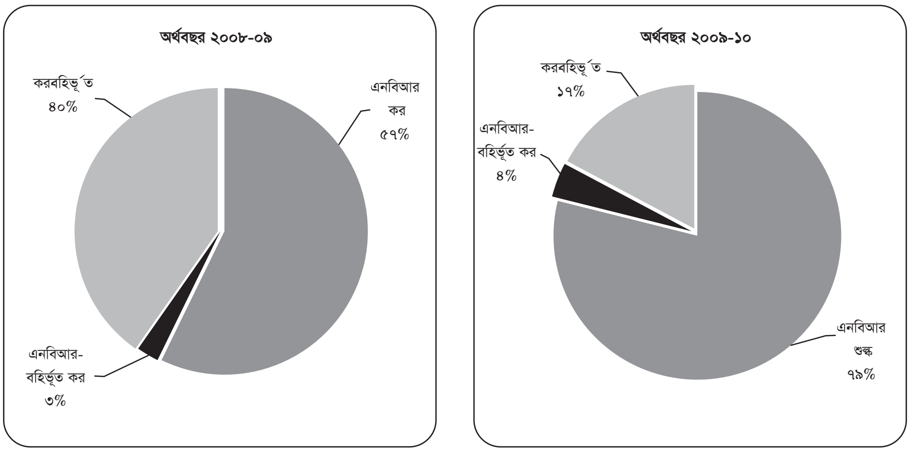

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।[৬]

কর রাজস্ব

২০০৯১০ অর্থ´বছরে মোট কর রাজস্ব (এনবিআর এবং এনবিআরবহিভ´ূত) ১৬.২ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে যা বিগত বছরগুলোর তুলনায় (২০০৭০৮ অর্থ´বছর ব্যতীত) সর্বোচ্চ।

[৫] http://www.mof.gov.bd/en/

[৬] http://www.nbr-bd.org/; http://www.mof.gov.bd/en/

এনবিআর থেকে উচ্চ প্রত্যাশা, বিশেষত আয়করের প্রত্যাশিত সাফল্যকে বিবেচনায় রেখেই কর রাজস্বের এই উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সামগ্রিক কর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও বাংলাদেশে কর জিডিপির অনুপাত দাঁড়াবে ১১.৬ শতাংশ যা অধিকাংশ প্রতিবেশী দেশের তুলনায় কম (চিত্র ৪.৩)।

চিত্র ৪.৩: দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের কর-জিডিপি এবং রাজস্ব-জিডিপি: অর্থবছর ২০০৮-০৯

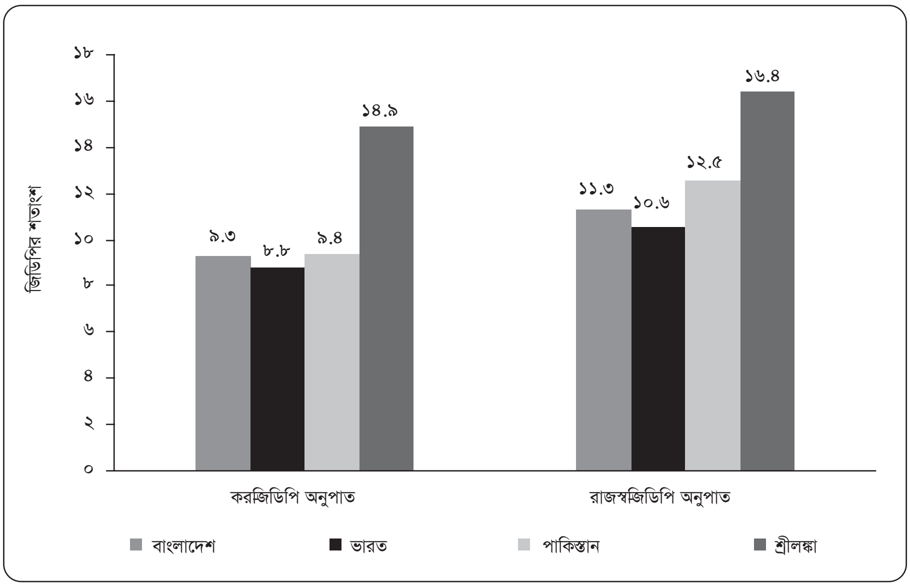

উৎস: বাজেট দলিল এবং সংশিষ্ট দেশগুলোর অর্থনৈতিক পর্যালোচনা।

দ্রষ্টব্য: ১. ২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের প্রাক্কলন। শুধুমাত্র ভারতের পরিসংখ্যান ২০০৮০৯ অর্থ বছরের প্রকৃত হিসাব।

২. ভারতের ক্ষেত্রে অনুপাত কম হওয়ার কারণ হলো এখানে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কর আহরণ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। রাজ্যগুলোর কর অন্তর্ভুক্ত করা হলে অনুপাত উলেখযোগ্য হারে বেড়ে যাবে।

এনবিআর কর

২০০১০২ থেকে ২০০৫০৬ অর্থ বছরে এনবিআর করের ক্ষেত্রে গড় প্রবৃদ্ধি হয় ১২.৭ শতাংশ যেখানে ২০০৬০৭ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৯.৫ শতাংশ। আগের বছরের উচ্চ প্রবৃদ্ধির (২৭.৪ শতাংশ) পর ২০০৮০৯ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি হয় ১০.৭ শতাংশ। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ২০০৭০৮ অর্থ বছরে উচ্চ রাজস্ব প্রবৃদ্ধির পেছনে অন্যতম কারণ ছিল আমদানি প্রবৃদ্ধি (মূল্যের বিচারে) এবং ওই সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের উচ্চ মূল্য। এছাড়া তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে রাজস্ব আদায় বাড়াতে জোর প্রশাসনিক উদ্যোগ এবং কর ফাঁকি এড়াতে কঠোর তদারকি ব্যবস্থা সামগ্রিক রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্যস্তর কমে আসা এবং একই সঙ্গে আমদানিতে ধীর গতির প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে শুল্ক আদায় পরিস্থিতি এবং প্রশাসনে পূর্বের পরিস্থিতি ফিরে আসার প্রভাবে ২০০৯১০ অর্থ বছরে এনবিআরের জন্য ১৬.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বেশ কঠিন হবে।

এনবিআর-বহির্ভূত কর

২০০৯১০ অর্থ বছরে এনবিআরবহির্ভূত করে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১৭ শতাংশ রাখা হয়েছে। ২০০১০২ থেকে ২০০৫০৬ অর্থ বছরে এক্ষেত্রে গড় প্রবৃদ্ধি ৯ শতাংশের নিচে থাকা সত্ত্বেও ২০০৬০৭ (২১.৬

শতাংশ) এবং ২০০৭০৮ অর্থবছরে উচ্চ প্রবৃদ্ধি (২৪.৮ শতাংশ) অর্জিত হয়েছে, এবং তা ২০০৮০৯ অর্থবছরের প্রথম তিনটি প্রান্তিকে (জুলাইমার্চ সময়কালে ১৭.৩ শতাংশ) অব্যাহত ছিল। ফলে এর ধারাবাহিকতায় ২০০৯১০ অর্থবছরে এনবিআরবহির্ভূত কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়।

কর-বহির্ভূত রাজস্ব

রাজস্ব উপাদানগুলোর মধ্যে করবহির্ভূত রাজস্বের ক্ষেত্রে তুলনা গত কয়েক বছরে বেশ অস্থির প্রবৃদ্ধি প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে (সারণি ৪.৪)। ২০০১০২ হতে ২০০৫০৬ অর্থবছর সময়কালে ২০.৯ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ২০০৬০৭ অর্থবছরে মাত্র ২.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। তবে ২০০৭০৮ অর্থবছরে এক্ষেত্রে ১৪.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে[৭], এবং এমনকি টিএন্ডটি বোর্ডকে কর্পোরেশনে রূপান্তরের পরেও ২০০৮০৯ অর্থবছরের জুলাইমার্চ সময়কালে ৯.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ২০০৯১০ অর্থবছরে করবহির্ভূত রাজস্ব আদায়ে ১৩.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাকে রক্ষণশীল বলেই মনে হয়, এবং বছর শেষে এ ক্ষেত্র থেকে রাজস্ব আহরণ এর চেয়ে বেশি হওয়াই উচিত।

২০০৯১০ অর্থবছরে সামগ্রিক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (১৫.৭ শতাংশ) বিগত বছরগুলোতে (২০০৭০৮ অর্থবছর ব্যতীত, কারণ এটি সব দিক বিবেচনায় রাজস্ব আদায়ের ব্যতিক্রমধর্মী বছর) অর্জিত গড় প্রবৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি। এই লক্ষ্যমাত্রার অর্জন নির্ভর করবে ফাঁকফোকর কমাতে প্রশাসনিক প্রচেষ্টা জোরদারকরণ, করের আওতায় আরও করারোপযোগ্য লোক অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে রাজস্ব-স্পর্শকাতর খাতগুলোকে গতিশীল করার ওপর। গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, ২০০৯ সালের মার্চ পর্যন্ত মামলাগুলোর কারণে ৬,৫৪২ কোটি টাকার কর বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে আটকে আছে। শুধুমাত্র বকেয়া আদায় নয়, মামলাকারীদের কাছে একটি সঠিক দিক নির্দেশনা পৌঁছে দেওয়ার জন্যও এসব মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

দেশের খানা আয় ও ব্যয় জরিপের তথ্যের ভিত্তিতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, দেশে করের ভিত্তি বাড়ানো যেতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭০ লাখের বেশি সম্ভাব্য করদাতার বিপরীতে প্রকৃত করদাতার সংখ্যা মাত্র সাড়ে ৭ লাখ। এ প্রেক্ষিতে শহরাঞ্চলে উদীয়মান বিভিন্ন কার্য খাতকে কর বেষ্টনীর আওতায় আনা জরুরি। যদিও কৃষিকাজের আয় থেকে কর আদায়ের নিয়ম রয়েছে তথাপি এই খাত এখনও পর্যন্ত তেমন অবদান রাখতে পারছে না, কেননা কর প্রশাসন এখনও গ্রামীণ অর্থনীতিতে কার্যকরভাবে পৌঁছাতে পারেনি। এছাড়া শহরের নিকটতম এলাকাগুলোর অর্থনৈতিক কার্যক্রমও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কর বেষ্টনীর বাইরে রয়ে গেছে। নতুন রাজস্বের খোঁজে উপজেলা পর্যায়ে কর অফিস প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে শহরতলী এবং গ্রাম থেকে কর আদায় করা সহজ হবে।

৪.৩.২ আয়কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা

২০০৮০৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৯১০ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আদায় বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা ১০,২৮১ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে যেখানে বর্ধিত রাজস্বের ২৯.৪ শতাংশ আয়কর থেকে আসার কথা। সুতরাং রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাফল্য ব্যক্তি আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণের ওপর নির্ভর করবে যদিও করের হার পূর্বের পর্যায়েই রয়েছে (কর্পোরেট কর ব্যতিরেকে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য যা ২.৫ শতাংশ কমানো হয়েছে)।

---

[৭] ২০০৮০৯ অর্থবছরের মধ্যভাগে এসে (ডিসেম্বর ২০০৮) করবহির্ভূত রাজস্বের উপাত্ত সংশোধন করে ২০০৬০৭ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি ২১.৫ শতাংশ এবং ২০০৭০৮ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মকে (–) ৩.৬ দেখানো হয়।

গত ১০ বছরের গতিধারা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৬৯৭ অর্থ´বছর থেকে ২০০০০১ অর্থ´বছর সময়কালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর আদায়ে গড়ে ১৮.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে উলেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে (সারণি ৪.৫)। অন্যদিকে ২০০১০২ অর্থ´বছর থেকে ২০০৫০৬ অর্থ´বছর সময়কালে আয়কর আদায়ে গড়ে প্রবৃদ্ধি হয় ১৫.৬ শতাংশ। কর ফাঁকিবাজদের ধরতে রাজস্ব বোর্ডের অভিযান এবং একই সঙ্গে সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের ফলে ২০০৭০৮ অর্থ´বছরে আয়কর আদায়ে ৩৪.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়।

সারণি ৪.৫: গত দশকে আয়কর প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতাংশ)

উপাদান	অর্থবছর ১৯৯২ - অর্থবছর ১৯৯৬	অর্থবছর ১৯৯৭- অর্থবছর ২০০১	অর্থবছর ২০০২- অর্থবছর ২০০৬	অর্থবছর ২০০৭	অর্থবছর ২০০৮	অর্থবছর ২০০৯	অর্থবছর ২০১০ বাজেট
আয়কর আদায়	৭.১	১৮.৩	১৫.৬	২১.৮	৩৪.৭	১৮.৩	১৯.২

উৎস: NBR (২০০৯) এবং ২০০৯১০ অর্থ´বছরের বাজেট দলিলসমূহ।[৮]

২০০৯১০ অর্থ´বছরে আয়কর প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা (১৯.২ শতাংশ) অর্জন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে যার জন্য দরকার নানাবিধ উদ্যোগ। চলতি অর্থবছরের (২০০৯১০) ম ধ্যে অন্তত চার লাখ নতুন করদাতাকে কর বেষ্টনীর আওতায় আনতে সরকার একটি নতুন কর জরিপ পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছে। এই উদ্যোগের পাশপাশি কর ফাঁকি প্রতিরোধে কঠোর তদারকিরও দরকার আছে। তবে এটা ঠিক যে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ জনগণের জন্য সরকারের সেবাদানের সক্ষমতা কর সংক্রান্ত বিধিবিধান স্বেচ্ছায় মেনে নিতে জনগণের আগ্রহের ওপর প্রভাব ফেলবে।

উলেখ্য, প্রায় দেড় লাখ সরকারি কর্মকর্তা মোট আয়কর পরিধির (প্রায় ২০ শতাংশ) মধ্যে আছে যারা বছর শেষে পুনরায় করের অর্থ ফেরত পায়। ফলে কার্যকর আয়কর দাতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ লাখের কাছাকাছি। চলতি অর্থবছর থেকে আয়কর আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকার সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আয়কর ফেরত অব্যাহত না রাখার বিষয়টি বিবেচনা করছে। এর ফলে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে কোম্পানিসমূহের নিম্ন মুনাফা থেকে উদ্ভুত সম্ভাব্য ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নেওয়া ছাড়াও নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়তা হবে বলে আশা করা যায়।

৪.৩.৩ নিম্ন কর্পোরেট কর হার

আগেই উলেখ করা হয়েছে যে, রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা কর্পোরেট করসহ আয়কর আদায়ের প্রবৃদ্ধির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট আয়করের মধ্যে কর্পোরেট করের অংশ প্রায় ৬০ শতাংশ। সংসদে বাজেট অনুমোদনের সময় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট কর ৪৫ শতাংশ থেকে ৪২.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। নিম্ন কর হার এবং খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে মধ্যমেয়াদি থেকে দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক সম্পর্ক থাকলেও, কর্পোরেট কর কমিয়ে আনার কারণে স্বল্পমেয়াদে (২০০৯১০ অর্থ´বছর) রাজস্ব আদায়ও কমে যেতে পারে। নতুন হারের কারণে চলতি অর্থবছরে এখান থেকে ৫৫০ কোটি টাকার রাজস্ব কম আসবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

নিম্ন কর্পোরেট করের কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য রাজস্ব ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের সম্প্রসারণের দিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। মোট আয়করে এ ইউনিটের অবদান ৩৭ শতাংশের বেশি

[৮] http://www.mof.gov.bd/en/

এবং এর আওতায় ৯৮১ জন করদাতা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ২৮১টি কোম্পানি। সরকার চলতি অর্থবছরে এখান থেকে ৬,০০০ কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে যা গত অর্থবছরে অর্জিত আয় থেকে ১,১০০ কোটি টাকা বেশি। এ লক্ষ্যমাত্রার বেশিরভাগটাই বেসরকারি কোম্পানিগুলো থেকে আসবে বলে ধারণা করা হয়। তবে এসব কোম্পানির অনেকেই (৫৫টি কোম্পানি) ইতিমধ্যে লোকসানে পড়েছে, নয়টি কোম্পানির কার্যক্রম নেই, এবং আরও নয়টি কোম্পানি কর অবকাশ সুবিধা ভোগ করছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও এসব কোম্পানির আয় ও মুনাফার ওপর প্রভাব ফেলবে। সুতরাং, ২০০৯১০ অর্থবছরে দেশে বিনিয়োগ চাঙ্গা করতে সরকারের কার্যকর প্রচেষ্টা রাজস্ব আদায়কেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে।

৪.৩.৪ মূল্য সংযোজন করের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা

২০০৯১০ অর্থবছরে ভ্যাট আদায়ে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৩.২ শতাংশ। অর্থাৎ এ অর্থবছরে মোট বর্ধিত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার প্রায় একতৃতীয়াংশ ভ্যাট থেকে আসবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে (সারণি ৪.৬)। ২০০১০২ অর্থবছর থেকে ২০০৫০৬ অর্থবছর সময়কালে ভ্যাট আদায়ে গড়ে ১৪.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পটভূমি বিবেচনা করলে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনযোগ্য। যদিও ২০০৬০৭ অর্থবছরে ভ্যাট আদায়ে কম প্রবৃদ্ধি (১১.৫ শতাংশ) হয়েছে, তবে ২০০৭০৮ অর্থবছর ছিল এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী (৩৪.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি) একটি বছর। ২০০৮০৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি কমে আবার ১৩.৯ শতাংশ দাঁড়ায়।

সারণি ৪.৬: ভ্যাট আদায়ে প্রবৃদ্ধির প্রবণতা: অর্থবছর ১৯৯২-৯৩ থেকে অর্থবছর ২০০৯-১০

(শতাংশ)

উপাদান	অর্থবছর ৯৩ - অর্থবছর ৯৬	অর্থবছর ৯৭ - অর্থবছর ০১	অর্থবছর ০২ - অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ২০০৭	অর্থবছর ২০০৮	অর্থবছর ২০০৯	অর্থবছর ২০১০ বাজেট
মোট ভ্যাট	২৩.১	১০.৮	১৪.২	১১.৫	২৮.২	১৩.৯	১৩.২
ভ্যাট (আমদানি)	২০.০	৭.৮	১০.০	৭.২	৩৪.৫	৮.২	–
ভ্যাট (অভ্যন্তরীণ)	৩২.১	১৫.৯	১৯.২	১৫.৪	২২.৯	১৯.২	–

উৎস: NBR (২০০৯) এবং ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেট দলিলসমূহ।[৯]
দ্রষ্টব্য: '–' অর্থাৎ প্রযোজ্য নয়।

পণ্যমূল্যে অস্থিরতাসহ বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অনিশ্চয়তার প্রভাব চলমান থাকলে ২০০৯১০ অর্থবছরেও আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট আদায়ে সমস্যা হতে পারে। তখন ওই পরিস্থিতি পুষিয়ে নিতে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে ভ্যাট আদায় জোরদার করার দরকার হবে। একই সঙ্গে কিছু পণ্য এবং পেশার (যেমন: চিকিৎসক) ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জও রয়েছে।[১০] সকল বিক্রয় কেন্দ্রে বাধ্যতামূলকভাবে যান্ত্রিক ক্যাশ রেজিস্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নির্ধারিত সময়ভিত্তিক উদ্যোগ নিতে হবে। ভ্যাট আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ভ্যাট ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ এবং খুচরা দোকান থেকে ভ্যাট আদায়ে ব্যাপক অভিযানের মতো প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আয়কর এবং ভ্যাটের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দরকার রয়েছে বলে সিপিডি মনে করে।

---

[৯] http://www.mof.gov.bd/en/

[১০] ম্যানুফ্যাকচারিং পর্যায়ে, বিদ্যুৎ, ক্যান্সার প্রতিরোধক ওষুধ, হার্ডবোর্ড, বৈদ্যুতিক জেনারেটর, রেফ্রিজারেটর, মোটর সাইকেল, সৌর প্যানেল, মাল বহনকারী ট্রেইলার ইত্যাদি ২০০৯১০ অর্থবছরে ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। একই সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত ইন্টারনেট, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং বাণিজ্য পর্যায়ে ভুট্টা বীজকে ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে।

৪.৩.৫ বৈশ্বিক আর্থিক সংকট এবং রাজস্ব পরিস্থিতি

আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য হ্রাসের কারণে বাংলাদেশে ২০০৮০৯ অর্থ´বছরে আমদানি শুল্ক আদায় কমে যায় (সারণি ৪.৭)। চিত্র ৪.৪এ উপ স্থাপিত মাসওয়ারি তথ্যে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, ২০০৮০৯ অর্থবছরের জুলাই মাসে আমদানি শুল্কের প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৫.৭ শতাংশ যা একই অর্থবছরের জুনে এসে ২৭.৯ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধিতে নেমে যায়। মাসিক পরিস্থিতির আলোকে উলেখ্য, ২০০৮০৯ অর্থবছরে আমদানি শুল্ক আদায়ে ১৩.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শেষ পর্যন্ত সংশোধন করে ঋণাত্মক (-) ০.৩ শতাংশ করা হয়। কি ন্তু দেখা যায়, অর্থবছর শেষে ওই লক্ষ্যমাত্রাও অর্জিত না হয়ে তা আরও ঋণাত্মক (-) ২.৮ শতাং শে নেমে আসে (সারণি ৪.৭)। অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে আমদানি সংক্রান্ত শুল্কের ক্ষেত্রেও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫.১ শতাংশে দাঁড়ায় (২০০৮০৯ অর্থ´বছরে ১৩.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পরবর্তীতে কমিয়ে ৭.৪ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়)।

সারণি ৪.৭: আমদানি শুল্ক আদায়ে প্রবৃদ্ধির প্রবণতা: অর্থবছর ১৯৯২-৯৩ থেকে অর্থবছর ২০০৯-১০

(শতাংশ)

উপাদান	অর্থবছর ৯২ - অর্থবছর ৯৬	অর্থবছর ৯৭ - অর্থবছর ০১	অর্থবছর ০২ - অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ২০০৭	অর্থবছর ২০০৮	অর্থবছর ২০০৯	অর্থবছর ২০১০ বাজেট
আমদানি শুল্ক আদায়	১০.০	৬.৭	৯.২	৪.২	১৭.৭	২.৮	১১.৮

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।[১১]

চিত্র ৪.৪: আমদানি শুল্ক আদায়ে ধীর গতি: অর্থবছর ২০০৮-০৯

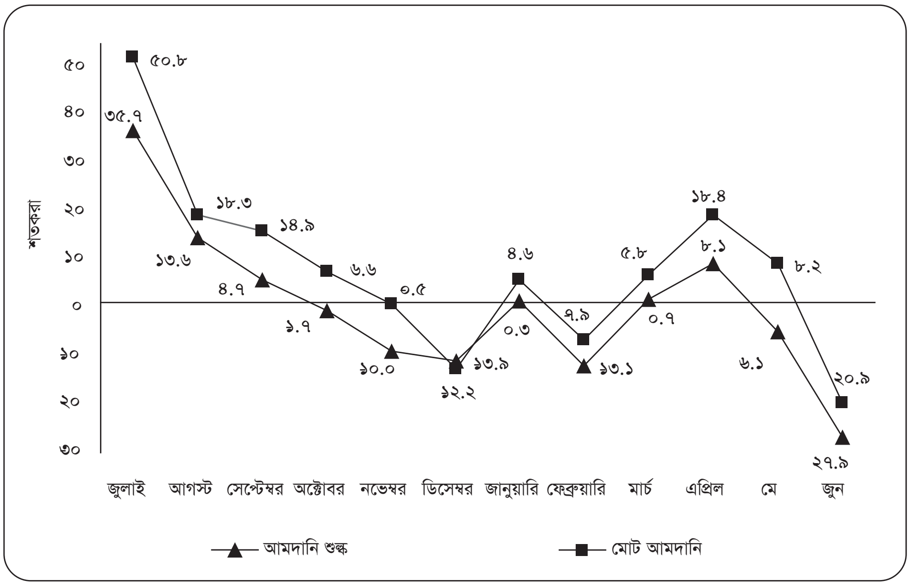

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।[১২]

---

[১১] http://www.mof.gov.bd/en/

[১২] http://www.nbr-bd.org/

আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য আমদানি সম্পর্কিত কর বাংলাদেশে মোট এনবিআর রাজস্ব আদায়ের ৪০ শতাংশ (মোট রাজস্বের ৩৪ শতাংশ)। সুতরাং, বৈশ্বিক আর্থিক সংকট নিরসনের সঙ্গে ২০০৯১০ অর্থবছরে বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়েরও উলেখযোগ্য সম্পর্ক রয়েছে। তবে বিভিন্ন প্রক্ষেপণ অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্ব অর্থনীতি কিছুটা চাঙ্গা হতে পারে এবং সাম্প্রতিক বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্যের উর্ধ্বগতির মাধ্যমে তার লক্ষণ দেখা গিয়েছে। সম্প্রতি জ্বালানি তেলের দাম ৭০ ডলারে পৌঁছে গেছে যা ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে ৪০ ডলারের মতো ছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক আউটলুক (এপ্রিল ২০০৯)এর ম তে, ২০০৯১০ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে এসে বর্তমানের তুলনায় জ্বালানি তেলের দাম আরও বাড়তে পারে। এছাড়াও আইএমএফ ২০১০ সালের জন্য যে পণ্য মূল্যসূচক (১২০.৬) প্রক্ষেপণ করেছে তা ২০০৯ সালের (১০৭.৯) চেয়ে বেশি। ফলে এটা অনুমেয় যে, আগামী বছরে গড় পণ্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পাবে। ২০০৯ সালের মেজুন সময়কা লের পণ্যমূল্য বিবেচনায় ২০০৯১০ অর্থ বছরে আমদানি খাতে শুল্ক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল বলে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক আদায় বাড়তে পারে এবং তা এ খাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়।

উলেখ্য যে, ২০০৯১০ অর্থ বছরে আমদানি শুল্ক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা সাম্প্রতিক গতিধারার (অর্থবছর ২০০৭০৮ ছাড়া) চেয়ে অনেক ওপরে। বিভিন্ন পূর্বাভাস অনুযায়ী বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি থেমে গেলেও, তা ঘুরে দাঁড়ানোর গতিপথ "ভি" আকৃতির (সরাসরি) পরিবর্তে "ইউ" আকৃতি (ধীরগতিতে) হতে পারে। সেক্ষেত্রে ২০০৯১০ অর্থ বছরে আমদানি শুল্ক আদায়ে ১১.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিতে পারে।

৪.৩.৬ নতুন শুল্ক কাঠামো

প্রস্তাবিত শুল্ক কাঠামোতে শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক ৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্তের ফলে সম্ভাব্য রাজস্ব ক্ষতিতে ভারসাম্য আনতে তৈরি পণ্য/বিলাস দ্রব্য (গাড়ি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র প্রভৃতি) আমদানিতে শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। একই সঙ্গে গুঁড়ো দুধ এবং বিলাস পণ্যের ২৫ শতাংশ আমাদানি শুল্কের সঙ্গে ৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

সিপিডির হিসাব অনুযায়ী বর্তমানের এই শুল্ক কাঠামো যদি ২০০৭০৮ অর্থ বছরের আমদানিতে আরোপ করা হতো তাহলে ওই অর্থবছরে ৫.৬৫ শতাংশ অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হতো। এর মানে আমদানিতে শূন্য প্রবৃদ্ধি হলেও আমদানি শুল্কে ৫.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতো। ২০০৯১০ অর্থ বছরে আমদানিতে ১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে (মধ্যমেয়াদি বাজেটীয় কাঠামোর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী) ২০০৮০৯ অর্থ বছরের তুলনায় আমদানি থেকে শুল্ক আদায়ে প্রায় ১১.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে। অনুকূল শুল্ক কাঠামো আমদানি সম্পর্কিত শুল্ক বাড়াতে সহায়তা করবে তবে এটি আমদানি প্রবৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য পরিস্থিতির ওপরও নির্ভর করবে।

৪.৩.৭ অপ্রদর্শিত আয় বৈধকরণ

২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার বিধান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ লক্ষ করা যায়: ১. বৈধ আয় এবং অবৈধ আয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য না করা; ২. কর দিতে হবে মাত্র ১০ শতাংশ, যা নিয়মিত আয়করের চেয়ে কম এবং ৩. কোনো জরিমানা প্রযোজ্য হবে না। বস্তুত, ফ্ল্যাট অথবা বাড়িতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার ক্ষেত্রে কার্যকর করের হার ১ শতাংশেরও নিচে হতে পারে। এ রকম বিধান নিয়মিত করদাতাদের নিরুৎসাহিত করতে পারে এবং রাজস্ব আদায়েও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

ফ্ল্যাট/বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে সুযোগের পাশাপাশি অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পুঁজিবাজার সহ ৪৪টি শিল্প খাতে ১০ শতাংশ কর পরিশোধ করে অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগের জন্য অর্থনীতিব্যাপী সবাইকে সুযোগ না দিয়ে বিশেষভাবে উলেখ্য খাতসমূহে অগ্রাধিকার দিলে তা অধিকতর যৌক্তিক হতো। একই সঙ্গে যেখানে পুঁজিবাজার বর্ধিত মূলধন প্রবাহ আকর্ষণ করতে পারতো সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকজন অর্থ ফ্ল্যাট/বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম হারে কর প্রদানের সুযোগ নেবে। এছাড়া এই খাতে বিনিয়োগে মুনাফাও বেশি। ফলে অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার সুযোগ অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণ অথবা উচ্চ রাজস্ব আদায়ে বড় কোন অবদান নাও রাখতে পারে।

উলেখ্য যে, অপ্রদর্শিত বৈধ আয় থেকে রাজস্ব আদায় ধীরে ধীরে কমে আসছে। ২০০৭০৮ অর্থ বছরে এখান থেকে রাজস্ব এসেছে ৮০৩ কোটি টাকা, যা ২০০৮০৯ অর্থ বছরে কমে দাঁড়ায় মাত্র ১০৫ কোটি টাকা। এই সুযোগ নেওয়া লোকের সংখ্যা ২০০৭০৮ অর্থ বছরের ৪২,০০০ থেকে ২০০৮০৯ অর্থ বছরে কমে দাঁড়ায় ১৪,২১৬ জন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় যে, বছরের পর বছর এ সুযোগ অব্যাহত রাখলে এর ফলপ্রসূতা ধীরে ধীরে কমে আসে। জরিমানা না থাকায় এবং কর ন্যূনতম কার্যকর হারের চেয়ে কম থাকা সত্ত্বেও ২০০৯১০ অর্থ বছরে এ খাত থেকে প্রত্যাশা অনুযায়ী রাজস্ব না আসার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

৪.৩.৮ রাজস্ব আদায়ে প্রশাসনিক দক্ষতা

১৪ কোটির বেশি জনসংখ্যার মধ্যে বাংলাদেশে ২৩ লাখ নিবন্ধিত কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) গ্রহীতা রয়েছেন যাদের মধ্যে মাত্র সাড়ে ৭ লাখ নিয়মিত ভিত্তিতে কর পরিশোধ করে থাকেন। প্রায় দেড় লাখ সরকারি চাকরিজীবী পরবর্তীতে পরিশোধিত কর ফেরত পেয়ে থাকেন। ফলে কার্যকর আয়কর দাতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ লাখে। ২০০৮০৯ অর্থ বছরে (সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে) রাজস্ব জিডিপি অনুপাত ছিল মাত্র ১১.২ শতাংশ। বর্ধিত উন্নয়ন ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে সরকারের সম্প্রসারণমুখী পদক্ষেপের আলোকে কর প্রশাসনকে, বিশেষত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে শক্তিশালী করার জরুরি প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সরকারের যেসব বিষয়ে দ্রুত মনোযোগ দেওয়া দরকার সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

জনশক্তি: আইনগত বিরোধের কারণে ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার জনশক্তি সম্প্রসারণ করতে পারেনি। এই বিষয়টি অবশ্যই নিষ্পত্তি করতে হবে এবং রাজস্বের লক্ষ্য অর্জনে প্রশিক্ষিত এবং নিবেদিত শ্রমশক্তি সহ একটি কার্যকর রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। হিসাব মতে, রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে বর্তমানে ৮,০০০ পদ খালি রয়েছে। এসব শূন্য পদ পূরণ না হলে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে।

নতুন সম্ভাবনার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্প্রসারণ: গত দুই দশকে পৌরসভা ও উপজেলা এলাকায় বসবাসরত মানুষের আয় উলেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তবে স্থানীয় পর্যায়ে কর প্রশাসনের প্রয়োজনীয় জনবল ঘাটতির কারণে এসব এলাকা থেকে রাজস্ব আদায় তেমন একটা বাড়েনি।

সহজ ও যুগোপযোগী আয়কর আইন: স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা এবং অনুমানযোগ্যতা নিশ্চিত করতে কর আইনকে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত বিবেচনায় অবশ্যই করদাতাবা ন্ধব করতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত অনেক আইন বৃটিশ আমলে প্রণীত, এবং এখনও পর্যন্ত সেগুলোর ভাষা ও সূত্র যুগোপযোগী করা হয়নি। আবার এদেশের গত দুই দশকে ঘটিত অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সঙ্গেও তা সামঞ্জস্যপূর্ণও নয়। আয়কর আইন সর্বশেষ সংশোধন করা হয়েছে ১৯৮৪ সালে (আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪)। সরকারি সম্পদের জন্য বাংলাদেশ এখন বৈদেশিক সাহায্যের চাইতে স্থানীয় উৎসের ওপরই বেশি নির্ভরশীল।

ফলে স্থানীয় উৎস থেকে বেশি রাজস্ব আদায় করতে হবে। কিন্তু এসব আইনে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের কোন প্রতিফলন নেই।

মধ্যবর্তী বিষয়সমূহের বিলুপ্তি: মধ্যবর্তী কারও সহায়তা ছাড়া করদাতাদেরকে সরাসরি রাজস্ব প্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে 'স্বনির্ধারণী' পদ্ধতির প্রচলন করলে সরকারের রাজস্ব আয় উলেখযোগ্য হারে বাড়তে পারে। কর পরিশোধ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগীদের সম্পৃক্ততা করদাতাকে অনেক সময় নিরুৎসাহিত করে এবং কর ফাঁকি দিতে উদ্বুদ্ধ করে। অতএব, সাধারণ জনগণের বিশ্বাস অর্জন করতে কর পদ্ধতি অবশ্যই সহজ হতে হবে।

নিরীক্ষা ও তদারকি: অর্থনৈতিক পরিবেশ ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুষ্ঠু, নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকর প্রয়োগ কৌশল প্রণয়ন করলে তা কর ব্যবস্থার ফাঁকফোকর কমিয়ে আনবে। সরকার অনুমোদিত কালো টাকা সাদা করার সুযোগের আলোকে আবাসন খাতে এর প্রভাব তদারকির বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে প্রায় ৫ লাখ ক্রেডিট কার্ড গ্রাহক রয়েছেন। এদের কর সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় কিনা তা নিশ্চিত করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রচেষ্টা থাকা উচিত। কর মওকুফ পরিকল্পনার আওতায় অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সর্বশেষ ব্যবহারের (end-use) উপাত্ত কার্যকরভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

আধুনিকায়ন: তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক কর প্রশাসন গড়ে তুললে তা দুর্নীতি কমাবে এবং কর আদায়ে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বাড়াবে। অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল জনপ্রিয় করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া উচিত। ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টারের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং বড় বড় বন্দর ও দেশের প্রবেশ মুখে কাস্টমস ব্যবস্থা আধুনিকায়ন সরকারের রাজস্ব বাড়াতে সহায়তা করবে। জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেইজ ব্যবহার করের আওতা সম্প্রসারণে সহায়ক হতে পারে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মপদ্ধতি সহ এর সাংগঠনিক কাঠামোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি, আইনের সহজীকরণ এবং করদাতাদের জন্য সেবার মান বৃদ্ধি কর আহরণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এ দিকগুলো অনতিবিলম্বে সরকারের মনোযোগ দাবী করে।

৪.৪ বৈদেশিক সম্পদের প্রবাহ

সামগ্রিক রাজস্ব ঘাটতি পূরণে ২০০৯১০ অর্থবছরে প্রায় ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (১৮,৩৪৫ কোটি টাকা) বৈদেশিক উৎস থেকে আসবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এটি চলতি অর্থবছরের প্রাক্কলিত রাজস্ব ঘাটতির ৪০ শতাংশের কাছাকাছি (পরবর্তীতে বিস্তারিত রয়েছে)।

যদি বৈদেশিক অর্থায়নের এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় তাহলে এটিই হবে একটি বছরের সর্বোচ্চ বৈদেশিক সম্পদের অভ্যন্তরমুখী প্রবাহ। পরিমাণগত এই দিক ছাড়াও প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহের প্রকৃতি ও ধরনেরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাজেটের চাহিদা মেটাতে বড় অঙ্কের বৈদেশিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে ২০০৯১০ অর্থবছরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে: (১) বাজেট সহায়তার অংশ (প্রকল্প সাহায্যের তুলনায়); (২) অনুদানের অংশ (ঋণের বিপরীতে); (৩) সহজ ও স্বল্প সুদে ঋণের অংশ (বাণিজ্যিক ঋণ/সরবরাহকারী ঋণের তুলনায়); এবং (৪) সাহায্য শর্ত (দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র সহ, যার ভবিষ্যৎ বর্তমানে কিছুটা অনিশ্চিত)।

মোট ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রক্ষেপিত বৈদেশিক অর্থায়নের মধ্যে ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৭০ শতাংশ) প্রকল্প সাহায্য হিসেবে আসার কথা। অর্থাৎ ২০০৮০৯ অর্থবছরের (সংশোধিত

এডিপি অনুসারে) তুলনায় ২০০৯১০ অর্থ বছরে ২৬ শতাংশ বেশি প্রকল্প সাহায্য ছাড় করতে হবে। ফলে পাইপলাইনে থাকা প্রায় ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সাহায্যের সুযোগ নিতে জোর প্রচেষ্টা হাতে নেওয়া প্রয়োজন। বৈদেশিক সাহায্যের ভবিষ্যত চাহিদা মেটাতে সরকারকে নতুন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হবে। উলেখ্য যে, গত দুটি অর্থবছরে (২০০৭০৮ এবং ২০০৮০৯) এডিপির নিম বাস্তবায়ন পরিস্থিতির জন্য মোট বৈদেশিক সম্পদের প্রবাহ কমে যায়। অন্যদিকে এ সময়ে মোট বৈদেশিক অর্থায়নের মধ্যে প্রকল্প সহায়তার অংশও কমেছে (চিত্র ৪.৫)। এর কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাতাদের কাছ থেকে, বিশেষত বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে বড় অঙ্কের বাজেট সহায়তা পেয়েছিল। তহবিল ব্যবহারে নমনীয়তা বজায় রাখতে সরকারকে শুধুমাত্র বহুপক্ষীয় উৎস থেকেই এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও বিশ্বব্যাংক নয়, দ্বিপক্ষীয় দাতাদের (যেমন: যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা, ডিএফআইডি) সাহায্য নেওয়ারও দরকার আছে।

চিত্র ৪.৫: মোট বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প সহায়তার অংশ: অর্থবছর ১৯৯৯-০০ থেকে অর্থবছর ২০০৮-০৯

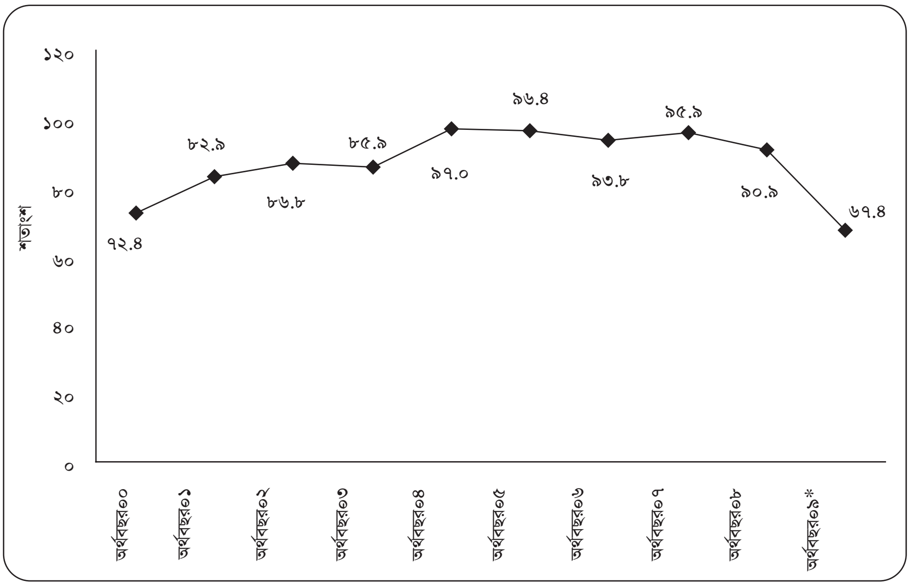

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়।[১৩]
দ্রষ্টব্য: *সংশোধিত বাজেট।

২০০৯১০ অর্থ বছরে বর্ধিত বৈদেশিক অর্থায়নের একটি বড় অংশই ঋণ হিসেবে আসে (৭২ শতাংশ), অপরদিকে অনুদানের অংশ মাত্র ২৮ শতাংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধারাবাহিকভাবে বৈদেশিক অর্থায়নে অনুদান হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয় (চিত্র ৪.৬)। এ জন্য অনুদান আকারে অধিক বৈদেশিক সহায়তা আনার চেষ্টা আরও জোরদার করতে হবে, বিশেষত ঋণ পরিশোধের দায়কে সহনীয় পর্যায়ে ধরে রাখার জন্য। যদিও ২০০৮০৯ অর্থ বছরে বৈদেশিক ঋণ দায় ছিল রাজস্ব বাজেটের প্রায় ২ শতাংশ, আগামী বছরগুলোতে এর অংশ আরও বাড়তে পারে। একইসাথে নিম্ন আয়ের অর্থনীতিতে বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক নানা সহায়তা প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষাপটে (বিশেষত জি২০ বৈঠকে প্রাপ্ত) এ ধরনের সম্ভাবনাময় উৎস থেকে সহায়তা পেতে বাংলাদেশকে সঠিক প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হবে।

[১৩] http://www.bangladesh-bank.org/; http://www.mof.gov.bd/en/

চিত্র ৪.৬: বৈদেশিক সহায়তার অংশ হিসেবে অনুদান প্রবাহ: অর্থবছর ১৯৯৭-৯৮ থেকে অর্থবছর ২০০৭-০৮

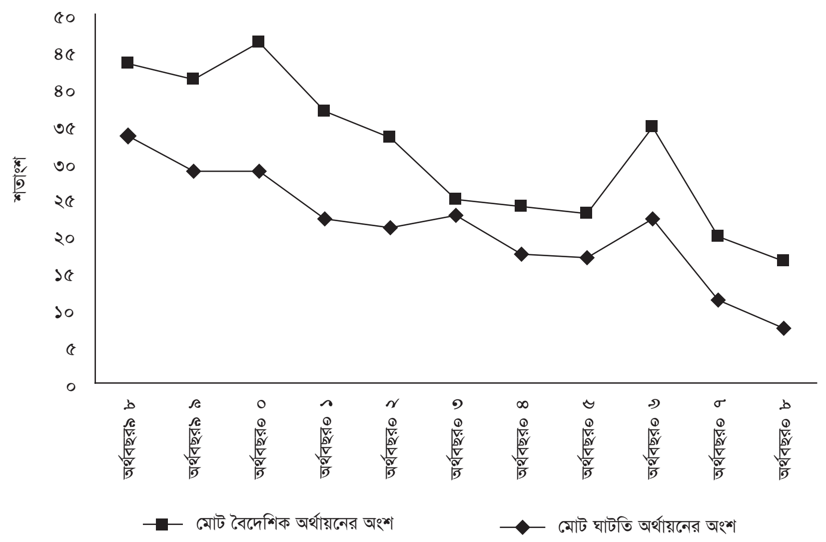

উৎস: MoF (২০০৯a)।

২০০৯১০ অর্থ বছরে বৈদেশিক সহায়তার ওপর সরকারের অধিক জোর দেওয়ার বিষয়টি ইতিমধ্যে বিভিন্ন বড় আকারের প্রকল্পে অর্থায়ন এবং বাজেট ঘাটতিতে সহায়তা করতে বহুপক্ষীয় এবং দ্বিপক্ষীয় দাতাদের কাছে অনুরোধ করার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উন্নয়ন সহযোগীদের বিভিন্ন বিবৃতিতেও ইতিমধ্যে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছে। বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ইতিমধ্যে আগামী বছরগুলোতে যথাক্রমে ২০ শতাংশ এবং ৩৩ শতাংশ সহায়তা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে।

চলতি অর্থবছরে বড় অঙ্কের সহায়তার প্রয়োজনের আলোকে দাতাদের প্রতিশ্রুতি সম্ভানাময় মনে হলেও কিছু কিছু বিষয়ে উদ্বেগও রয়েছে। একটি বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হলো, উচ্চ সুদে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে সরকারের আগ্রহ। সম্প্রতি সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কাছ থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে যেখানে ওই দাতা সংস্থা লাইবরের (London Interbank Offered Rate) চেয়েও বেশি সুদ দাবি করছে।

বক্স ৪.১: বহুপক্ষীয় এবং দ্বিপক্ষীয় দাতাদের সাম্প্রতিক কিছু বক্তব্য

সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, জাপান সরকার ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বিশ্বব্যাংক ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এডিবি বাংলাদেশের জন্য বার্ষিক সহায়তা প্যাকেজ (২০০৯১১ সাল সময়ে) ৩৩ শতাংশ বাড়িয়ে মোট ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়াও বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সহায়তা পেতে বাংলাদেশের অনুরোধ এডিবি বিবেচনা করছে। এছাড়া বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতের সহায়তায় এডিবি আরও ৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দিতে পারে। বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি গ্রামীণ এলাকায় মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে সৌর পদ্ধতি স্থাপনের মাধ্যমে দেশে বিদ্যুতের সংস্থান বাড়াতে ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ দিয়েছে। আগামী তিন বছরের জন্য বিশ্বব্যাংক তার বার্ষিক সহায়তা ২০ শতাংশ বাড়িয়ে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার চীন সরকারের কাছ থেকে প্রকল্প সাহায্য হিসেবে ৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তার চেষ্টা করছে যা আগামী বছরগুলোতে পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এছাড়া কয়েকটি প্রকল্পে চীন সরকারের কাছে ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের সহায়তার যে অনুরোধ করা হয়েছে তা সম্ভবত সরবরাহকারী ঋণ হিসেবে নেওয়া হবে। বস্তুত, বাংলাদেশ উচ্চ সুদ হারের কারণে গত কয়েক বছর ধরে এ ধরনের ঋণ গ্রহণ থেকে বিরত আছে। অন্যদিকে, এসব সহায়তার শর্তগুলোও খুব সতর্কভাবে পরীক্ষানিরী ক্ষা করা প্রয়োজন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ঋণ পেতে আলোচনা শুরু করেছে। উলেখ্য যে, এ সংস্থা মূলতঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য মোকাবেলায় ঋণ দিয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রস্তাবিত ঋণের সুদ হার খুবই কম (০.২৫ শতাংশ)। আশা করা যায় যে, বৈশ্বিক সংকট পরবর্তী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল তার বিভিন্ন ধরনের কঠিন শর্ত থেকে বেরিয়ে অধিকতর নমনীয় হবে। তবে সরকারকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মূল সাহায্য শর্ত সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে তারা সরকারের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে এবং অন্যান্য দাতাদেরকেও এ ধরনের পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখতে পারে।

৪.৫ নির্দিষ্ট ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াবলী

৪.৫.১ নতুন বেতন কাঠামোর বাস্তবায়ন

জাতীয় বেতন কমিশন ২০০৯ সালের এপ্রিলে এর প্রাথমিক সুপারিশমালায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য গড়ে ৭৯.৭ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করে (সারণি ৪.৮)। পরবর্তীতে

সারণি ৪.৮: সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য বর্তমান ও প্রস্তাবিত (মূল) বেতন কাঠামো

গ্রেড	বর্তমান স্কেল	বেতন কমিশনের সুপারিশ		সচিব কমিটির সুপারিশ		গড় বৃদ্ধি (সচিব কমিটির সুপারিশ)
		প্রস্তাবিত স্কেল	প্রস্তাবিত বেতন বৃদ্ধি	প্রস্তাবিত স্কেল	প্রস্তাবিত বেতন বৃদ্ধি	
১ম বিভাগ	২৩০০০	৪৫০০০	৯৫.৭	৪০০০০	৭৩.৯	৬৮.০
	১৯৩০০	৩৭৭৫০	৯৫.৬	৩৩৫০০	৭৩.৬	
	১৬৮০০	৩২৬০০	৯৪.০	২৯০০০	৭২.৬	
	১৫০০০	২৮৮৫০	৯২.৩	২৫৭৫০	৭১.৭	
	১৩৭৫০	২৬২৩০	৯০.৮	২২২৫০	৬১.৮	
	১১০০০	২০৮০০	৮৯.১	১৮৫০০	৬৮.২	
	৯০০০	১৬৯০০	৮৭.৮	১৫০০০	৬৬.৭	
	৭৪০০	১৩৭৫০	৮৫.৮	১২০০০	৬২.২	
	৬৮০০	১২৯০০	৮৯.৭	১১০০০	৬১.৮	
২য় বিভাগ	৫১০০	৯৩০০	৮২.৪	৮০০০	৫৬.৯	৫৬.৯
৩য় বিভাগ	৪১০০	৭০০০	৭০.৭	৬৪০০	৫৬.১	৫৭.৫
	৩৭০০	৬৪০০	৭৩.০	৫৯০০	৫৯.৫	
	৩৫০০	৬০০০	৭১.৪	৫৫০০	৫৭.১	
	৩৩০০	৫৬০০	৬৯.৭	৫২০০	৫৭.৬	
	৩১০০	৫৩০০	৭১.০	৪৯০০	৫৮.১	
	৩০০০	৫০০০	৬৬.৭	৪৭০০	৫৬.৭	
৪র্থ বিভাগ	২৮৫০	৪৭০০	৬৪.৯	৪৫০০	৫৭.৯	৬৭.০
	২৬০০	৪৪০০	৬৯.২	৪৪০০	৬৯.২	
	২৫০০	৪২০০	৬৮.০	৪২৫০	৭০.০	
	২৪০০	৪০০০	৬৬.৭	৪১০০	৭০.৮	
অনুপাত (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গ্রেড)	১:৯.৬	১:১১.৩		১:৯.৮		

উৎস: ২০০৯ সালের ১১ মে ডেইলি স্টারে এবং ২০ জুলাই দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে লেখকবৃন্দের নিজস্ব হিসাব।

২০০৯ সালের জুলাই মাসে সচিব কমিটি পে কমিশনের প্রস্তাব সংশোধন করে গড়ে ৬৪.১ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়। উলেখ্য যে, সরকারি বেতন কাঠামোর সর্বশেষ সংশোধনী হয় ২০০৫ সালের মে মাসে এবং যা ২০০৫ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। নতুন বেতন কাঠামো ঈদউলফিত রের পর (কিন্তু জুলাই থেকে কার্যকর) চূড়ান্ত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য উলেখিত বেতন বৃদ্ধি ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে ৩,৫০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয় সংযোজন করবে। উলেখ্য নতুন বেতন কাঠামোর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হবে পরবর্তী দুই বছর ধরে। বর্তমান বছরে শুধুমাত্র বেতন, এবং পরবর্তী বছরে বোনাস ও ভাতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে। সম্পদ ব্যবস্থাপনার সার্বিক প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হচ্ছে, এই সিদ্ধান্ত এবং এর ব্যবস্থাপনার ওপর মূল্যস্ফীতিজনিত প্রভাব। এ বিবেচনায় যদি বেসরকারি খাতে এ ধরনের বেতন বৃদ্ধি না ঘটে তাহলে এ খাতের মধ্যআ য়ের বেতনভোগী লোকজনের ক্ষেত্রেও তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অন্যদিকে সরকারের চূড়ান্ত বেতন কাঠামো কীভাবে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করা এবং নিম্ন বেতনভোগীদের[১৪] জন্য সমতা নিশ্চিত করবে সেটাই এখন মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। প্রস্তাবিত কাঠামো ইতিমধ্যে বিভিন্ন গ্রেডে বেতন বৃদ্ধির হার নিয়ে কিছু উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। সচিব কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সর্বোচ্চ গ্রেডে (গ্রেড১) মূল বেতন বাড়বে ৭৩.৯ শতাংশ। অন্যদিকে সর্বনিম্ন গ্রেডে (গ্রেড-২০) ৭০.৮ শতাংশ বেতন বাড়বে। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের গড় বেতন বাড়বে ৬৮ শতাংশ, যেখানে বাকিদের (দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শ্রেণী) বেতন বাড়বে ৬০.৯ শতাংশ।

এক্ষেত্রে উদ্বেগের বিষয় হলো, জনপ্রশাসনে আনুষঙ্গিক সংস্কার ছাড়া বেতন কমিশন বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাঠামো এবং অন্যান্য সুবিধা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটির (১৯৯৬ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গঠিত) সুপারিশগুলো পুনরায় পর্যালোচনা করা উচিত।

৪.৫.২ প্রণোদনা প্যাকেজ

বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের প্রভাব মোকাবেলায় সরকার ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে ৩,৪২০ কোটি টাকার প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। ২০০৮০৯ অর্থ বছরের শেষ প্রান্তিকে ব্যবহার করার জন্য এই তহবিলে রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের জন্য (সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত) ৪৫০ কোটি টাকার নগদ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। বাকি বরাদ্দের মধ্যে কৃষির জন্য ১,৫০০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ খাতের জন্য ৬০০ কোটি টাকা, কৃষি ঋণের পুনঃমূলধনীকরণের জন্য ৫০০ কোটি টাকা, এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৩৭৪ কোটি টাকা। এসব তহবিলের ছাড় প্রক্রিয়াও সহজ করা হয়েছে। নগদ সহায়তা দাবির ৭৫ শতাংশ দ্রুত ছাড় করা এবং যাচাইয়ের পর বাকি দাবি পরিশোধের নিয়ম করা হয়েছে।

২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ হিসেবে ৫,০০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। নতুন প্যাকেজের বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশিত না হলেও এটা বলা হয়েছে যে, এটি প্রথম প্যাকেজের নীতিগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। এছাড়াও অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচির পাশাপাশি একটি ঋণ সুবিধাও থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর দুর্বল বাস্তবায়ন

[১৪]বর্তমান পে-স্কেল অনুযায়ী গ্রেড ২০ ও গ্রেড ১এর ম ধ্যে অনুপাত ১:৯.৬, যেখানে সেক্রেটারি কমিটি দ্বারা প্রস্তাবিত পে-স্কেলে এই অনুপাত ১:৯.৮ (সারণি ৪.৮)।

হার মাথায় রেখে প্যাকেজ তহবিলের সময়মতো ছাড় এবং সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের জন্য নীতি সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে সরকারের সচেষ্ট থাকা উচিত। এ প্রক্রিয়ায় অর্থ মন্ত্রণালয়কে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব বিবেচনায় রেখে তার খাতভিত্তিক সহায়তা সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় করতে হবে।

৪.৫.৩ সুদ পরিশোধ এবং ঋণ পরিস্থিতি

১৯৯৩৯৪ অর্থ´বছর পর্যন্ত জিডিপির অংশ হিসেবে মোট সরকারি ঋণের (স্থানীয় এবং বৈদেশিক) ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ছিল লক্ষণীয় (সর্বোচ্চ জিডিপির ৫৩.৫ শতাংশ); এরপর থেকে এটি কমতে থাকে এবং ২০০৮০৯ অর্থ´বছরে (মার্চ পর্যন্ত) জিডিপির ৪৩.২ শতাংশে নেমে আসে (চিত্র ৪.৭)। ২০০৭০৮ অর্থবছরে জিডিপির অংশ হিসেবে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল ২৭.২ শতাংশ এবং ২০০৮০৯ অর্থ´বছরে (মার্চ পর্যন্ত) ছিল ২৪.৪ শতাংশ। অন্যদিকে জিডিপির অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ ঋণের স্থিতি নব্বই দশকের গড় ৭.৬ শতাংশের তুলনায় বেড়ে ২০০৮০৯ অর্থ´বছরে ১৬.৯ শতাংশে দাঁড়ায়। এরপরেও বাংলাদেশের ঋণ পরিস্থিতি কাছাকাছি মানের অর্থনীতির দেশগুলোর তুলনায় অনেক ভালো অবস্থানে রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাজেট ঘাটতির ঊর্ধ্বমুখিতার ফলে সৃষ্ট ঋণ পরিস্থিতি নিকট ভবিষ্যতে উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

চিত্র ৪.৭: জিডিপির অংশ হিসেবে ঋণ পরিস্থিতি: অর্থবছর ১৯৯৯-০০ থেকে অর্থবছর ২০০৮-০৯

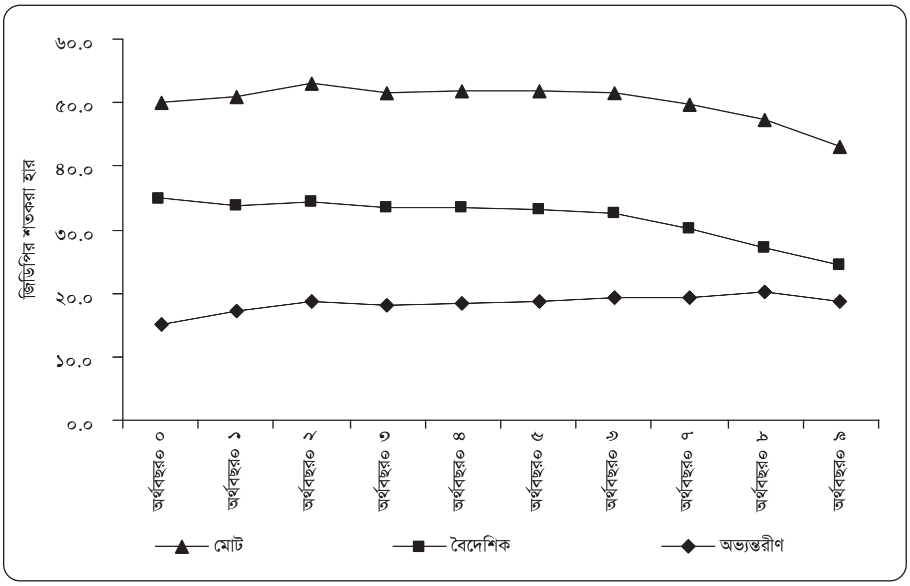

উৎস: MoF (২০০৯a)।

২০০৯১০ অর্থ´বছরে ঋণ পরিশোধে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৮.৭ শতাংশ, যেখানে অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধে ২০.৬ শতাংশ এবং বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে। এটি একটি বড় ধরনের উদ্বেগের কারণ হতে পারে। কেননা ঋণ পরিশোধ ২০০৯১০ অর্থ´বছরের বাজেটের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অংশ (১৩.৯ শতাংশ), যদিও ২০০৮০৯ অর্থ´বছরে তা একটু বেশি ছিল (১৪.১ শতাংশ)। ২০০৯১০ অর্থ´বছরের বাজেটে স্থানীয় ও বৈদেশিক ঋণের অংশ যথাক্রমে ১২.৭ শতাংশ এবং ১.২ শতাংশ (রাজস্ব ব্যয়ের ১৯.৮ শতাংশ এবং ১.৮ শতাংশ) (সারণি ৪.৯)।

সারণি ৪.৯: মোট রাজস্ব ব্যয়ে সুদ পরিশোধের অংশ: অর্থবছর ১৯৯৬-৯৭ থেকে অর্থবছর ২০০৯-১০

সুদ পরিশোধ	গড় (অর্থবছর ১৯৯৭-অর্থবছর ২০০১)	গড় (অর্থবছর ২০০২-অর্থবছর ২০০৬)	অর্থবছর ২০০৭	অর্থবছর ২০০৮	অর্থবছর ২০০৯ (সংশোধিত বাজেট)	অর্থবছর ২০১০ (বাজেট)
মোট সুদ পরিশোধ	১৭.৬	২০.৫	২০.২	২০.৮	১৯.৮	২১.৭
অভ্যন্তরীণ	১২.৯	১৬.৮	১৭.৩	১৮.৫	১৭.৯	১৯.৮
বৈদেশিক	৪.৭	৩.৭	২.৯	২.৩	২.০	১.৮

উৎস: MoF (২০০৯a)।

বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের (অথবা মোট রপ্তানি আয়) অংশ হিসেবে ঋণ দায় পরিস্থিতিতে গত দশকে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছে (সারণি ৪.১০)। তবে ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে উচ্চ সুদে বাণিজ্যিক ঋণের দিকে সরকার আগ্রহ দেখিয়েছে (এ অধ্যায়ের ৪.৪ অংশে উলেখ করা হয়েছে) যা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। যদিও সামগ্রিকভাবে ঋণ অর্থায়ন উদ্বেগের কারণ নাও হতে পারে।

সারণি ৪.১০: ঋণ পরিশোধ দায় প্রবণতা: অর্থবছর ১৯৯৯-০০ থেকে অর্থবছর ২০০৭-০৮

অর্থবছর	মোট ঋণ দায় মোট রপ্তানি আয়ের অংশ হিসেবে	মোট ঋণ দায় মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অংশ হিসেবে
১৯৯৯০০	১০.৭	৭.২
২০০০০১	৯.২	৬.৫
২০০১০২	৯.৮	৬.৩
২০০২০৩	৯.৩	৫.৮
২০০৩০৪	৭.৭	৪.৯
২০০৪০৫	৭.৬	৪.৮
২০০৫০৬	৬.৪	৪.১
২০০৬০৭	৫.৯	৩.৭
২০০৭০৮	৫.৫	৩.৬

উৎস: MoF (২০০৯a) থেকে সংগৃহীত।

৪.৫.৪ ভর্তুকি এবং স্থানান্তর

আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্য মূল্য (বিশেষত খাদ্য, জ্বালানি ও সার) বৃদ্ধির ফলে ভর্তুকি চাহিদার তারতম্য বাংলাদেশের বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা এবং সরকারের প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টির একটি অন্যতম উৎস। ২০০৭০৮ অর্থ বছরে প্রকৃত ভর্তুকির দরকার হয় মূল বরাদ্দের ৯৪.৫ শতাংশ বেশি। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য, জ্বালানি তেল এবং সারের দাম উলেখযোগ্য বৃদ্ধির কারণে ভর্তুকি চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া এর সবচেয়ে বড় কারণ। ২০০৭০৮ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৮০৯ অর্থ বছরে কৃষি ভর্তুকি এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) ভর্তুকি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২,১৪২ কোটি টাকা (১৫২.৮ শতাংশ) এবং ৪,১১৭ কোটি টাকা (৩৪৩.১ শতাংশ)।

২০০৮০৯ অর্থ বছরের বাজেটে সরকার ভর্তুকি পরিশোধের জন্য ১৩,৬৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। যদিও গত অর্থবছরে ভর্তুকি পরিশোধের চূড়ান্ত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি, তবে অনুমান করা হয় যে, প্রকৃত পরিশোধ মূল বরাদ্দের চেয়ে অনেক কম হবে। খাদ্য এবং জ্বালানি তেলের দাম কমে যাওয়ায় ভর্তুকি চাহিদার ওপর চাপ কমেছে, এবং একই সঙ্গে শস্যের ভালো ফলন ও এডিপির নিম্ন বাস্তবায়নের কারণে বাজেট ঘাটতি প্রক্ষেপণের তুলনায় কম হয়েছে।

২০০৯১০ অর্থ´বছরে ভর্তুকি চাহিদা তার আগের দুটি অর্থবছরের মতো একই বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে বাজেটে ভর্তুকি বরাদ্দের ওপর বিস্তারিত তথ্য না থাকার ফলে সরকারের প্রাক্কলন পরিষ্কার নয়। একই সঙ্গে প্রণোদনা প্যাকেজে কতটুকু ভর্তুকি রয়েছে তাও স্পষ্ট নয়। বাজেট দলিলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের জন্য ভর্তুকি বরাদ্দের বিষয়ে কিছু উলেখ করা হয়নি। শুধু কৃষি খাতে (৩,৬০০ কোটি টাকা) বরাদ্দ বাজেটে উলেখ করা হয়েছে। বাজেট প্রক্রিয়ায় কার্যকর তদারকি বাড়াতে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ভর্তুকি বরাদ্দ এবং বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য নিয়মিত ভিত্তিতে জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা উচিত।

২০০৯১০ অর্থ´বছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে ২০০৮০৯ অর্থ´বছরের তুলনায় ২৫.১ শতাংশ বরাদ্দ বাড়ানো হয়। এই বরাদ্দ মোট বাজেটের প্রায় ১৫.২ শতাংশ এবং এর মধ্যে ১,১৭৬ কোটি টাকা অতি দরিদ্রদের জন্য একটি কর্মসংস্থান কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত রয়েছে। এসব কর্মসূচির বাস্তবায়ন বাজেটের মোট ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব ফেলবে। এর আগে সূচিত ১০০দি নের কর্মসৃজন কর্মসূচি কৃষি খাতে কাজহীন (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্যন ভেম্বর) সময়কে লক্ষ্য করে প্রণীত হয়েছে। যদি হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি একই সময়কালকে লক্ষ্য করে প্রণীত হয়ে থাকে তাহলে পরিকল্পনা এবং সমন্বয় আগে থেকেই শুরু করা উচিত। আগের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে তড়িঘড়ি বাস্তবায়ন এবং পরিকল্পনার জন্য পর্যাপ্ত সময়ের অভাব এসব কর্মসূচির সাফল্যের পথে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করে।

৪.৫.৫ প্রচ্ছন্ন দায়

২০০৯১০ অর্থ´বছরের বাজেটে প্রচ্ছন্ন দায়ের বিষয়গুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে, কেননা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো লোকসান থেকে এখনও বের হতে পারেনি। ২০০৭০৮ অর্থ´বছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো ৯,৯৮২ কোটি ৯০ লাখ টাকা লোকসান দেয় যার মধ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (খুচরা পর্যায়ের মূল্যে জ্বালানি ভর্তুকি প্রদানের কারণে) ছিল ৯,৫৫৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা। ২০০৮০৯ অর্থ´বছরে এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৫৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা (এপ্রিল ২০০৯), যা তার আগের অর্থবছরের তুলনায় অনেক কম।

২০০৮০৯ অর্থ´বছরে তেল, গ্যাস ও খনিজ কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড যথাক্রমে ১,০২৬ কোটি ২১ লাখ এবং ৯৯৩ কোটি ২০ লাখ টাকা লোকসান দিয়েছে। নিকট ভবিষ্যতে কোন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারিকরণ না করার সিদ্ধান্তের কারণে তার জন্য প্রস্তুতি থাকতে হবে। এটা বিবেচনা করা দরকার যে, আন্তর্জাতিক বাজারে তুলনামূলকভাবে তেলের নিম্নমূল্য আস্তে আস্তে বাড়তে পারে এবং এতে সরকারকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের জন্য উচ্চতর তহবিল গঠন করতে হতে পারে। যাই হোক, প্রচ্ছন্ন দায় বিবেচনায় রেখে সরকারকে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সরকারি দায়ের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র এবং এ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান জনগণের কাছে প্রকাশ করতে হবে।

৪.৬ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন

এডিপি বরাদ্দ এবং বাস্তবায়নে (জিডিপির অংশ হিসেবে) হার গত এক দশকে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছে (চিত্র ৪.৮)। ২০০০০১ অর্থ´বছরে প্রকৃত এডিপি ছিল মূল এডিপির ৯২.৯ শতাংশ যা ২০০৪-০৫ অর্থবছর এবং ২০০৭০৮ অর্থ´বছরে ছিল যথাক্রমে ৮৫.১ শতাংশ এবং ৬৯.৮ শতাংশ।

২০০৮০৯ অর্থ´বছরে মূল এডিপি ২৫,৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ৭৬.৭ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছে (সংশোধিত এডিপি ২৩,০০০ কোটি টাকার ৮৫.৪ শতাংশ), যা এডিপি বাস্তবায়নে উন্নতির কোন লক্ষণ

চিত্র ৪.৮: জিডিপির অংশ হিসেবে মূল এবং প্রকৃত এডিপি: অর্থবছর ১৯৯৯-০০ থেকে অর্থবছর ২০০৮-০৯

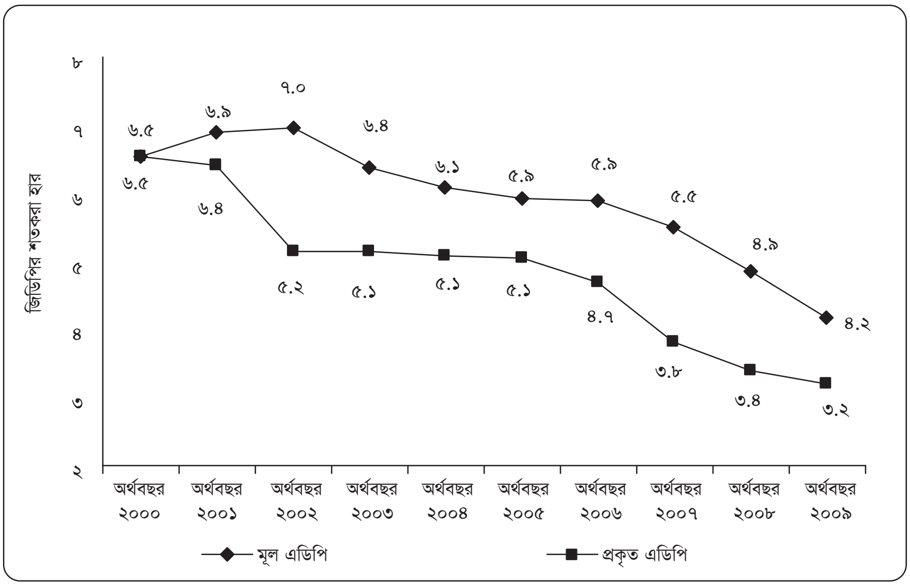

উৎস: MoF (২০০৯a)।

নয়, এমনকি ২০০৮০৯ অর্থবছরের মূল এডিপি ২০০৭০৮ অর্থবছরের চেয়ে ৯০০ কোটি টাকা কম ছিল। অতীতের ধারাবাহিকতায় ২০০৮০৯ অর্থবছরের এডিপিতেও শেষ ২৩ মাসে দ্রুত খরচের প্রবণতা ছিল। এপ্রিল শেষে মূল বরাদ্দের মাত্র ৪৬.৩ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়। এই 'শেষ প্রান্তিকের কর্মময়তা' প্রায়শই সমালোচনার মুখোমুখি হয়, কেননা এটি প্রকল্পের গুণগত মানকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। সবশেষ ২০০৮০৯ অর্থবছরের প্রকৃত এডিপি ২০,০০০ কোটি টাকা অতিক্রম করতে পারেনি, বছর শেষে যা ১৯,৬৪৬ কোটি টাকায় পৌঁছায়।[১৫] এর ফলে এডিপিজিডিপি অনুপাত দাঁড়ায় মাত্র ৩.১৯ শতাংশ, যা এ যাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে কম।

এডিপির দুর্বল বাস্তবায়ন তিনটি বিষয়ের যৌথ পরিণতিতে ঘটছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে: (১) সম্পদের সীমাবদ্ধতা; (২) অবাস্তব লক্ষ্য নির্ধারণ; এবং (৩) বাস্তবায়ন সক্ষমতার অভাব।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা: গত এক দশকের গতিধারা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এডিপির প্রকৃত বাস্তবায়নে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি রাজস্ব আয়ের পরিবর্তনকে অনুসরণ করেছে (চিত্র ৪.৯)।[১৬] সিপিডির আগের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এডিপির বাস্তবায়ন রাজস্ব আদায় পরিস্থিতির ওপর বহুলাংশেই নির্ভর করে। অতএব এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্পদের সীমাবদ্ধতাও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যদিও এ পর্যন্ত নীতি বিশেষণে এ বিষয়টি খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি (CPD ২০০৭)।

[১৫]সিপিডির প্রক্ষেপণ অনুযায়ী এডিপি বাস্তবায়ন ছিল ১৯,৫০০ কোটি টাকা।
[১৬]নয়টি পর্যবেক্ষণের মধ্যে (অর্থবছর ২০০০০১ থেকে অর্থবছর ২০০৮০৯) সাতটির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের গতি একই ছিল।

চিত্র ৪.৯: প্রকৃত এডিপি এবং রাজস্ব আদায়ে পরিবর্তন প্রবণতা: অর্থবছর ২০০০-০১ থেকে অর্থবছর ২০০৮-০৯

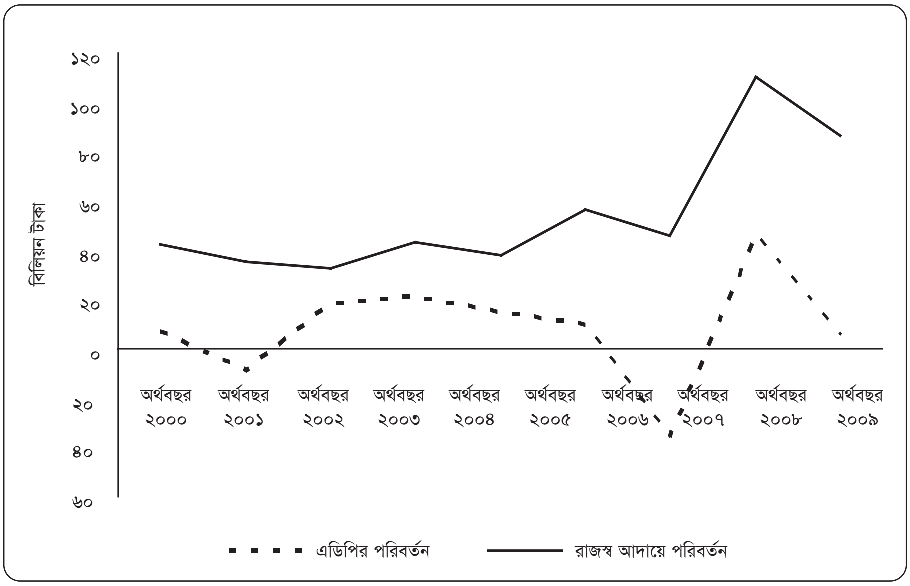

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্যের ভিত্তিতে লেখকবৃন্দের নিজস্ব হিসাব।[১৭]

অবাস্তব লক্ষ্য নির্ধারণ/সম্ভাব্য বিনিয়োগ চাহিদা: ২০০৯১০ অর্থ বছরে এডিপিজিডিপি অনুপা তের লক্ষ্যমাত্রা ৪.৪ শতাংশ ধরে এডিপির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩০,৫০০ কোটি টাকা। সাম্প্রতিক সময়ে বাস্তবায়নে স্থবিরতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় না এনে এডিপির লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির এই প্রবণতা লক্ষণীয়। ২০০০০১ অর্থ বছর থেকে ২০০৭০৮ অর্থ বছরের ব্যবধানে প্রকৃত এডিপি বেড়েছে মাত্র ১৩.৯ শতাংশ, যেখানে মূল এডিপি বেড়েছে ৫১.৪ শতাংশ। মূল এডিপির এই প্রবৃদ্ধি একটি উন্নয়নশীল দেশের সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ চাহিদার প্রতিফলন দেয়। গত এক দশকের এডিপি বাস্তবায়নের গতিধারা থেকে দেখা যায়, ১৯৯৯০০ অর্থ বছরে এডিপি বাস্তবায়নে সর্বাধিক ২৩.৭ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হয়, অন্যদিকে সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধি হয় ২০০১০২ অর্থ বছরে (৯৩.২ শতাংশ)। এই দশ কে গড়ে প্রতি বছরে এডিপি বাস্তবায়নে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৮ শতাংশ। এসব পরিসংখ্যান এবং ২০০৮০৯ অর্থ বছরের প্রকৃত এডিপি (১৯,৬৪৬ কোটি টাকা) বিবেচনায় ২০০৯১০ অর্থ বছরে প্রকৃত এডিপি প্রায় ২৪,৩০০ কোটি টাকা (প্রাক্কলিত জিডিপির ৩.৫ শতাংশ) হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যা হবে মূল এডিপির চেয়ে প্রায় ৬,২০০ কোটি টাকা কম। অন্যদিকে কেউ যদি গত ১০ বছরের গড় প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় আনে তাহলে প্রকৃত এডিপি ২০,৮০০ কোটি টাকা (প্রাক্কলিত জিডিপির ৩ শতাংশ এবং মূল এডিপির চেয়ে ৯,৭০০ কোটি টাকা কম) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সিপিডি তার বাজেট বিশেষণে কীভাবে এডিপি এর মেয়াদোত্তীর্ণ এবং পুরোনো প্রকল্পের ভার বহন করে চলেছে তা উলেখ করেছিল। এই বিষয়টি ২০০৯১০ অর্থ বছরে আরও বেশি হতে পারে, এবং এতে 'মূল এডিপি' ও 'প্রকৃত এডিপি'র মধ্যে আগের চেয়ে বেশি পার্থক্য থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে।

বাস্তবায়ন দক্ষতার অভাব: জিডিপির অনুপাত হিসেবে বর্তমানের নিম্ন সরকারি বিনিয়োগ পরিস্থিতির কারণে প্রশাসনিক সক্ষমতা জোরদার করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। সামগ্রিক এডিপি বাস্তবায়নের

[১৭] Ministry of Finance (২০০৯a).

তুলনায় কম বাস্তবায়ন হার রয়েছে এমন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ওপর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। ১৯৯৯০০ অর্থ বছর এবং ২০০৪০৫ অর্থবছরে এ ধরনের মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩০টি ও ৪৫টি। ২০০৮০৯ অর্থ বছরের তৃতীয় প্রান্তিক শেষে ওই সমীক্ষার আওতায় ২৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে নিম্ন বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। সারণি ৪.১১এ ১৯৯৯০০, ২০০৪০৫ ও ২০০৮০৯ অর্থ বছরগুলোর সমীক্ষায় চিহ্নিত দুর্বল এডিপি বাস্তবায়নের বড় কারণগুলো শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয়েছে।

সারণি ৪.১১: এডিপি বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমস্যাগুলোর শ্রেণীবিন্যাস[১]

কারণ	অবস্থান অর্থবছর ২০০০	অবস্থান অর্থবছর ২০০৫	অবস্থান অর্থবছর ২০০৯ (তৃতীয় প্রান্তিক)
দরপত্র প্রক্রিয়ায় বিলম্ব	৫	৩	১
জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব	৫	১৩	২
প্রকল্প সংশোধনে বিলম্ব	১১	১০	৩
তহবিল ছাড়ে বিলম্ব	১	১০	৪
জনশক্তির অভাব	১	৭	৫
দুর্বল পরিকল্পনা	১১	৫	৬
ক্রয় প্রক্রিয়ায় বিলম্ব	৫	১	৭
প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব	৮	২	৭
বিল তৈরি/পরিশোধে বিলম্ব	১৪	১০	৭
অন্যান্য[২]	৩	৭	১০
পরামর্শক নিয়োগে বিলম্ব	৮	৯	১০
আইনি সমস্যা	৮	১৪	১২
সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমতার অভাব	১১	৩	১২
দাতাদের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব	৪	৫	১৪
প্রয়োজনের তুলনায় কম বরাদ্দ	১৪	১৪	১৪

উৎস: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগের বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে লেখকবৃন্দের সংকলন।[১৮]

দ্রষ্টব্য: ১.একই অবস্থান মানের সমস্যাগুলো সমান সংখ্যায় রিপোর্ট করা হয়েছে।

২.অন্যান্য কারণগুলো হলো -প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিলম্ব, উপাদানের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিলম্ব, তহবিল তুলে নেওয়া, যোগাযোগের অভাবের কারণে বিলম্ব, সংসদ অধিবেশন না বসা, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পালনে ব্যর্থ হলে বিলম্ব, ইত্যাদি।

১৯৯৯০০ অর্থ বছরে দুর্বল বাস্তবায়নের প্রধান তিনটি কারণ ছিল: (ক) তহবিল ছাড়ে বিলম্ব, (খ) জনশক্তির অভাব, এবং (গ) দাতাদের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব; যেখানে ২০০৪০৫ অর্থ বছরের কারণগুলো ছিল: (ক) ক্রয় প্রক্রিয়ায় বিলম্ব, (খ) প্রকল্প অনুমোদনে দেরি, এবং (গ) দরপত্র প্রক্রিয়ায় দেরি। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন (২০০৮০৯ অর্থ বছর) অনুসারে মন্ত্রণালয়গুলোর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যে তিনটি প্রধান সমস্যা চিহ্নিত হয়, তা হলো: (ক) দরপত্র প্রক্রিয়ায় বিলম্ব, (খ) জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, এবং (গ) প্রকল্প সংশোধনজনিত বিলম্ব। মন্ত্রণালয় এবং বিভাগগুলোর নিজস্ব এসব মূল্যায়ন থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। প্রথমত, এডিপি বাস্তবায়নের পথে অন্যতম বাধা হলো, আর্থিক এবং মানব পুঁজির উভয় বিচারে, সম্পদের প্রাপ্যতার অভাব। দ্বিতীয়ত, দাতাদের সঙ্গে সমন্বয় উলেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, যার ফলে সম্ভবত সাদৃশ্যায়িত কর্মপরিকল্পনা (হারমোনাইজেশন অ্যাকশন প্ল্যান) মতো ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে। তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হচ্ছে এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়গুলো, যেমন -দরপ ত্র প্রক্রিয়া এবং জমি অধিগ্রহণ এসব বিষয়গুলো বিলম্ব হওয়ার একটি বড় কারণ। অর্থাৎ সময়ের পরিক্রমায় প্রকল্প বাস্তবায়নের উপরের ধাপগুলোতে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলো প্রধান হয়ে উঠছে। অন্য কথায় বলা যায়, বর্তমান সময়কালে প্রকল্পের উদ্বোধনই একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

[১৮] IMED (২০০০), (২০০৫) এবং (২০০৯)।

দরপত্র, জমি অধিগ্রহণ এবং অন্যান্য ক্রয় প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতাসহ যেসব বিষয়গুলো এডিপিকে গতিময় করতে বাধা সৃষ্টি করেছে, সেগুলোকে দূর করার উদ্যোগ নিলে সংশিষ্ট সংস্থাগুলোর বাস্তবায়ন দক্ষতায় কিছু উন্নতি ঘটতে পারে। তবে সরকারি বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করতে অধিকতর সমন্বিত কৌশলের দরকার। পূর্বে এডিপির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রবর্তন করা হয়েছিল। তথাপি, এ কাঠামোর আওতায় নিজস্ব বাজেট প্রণয়নে মন্ত্রণালয়গুলোর সম্পৃক্ততা তাদের এডিপি বাস্তবায়নে সহায়ক হয়নি।[১৯]

স্মরণ করা যেতে পারে যে, অর্থমন্ত্রী তার সর্বশেষ বাজেট বক্তৃতায় এডিপি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি উন্নত করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের আগ্রহের কথা জানান:

- প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে পরিকল্পনা ও বাজেট অনুবিভাগ প্রতিষ্ঠা;
- প্রকল্পের দ্রুত অনুমোদন এবং পরিবীক্ষণ জোরদার;
- এডিপির সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ে (মোট এডিপির ৭৮ শতাংশ) পরিবীক্ষণ জোরদার;
- প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সংস্কার;
- সরকারি ক্রয়বিধি এবং সরকারি ক্রয় আইনের সংশোধন;
- প্রকল্প পরিচালকদের দক্ষতা বৃদ্ধি; এবং
- ক্রিটিক্যাল পাথ মেথডের (সিপিএম) মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরিবীক্ষণ।

এর আগে সিপিডি তার প্রাকবা জেট প্রস্তাবনায় এডিপির ওপর কিছু সুপারিশ করেছিল (CPD ২০০৯c; এবং Choudhury ২০০৯)। এদিক থেকে একটি বিষয় হলো, অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তব্যে উলেখিত বেশ কিছু নীতি প্রস্তাবনার সাথেও সিপিডি প্রদত্ত সুপারিশগুলোর সামঞ্জস্যতা রয়েছে। সিপিডি প্রস্তাবিত সুপারিশমালা এক্ষেত্রে আরও একবার উলেখ করা যেতে পারে।

কর্মপরিকল্পনা

সকল চলমান প্রকল্প সময়মতো শেষ করার জন্য প্রকল্পভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এসব কর্মপরিকল্পনা সংশিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কর্তৃক তৈরি এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া উচিত। যেহেতু এসব প্রকল্প উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে, তাই কর্মপরিকল্পনাগুলো জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) অথবা পরিকল্পনা কমিশনের মতো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার দরকার নেই।

এসব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে এবং সম্পদের প্রাপ্যতাসহ প্রকল্পের বাকি সময়ে কতটুকু অর্জন সম্ভব তার ওপরও বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা থাকতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতার ওপর যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনার আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক তদারকি কার্যক্রম এবং কর্তৃপক্ষের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে। যেসব কাজ প্রকল্পকালীন সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব নয় এবং অধিক অগ্রাধিকারভুক্ত নয়, তা এডিপি থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে, এবং তার জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদ অগ্রাধিকার প্রকল্পের জন্য আলাদা করে রাখা যেতে পারে।

[১৯]এখন পর্যন্ত ২০টি মন্ত্রণালয় মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।

কর্মপরিকল্পনাটির আওতায় পণ্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ থাকতে হবে এবং প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্নের চাহিদা মেটানোর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে।

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে প্রকল্পসমূহে জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। শূন্য পদগুলোতে, বিশেষত প্রকল্প পরিচালক পদে নিয়োগ দ্রুত শেষ করতে হবে। সকল প্রকল্পের জন্য পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে, যদি না প্রকল্প প্রস্তাবনায় খণ্ডকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের সুযোগ দেওয়া থাকে।

সংশিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষসমূহকে প্রত্যেকটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের সঙ্গে সংযুক্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ পক্ষগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। এছাড়া এসব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে যতদূর সম্ভব স্থানীয় প্রশাসনের সম্পৃক্ততা বাড়ানোও গুরুত্বপূর্ণ।

উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের মতো স্থানীয় সরকারের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল অর্থবছরের প্রথম দিকে একবারে ছাড় করা যেতে পারে যাতে এসব প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা (স্কীম) হাতে নিয়ে বছরের প্রথম থেকেই বাস্তবায়ন শুরু করতে পারে। এসব স্কীম স্থানীয় সংশিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে (স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার মাধ্যমে) তৈরি করা উচিত। এ ধরনের স্কীম উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং ঢাকা অথবা জেলা পর্যায়ের কোনো কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না। এসব উলেখিত কর্মপরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়ন অর্থবছরের প্রথম থেকেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করা উচিত ।

তদারকি কৌশল

প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনার সময়মতো বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বাস্তবসম্মত তদারকি কৌশল প্রণয়ন করা যেতে পারে। যেখানে সম্ভব সেখানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোসহ প্রকল্পের বাইরের সংশিষ্ট সকলকেও এই তদারকি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

গুণগত ও পরিমাণগত উভয় বিচারে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যাপ্তভাবে তদারক নিশ্চিত করতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগকে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করতে হবে। বর্তমানে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং জাপান সরকারের সহায়তায় এ বিভাগকে শক্তিশালী করে তোলার একটি কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের অংশ হিসেবে ফলাফল নির্ভর তদারকি ও মূল্যায়নের ধারণা প্রতিষ্ঠা করা; জ্ঞান ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন; প্রশিক্ষণ ও গবেষণাসহ মানবসম্পদ আরও শক্তিশালী করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফলাফল নির্ভর তদারকি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগের কার্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত। এই তদারকির আওতায় মূল বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের সংশিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

মালিকানা

এসব কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ প্রাপ্যতা সমস্যা হবে না, কেননা অনুমোদিত চলমান প্রকল্পগুলোর সম্পদ ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুত এবং অনেক ক্ষেত্রেই মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় তা বরাদ্দ করা রয়েছে। এক্ষেত্রে বেশি দরকার হলো বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষের শক্তিশালী মালিকানাবোধ। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধির এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে এই ধরনের মালিকানা বিরাজ করে।

ক্রয়নীতি

ক্রয়নীতি ২০০৬এ অ নেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলেও কমপায়েন্স সংশিষ্ট বিষয়ে দীর্ঘসূত্রতার জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এটি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। সরকার দেশে সরকারি ক্রয়নীতির উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ক্রয় কারিগরি ইউনিট বা সিপিটিইউ স্থাপন করেছে। তাছাড়াও ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করতে সরকার বর্তমানে ক্রয়নীতি পর্যালোচনা করছে। যাই হোক, আগের পদ্ধতির দুর্বলতাসমূহ (যেমন, নির্দিষ্টকরণের অভাব, নির্বাচন মানদণ্ডের গোপনীয়তা অবলম্বন, যথাযথ কারণ ছাড়াই পুনঃদরপত্র আহ্বান ইত্যাদি) দূর না করে এটা করা উচিত হবে না। এই পর্যালোচনা কার্যক্রম যত দ্রুত সম্ভব শেষ করতে হবে।

জমি অধিগ্রহণ, স্থানচ্যুতি, পুনর্বাসন এবং পুনঃস্থাপনের (resettlement) কারণে অনেক সময় প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হয়। উন্নয়নের জন্য জমির প্রয়োজনীয়তা এবং যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয় তাদের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া – এ দুইয়ের মধ্যে একটি সুন্দর ভারসাম্য রক্ষা করা অবশ্যই দরকার। এ জন্য পর্যাপ্ত পুনর্বাসন প্যাকেজের ব্যবস্থা করে এবং স্থানচ্যুতির বিকল্প কম রেখে পুনর্বাসন এবং পুনঃস্থাপনের একটি নীতি থাকা দরকার।

তহবিল ছাড়

তহবিল ছাড়ে অতিকেন্দ্রীকরণ এবং অন্যান্য বাধাসমূহ দূর করা প্রয়োজন। একটি সাধারণ নীতি হতে পারে যে, এডিপিতে একবার অন্তর্ভুক্ত হলে সেই প্রকল্পগুলোর তহবিল ছাড়ে অন্যান্য সংস্থার আর কোন অনুমোদনের বিধান না রাখা।

খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার

বিদ্যুৎ উৎপাদনের গুরুত্ব বিবেচনায় এ খাতে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। বাজেটে এক্ষেত্রে সঠিক বরাদ্দ দিতে হবে। এই খাতের জন্য বিশেষ তদারকি কৌশল তৈরি করতে হবে। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপের ক্রমভুক্তিকরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। কয়লানীতি চূড়ান্তকরণ, কয়লা সম্পদের ব্যবহার এবং কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যেসব বিভাগ আগে সফলতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে তাদেরকে একটি প্রণোদনাভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তহবিল বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে।

স্থানীয় সরকার

এডিপি বাস্তবায়নে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের ঘনিষ্ঠ সংশিষ্টতার অভাব একটি বড় ধরনের সমস্যা। প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করতে সঠিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা উচিত। এলাকাগুলোতে এডিপি বাস্তবায়নের গুণগতমান তদারকি এবং সময়মতো বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মকর্তা, সুবিধাভোগী এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

এই প্রেক্ষিতে আমরা ২০০৮ সালের নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যানকে স্মরণ করতে পারি যিনি “কেনসিয়ান সমাধান” ও প্রবিধানের পক্ষে মতামত দিয়ে থাকেন।[২০] এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে,

[২০]দেখুন http://krugman.blogs.nytimes.com/

কেনসিয়ান রাজস্ব প্রণোদনা শুধু ব্যয় নয়, এটা এমন এক ধরনের ব্যয় যা সমতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। বস্তুত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দারিদ্র্য হ্রাসকারী প্রবৃদ্ধি সরকারি বিনিয়োগের উন্নতির ওপরও বহুলাংশে নির্ভর করবে। তবে শুধু বিনিয়োগ বিভেদ পূরণ করতে নয়, এই প্রক্রিয়ায় বেসরকারি খাতকেও অধিকতর কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির ভিত্তি নিশ্চিত করতে আজ সরকারি বিনিয়োগ অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে (Baldacci *et al.* ২০০৮)। বিশেষত সাম্প্রতিক বৈশ্বিক সংকট এবং এর প্রভাব মোকাবেলার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি বিনিয়োগের গুরুত্ব অনেক বেশি। সরকারি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ কর্মসূচিতে সরকারি বিনিয়োগ বৈশ্বিক আর্থিক সংকট পরবর্তী সময়ের নতুন চ্যালেঞ্জের সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্কিত (Schwartz এবং Schwenninger ২০০৮)। উদ্বৃত্ত পুঁজির একটি অর্থনীতিতে নতুন বেসরকারি বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা এবং বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্পমেয়াদে ভালো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা শুধুমাত্র দ্রুত এবং সবচেয়ে নির্ভরশীল উপায়ই নয়, সর্বোত্তমও বটে।

৪.৭ বাজেট কাঠামোর মধ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের সূচনা

অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ সমস্যা বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য মূল প্রতিবন্ধক। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন এবং উন্নয়ন সরকারের প্রাথমিক দায়দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। তবে অবকাঠামোর জন্য চাহিদা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা বেড়ে যাওয়ায় এসব প্রকল্পে অর্থায়ন, উদ্ভাবনমূলক চর্চা এবং কারিগরি দক্ষতার জন্য গত দুই দশকে বিশ্বব্যাপী সরকারগুলো বেসরকারি খাতের দিকে ঝুঁকছে। এই প্রত্যয়টি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) নামে পরিচিত। চীন, ব্রাজিল, চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কিছু ক্ষেত্রে ভারতের মতো অগ্রসর অর্থনীতির বিশ্বের ৩০টিরও বেশি দেশে এ ধরনের উদ্যোগের সঙ্গে সংযুক্ত (European Commission ২০০৩; এবং Gawlick ২০০৮)। যদিও বাজেটে পিপিপি উপাদান বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন পদক্ষেপ, তবে পিপিপির মাধ্যমে অবকাঠামো প্রকল্প, বিশেষত কয়েকটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প (যেমন, বিবিয়ানায় ৩৩০৪৫০ মেগাওয়াটের পাওয়ার প্ল্যান্ট) ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

বরাদ্দ

বেশিরভাগ দেশ এ ধরনের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবহন এবং পরিবহন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোর দিকে মনোযোগ দিয়েছে। বাংলাদেশেও এখন পর্যন্ত যে কয়েকটি বড় প্রকল্প নতুন পিপিপি উদ্যোগের আওতায় আনা হয়েছে তার সবগুলোই পরিবহন ও বিদ্যুৎ খাতের সঙ্গে সর্ম্পকিত। ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেটে পিপিপির জন্য ২,৫০০ কোটি টাকা (বাজেটের ২.২ শতাংশ) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে কারিগরি সহায়তার জন্য ১০০ কোটি টাকা, ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিংএর জন্য ভর্তুকি হিসেবে ৩০০ কোটি টাকা এবং বাকি বরাদ্দকৃত অর্থ অবকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল বাবদ রাখা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অবস্থানপত্রে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশে "অবকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল" সৃষ্টি করা হবে। প্রাথমিক হিসাব মতে, ২০০৯১০ অর্থবছরে ৬ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার প্রেক্ষিতে ৭৩,৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ ঘাটতি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে এবং পিপিপির মাধ্যমে এই ব্যবধান পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

প্রতিষ্ঠান

প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো – উভয় দিক থেকে একটি আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব কাঠামো গঠন করাই হবে চলতি অর্থবছরের প্রধান চ্যালেঞ্জ। প্রাপ্য অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, বাস্তবায়নকারী

মন্ত্রণালয়গুলোই পিপিপির উদ্যোগ নিয়ে থাকে। তবে পিপিপি সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতার জন্য বেশ কিছু দেশ নিবেদিত 'কেন্দ্র' অথবা 'বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনকি এশিয়া অঞ্চলেও কিছু পিপিপি কেন্দ্রের অস্তিত্ব রয়েছে; যেমন: ফিলিপাইনে বিওটি (BOT) কেন্দ্র, কোরিয়াতে বেসরকারি অবকাঠামো বিনিয়োগ কেন্দ্র (PICKO) (European Commission ২০০৩)| সরকার অর্থ বিভাগের আওতায় একটি পিপিপি সেল গঠনের চিন্তা করছে এবং পিপিপি বাজেট ব্যবস্থাপনা আগামী সেপ্টেম্বর নাগাদ পুরোপুরি কার্যকর হবে বলে আশা করছে। অর্থ মন্ত্রণালয় সম্প্রতি একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি কোর গ্রুপ (core group) গঠন করেছে। এর কাজ হবে ঋণ অথবা সমমূলধনী তহবিল, ভিজিএফ এবং কারিগরি সহায়তার জন্য তিনটি আলাদা নীতিমালা তৈরি করা, এবং ২০০৯ সালের ৩০ আগস্টের মধ্যে এর খসড়া দাখিল করা। কার্যপ্রণালী অনুযায়ী এই কোর গ্রুপ উলেখিত তিনটি তহবিল থেকে বরাদ্দ পাওয়ার উপযুক্ততার নিয়মনীতি তৈরি, পিপিপি বরাদ্দের জন্য অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণ, সম্পদ ছাড়ের শর্ত প্রণয়ন, বরাদ্দ ছাড়ের পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ এবং সরকারি বরাদ্দের জন্য উচ্চ পর্যায়ের সুপারিশ করবে। এছাড়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলেটেশন সেন্টারকে (আইআইএফসি) পরবর্তী প্রকল্প চিহ্নিতকরণ এবং রোডম্যাপ তৈরি করতে একটি সমীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

আইনগত কাঠামো

পিপিপিকে দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর রাখতে একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা একটি পূর্বশর্ত। বেসরকারি খাতকে পিপিপি প্রকল্পে অর্থায়ন, নির্মাণ, পরিচালনা ও টোল আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সুবিধা দিতে যথাযথ আইন প্রণয়ন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ কোরিয়া অবকাঠামো খাতে বেসরকারি অংশীদারিত্ব (২০০২) শীর্ষক আইন তৈরি করে আইনি সহায়তা দিয়েছে; ফিলিপাইনে ১৯৯৩ সালে বিওটি (BOT) আইন কার্যকর করা হয়। আয়ারল্যান্ড রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনার অ্যারেঞ্জমেন্টস) মাধ্যমে আইনগত সুবিধা দিয়েছে। পিপিপি উদ্যোগে যথাযথ আইনি কাঠামোর অভাবে অনেক দেশে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যায়নি। যেমন: চীন ও তুরস্ক এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছে এবং এসব সমস্যা থেকে উত্তরণে তাদের সরকার উদ্যোগ নিয়েছে (European Commission ২০০৩; এবং Gawlick ২০০৮)। পিপিপি পরিচালনায় আইনি কাঠামো চূড়ান্ত করতে অর্থ বিভাগের সচিবকে প্রধান করে একটি সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে সরকার জাতীয় সংসদের মাধ্যমে একটি "পিপিপি আইন" প্রণয়ন করতে পারে। তবে আইন প্রণয়নের আগে এ বিষয়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সংশিষ্ট সকলের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। আইনি কাঠামোটি অবশ্যই স্বচ্ছ হতে হবে এবং অর্থায়ন, নির্মাণ, পরিচালনা ও পিপিপি প্রকল্প থেকে রাজস্ব অথবা সেবা পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে বেসরকারি খাতকে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা দিতে হবে। ভবিষ্যত বিরোধ ও ঝামেলা এড়াতে ক্রয়নীতি, জমি অধিগ্রহণ, ঝুঁকি ও মুনাফা ভাগাভাগি, সেবার মূল্য নির্ধারণ এবং সেবার হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়গুলো আইনের মধ্যে (বিস্তারিতভাবে) আসতে হবে। আশা করা যায় যে, প্রস্তাবিত আইনি কাঠামোতে তদারকি ও সম্ভাব্য বিরোধ নিষ্পত্তির কৌশলগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

আলোচনার জন্য ইস্যুসমূহ

উলেখিত বিস্তারিত ইস্যুসমূহের পাশাপাশি পিপিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। যেমন:

১. পিপিপির আওতায় চলমান প্রকল্পগুলো নতুন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে সমন্বিত হতে হবে। বর্তমানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল), ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন

অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ) এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলেটেশন সেন্টার (আইআইএফসি)এর আওতায় ৬৪টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা নতুন পিপিপি কাঠামোর আওতায় আনতে হবে।

২. পিপিপির আওতাধীন প্রক্ষেপিত বিনিয়োগ বরাদ্দকৃত এডিপির দ্বিগুণেরও বেশি, এবং মধ্যমেয়াদে পিপিপির সফল বাস্তবায়ন হলে এ দুইয়ের পার্থক্য আরও বাড়তে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে এডিপি বাস্তবায়নে ধীরগতির বিবেচনায় এটি জ্বালানি, অবকাঠামো এবং সামাজিক সেবার উপাদান হিসেবে এডিপির ওপর চাপ কমাতে বিকল্প কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হবে কিনা তা গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করা দরকার।

৩. নতুন পিপিপি উদ্যোগগুলোর প্রত্যাশিত মডেলগুলো কেমন হবে? প্রকল্পের ধরনের ভিত্তিতে পিপিপি বিভিন্ন রকমের মডেল, যেমন - নির্মাণঅধিগ্রহণপরিচালনা (বিওও), নির্মাণপরিচালনাহস্তান্তর (বিওটি) এবং নির্মাণঅধিগ্রহণপরিচালনাহস্তান্তর (বিওওটি) মডেল ব্যবহার করতে পারে। পিপিপি উদ্যোগের সফলতার একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য কীভাবে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর পরামর্শ দেওয়া হবে এবং তার জন্য নীতিমালা কী হবে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নটি অতি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত প্রস্তাবিত মনোরেল (monorail), এলিভেটেড এক্সপ্রেস হাইওয়ের মতো বড় প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে। এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে। জমির মূল্য নির্ধারণের নীতিমালা কী হতে পারে? সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬ এবং সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ পিপিপি প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা, এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর অতি গুরুত্বপূর্ণ।

৫. পিপিপি উদ্যোগগুলোর জন্য কর প্রণোদনা কী হওয়া উচিত? পিপিপি প্রকল্পগুলোর জন্য রাজস্ব প্রণোদনায় কি ভিন্নতা থাকা উচিত হবে? পিপিপির অবস্থানপত্র (MoF ২০০৯c) তিনটি কর প্রণোদনার প্রস্তাব করেছে: প্রথমত, বিনিয়োগকৃত অর্থের ওপর সর্বনিম্ন কর হার আরোপ করে কর ছাড় দেওয়া; দ্বিতীয়ত, পিপিপি প্রকল্পগুলোর জন্য মূলধনী পণ্যে সর্বনিম্ন হারে আমদানি শুল্ক আরোপ; এবং তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা থেকে আগত মুনাফার ওপর সর্বনিম্ন হারে কর আরোপ। এটি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, এসব প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রণোদনা অন্যান্য বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই), এবং রপ্তানিমুখী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেওয়া প্রণোদনার সঙ্গে মিল থাকবে এবং স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করবে না।

৬. পিপিপির জন্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এক অন্যতম বড় বিষয় হতে পরে। পিপিপি প্রকল্পগুলোতে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ফর্মুলা কী হবে? পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের জন্য লাভজনক বা win-win ফলাফলের জন্য স্বচ্ছতা এবং কারিগরি দক্ষতা মূল বিষয় হবে।

৭. পিপিপি বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের জন্য বড় প্রণোদনা হিসেবে কাজ করবে? বেশ কিছু প্রণোদনার সুযোগ থাকলেও প্রতিবেশি দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে এরূপ বিনিয়োগ প্রবাহ সম্ভাবনাময় হতে পারেনি। অন্যান্য পিপিপি অথবা বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রস্তাবের বিপরীতে তা সম্পৃক্ত পিপিপি প্রকল্পে অতিরিক্ত প্রণোদনা দেওয়া হবে কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে।

৮. পিপিপি প্রকল্পের অর্থায়ন হবে দ্বিপাক্ষিক দর কষাকষির কেন্দ্রবিন্দু। পিপিপি প্রকল্পগুলোতে কি দাতাদের অর্থায়ন থাকতে পারবে? দাতাদের অর্থায়ন কি সরকারের ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে অথবা

এটা কি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির আওতায় হবে? পিপিপির জন্য পুঁজিবাজার অথবা বৈদেশিক বাণিজ্যিক ঋণ নেওয়া যাবে? পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তি কি বাধ্যতামূলক হবে?

৯. স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাসহ সামাজিক খাতে কি পিপিপির অনুমতি দেওয়া হবে? এসব প্রকল্পে ব্যবহারকারীদের প্রবেশজনিত ব্যয় (access cost) কীভাবে নির্ধারিত হবে? এখানে বেসরকারি মুনাফার জন্য সরকারি অর্থায়ন ব্যবহৃত হবে কি?

এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরের ওপর সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগগুলোর সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করবে।

ডকুমেন্টেশন

প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং প্রকল্প কার্যক্রমে প্রক্রিয়াগত নীতিমালার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলপত্র তৈরি করার দরকার হবে। যেহেতু প্রত্যকটি প্রকল্পের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেহেতু এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ সম্ভব নয় এবং সকল পিপিপির ক্ষেত্রে তা প্রয়োগযোগ্যও নয়। এ জন্য ন্যূনতম তথ্যের পরিমাণ ও ধরন নির্ধারণ করা দরকার যা প্রত্যেকটি পিপিপি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি প্রমিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন 'পিপিপি কন্ট্রাক্ট ম্যাট্রিক্স' (PPP contract matrix) তৈরি করা যেতে পারে। এটি প্রকল্প প্রণয়নের সময় ও খরচ কমাবে। এছাড়াও অন্যান্য মানসম্পন্ন দলিলাদি তৈরির সম্ভাবনাও পরীক্ষা করা যেতে পারে। ক্রয়সংক্রান্ত একটি প্রমিত দলিল তৈরি করলে তা পরিলক্ষিত দুর্বলতা এবং সকল শক্তিশালী দিকসমূহ সহ একটি সূত্র হিসেবে কাজ করতে পারে।

অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে যেখানে পিপিপি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, সেখানে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব ধীরগতির নীতি বাস্তবায়ন সমস্যার উত্তরণ ঘটাতে পারে। যদি সরকার তার প্রশাসনিক দক্ষতা এবং আলোচনা/ দরকষাকষি সক্ষমতার উন্নতি না করতে পারে তাহলে পিপিপি প্রত্যয় সফল নাও হতে পারে।

পিপিপি কর্মসূচি তৈরির ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে এ থেকে কী অর্জিত হবে তা সরকারকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। সরকারের পিপিপি পরিকল্পনা নিম্নলিখিত লক্ষ্যকাঠামোর আওতায় প্রণীত হওয়া উচিত:

ক. সেবা/অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব বেসরকারি খাতে স্থানান্তরের মাধ্যমে সরকারের ব্যয় ও ঝুঁকি কমানো;

খ. সেবা/অবকাঠামো সুবিধা পৌঁছানোর গুণগতমান তদারকি করা;

গ. বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করতে পিপিপি অবশ্যই আর্থিক মুনাফার ওপর গুরুত্ব দেবে; এবং

ঘ. এটা নিশ্চিত করতে হবে যেকোন পিপিপি প্রকল্পই জনস্বার্থের জন্য করা এবং এতে যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে।

এছাড়া সরকারকে পরবর্তীতে উদ্ভূত পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ পিপিপির সাফল্য সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকায় পরিবর্তন আনবে। তবে এর ফলে নাগরিকেরা যেহেতু অধিকতর ভালো সেবা পাবে সেহেতু চূড়ান্ত পর্যালোচনায় রাজনৈতিক লাভ সরকারের দিকেই যাবে।

৪.৮ বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন

২০০৯১০ অর্থ´বছরে জিডিপির অংশ হিসেবে বাজেট ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা ৫ শতাংশ (৩৪,৩৫৮ কোটি টাকা) দেখানো হয়েছে। জিডিপির অংশ হিসেবে ২০০৯১০ অর্থ´বছরে প্রক্ষেপিত ঘাটতি ২০০৮০৯ অর্থবছরের প্রক্ষেপিত ঘাটতির মতো একই রকম হলেও প্রকৃত অর্থে এই ঘাটতি গত অর্থবছরের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় ৩৭.৭ শতাংশ এবং মূল প্রাক্কলিত পরিমাণের তুলনায় ১২.৪ শতাংশ বেশি। তবে অর্থবছর শেষে এডিপি বাস্তবায়নের নিম্ন হার বাজেট ঘাটতিজিডিপি অনুপাত ৪ শতাং শে নামিয়ে আনতে পারে যা ২০০৮০৯ অর্থ´বছরের সংশোধিত প্রাক্কলনের (৪.১ শতাংশ) কাছাকাছি হতে পারে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় দেখা গেছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর বাজেট ঘাটতির একটি ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে (Al-Khedair ১৯৯৬)। কর্মসংস্থানৰা ম্বব প্রবৃদ্ধির সহায়তা নিতে সম্ভবত একটি পরিমিত উচ্চ ঘাটতি নেওয়াই উত্তম এবং তা প্রত্যাশিত ফলাফল বয়ে আনতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অনেক অর্থনীতিবিদ বাজেট ঘাটতিকে বড় ধরনের উদ্বেগের কারণ মনে করেন না; বরং জাতীয় বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে উদ্বেগের কারণ রয়েছে বলে মনে করেন (যা বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য) (Baldacci *et al.* ২০০৪)। ঘাটতিজ্জিডিপি অনুপাত ২০০৯১০ অর্থ´বছরে যদিও খুব বেশি উদ্বেগের কারণ হবে না, তবুও ঘাটতি অর্থায়নের কৌশল সতর্কভাবে নির্ধারণ করা উচিত।

সারণি ৪.১২ অনুযায়ী ১৯৯১৯২ অর্থ´বছর থেকে ২০০৭০৮ অর্থ´বছরের মধ্যে বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস থেকে স্থানীয় উৎসের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১৯৯১৯২ থেকে ১৯৯৫৯৬ সময়কালে বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে নিট বৈদেশিক উৎসের অবদান ছিল গড়ে ৭৩ শতাংশ, যেখানে ২০০৭০৮ অর্থ´বছরে এটি ২৯ শতাংশে নেমে আসে। তবে গত অর্থবছরে বৈদেশিক অর্থায়নের অংশ বেড়েছে এবং ২০০৯১০ অর্থ´বছরে তা ৪০ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সারণি ৪.১২: বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের প্রবণতা: অর্থবছর ১৯৯১-৯২ থেকে অর্থবছর ২০০৯-১০

(শতাংশ)

উৎস	অর্থবছর ৯২-অর্থবছর ৯৬	অর্থবছর ৯৭-অর্থবছর ০১	অর্থবছর ০২-অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ২০০৭	অর্থবছর ২০০৮	অর্থবছর ২০০৯ সংশোধিত বাজেট	অর্থবছর ২০১০ বাজেট
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন	**২.৭**	**৫৩.৩**	**৫২.৬**	**২৭.৯**	**২৯.২**	**৪৩.১**	**৪০.২**
অনুদান	৪২.৬	৩০.৮	২০.১	১১.১	৭.৫	১৯.৭	১৪.৯
ঋণ	৪৪.৭	৩৯.৬	৫৩.১	৪৫.২	৩৮.০	৪০.৯	৩৮.৫
ঋণ পরিশোধ	১৪.৭	১৭.২	২০.৭	২৮.৫	১৬.৪	১৭.৬	১৩.২
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	**২৭.৩**	**৪৬.৭**	**৪৭.৪**	**৭২.১**	**৭০.৮**	**৫৬.৯**	**৫৯.৮**
ব্যাংক	১০.৯	২১.৯	১৭.৮	৪১.৪	৬১.৩	৪২.৯	৪৮.৮
ব্যাংকবহির্ভূত	১৬.৪	২৪.৯	২৯.৭	৩০.২	৯.৪	১৪.০	১১.১

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়।[২১]

বিগত কয়েক বছরে বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ উৎসের উপাদানগুলোর মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ২০০৩০৪ অর্থ´বছরে মোট অর্থায়নে ব্যাংকবহির্ভূত অর্থায়নের হার ছিল ৩০.৫ শতাংশ যা ২০০৭০৮ অর্থ´বছরে ৯.৪ শতাংশে নেমে আসে। অন্যদিকে এ সময়কালে ব্যাংক খাত থেকে অর্থায়ন ১৭.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৬১.৩ শতাংশ (চিত্র ৪.১০)। ২০০৯১০ অর্থ´বছরে প্রক্ষেপিত ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ঋণের অংশ ৪৮.৮ শতাংশ।

[২১] http://www.mof.gov.bd/en/

চিত্র ৪.১০: ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ উৎসের অংশ

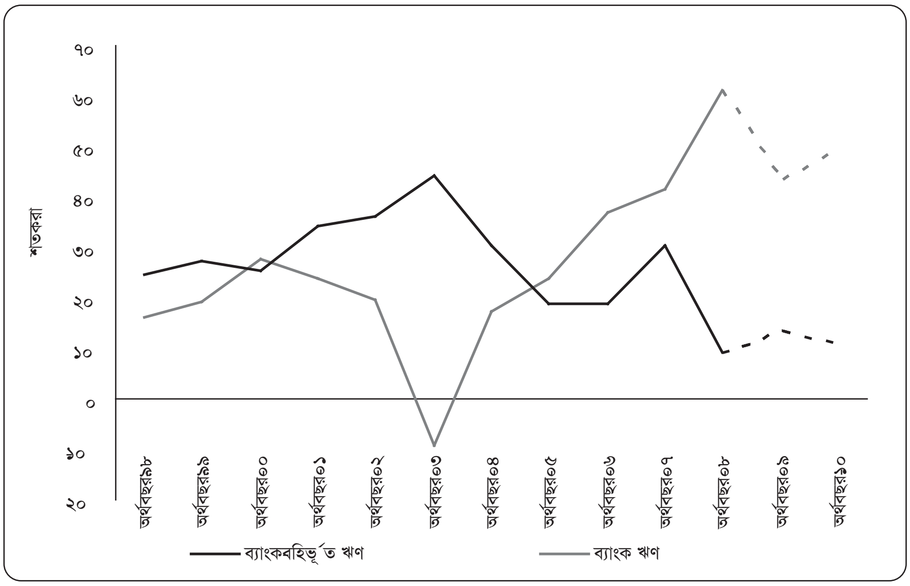

উৎস: MoF (২০০৯a)।

দ্রষ্টব্য: ২০০৮০৯ অর্থবছরের ক্ষেত্রে সংশোধিত বাজেটের চিত্র; ২০০৯১০ অর্থবছরের ক্ষেত্রে বাজেটের চিত্র।

ব্যাংকিং খাত থেকে অধিক হারে ঋণ গ্রহণ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রাপ্তিতে চাপ ফেলতে পারে। তবে ব্যাংকিং খাতে উচ্চ অতিরিক্ত তারল্যের উপস্থিতি (প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকা) এই চাপ সহনীয় পর্যায়ে রাখবে। অন্যদিকে মনে রাখতে হবে যে, বৈশ্বিক আর্থিক সংকট থেকে উত্তরণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ২০০৯১০ অর্থবছরে, বিশেষত দ্বিতীয়ার্ধে, বিনিয়োগ চাহিদা বাড়তে পারে, যা বেসরকারি খাতের ঋণ চাহিদাকে বৃদ্ধি করতে পারে। আবার, ব্যাংকবহির্ভূত ঋণের তুলনায় ব্যাংক ঋণের সুদ হার কিছুটা কম হলেও এটি মূল্যস্ফীতিকে প্রভাবিত করে যা মূল্য স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

২০০৯১০ অর্থবছরের জন্য (বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের প্রেক্ষিতে) মোট প্রক্ষেপিত বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে (২.৬ বিলিয়ন ডলারের) উচ্চ বৈদেশিক অর্থায়ন প্রবাহ নিশ্চিত করা একটি বড় উদ্বেগের কারণ হতে পারে। যদি এই অর্থায়ন সম্ভব হয় তাহলে তা হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সাহায্য প্রবাহ। নীট ভিত্তিতে ২০০৯১০ অর্থবছরে প্রক্ষেপিত বৈদেশিক অর্থায়নের পরিমাণ ২ বিলিয়ন ডলার (১৩,৮০৩ কোটি টাকা) যা ২০০৮০৯ অর্থবছরের সংশোধিত প্রক্ষেপণের তুলনায় ২৮.৩ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য যে, এই উচ্চ বৈদেশিক অর্থায়নের প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে। যেখানে ২০০৮০৯ অর্থবছরের সংশোধিত প্রক্ষেপণের তুলনায় অনুদানের পরিমাণ বাড়বে মাত্র ৪ শতাংশ; সেখানে ঋণ বাড়বে ২৯ শতাংশ। এত বড় অঙ্কের বৈদেশিক ঋণ পাওয়া সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে এবং এ বাজেট সহায়তার আওতায় ঋণ প্রাপ্তির জন্য তৎপরতা বাড়ানোর দরকার হবে। যদি বৈদেশিক অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হয় তাহলে স্থানীয় উৎসের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হবে এবং এর পরিণতিতে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রাপ্যতার ওপরও চাপ সৃষ্টি হবে।

৪.৯ সমাপনী পর্যবেক্ষণ

এই পর্যালোচনায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাজেট বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রাগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাই, ঐতিহাসিক গতিধারা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান

এবং উদ্ভূত বাহ্যিক বিষয়গুলোর আলোকে ২০০৯১০ অর্থ বছরের জন্য বাজেট ফলাফলের সম্ভাব্য দৃশ্য খোঁজা হয়েছে। এ ধরনের তিনটি দৃশ্যকল্প সারণি ৪.১৩-তে উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি ৪.১৩: ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট ফলাফলের রূপরেখা

নির্দেশক	অর্থবছর ২০০৯১০ বা জেট	উচ্চ পর্যায়ের পরিস্থিতি	গতানুগতিক পরিস্থিতি	নিম্ন পর্যায়ের পরিস্থিতি
রাজস্ব আয় (প্রবৃদ্ধির %)	**১৫.৭**	**১৬.৮**	**১৩.৫**	**১০.১**
এনবিআর কর	১৬.১	১৬.০	১৩.২	১০.৩
এনবিআরবহির্ভূত কর	১৭.০	১৭.৭	১৫.২	১০.৯
করবহির্ভূত	১৩.৬	১৯.৭	১৪.৪	৯.২
এডিপি (জিডিপির %)	**৪.৪**	**৩.৫**	**৩.২**	**৩.০**
ঘাটতি (জিডিপর %)	**৫.০**	**৪.৭**	**৪.৩**	**৪.১**
ঘাটতি অর্থায়ন (জিডিপির %)				
বৈদেশিক	২.০	২.০	১.৭	১.২
অভ্যন্তরীণ	৩.০	২.৭	২.৬	২.৯

উৎস: সিপিডির প্রাক্কলন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়।[২২]

উচ্চ পর্যায়ের পরিস্থিতির রূপরেখার আওতায় ২০০৯১০ অর্থ বছরে সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হতে পারে। কিছু রাজস্ব আহরণের খাতের (যেমন: এনবিআরবহির্ভূত কর ও করবহির্ভূত রাজস্ব) ক্ষেত্রে রক্ষণশীল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব উপাদান থেকে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার বেশি হতে পারে। বৈদেশিক সম্পদ প্রাক্কলন অনুযায়ী পাওয়া যেতে পারে। যার ফলে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে কম ঋণ প্রয়োজন হবে। তবে বিদ্যমান সক্ষমতা সরকারি বিনিয়োগের সম্পূর্ণ বিতরণ নিশ্চিত করতে পারবে না। এই পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বাজেট ঘাটতি হবে প্রায় ৪.৭ শতাংশ যা লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি।

অন্যদিকে সরকারি অর্থায়নের গতানুগতিক পরিস্থিতির হলে সম্পদ প্রবাহে ঘাটতি দেখা দেবে (বিশেষত অভ্যন্তরীণ সম্পদ) যা সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি করবে। এক্ষেত্রে এডিপিজিডিপি অনুপাত ২০০৮০৯ অর্থ বছরের পর্যায়ে (৩.২ ভাগ) হতে পারে। এর ফলে রাজস্ব ঘাটতি প্রক্ষেপণের চেয়েও কম হতে পারে।

যদি অর্থনীতির অবস্থা আরও খারাপ হয় তাহলে তা নিম্ন পর্যায় পরিস্থিতির রূপরেখার সৃষ্টি হবে। যদি বাহ্যিক বিষয়গুলোর নেতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি পড়ে এবং বিদ্যমান স্থবির বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি না হয় তাহলে ওই পরিস্থিতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে সম্পদ সংগ্রহ এবং সরকারি বিনিয়োগ -দু টোই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এনবিআর কর কম আদায়ই হবে সম্পদ ঘাটতির মূল কারণ। এডিপি বাস্তবায়ন প্রকল্প সাহায্য প্রাপ্তি কমে যাওয়ার ফলে ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে যেতে পারে (জিডিপির ৩ শতাংশ)। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বাজেট ঘাটতি আরও কমবে এবং স্থানীয় উৎস থেকে অর্থায়নের পরিমাণ কিছুটা বাড়বে।

আমাদের উচিত উচ্চ পর্যায় পরিস্থিতির রূপরেখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। গতানুগতিক পরিস্থিতি হবে সর্বনিম্ন প্রত্যাশার ফলাফল, বিশেষত এক্ষেত্রে ৫.৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হবে। অন্যদিকে নিম্ন পর্যায় পরিস্থিতি রূপরেখা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে।

---

[২২] http://www.mof.gov.bd/en/budget/09_10/speech/bs_09_10_en.pdf

সাফল্যের ক্ষেত্রে মূল শর্ত হবে একটি কার্যকর এবং সক্ষম উন্নয়ন প্রশাসন যা কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক গোপন স্বার্থ বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হবে না। যদি অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় দক্ষ নেতৃত্ব দেয়, তাহলে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলো প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং তদারকিতে পর্যাপ্ত দক্ষতা দেখাতে পারবে। একই সঙ্গে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলোকে অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়া উচিত হবে না। স্থানীয় সরকারকে অবশ্যই বাজেট প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বাজেট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অংশীদারিত্ব দেওয়া উচিত।

বেসরকারি খাতকে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত রাখা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হবে। সেবা বিতরণ প্রক্রিয়ায় বেসরকারি সংস্থাসমূহের (এনজিও) অংশীদারিত্বকে কার্যকর জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার আওতায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকৃত সময়ের উপাত্ত সহ একটি অবগত পরিবীক্ষণ কৌশল সফল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য উপাদান। জাতীয় সংসদে অর্থনীতির অবস্থা সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উপস্থাপনের চর্চা এক্ষেত্রে ভালো ফল দিতে পারে।

পরিশেষে, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তব্যে উলেখিত সংস্কার কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ছাড়া বাজেটের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করা যাবে না। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বাজেটের বাস্তবায়ন দেশের উন্নয়নকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

সেপ্টেম্বর ২০০৯

গ্রন্থপঞ্জী

Al-Khedair, S.I. 1996. The Impact of the Budget Deficit on Key Macroeconomic Variables in the Major Industrial Countries. PhD diss., Florida Atlantic University.

Bahl, R.W. 1971. "A Regression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis." *IMF Staff Papers*, 18 (3): 570-612.

Baldacci, E., Clements, B., Gupta, S. and Cui, Q. 2004. *Social Spending, Human Capital and Growth in Developing Countries: Implications for Achieving the MDGs*. Working Paper No. WP/04/217. Washington, D.C.: International Monetary Fund (IMF).

Bangladesh Bank. 2009. *Monetary Policy Statement*. Dhaka: Bangladesh Bank.

Bangladesh Bank. http://www.bangladesh-bank.org/

Budget Speech by the Finance Minister. http://www.mof.gov.bd/en/budget/09_10/speech/bs_09_10_en.pdf

Chelliah, R.J. 1971. "Trends in Taxation in Developing Countries." *IMF Staff Papers*, 18 (2): 254-325.

Choudhury, S.R. 2009. *Improving ADP Implementation: Challenges and Way Forward*. A study recently initiated by CPD (mimeo).

CPD. 2007. *State of the Bangladesh Economy in FY2005-06 and Outlook for FY2006-07*. Dhaka: Centre for Policy Dialogue (CPD).

CPD. 2009a. *An Analysis of the National Budget for FY2009-10*. Dhaka: Centre for Policy Dialogue. http://cpd.org.bd/downloads/CPD%20Budget%20Response%20 FY10.pdf

CPD. 2009b. *Bangladesh Economy in FY2008-09: An Interim Review of Macroeconomic Performance*. Dhaka: Centre for Policy Dialogue (CPD).

CPD. 2009c. *A Set of Proposals for the National Budget FY2009-10*. Dhaka: Centre for Policy Dialogue. http://cpd.org.bd/downloads/Proposals%20for%20the%20 National%20Budget% 20FY2009-10.pdf

European Commission. 2003. *Guidelines for Successful Public-Private Partnerships*. Brussels: Director General, Regional Policy, European Commission.

Gawlick, S. 2004. *Public Private Partnership A Financier's Perspective*. Bangkok: Transportation and Tourism Division, United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP).

http://krugman.blogs.nytimes.com/

IMED. 2000. *Progress Report on Implementation of Annual Development Programme 1999-00*. Dhaka: Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED), Ministry of Planning, Government of Bangladesh (GoB).

IMED. 2005. *Progress Report on Implementation of Annual Development Programme 2004-05*. Dhaka: Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED), Ministry of Planning, Government of Bangladesh (GoB).

IMED. 2009. *Progress Report on Implementation of Annual Development Programme 2008-09*, Third Quarter (July-March). Dhaka: Implementation Monitoring and Evaluation Division(IMED), Ministry of Planning, Government of Bangladesh (GoB).

Majumder, M.A. 2007. *Does Public Borrowing Crowd-out Private Investment? The Bangladesh Evidence*. Working Paper Series No. WP 0708. Dhaka: Policy Analysis Unit (PAU), Bangladesh Bank.

MoF. 2009a. *Bangladesh Economic Review 2009*. Dhaka: Ministry of Finance (MoF), Government of Bangladesh (GoB).

MoF. 2009b. *Medium-Term Budgetary Framework (MTBF) 2009-10 to 2011-12*. Dhaka: Ministry of Finance (MoF), Government of Bangladesh (GoB).

MoF. 2009c. *Invigorating Investment Initiative through Public Private Partnership: A Position Paper*. Dhaka: Ministry of Planning, Government of Bangladesh (GoB).

MoF. http://www.mof.gov.bd/en/

NBR. 2009. *Annual Report 2008*. Dhaka: National Board of Revenue (NBR). http://www.nbr-bd.org/

NBR. http://www.nbr-bd.org/

Rasheed, F. 2006. "An Analysis of the Tax Buoyancy Rates in Pakistan." *Market Forces*, 2 (3).

Schwartz, B. and Schwenninger, S. 2008. "Public Investment Works." *Journal of Economic Theory*, 69-81.

The Daily Star. 2009. http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=92336. 13 June.

অধ্যায় ৫

মুদ্রানীতি সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবৃতি (জুলাই ২০০৯)

একটি বিশ্লেষণ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
তৌফিকুল ইসলাম খান

৫.১ ভূমিকা

মুদ্রানীতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মুদ্রা সরবরাহ, মুদ্রার প্রাপ্যতা, অর্থ্র বাবদ খরচ বা সুদের হার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। রাজস্ব নীতির মাধ্যমে 'চাহিদা ব্যবস্থাপনা' উৎসাহিত করার কেইনসের প্রচারিত তত্ত্বটি যেমন মহামন্দা পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি ১৯৭০ এর দশকে উচ্চ মূল্যস্ফীতির পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য জোর দেওয়া হয় মুদ্রানীতির ওপর। সনাতনী ধারার রাজস্ব নীতিতে কর্মসংস্থান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হতো সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ও করের পরিমাণ হ্রাস করে; অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস লক্ষ করা যেতো ব্যয় কমিয়ে ও কর বাড়িয়ে।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন বা বজায় রাখার প্রচেষ্টায় মুদ্রানীতির গুরুত্ব বেড়ে যাওয়া এবং রাজস্ব নীতির ভূমিকা কমে যাওয়ার তাৎপর্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার আলোকেই প্রতিফলিত হয়। মুদ্রানীতি এবং রাজস্ব নীতির প্রভাব বিস্তারের গতিতে পার্থক্য থাকে। মুদ্রানীতির ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল (যাতে প্রতি মাসেই হার পরিবর্তন করা যেতে পারে) এবং জরুরি প্রয়োজনে হার পরিবর্তনও করা যেতে পারে। অন্যদিকে রাজস্ব নীতিতে করারোপ করে তা বাস্তবায়ন করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এছাড়া রাজস্ব নীতিতে সরকারের ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত হয়ে যায়।

১৯৮০ র দশক থেকে অতি সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে 'সুবর্ণ প্রবৃদ্ধি' (Golden Growth) হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। এ সময়ে গৃহীত সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালায় মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বর্তমানে চলমান বিশ্বমন্দার পরিপ্রেক্ষিতে সামষ্টিক অর্থনীতির তত্ত্বসমূহ নিয়ে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালার ভূমিকা ও কার্যকারিতা নির্ধারণের বিষয়টিও উঠে এসেছে।[১]

একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল্যস্ফীতির হার স্থিতিশীল ও নিম্ন পর্যায়ে রাখা, সর্বোচ্চ সক্ষমতা সদ্ব্যবহার করে বেকারত্বের হার যথাসম্ভব নিম্নাবস্থায় রাখা, উচ্চ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রবণতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালানো, এবং কার্যকর বিনিময় হারের ব্যবস্থাপনা যাতে রপ্তানিকারক ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থই অক্ষুণ্ন থাকে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার

---

[১] চলমান অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সামষ্টিক অর্থনীতির তাত্ত্বিক 'সংকট' এর বিষয়ে দেখুন The Economist (২০০৯a এবং ২০০৯b)।

উদ্দেশ্যে কোন স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত একটি আদর্শ মুদ্রানীতিতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের স্বার্থ ও প্রত্যাশা পূরণের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক মুদ্রানীতি সংক্রান্ত বিবৃতি (এমপিএস) প্রকাশ করে ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বাভাস অনুসারে নিকট ভবিষ্যতে দেশের প্রকৃত খাত ও মুদ্রা ব্যবস্থার উন্নয়ন কেমন হতে পারে তা প্রাক্কলন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তুলে ধরার লক্ষ্যে সে সময় এ নীতি ঘোষণা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি ২০০৯ সালের ১৯ জুলাই ছয় মাসের জন্য (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৯-১০ অর্থবছর) অষ্টম ষান্মাসিক মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়।

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত সাম্প্রতিক মুদ্রানীতি সংক্রান্ত নীতিমালা সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির লক্ষ্যসমূহ এবং এগুলো অর্জনে সূচিত বিভিন্ন কৌশল। চতুর্থ অংশে আলোচিত হয়েছে বাংলাদেশে বিগত ও সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত মুদ্রানীতি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কৌশলসমূহ ও তাদের অবস্থা। মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনসমূহের গতি-প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে পঞ্চম অংশে। ষষ্ঠ অংশের প্রতিপাদ্য বিষয় মুদ্রানীতির উদ্দেশ্যসমূহ। ব্যাংক খাতের অতিরিক্ত তারল্য ও কৃষি খাতের ঋণ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে অধ্যায়ের সপ্তম অংশে। অষ্টম অংশে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলো বর্তমান মুদ্রানীতিতে বাদ পড়েছে বা স্থান পায়নি। সর্বশেষ অংশে চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি বিষয়ক কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫.২ মুদ্রানীতি বিকাশের প্রক্রিয়া: একটি পর্যালোচনা

৫.২.১ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মুদ্রানীতি

২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বেশ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। বিশেষত জ্বালানি তেল, খাদ্য ও সার সহ বিভিন্ন পণ্যের উচ্চমূল্যের কারণে অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির মারাত্মক চাপ বজায় ছিল। বিশ্ব বাজারে পণ্যমূল্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতিতে দেশে মূল্যস্ফীতির হার ৯ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করে। তবে ওই সময়ে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দুই অংকে উঠে আসে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৬.৫ শতাংশ অর্জনের প্রয়াসে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ বিতরণের কর্মসূচি হাতে নেয় (Bangladesh Bank ২০০৯b)। এজন্য উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতে ঋণ বাড়ানোর বিষয়ে একদিকে যেমন জোর দেওয়া হয়, তেমনি অন্যদিকে অপ্রয়োজনীয় ভোগ ব্যয় নিরুৎসাহিত করা হয়। পাশাপাশি মুদ্রা সরবরাহ কমাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষণা করে যে নগদ সঞ্চিত জমা (সিআরআর) মাসের কোন দিনই ৪.৫ শতাংশের কম হতে পারবে না (এর আগে যা ছিল ৪.০ শতাংশ), এবং এর হার এক পক্ষ কালে বা দুই সপ্তাহের গড়ে ৫.০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী কোন ব্যাংক নগদ জমার হার বজায় রাখতে ব্যর্থ হলে জরিমানা (বিদ্যমান নগদ জমা ও নির্দেশিত জমার ব্যবধানের ওপর ৫.০ শতাংশ হারে) করা হবে বলেও সতর্ক করে দেওয়া হয়। এছাড়া বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রেপো এবং নভেম্বর মাসে রিভার্স রেপোর সুদের হার ২৫ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়িয়ে যথাক্রমে ৮.৭৫ শতাংশ ও ৬.৭৫ শতাংশে নির্ধারণ করে।

২০০৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে দেশে মূল্যস্ফীতির হার কমতে শুরু করে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০০৮-০৯ অর্থবছরের দ্বিতীয় মুদ্রানীতি সংক্রান্ত বিবৃতিতে মূল্যস্ফীতির হার ৮.৫ শতাংশে প্রাক্কলন করে। অন্যদিকে বৈশ্বিক অর্থনীতির মন্দা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে দুর্বল করে দেওয়ার

প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক চলতি ২০০৯ সালের মার্চে রেপো ও রিভার্স রেপোর হার কমিয়ে আগের অবস্থায় নিয়ে আসে। এই সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি ব্যাংকগুলোর জন্য কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ বাধ্যতামূলক করে দেয়। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) ক্রেডিট কার্ড ও ভোক্তা ঋণ বাদে অন্যান্য ঋণ বিতরণে সুদের হার ১৩ শতাংশে নির্ধারণ করে। পাশাপাশি বহির্বিশ্বে চাহিদা কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে হিমায়িত খাদ্য, পাট, চামড়া এবং বস্ত্র – এই চারটি খাতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনোরকম এককালীন জমা ছাড়াই ঋণ পুনঃতফসিলীকরণের সুযোগ দেওয়া হয়।

এভাবে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রানীতিতে অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই, অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়। এ ধরনের সমন্বয় এবং অন্যান্য নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যথেষ্ট সুষমভাবে পরিচালিত হয়ে প্রায় ৬ শতাংশের কাছাকাছি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। একই সাথে মাথাপিছু আয়ের ৪.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটে। কৃষি খাতেও (বিশেষ করে শস্য উপখাতে) উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ করা গিয়েছে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতির অধিকাংশ সূচকে কাঠামোগত দুর্বলতা সত্ত্বেও সার্বিকভাবে তেজি প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ২০০৮-০৯ অর্থবছর শেষে মূল্যস্ফীতির হার ৮.৫ শতাংশের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কমে ৭.০ শতাংশ হয়েছে। বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের অবস্থাও ছিল বেশ স্বস্তিদায়ক, যা প্রবাসী আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি আয় অর্জনে স্থিতিশীলতা এবং আমদানি ব্যয় কমার সুবাদে সম্ভব হয়েছে। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ বেড়ে ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। বিশ্বে স্বল্প আয়ের যে কয়েকটি দেশ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ ধরনের সাফল্য রেকর্ড করেছে এবং অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছে সেগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি।

পূর্ববর্তী অর্থবছরের স্বস্তিদায়ক ও ইতিবাচক পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হলেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সাম্প্রতিক সময়ে আবার বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব এবং বিনিয়োগ চাহিদা কমে যাওয়ার আশংকা করা হচ্ছে। এতে চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রভাব পড়তে পারে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতিতে মূল্যস্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহ এর মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহের পাশাপাশি অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

৫.২.২ ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি

বাংলাদেশ ব্যাংক তার ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি সংক্রান্ত বিবৃতিতে লক্ষ্য হিসেবে যে বিষয়গুলো নির্ধারণ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে: জিডিপিতে ৫.৫ থেকে ৬.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন; মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশে সীমিত রাখা; এবং মুদ্রা আয়ের গতিময়তা (ইনকাম ভেলোসিটি অব মানি) ৩ শতাংশ কমানো। আলোচ্য মুদ্রানীতি পর্যালোচনায় কয়েকটি বিষয় উঠে আসে।

১. দেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্য রয়েছে যা সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের চাহিদা মেটাতে সক্ষম বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করে। এটি হচ্ছে ঘোষিত সংকুলানমূলক মুদ্রানীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বর্তমান ২০০৯-১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটেও এ ধরনের একটি সীমিত সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতির কথা বলা হয়েছে।

২. বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ ঋণের শর্তাবলী স্বাভাবিক রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত ২০০৮-০৯ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিক থেকে রিভার্স রেপো কার্যক্রম পরিচালন থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এবং চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথমার্ধেও তা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয়।

৩. বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাখার চেয়ে বরং প্রবৃদ্ধি প্রবণ বিনিয়োগ খাতেই বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের ওপরই অধিক জোর দিয়েছে।

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণভিত্তিক বিনিয়োগের চেয়ে মূলধনভিত্তিক বিনিয়োগে নির্ভর করার সংস্কৃতিকেই প্রতিপালনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। তবে এক্ষেত্রে কীভাবে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ করা হবে সেটিই এখন দেখার বিষয়।

৫. উন্নত দেশগুলোর বাজারে সাম্প্রতিকালে যে দুরবস্থার চিত্র দেখা গিয়েছে তা যেন এদেশেও সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সতর্ক রয়েছে। সে অনুযায়ীই কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংকিং খাত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অতিরিক্ত তারল্য পরিস্থিতি, মূলধন পর্যাপ্ততা ও ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয় পর্যবেক্ষণে রাখার ওপর জোর দিয়েছে, যাতে অভ্যন্তরীণ আর্থিক বাজারকে অস্থিতিশীলতা থেকে রক্ষা করা যায়। এ ধরনের অভিপ্রায়ের পেছনে অবশ্য সুনির্দিষ্ট কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। যাই হোক, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উল্লেখিত উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় সফল করতে ঋণ ও মূলধন বাজারের অবস্থা এবং মূলধন বাজারের সতর্ক উন্নয়নের বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন।

৬. বেসরকারি খাতের ঋণগ্রহীতা ও ব্যাংকগুলোর ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নিয়ে দেশে স্বাধীনভাবে ঋণের মান নির্ণয়ের (সোভরেইন ক্রেডিট রেটিং) পদক্ষেপ চূড়ান্ত করেছে। নিকট ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সরকারের কঠিন শর্তের (নন্ কনসেশনাল) বাণিজ্যিক ঋণ নেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্ভবত এমন একটি সুযোগ রাখতে চায় যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার অবকাশ থাকে।

৫.৩ সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

৫.৩.১ মূল্যস্ফীতি

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালায় মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রাকে না হলেও এর প্রত্যাশাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। দেশে ফসলের বাম্পার ফলন হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেল সহ বিভিন্ন পণ্যের দাম কমায় সাম্প্রতিককালে মূল্যস্ফীতির চাপ কমতে শুরু করেছে। ২০০৯ সালের মে মাসের দিকে গড় মূল্যস্ফীতি (১২ মাসের গড় হিসাবে) কমে ৭.৩ শতাংশে নেমে আসে (চিত্র ৫.১), যা অর্থবছর শেষে ৮.৫ শতাংশ হতে পারে বলে ইতিপূর্বে প্রাক্কলন করা হয়েছিল।

২০০৯ ১০ অর্থবছরে দেশে মূল্যস্ফীতির হার ৬.৫ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য এবং দেশে খাদ্যশস্যের ফলন পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ায় মূল্যস্ফীতির এই প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবসম্মত হয়েছে বলা যায়। বিশ্ব বাজারে ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে পণ্যমূল্য (চাল, জ্বালানি তেল, ইউরিয়া সার ও সয়াবিন তেল) কমছে (চিত্র ৫.২ ও ৫.৩)। এর প্রভাব দেশের বাজারেও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

উন্নত ও বিকাশমান অর্থনীতির দেশগুলোতে ইতিমধ্যে মন্দা কাটিয়ে পুনরুদ্ধারের লক্ষণ দেখা দেওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে পুনরায় পণ্যের দাম বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্ব বাজারে ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম বাড়তে শুরু করেছে (চিত্র ৫.৩)। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি ব্যারেল জ্বালানি তেলের দাম ৬০ থেকে ৬৫ ডলারে ওঠা নামা করছে। জ্বালানি তেলের দামের এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ২০০৯ সালের শেষার্ধে এবং ২০১০ সালের প্রথম ভাগেও বিরাজমান থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

চিত্র ৫.১: সাধারণ, খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির গতিপ্রকৃতি: জুলাই ২০০৬- মে ২০০৯

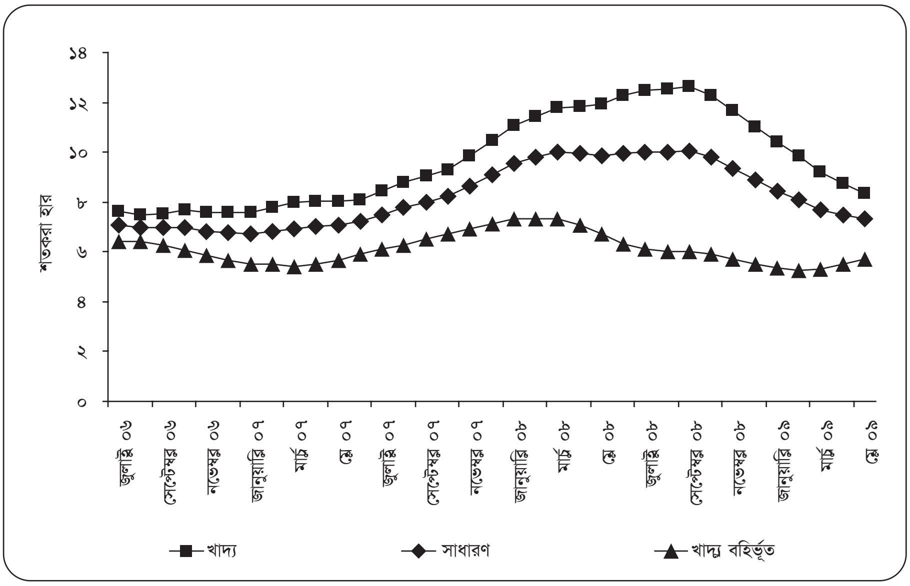

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চিত্র ৫.২: বিশ্ব বাজারে পণ্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি

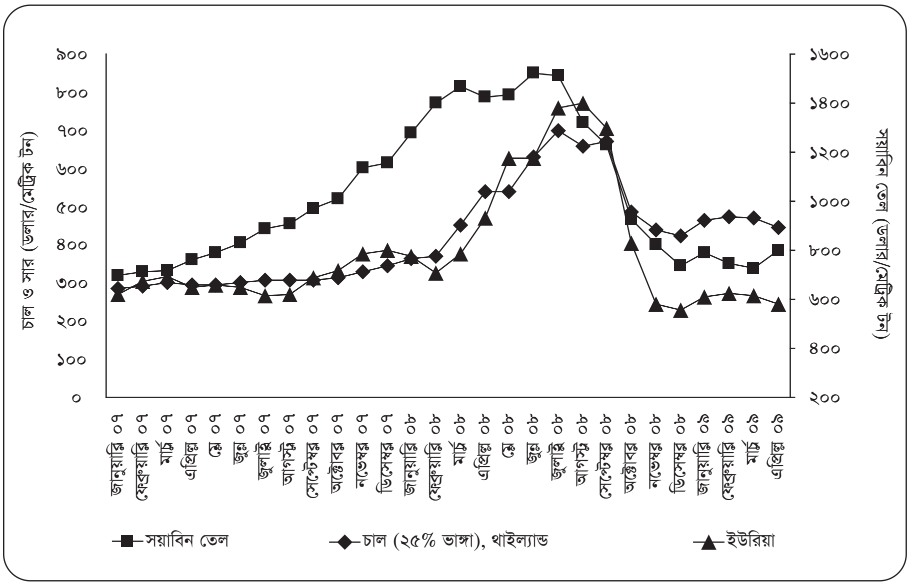

উৎস: বিশ্বব্যাংক, পিঙ্ক শীট।

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি ওঠা নামার প্রবণতা মূলতঃ খাদ্য মূল্যস্ফীতির আলোকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। চিত্র ৫.২ এ দেখা যায় যে প্রতি মেট্রিক টন চালের দাম (থাইল্যান্ড, ২৫ শতাংশ ভাঙ্গা) ৪৪০ মার্কিন ডলারে স্থিতিশীল হয়ে আছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বিবেচনা করলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাদ্যশস্য

চিত্র ৫.৩: আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি

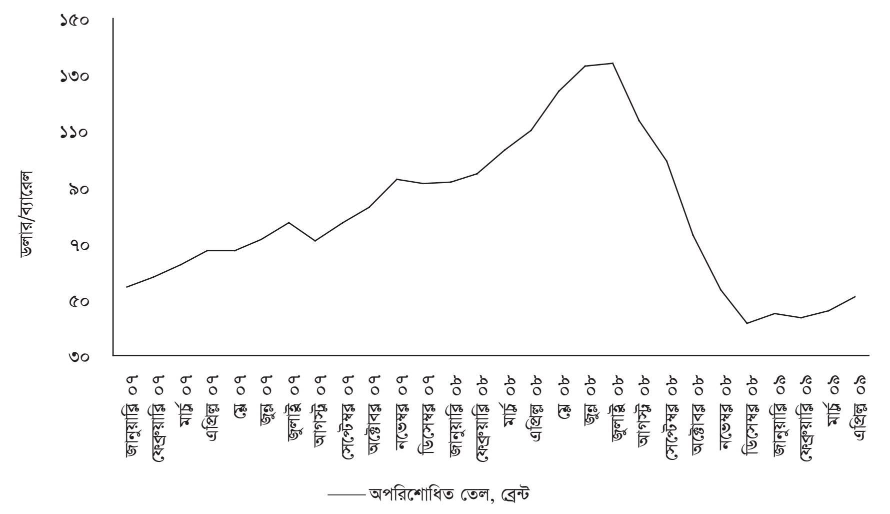

উৎস: বিশ্বব্যাংক, পিঙ্ক শীট।

উৎপাদন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আন্তর্জাতিক বাজারে ইউরিয়া সারের দাম স্থিতাবস্থায় থাকলেও সয়াবিন তেলের দামে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে (চিত্র ৫.২)।

৫.৩.২ সম্প্রসারণমূলক মুদ্রাব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাম্প্রতিক মুদ্রানীতিতে পণ্যমূল্য আবার বাড়তে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। মুদ্রানীতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করার আগ্রহ দেখানো হয়েছে যাতে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সাধারণত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয়। অনেকেই যুক্তি দেন এ দুইয়ের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে তেমন গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে না, তবে স্বল্পমেয়াদে অবশ্য এই সম্পর্কটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতির প্রবণতার ওপরও সতর্ক নজর রাখতে হবে, যেন আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি এবং/অথবা সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি (যা প্রধানত সরকারের ঋণ বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট) মূল্য স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করতে না পারে।

৫.৩.৩ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯ ১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ঘাটতি মেটাতে সরকারকে প্রয়োজনীয় সম্পদ তথা অর্থায়নের জোগান দেওয়ার দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ জিডিপির ৫ শতাংশের সমান। সুদের দায় পরিশোধের প্রশ্নে ব্যাংক খাত থেকে ঋণ নেওয়াটাই সরকারের জন্য সুবিধাজনক, কারণ এতে তুলনামূলক ব্যয় কম হয়। অসুবিধা হলো এতে মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়তে পারে। এছাড়া ব্যাংক খাত থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বেড়ে গেলে বেসরকারি খাতের জন্য ঋণপ্রাপ্তি দুরূহ হতে পারে। এটিও অর্থনীতির জন্য উদ্বেগের বিষয়। বর্তমানে ব্যাংক খাতে অতিরিক্ত

তারল্য থাকলেও তা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না। অন্যদিকে ব্যাংক্ক বহির্ভূত খাত থেকে সরকার ঋণ নিলে সেটি মূল্যস্ফীতি ত্বরান্বিত করে না। তবে তা ঋণের বিপরীতে উচ্চ হারে সুদ পরিশোধের দায় বাড়ায়, এবং এ ধরনের ঋণের জোগান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য সরকার চলতি অর্থবছরের বর্ধিত বাজেট ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা মেটাতে ব্যাংক খাত থেকেই ঋণ নেওয়ার বিষয়টি বেছে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতিতেও ব্যাংক খাত থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণজনিত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া এবং বেসরকারি খাতের ঋণ পাওয়া তেমন কোন উদ্বেগের বিষয় হবে না বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে Majumder (২০০৭) এবং অন্যান্যরা তাদের গবেষণায় বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্যের পরিস্থিতিতে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রাপ্তি দুরূহ হওয়ার যুক্তি প্রত্যাখান করেছেন।

বাজেটের ঘাটতি অর্থায়নের জন্য নীট ঋণের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা বাস্তবসম্মত। ২০০৮–০৯ অর্থবছরে আর্থিক ঘাটতি ও মুদ্রা বিস্তরণের (মনেটারি স্পেস) অনুপাত ছিল ৮৭ শতাংশ, যার অনুমিত প্রাক্কলন ছিল ৯৫.৬ শতাংশ। পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার ৪০ শতাংশ যদি বৈদেশিক সাহায্য থেকে না পাওয়া যায় এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেও প্রয়োজনীয় অর্থ আহরণ সম্ভব না হয়, তবে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানোর প্রতি নজর দেওয়া উচিত হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককেও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ চাহিদা পূরণে বিচারিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫.৩.৪ বৈদেশিক খাত

২০০৯–১০ অর্থবছরের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের প্রস্তুতকৃত মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে (এমটিএমএফ) সতর্কতার সাথে বৈদেশিক খাত সংশ্লি ষ্টলক্ষ্যমাত্রাসমূহের সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে। রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যদিও দুই অংকে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, গত অর্থবছরের (২০০৮–০৯) তুলনায় প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি ২৩.৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৯.৫ শতাংশে প্রাক্কলন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈশ্বিক অর্থনীতির মন্দার যে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে তা কাটিয়ে উঠতে উন্নত ও বিকাশমান দেশগুলোর তুলনায় দেরি হবে। এ বিবেচনায় ২০০৯–১০ অর্থবছরের বৈদেশিক খাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ সীমিত রাখা হয়েছে। একইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতিতেও বৈদেশিক খাতের নির্দেশকগুলোর প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন সীমিত রাখা হয়। যেমন– বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের লক্ষ্যমাত্রাও পরিকল্পনা কমিশন প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম নির্ধারণ করা হয়।

৫.৩.৫ প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিতে ২০০৯–১০ অর্থবছরের জন্য জিডিপির প্রবৃদ্ধি 'রক্ষণশীলভাবে প্রাক্কলন' করে ৫.৫ থেকে ৬.০ শতাংশের মধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে মুদ্রনীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছু ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি আরও বেশি হতে পারে। উল্লেখ্য যে, ২০০৯–১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ওপর দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগও (সিপিডি) বলেছিল, যেখানে অস্থিরতার মধ্যেও ২০০৮–০৯ অর্থবছরে প্রায় ৬ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে সেখানে ২০০৯–১০ অর্থবছরের জন্য ৫.৫ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ হচ্ছে 'অবশ্যই রক্ষণশীল।' সুতরাং জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা এরূপ পুনর্মূল্যায়ন করাটা প্রশংসনীয়।

যদিও সাম্প্রতিক মুদ্রানীতিতে চলমান অর্থবছরের জন্য খাতভিত্তিক জিডিপি প্রাক্কলন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই অর্থবছরের কৃষি খাতে ৪.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করেছে। ২০০৮–০৯ অর্থবছরে কৃষি উৎপাদনে ৪.৭ শতাংশের উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়ায় এ ধরনের একটি

লক্ষ্যমাত্রাকে চ্যালেঞ্জই বলা যায়। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিপূর্বে ঘোষিত কৃষিঋণ নীতিমালায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

এক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের বিবেচনায় একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। যেহেতু বাংলাদেশের জিডিপিতে জাতীয় আয়ে সেবা খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি সেহেতু সেবা খাতকে কম গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টি শিল্প খাতের উৎপাদন কার্যক্রমের ওপরও নির্ভর করে। শিল্প (বিশেষ করে শিল্পোৎপাদন (ম্যানুফ্যাকচারিং) উপখাতে) ও সেবা খাতে বর্তমানে বিনিয়োগ চাহিদা স্থবির বা মন্থর হয়ে আছে। এ ব্যাপারে মুদ্রানীতিতে মনোযোগ দেওয়া হয়নি।

৫.৪ মুদ্রানীতি সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহের অবস্থা

মিশ্র অর্থনীতির বাজার কাঠামোতে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে বেশ কয়েকটি কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন: নগদ সঞ্চিত জমা অথবা বিধিবদ্ধ জমা (স্ট্যাটিউটরি লিকুইডিটি রেশিও বা এসএলআর), ব্যাংক হার, নির্দেশিত ঋণ (ডিরেক্টেড ক্রেডিট), আরোপিত সুদের হার, রেপো, রিভার্স রেপো, খোলা বাজারে সরকারি সিকিউরিটিজের প্রত্যক্ষ লেনদেন ইত্যাদি। এছাড়াও মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল ব্যবহার করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিতে ব্যবহার করা প্রধান কৌশলসমূহ সারণি ৫.১ এ তুলে ধরা হল।

নব্বইয়ের দশকের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক খাতে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে নগদ সঞ্চিত জমা, বিধিবদ্ধ জমা এবং ব্যাংক হার পরিবর্তন করতো। নব্বই দশকের শুরুর দিকে প্রধানত সরকারি ট্রেজারি বিলের (ট্রি বিল) নিলামের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। ব্যাংক ব্যবস্থায় এখনকার অতিরিক্ত তারল্যের পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব কৌশলের যেকোন একটি ব্যবহার করতে পারে (সারণি ৫.১)। কেননা এতে সরকারের সামনে এই খাত থেকে বাড়তি ঋণ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। দক্ষতার সঙ্গে ব্যাংক খাতের তারল্য ব্যবস্থাপনা এবং মুদ্রা সরবরাহে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৩ সালে রেপো ও রিভার্স রেপো – এ দুটি কৌশলও চালু করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সচরাচর মুদ্রানীতির পরোক্ষ নির্দেশক হিসেবে স্বল্পমেয়াদি সুদের হার, রেপো ও রিভার্স রেপো হার ব্যবহার করে থাকে, যাতে ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্যের জোগান বাড়ানো কিংবা অতিরিক্ত তারল্য কাজে লাগানো যায়। সাবলীলভাবে মুদ্রাবাজার পরিচালনার লক্ষ্যে তারল্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং সঞ্চিত অর্থের (রিজার্ভ মানি) লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এ কাজ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে ঋণ তহবিলের জোগান হিসেবে প্রায়শই রেপো রেট ব্যবহার করে থাকে। মুদ্রানীতির কৌশলগুলোর মধ্যে ব্যাংক হার একটি সেকেলে ধরনের পদক্ষেপ, যার প্রয়োগ এখন আর নেই বললেই চলে।

সারণি ৫.১: মুদ্রানীতি সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহের অবস্থা

কৌশল	বর্তমান সুদ হার (%)	সর্বশেষ সুদ হারের পরিবর্তন	মন্তব্য
সিআরআর	৫.০	২০০৬ সালে ৪.৫ শতাংশ ছিল	বর্তমান অতিরিক্ত তারল্যের পরিস্থিতিতে এসব নির্দেশকের যেকোন একটি ব্যবহার করা যেতে পারে; তাছাড়া অতিরিক্ত তারল্য থাকার সুবাদে সহনীয় ও সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণের সুযোগ রয়েছে
এসএলআর	১৮.০	২০০৬ সালে ১৬.০ শতাংশ ছিল	
ব্যাংক হার	৫.০	২০০৪ সালে ৬.০ শতাংশ ছিল	
রেপো	৮.৫	২০০৯ সালের মার্চ মাসে ৮.৭৫ শতাংশ ছিল	নিয়মিত ব্যবহার করা হয়
রিভার্স রেপো	৬.৫	২০০৯ সালের মার্চ মাসে ৬.৭৫ শতাংশ ছিল	রিভার্স রেপো পরিচালনা বর্তমানে বন্ধ আছে

উৎস: লেখকগণ কর্তৃক সংকলিত।

৫.৫ মুদ্রানীতির সমন্বিত উপাদানসমূহের প্রবণতা: লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৮-০৯ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতি সংক্রান্ত বিবৃতিতে সার্বিক প্রক্ষেপণের ওপর জোর দিয়ে কতিপয় তদারকযোগ্য সূচক চালু করে। বস্তুতপক্ষে উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপজনিত কারণে দেশের জন্য ২০০৮-০৯ অর্থবছরটি ছিল ব্যতিক্রমী সময়; এ সময় ব্যাপক মুদ্রার (এম২) প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম অথবা বেশি যেকোনটাই অর্জিত হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রার ১৭.৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৭.২ শতাংশ অর্জিত হয় (সারণি ৫.২)। ২০০৯-১০ অর্থবছরের জন্য মুদ্রা সরবরাহে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫.৫ শতাংশ। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, বিগত পাঁচ বছরে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহে গড় বার্ষিক ১৭.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি লক্ষ করা গিয়েছে।

সারণি ৫.২: মুদ্রানীতির সূচকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

সূচক	অর্থবছর ২০০৮-০৯ (লক্ষ্যমাত্রা)	অর্থবছর ২০০৮-০৯ (প্রাক্কলিত)	অর্থবছর ২০০৯-১০ (লক্ষ্যমাত্রা)
ব্যাপক মুদ্রা	১৭.৫	১৭.২	১৫.৫
নীট বৈদেশিক সম্পদ	১৪.৩	২৩.৯	-৪.১
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৮.১	১৬.০	১৯.৩
অভ্যন্তরীণ ঋণ	২০.৪	১৭.১	১৮.৭
সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	২৭.৩	২৪.৫	২৫.৩
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১৮.৫	১৫.০	১৬.৭
মূল্যস্ফীতি (১২ মাসের গড়)	৮.৫	৭.০	৬.৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি সংক্রান্ত বিবৃতি, জুলাই ২০০৯ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সূত্র থেকে সংকলিত।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার পরিস্থিতিতে জিডিপিতে ৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের নিম্ন সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে অর্থনীতিতে অধিক অর্থায়নের ইঙ্গিত দিয়ে ব্যাপক মুদ্রা ও জিডিপির অনুপাত ০.৪৭ (অর্থবছর ২০০৮-০৯) থেকে বেড়ে ০.৪৯ এ উন্নীত হবে বলে আশা করা হয়েছিল। জিডিপিতে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা বিবেচনায় এ অনুপাত আরও কমার কথা বলা হয়, অর্থাৎ অর্থনীতিতে মনিটাইজেশন কম হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯-১০ অর্থবছরে মুদ্রার আয়জনিত গতিময়তা ৩ শতাংশ কমবে বলে লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করেছে। ফলে চলমান অর্থবছরে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কম হতে পারে। উল্লেখ্য যে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মুদ্রার আয়জনিত গতিময়তা প্রায় ৪ শতাংশ কমেছে।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে সার্বিকভাবে মুদ্রা সরবরাহ প্রায় লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছিই ছিল। তবে মুদ্রা সরবরাহের উপাদানগুলোর মধ্যে লক্ষণীয় ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার বিরূপ প্রভাবের আশংকায় নীট বৈদেশিক সম্পদের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়। তবে প্রবাসী আয়ে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়ায় নীট বৈদেশিক সম্পদের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত অর্থবছরে স্থানীয় আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজার থেকে প্রায় ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে, যাতে জাতীয় মুদ্রার মূল্যমান বৃদ্ধিটা বজায় থাকে। ২০০৯-১০ অর্থবছরেও নীট বৈদেশিক সম্পদ আহরণের যে লক্ষ্যমাত্রা প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, তাতে বলা যায়, বাংলাদেশ এবারেও বৈদেশিক খাতের বিষয়ে সতর্ক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। প্রধানত নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবাহ কমে যাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক নীট বৈদেশিক সম্পদ আহরণে রক্ষণশীল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে (-৪.১ শতাংশ)। বৈদেশিক খাত সম্পর্কিত অস্পষ্ট পূর্বাভাসের পরিস্থিতিতে এবং বিনিয়োগ ও ভোগ্য পণ্য আমদানিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবহারের পরিকল্পনা থাকায় এবারে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের নিম্ন প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ২০০৯-১০ অর্থবছরে নীট বৈদেশিক সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ কমে যাওয়ায় ২০০৮ ০৯ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে প্রাক্কলন করা হয়। এ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন কম হওয়ায় বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে কম পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন পড়েছে, ফলে সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ কমেছে। চলতি ২০০৯ ১০ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ১৮.৭ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি (১৭.১ শতাংশ)। চলতি অর্থবছরেও অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহে সরকারি খাতেরই প্রাধান্য থাকবে। এই খাতে নীট ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করা হয়েছে ২৯.৬ শতাংশ, যেখানে বেসরকারি খাতের জন্য ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করা হয় ১৬.৭ শতাংশে। বিগত পাঁচ বছরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ গড়ে বার্ষিক ১৮ শতাংশ করে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারি খাতে যদি সত্যিকার অর্থেই বিনিয়োগের চাহিদা বাড়ে তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক খাত ব্যাতীত সরকারি 'অন্যান্য' খাতে শূন্য প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করেছে, যা অপ্রত্যাশিত। সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে যদি নতুন উদ্যমে পরিচালনার উদ্যোগ নিতে চায় সেক্ষেত্রে এ ধরনের শূন্য প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ যুক্তিসঙ্গত নয়।

৫.৬ মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য(সমূহ)

মুদ্রানীতির জন্য মধ্যবর্তী উদ্দেশ্য থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যখন মূল্যস্ফীতি বা প্রবৃদ্ধির কিংবা দুটোরই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য অর্জন শ্লথ হয়ে পড়ে তখন এই মধ্যবর্তী উদ্দেশ্যই নীতি্ নির্ধারকদের সময়মতো পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনা দেয়। এটি নীতি্ নির্ধারণে অনিশ্চয়তা যেমন দূর করে, তেমনি স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করে থাকে (Crockett ২০০৪; Lindsey and Wallich ১৯৮৯)। এরই পটভূমিতে মুদ্রানীতির সবচেয়ে জনপ্রিয় তিনটি উদ্দেশ্য এখানে তুলে ধরা হলো:

ক) বিনিময় হারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;
খ) মুদ্রা ব্যবস্থার সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ; এবং
গ) মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।

বাংলাদেশের মুদ্রানীতি উল্লিখিত তিনটি লক্ষ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। বিনিময় হারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক ও ভোক্তাদের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রাখার বিষয়টি অব্যাহতভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মুদ্রানীতির সার্বিক লক্ষ্য হবে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রেখে প্রবৃদ্ধি অর্জনে জোর দেওয়া।

বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, মুদ্রানীতি গঠনে ব্যাপক মুদ্রাই হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরশীল উপায়। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো এই চর্চাই করে থাকে, অর্থাৎ মুদ্রানীতিতে ব্যাপক মুদ্রা অন্যতম চলক হিসেবে কাজ করে। United Nations Development Policy and Analysis Division (২০০৮) এবং Chatterjee and Shukayev (২০০৬) কর্তৃক প্রণীত পদ্ধতি ব্যবহার করে বিগত আট বছরে বাংলাদেশের মুদ্রা সরবরাহের স্থিতিশীলতা এবং এর বিভিন্ন নির্দেশক বিশ্লেষণে বর্তমান গবেষণা পত্রটিতে 'অস্থিতিশীলতা সূচক' এর একটি হিসাব নির্ণয় করা হয়েছে।

২০০১ সালের জুলাই মাস থেকে ২০০৯ সালের মে মাস পর্যন্ত সময়ে মুদ্রা ব্যবস্থায় ব্যাপক মুদ্রার বিভিন্ন উপাদানসমূহ, যেমন, সরকারের নীট ঋণ গ্রহণ সহ বিভিন্ন খাতে ঋণ গ্রহণ, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের মাসিক উপাত্তগুলোকে রিগ্রেশন করা হয়েছে। সংশ্লি ষ্টসূচকগুলোর প্রবণতার বিপরীতে মানসম্মত বিচ্যুতিতে (স্ট্যান্ডার্ড এরর) একটি নির্দিষ্ট সূচকে অস্থিতিশীলতা লক্ষ করা যায়। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,

ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা এর উপাদানগুলোর তুলনায় অধিকতর স্থিতিশীল (সারণি ৫.৩)। ব্যাপক মুদ্রার উপাদানগুলোর মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে কম অস্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। এর পেছনেই হলো সরকারি ঋণের অবস্থান। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়াটা সবচেয়ে বেশি অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। তবে অন্য দুটি উপাদানের তুলনায় এই খাতে ঋণের প্রবাহ কম রয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মোট মুদ্রা সরবরাহের দিকেই বেশি নজর দেয় এবং সে অনুযায়ী ঋণ বিতরণ করতে চায়। মুদ্রানীতির তত্ত্ব অনুযায়ী উপাদান বা উপকরণগুলোর উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা অর্জনে জোর দিয়ে, এবং মোট মুদ্রা সরবরাহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে দিলেই বেশি ভালো ফলাফল পাওয়া যায় (Ramey and Ramey ১৯৯৫)। তাছাড়া মুদ্রানীতিতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই সরকারি ও বেসরকারি খাতের ঋণের প্রয়োজন মেটানোর বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত।

সারণি ৫.৩: ব্যাপক মুদ্রা এবং এর উপাদানগুলোর অস্থিতিশীলতা

সূচক	ব্যাপক মুদ্রা (এম২)	সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ
অস্থিতিশীলতার সূচক	০.০০০০৮৩	০.০০০৪৭	০.০০০৬১	০.০০০০৭০

উৎস: লেখকদের প্রাক্কলন।
দ্রষ্টব্য: মোট পর্যবেক্ষণ: ৯৫।

৫.৭ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়

৫.৭.১ অতিরিক্ত তারল্য

দেশের তফসিলি ব্যাংকগুলোতে চলতি ২০০৯ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ অতিরিক্ত তারল্যের পরিমাণ বেড়ে ২৭,৭১৬ কোটি ৯৯ লাখ টাকায় উন্নীত হয়েছে। যা ২০০৮ সালের জুন মাসে ছিল ১২,৯৮৮ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। উল্লেখ্য যে ১০ মাসে তফসিলি ব্যাংকগুলোতে তারল্য বেড়েছে ১১৩.৪ শতাংশ। অতিরিক্ত তারল্যের মধ্যে ৭,৫২৩ কোটি টাকা (২৭.১ শতাংশ) এসেছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বন্ড ছাড়ার মাধ্যমে। বাকিটা এসেছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অনুমোদিত সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের সুবাদে। বিনিয়োগ চাহিদায় ঘাটতির কারণেই মূলত এমন হয়েছে। তফসিলি ব্যাংকগুলোতে অতিরিক্ত তারল্যের পরিমাণ বৃদ্ধির পেছনে অবশ্য কয়েকটি কারণ রয়েছে।[২] কারণগুলো হচ্ছে – প্রথমত, আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কমে যাওয়ায় ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ কমে যায়। কারণ ব্যাংক ঋণের একটি বড় অংশ সাধারণত আমদানি ও রপ্তানি ঋণপত্র (এল/সি) খোলার জন্য ব্যবসায়ীদেরকে দেওয়া হয়। তাই ঋণপত্র খোলার হার কমে যাওয়ায় ব্যাংকে তারল্য বাড়তে থাকে। এছাড়া বিশ্ব বাজারে প্রধান পণ্যগুলোর দাম কমে যাওয়ার কারণে ঋণপত্র খোলার জন্য টাকার চাহিদাও কমে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও তাদের বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল হয়ে ওঠে, অর্থাৎ কোন পদক্ষেপ নিতে তারা সময় নেন। এ ধরনের প্রবণতা অর্থাৎ ঋণপত্র খোলার হার কমে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে। তৃতীয়ত, বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকারি অর্থায়নের জন্য ঋণ নেওয়ার পরিমাণও মোটামুটি কমে আসায় ব্যাংক খাতে তারল্য বাড়ার ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়েছে। এই অবস্থায় ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী মাসগুলোতে দেশের অর্থনীতিতে অতিরিক্ত তারল্যের পরিমাণ কমে একটি সাধারণ পর্যায়ে আসে কিনা সেটিই এখন দেখার বিষয়।

[২] এ কারণগুলো CPD (২০০৯b) তেও উল্লেখ করা আছে।

৫.৭.২ কৃষি ঋণ নীতিমালা

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০০৯ ১০ অর্থবছরে কৃষি খাতে মোট ১১,৫০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যা ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের প্রকৃত বিতরণের চেয়ে ২৪ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য কৃষি ঋণ বিতরণ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে এবং কৃষি ঋণ বিতরণের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সর্বাত্মক প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন খাত সহ কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এক্ষেত্রে 'অধিক উৎপাদনশীল অঞ্চলগুলোকে' যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনি চর, বিল ও উপকূল প্রভৃতি অনুন্নত এলাকাগুলোকেও অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত নারী উদ্যোক্তাদেরকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বর্গাচাষীদের মধ্যে ঋণ বিতরণের জন্য ৫০০ কোটি টাকার একটি ঋণ তহবিল বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় জাতীয় পরিচয়পত্র এবং কৃষকের পরিচয়পত্র দেখে বর্গাচাষীদেরকে ঋণগ্রহীতা হিসেবে নির্বাচিত করা হবে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদেরকেও ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যে জামানত রাখার বিধান রহিত করা হয়েছে। ব্যাংকগুলো জমির মালিক, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিবেশিদের সুপারিশের আলোকেই গরীব মানুষদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করতে পারবে। তাছাড়া দুটি বিশেষায়িত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান_ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের জন্যও এই ঋণ তহবিলের একটি অংশ তাদের সহযোগী বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এবং উপরে উল্লেখিত বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো তাদের বর্ধিত বরাদ্দের ঋণযোগ্য তহবিল এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় নেওয়া অর্থায়ন থেকে কী পরিমাণ ঋণ বিতরণ করছে তা সাথে সাথে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে না। কৃষি ঋণ বিতরণের এ দুটি মাধ্যমের অভিঘাত ভিন্ন হবে বলেই ধারণা করা যায়।

উপরোক্ত কর্মসূচিগুলো ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিবিড় তদারকি ও পরিবীক্ষণ দরকার। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার জন্য 'কৃষি ঋণ তদারকি ব্যবস্থা' গঠন করেছে। পল্লী অঞ্চলে ঋণ প্রবাহের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও ঋণ কার্যক্রমের ওপর সার্বিক তদারকির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সীমিত সামর্থ্যের বিষয়টিও সতর্ক বিবেচনার দাবি রাখে। এক্ষেত্রে তদারকি ও নজরদারির বিষয়টি তফসিলি ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ওপর ছেড়ে দেওয়াই বরং ভালো।

৫.৮ কিছু উপেক্ষিত দিক

৫.৮.১ শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি

মেয়াদি ঋণ বিতরণের পরিমাণ কমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প খাতে বড় ধরনের নিম্নগতি লক্ষ করা গেছে। ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত নয় মাসে মেয়াদি ঋণ বিতরণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় ৯.৬ শতাংশ কমেছে (সারণি ৫.৪)। আলোচ্য সময়ে দেশে মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি কমেছে। অবশ্য চলতি মূলধন হিসেবে দেওয়া ঋণের সরবরাহ ১৫.৫ শতাংশ বেড়েছে, যা বিদ্যমান সক্ষমতার সদ্ব্যবহারের কারণে হতে পারে। অনিশ্চিত সম্ভাবনার এক পর্যায়ে ২০09 সালের ১৭ মার্চ কেন্দ্রীয় ব্যাংক চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ বিতরণের সীমা বাড়ায়। এতে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সামনে সর্বাত্মকভাবে ঋণ বিতরণের সুযোগ তৈরি হয়। ফলে এসব ব্যাংকের বর্তমান ঋণ বিতরণের সক্ষমতা আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বাড়াতে হবে (বিগত সময়ে ব্যাংকগুলো আগের বছরের চেয়ে ৫ শতাংশ বেশি ঋণ দিতে পেরেছে)। এছাড়া একক ঋণগ্রহীতাদের জন্য তাদের পরিশোধিত মূলধনের বিপরীতে ঋণসীমা ৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে।

ইতিপূর্বে রেপো এবং রিভার্স রেপোর সুদের হার কমানোর পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে অর্থনীতির উৎপাদনশীল খাতগুলোতে ঋণ প্রবাহ বাড়বে বলে আশা করা যায়। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি সংক্রান্ত বিবৃতিতে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহের কেমন প্রভাব পড়তে পারে সে সম্পর্কে কোন ধারণা দেওয়া হয়নি। শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ বিতরণ বা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রকারান্তরে জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই ইস্যুতে যথেষ্ট মনোযোগ দিলে এতে সুফল পাওয়া যাবে।

সারণি ৫.৪: বাংলাদেশে মেয়াদি ঋণের অবস্থা

	জুলাই–মার্চ (অর্থবছর ২০০৮)	জুলাই–মার্চ (অর্থবছর ২০০৯)	প্রবৃদ্ধি (%)
বিতরণ	১৪৫৭৪.৩১	১৩১৭৪.২২	–৯.৬
আদায়	৯৭০৬.৬৭	১১২৩২.২৭	১৫.৭
নীট বিতরণ	৪৮৬৭.৬৪	১৯৪১.৯৫	–৬০.১

উৎস: সিপিডি আইআরবিডি ডাটাবেইজ।

৫.৮.২ খেলাপি ঋণ আদায় জোরদারকরণ

বৃহৎ অংকের খেলাপি ঋণ বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে দীর্ঘ সময় ধরে ভোগাচ্ছে। ২০০৮–০৯ অর্থবছরের প্রথম তিন্ন চতুষ্টকে দেশে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩,৫৮৬ কোটি ২২ লাখ টাকা (যা মোট বকেয়া ঋণের ১১.১২ শতাংশ); এটি ২০০৭–০৮ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.০৬ শতাংশ কম। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ কমানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আলোচ্য সময়ে এসব ব্যাংকে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৯৫২ কোটি ৫৩ লাখ টাকা বা ৬.৭ শতাংশ কমেছে। এক্ষেত্রে অবশ্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের বন্ড প্রবর্তনের একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। এছাড়া কু-ঋণ অবলিখন (রাইট–অফ) এবং জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে ঋণ আদায় বেড়ে যাওয়ার ফলেও শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটতে পারে বলে ধারণা করা যায়। উল্লেখ্য যে, দেশে ব্যবসারত বিদেশি ব্যাংকগুলোর শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ ২০০৮–০৯ অর্থবছরে ২৬.১ শতাংশ বেড়েছে (নিয়মকানুন কঠোর করার কারণে এমনটি হতে পারে)।

২০০৯ সালের ৫ মে অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদকে জানান, দেশে ২,১৯৬ জন ঋণখেলাপির কাছে ১৫,৪৫১ কোটি টাকার ঋণ আটকে আছে (যারা এক কোটি টাকা বা এর চেয়ে বড় অংকের ঋণখেলাপি)। ২০০৯ সালের মার্চ পর্যন্ত আলোচ্য ২,১৯৬ জন ঋণখেলাপির কাছেই আটকে রয়েছে মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের ৬৫.৫ শতাংশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালের ২১ জুলাই অর্থমন্ত্রীকে ধারাবাহিকভাবে ঋণ পরিশোধে এবং/অথবা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নিয়মিত ঋণ করেছে এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করতে বলেছেন। এ ধরনের ঋণখেলাপিদের একটি হালনাগাদ তালিকা শীঘ্রই জনসম্মুখে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে 'ভুলে যাওয়া' খেলাপি ঋণের ইস্যু আবারও আলোচনায় ওঠে এসেছে। বেসরকারি বিনিয়োগ চাহিদা নিয়ে হতাশ এবং উচ্চ হারের ঋণ ব্যয় নিয়ে বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও আশা করা হচ্ছে, ঋণখেলাপিদের কাছে আটকে পড়া কু-ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতিতে কিছু নীতিগত নির্দেশনা থাকবে। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর কাছে পাওনা থাকা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠানে তহবিলের চাহিদা রয়েছে সেগুলোকে আবার ঋণের জোগান দিয়ে পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে সরকার। বাংলাদেশ ব্যাংকও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থায়নের ব্যাপারে সতর্কতার সঙ্গে একটি দূরদর্শী কাঠামো প্রণয়ন করতে পারে।

৫.৮.৩ সুদ হার বিস্তার কমানো

বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণের উচ্চ সুদ হার একটি বাধা হয়ে আছে। ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এই ইস্যুতে জোর দিয়েছে। সুদের উচ্চ বিস্তার এ সমস্যাকে আরও প্রকট করেছে (Bangladesh Bank ২০০৮)। ঋণের সুদ হার বেশি হওয়ার পেছনে কতিপয় কারণ রয়েছে, যেমন: বাজারে প্রচলিত সরকারি সঞ্চয়পত্রসমূহের উচ্চ সুদ হার, বাজার বিভাজন, প্রতিযোগিতার অভাব ইত্যাদি। পুঁজিবাজারের মাধ্যমে মূলধন অর্থায়নের ব্যবস্থা জোরদার ও উৎসাহিত করা হলে বাজারে ঋণের চাহিদা কমবে এবং সুদের হারে এর প্রভাব পড়বে। ঋণখেলাপি ঝুঁকিও সুদ হার উচ্চ হওয়ার আরেকটি কারণ। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যেখানে অর্থনীতি বহির্ভূত বিভিন্ন কারণেও ঋণ শ্রেণীবিন্যাসিত করতে হয়।

মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাস করার পাশাপাশি প্রধান খাতগুলোতে দেওয়া ঋণের সুদ হার ১৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনার পদক্ষেপ নিতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতির এ পদক্ষেপের মাধ্যমে সুদ বিস্তার কমানোর কাঙ্ক্ষিত প্রভাব নাও পড়তে পারে। কারণ ইতিমধ্যে ২০টি ব্যাংক স্থায়ী আমানতের সুদ হার ১.৫ শতাংশ কমিয়েছে। সর্বশেষ তথ্য উপাত্তও উৎসাহব্যঞ্জক নয়, কারণ ২০০৯ সালের মে মাসের দিকে ঋণের জন্য সুদের হার এবং সঞ্চয়ের ওপর সুদ হারের পার্থক্য ছিল ৫.৫ শতাংশ, যা ২০০৮ ০৯ অর্থবছরের শেষে হয় ৪.৮ শতাংশ (চিত্র ৫.৪)। প্রতিবেশি ভারতে সুদ হারের এ পার্থক্য সাধারণত ৪ থেকে ৪.৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে ২০০৯ ১০ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতিতে এই ইস্যুটি স্থান পায়নি।

চিত্র ৫.৪: সুদ হার বিস্তার

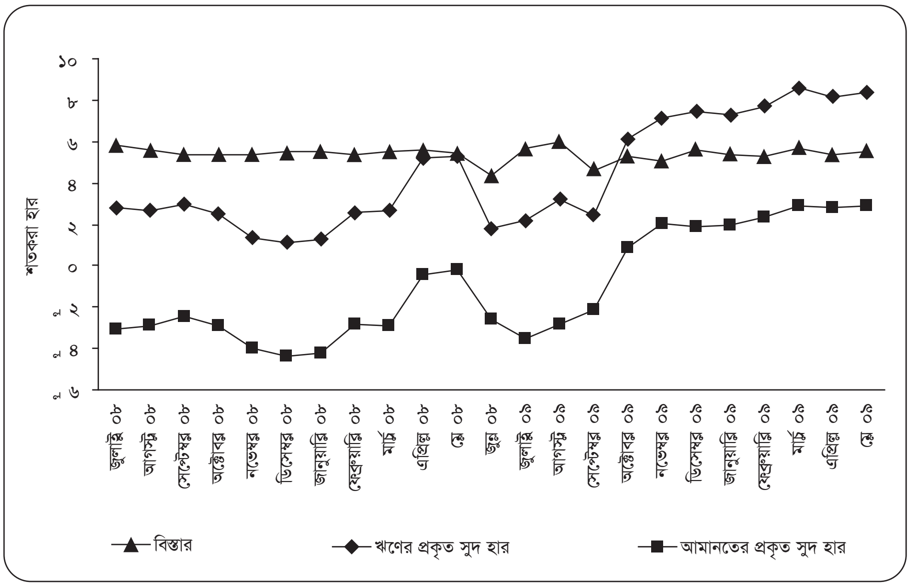

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবায়িত।

৫.৮.৪ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমন্বিতকরণ

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম আর্থিক খাতের মূলধারায় সম্পৃক্ত না হলেও এটি বেসরকারি খাতে, বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ঋণ চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০০৭ ০৮ অর্থবছরের শেষে বেসরকারি

খাতের মোট বকেয়া ঋণের মধ্যে (বেসরকারি খাত ও ক্ষুদ্রঋণ মিলে) ক্ষুদ্রঋণের অংশ ছিল ৭.১ শতাংশ, যা জিডিপির ২.৭ শতাংশ। যদিও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় আলাদা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে, এখন সময় হয়েছে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে মুদ্রানীতি বা মুদ্রাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার। ২০০৯ ১০ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতিতে গ্রামীণ জনপদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থায়নের বিষয়টিকে উচ্চমাত্রায় সংবেদনশীল বলে উল্লেখ করা হলেও এতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে নীতি কাঠামোতে সম্পৃক্তকরণের কথা বলা হয়নি।

৫.৮.৫ প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপসমূহ (ব্যাসেল ২)

আর্থিক ব্যবস্থায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান জোরদার করা এবং মূলধন পর্যাপ্ততা প্রাক্কলনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ব্যাসেল ২ প্রবর্তন করেছে, যাতে সতর্কতা বাড়ানোর মাধ্যমে ব্যাংক খাতের মূলধন ভিত্তি সহ সব ধরনের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতিতে মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করে ব্যাংকগুলোর জন্য বাধ্যতামূলকভাবে কমপ্লায়েন্স বা পরিপালনীয় শর্তাবলী মেনে চলার সুস্পষ্ট নীতি নির্দেশনা জারি করতে হবে। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ মুদ্রানীতিতে অনুপস্থিত।

৫.৯ উপসংহার

বাংলাদেশের মতো 'রাজস্ব খাত প্রভাবিত' দেশে রাজস্ব কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করে। সরকারি খাতের দায়নির্ভর রাজস্ব নীতি নানাভাবে মুদ্রানীতির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। প্রথমত, সরকারের বাজেটীয় প্রতিবন্ধকতাগুলোর প্রভাব বিভিন্ন সময় মুদ্রানীতির ওপর পড়তে পারে। দ্বিতীয়ত, মুদ্রানীতির বিভিন্ন উপাদান, যেমন – সুদ হার, সুদ হারের পার্থক্য এবং বিনিময় হারকে প্রভাবিত করতে পারে রাজস্ব নীতি। মূল্যস্ফীতি সহনীয় হয়ে আসার পরিস্থিতিতে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির মধ্যকার সম্পর্কে অবনতি ঘটতে পারে। বিশ্ব অর্থনীতিতে যেহেতু পুনরুদ্ধার বা উন্নয়নের প্রবণতা চলছে, সেহেতু বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এক্ষেত্রে মুদ্রানীতির কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে নির্ভর করে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতির উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে কতটা সক্ষম তার ওপর। এছাড়া সংশ্লিষ্টঅন্যান্য নীতিমালা, যেমন – রাজস্ব নীতি, সরবরাহ ব্যবস্থার সাবলীল কার্যক্রম ও সুশাসন সংস্কার ইত্যাদির ওপরও বিষয়টি নির্ভরশীল। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অব্যাহত মন্দার পরিস্থিতিতে ২০০৯ ১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও রাজস্ব আয় বাড়ানোর যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করাই হচ্ছে বর্তমান মুদ্রানীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য। তবে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে শুধুমাত্র সমর্থনমূলক বা সহায়ক ভূমিকা পালন করলেই হবে না, মুদ্রানীতির মাধ্যমে সক্রিয় সহযোগিতা দেওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে। আশা করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক চলতি ২০০৯ ১০ অর্থবছরের বাজেটের সঙ্গে সমন্বয় রেখে গতিশীল মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে সক্ষমতার পরিচয় দেবে।

ঋণখেলাপিদের কাছে বহুদিন ধরে আটকে থাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে সরকার একটি স্বাধীন, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও উপযুক্ত কমিটি গঠন করতে পারে। এই কমিটি সরকারকে খেলাপি ঋণ আদায়ের কার্যকারিতা, রুগ্ন ঋণের ভারে জর্জরিত রুগ্নশিল্প সমস্যার সমাধান, আর্থিক খাতে অধিকতর প্রতিযোগিতা, উচ্চ সুদ হার কমানো এবং বিদেশি উৎস থেকে বেসরকারি খাতের বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নেওয়ার যৌক্তিকতা পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপারে বাস্তবসম্মত পরামর্শ দেবে। বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মুখ থুবড়ে পড়ার পরিস্থিতি বিবেচনায় এই কমিটি সরকারকে দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা উন্নয়নের উপায় সম্পর্কেও পরামর্শ দিতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী

Bangladesh Bank. 2008. *Monetary Policy Statement (First Half of FY2008-09)*. Announced on 17 July 2008.

Bangladesh Bank. 2009a. *Monetary Policy Statement (Second Half of FY2008-09)*. Announced on 14 January 2009.

Bangladesh Bank. 2009b. *Monetary Policy Statement (First Half of FY2009-10)*. Announced on 19 July 2009.

CPD. 2009a. *An Analysis of the National Budget for FY2009-10*. Dhaka: Centre for Policy Dialogue (CPD). http://cpd.org.bd/downloads/CPD%20Budget%20Response %20FY2009-10.pdf

CPD. 2009b. *Bangladesh Economy in FY2008-09: An Interim Review of Macroeconomic Performance*. Dhaka: Centre for Policy Dialogue (CPD).

Chatterjee, P. and Shukayev, M. 2006. *Are Average Growth Rate and Volatility Related?* Bank of Canada Working Paper Series No. 2006-24. Canada: Bank of Canada.

Crockett, A. 2004. "Central Banking in the New Millenium," in Ahluwalia, M.S., Reddy, Y.V. and Tarapore, S.S. (eds.) *Macroeconomics and Monetary Policy*. New Delhi: Oxford University Press.

Lindsey, D.E. and Wallich, H. 1989. "Monetary Policy," in Eatwell, J., Millgate, M. and Newman, P. (eds.) *Money*. New York: The New Palgrave.

Majumder, M.A. 2007. *Does Public Borrowing Crowd-out Private Investment? Evidence from Bangladesh*. Working Paper Series No. WP 0708. Dhaka: Bangladesh Bank.

Ramey, G. and Ramey, V.A. 1995. "Cross-Country Evidence on the Link Between Volatility and Growth." *American Economic Review*, 85 (5): 1138-51.

The Economist. 2009a. *The Other-Worldly Philosophers*. 18-24 July.

The Economist. 2009b. *What Went Wrong with Economics*. 18-24 July.

United Nations Development Policy and Analysis Division. 2004. *Calculation of Instability Index*. http://www.un.org/esa/policy/devplan/profile/definitions.html

সংযুক্তি ১

বাজেট সংলাপ ২০০৯

*ঢাকা**

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) আয়োজিত "বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনা এবং ২০০৯১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট বিশেষণ" শীর্ষক সংলাপ গত ২০ জুন ২০০৯ তারিখে ঢাকা শেরাটন হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল ১১ জুন ২০০৯ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত ২০০৯১০ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাবনার ওপর সিপিডির পর্যবেক্ষণ এবং বিশেষণ তুলে ধরা এবং বাজেট সম্পর্কে সংশিষ্ট সকলের মতামত প্রকাশের একটি সুযোগ সৃষ্টি করা।

সংলাপ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব এ এম এ মুহিত, এমপি সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম সম্মানিত অতিথি এবং সাবেক কৃষিমন্ত্রী জনাব এম কে আনোয়ার, এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারকবৃন্দ, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন সংস্থা এবং তৃণমূল সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত সংলাপে উপস্থিত ছিলেন। সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রতিবেদনের শেষে সংযোজনীতে যুক্ত করা হলো।

সভাপতির সূচনা বক্তব্য

অধ্যাপক রেহমান সোবহান তার উদ্বোধনী বক্তৃতায় উলেখ করেন যে, সিপিডি প্রতি বছর এ বাজেট সংলাপ আয়োজন করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও নীতিপ্রণেতাদের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি মুক্ত আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। তিনি মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব এ এম এ মুহিত, এমপি-কে সংলাপে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং সিপিডির সংলাপসমূহে তার নিয়মিত অংশগ্রহণের কথা স্মরণ করেন। অধ্যাপক সোবহান আশা প্রকাশ করেন যে, এ সংলাপ মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাবসমূহ চূড়ান্তকরণে গঠনমূলক পরামর্শ প্রদানে সহায়ক হবে। তিনি সংলাপে উপস্থিত থাকার জন্য সম্মানিত অতিথি ড. এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম এবং জনাব এম কে আনোয়ার, এমপি-কেও ধন্যবাদ জানান। তিনি মনে করেন যে, বিভিন্ন স্বার্থ সংশিষ্ট গোষ্ঠীর ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে এ সংলাপ অর্থমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের সংশিষ্ট সকলকে এক জায়গায় নিয়ে আসার একটি অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

---

* সংলাপ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন তাপস কুমার পাল, গবেষণা সহযোগী, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)।

সূচনা বক্তব্যের শেষে অধ্যাপক সোবহান বাজেট বিশেষণটি প্রস্তুতির জন্য সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান সহ সিপিডির গবেষক দলের কঠোর পরিশ্রম ও পেশাদারিত্বমূলক কাজের প্রশংসা করেন এবং অধ্যাপক রহমানকে প্রবন্ধটি উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

উপস্থাপনার শুরুতে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রধান অতিথি মাননীয় অর্থমন্ত্রী, সম্মানিত অতিথি এবং বিশেষ অতিথিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান যে, বর্তমান প্রতিবেদনটি সিপিডির গবেষক টীমের যৌথ প্রয়াসে প্রণীত হয়েছে। বাজেট প্রতিক্রিয়া সংবলিত বর্তমান প্রতিবেদনটি তৈরিতে তার সহকর্মীরা যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের প্রতি তিনি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপস্থিত সুধীমণ্ডলীকে তিনি অবহিত করেন যে, আলোচ্য সংলাপটি হলো বাজেট সংশিষ্ট সিপিডির বিভিন্ন উদ্যোগের সর্বশেষ প্রয়াস। বাজেট সংশিষ্ট অন্যান্য উদ্যোগসমূহের মধ্যে, মে মাসে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবনা পেশ, জুনের প্রথম দিকে অর্থনীতির হালনাগাদ পরিস্থিতির ওপর অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রকাশ এবং ১১ জুন ২০০৯ তারিখে জাতীয় সংসদে জাতীয় বাজেট উপস্থাপনের পরদিন সকালে বাজেটের ওপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রদান ছিল অন্যতম।

২০০৯-১০ অর্থবছরের বেঞ্চমার্ক

অধ্যাপক রহমান বলেন যে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপিত এ বাজেট নবনির্বাচিত সরকারের প্রথম বাজেট। তিনি এ বাজেটকে সরকারের নীতিসমূহের প্রথম আনুষ্ঠানিক দলিল বলেও অভিহিত করেন। সরকার ক্ষমতায় এসেছে পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে এবং এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সম্মুখে নানাবিধ চ্যালেঞ্জও বিদ্যমান রয়েছে। অধ্যাপক রহমান উলেখ করেন যে, ২০০৮০৯ অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৫.৯ শতাংশ যা চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে বেশ সন্তোষজনক। বর্তমান বাজেট বাস্তবায়নের কাজ শুরু হওয়ার মুহূর্তে দেশের অর্থনীতিতে স্বল্প মূল্যস্ফীতি, স্থিতিশীল বিনিময় হার এবং সন্তোষজনক লেনদেনের ভারসাম্য বিরাজ করছে। তিনি মন্তব্য করেন যে, বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব মোকাবেলায় অনেক দেশ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছে। কিন্তু, বাংলাদেশ এ সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন মনে করেনি।

অধ্যাপক রহমানের মতে, বিগত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশ আকর্ষণীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সমর্থ হলেও অর্থনীতির বেশ কিছু ক্ষেত্রে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব, কিছু সময় পরে হলেও, গত কয়েক মাস যাবৎ বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বর্ধিত হারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০০৮০৯ অর্থ বছরের জুলাইডি সেম্বর সময়ে ছিল ১৯.৩ শতাংশ, যা হ্রাস পেয়ে জানুয়ারিএপ্রিল সময়ে হয়েছে ৪ শতাংশ; রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের চেয়ে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় (-) ২.৩ শতাং শে। প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি ২০০৮০৯ অর্থ বছরের জুলাইডি সেম্বরে ছিল ৩০.৯ শতাংশ, যা জানুয়ারি-মে সময়ে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৪.৫ শতাংশে। উলেখ্য যে, ২০০৮০৯ অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে বিদেশে শ্রমিক যাওয়ার হারও হ্রাস পায় (৩০.৮ শতাংশ)। সিপিডি কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, ব্যবসাবাণি জ্যে আস্থার অভাবের কারণে আগামী ২০০৯১০ অর্থ বছরে বিনিয়োগে প্রাণসঞ্চার করা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিবে।

২০০৮০৯ অর্থ বছরের জুলাইমার্চ সময়ে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং ঋণপত্র (এল/সি) খোলার হার কমেছে যথাক্রমে ১০.৬৮ শতাংশ এবং ৩১.৫৩ শতাংশ। বিনিয়োগের একটি বিকল্প নির্দেশক মেয়াদি ঋণ

বিতরণের হারও ২০০৮০৯ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ৯.৬১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অধ্যাপক রহমান উলেখ করেন যে, যদিও দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির কাঠামো এখনও যথেষ্ট সবল, তথাপি যদি চলমান বৈশ্বিক মন্দা আরও তীব্রতর হয় তাহলে এগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি হবে। এসব কারণে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপটে ২০০৯১০ অর্থ বছর একটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং বছর হবে।

২০০৯-১০ অর্থবছরের চ্যালেঞ্জসমূহ

অধ্যাপক রহমান বলেন, নিকট ভবিষ্যতে অর্থনীতি দুটি সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে উলেখিত "রূপকল্প ২০২১" থেকে জনমনে স্বল্পমেয়াদে লক্ষ্য অর্জনের জন্য উৎসরিত উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন; এবং দ্বিতীয়টি হলো চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা। তিনি এ দুটি চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সিপিডি কর্তৃক চিহ্নিত ২০০৯১০ অর্থ বছরের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আরও পাঁচটি চ্যালেঞ্জের কথা উলেখ করেন। এগুলো হলো: (১) বিনিয়োগে প্রাণসঞ্চার; (২) কৃষি সুসংহতকরণ; (৩) বৈদেশিক খাত প্রতিরক্ষণ; (৪) সরকারি অর্থব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ; এবং (৫) জনপ্রশাসনে গতি ফিরিয়ে আনা। তিনি বলেন যে, এ পাঁচটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাজেটে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ থাকতে হবে, যাতে পূর্ববর্তী বছরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ২০০৯১০ অর্থ বছরেও অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহের অবস্থা উন্নতি করা সম্ভব হয়।

প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ এবং সামষ্টিক অর্থনীতির পূর্বাভাস

প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের পূর্বাভাস

অধ্যাপক রহমান উলেখ করেন যে, ২০০৯১০ অর্থ বছরের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা কিছুটা রক্ষণশীল এবং এমনকি গত অর্থবছরের অর্জনের তুলনায়ও কম। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, প্রবৃদ্ধির এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অর্থনীতিতে বিশেষ কোন অর্জনের প্রয়োজন হবে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও ২০০৮০৯ অর্থ বছরে দেশে ৫.৮৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০০৮০৯ অর্থ বছরে এ লক্ষণীয় অর্জন হলেও (২০০৮০৯ অর্থ বছরে কৃষি ও শস্য খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৪.৭ শতাংশ ও ৫.২ শতাংশ) ২০০৯১০ অর্থ বছরে কৃষি খাতে উলেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করা হবে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা থেকে নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, সরকার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধি (জিডিপির শতকরা হিসাবে) আশঙ্কা করছে। এক্ষেত্রে তিনি উলেখ করেন যে, ২০০৯১০ অর্থবছরে বর্ধিত মূলধনউৎপাদন হারও (আইসিওআ র বা আইকর) বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৩ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। অর্থাৎ, ২০০৯১০ অর্থ বছরে মূলধনের উৎপাদনশীলতা আরও হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০০৯১০ অর্থ বছরে সরকারি বিনিয়োগ উলেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে তবেই তা অতিরিক্ত বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সমর্থ হবে। তবে মোট বিনিয়োগ (জিডিপির শতকরা হিসাবে) ২৪.২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২৩.৭ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা বিপরীতমুখী।

বৈদেশিক খাতের পূর্বাভাস

অধ্যাপক রহমান বলেন যে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাংকের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০০৮০৯ অর্থবছরে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১.৩ থেকে ১.৭ শতাংশ হ্রাস পাবে এবং ২০০৯১০ অর্থ বছরে ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি মনে করেন, বিশ্ব অর্থনীতির এ নিম্নমুখী প্রবণতা

ক্রমান্বয়ে বিশ্বায়নমুখী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে, বিশেষ করে এদেশের অর্থনীতির বৈদেশিক খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। উন্নত দেশসমূহের চাহিদা আগামী বছরে যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি না পেলে দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং (শিল্পোৎপাদন) খাত, বিশেষ করে এর রপ্তানিমুখী অংশ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সরকার রপ্তানি ও আমদানির প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করেছে যথাক্রমে ১২.৫ শতাংশ এবং ১৩ শতাংশ। প্রবাসী আয় প্রবাহ ২০০৯১০ অর্থ বছর শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ১০.৬ বিলিয়নে দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তিনি মনে করেন, এসবের অনেক কিছু নির্ভর করবে মন্দা কাটিয়ে উঠার ধরন ও গতির ওপর।

মুদ্রানীতির পূর্বাভাস

মুদ্রানীতির বিষয়ে অধ্যাপক রহমান বলেন যে, সরকারের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ) অনুযায়ী আগামী তিন বছরে মূল্যস্ফীতির চাপ কিছুটা সহনীয় হয়ে আসবে। সে অনুযায়ী, ২০০৯১০ অর্থ বছরে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়াবে ৬.৫ শতাংশ। সরকার ২০০৯১০ অর্থ বছরে ব্যাপক মুদ্রা (এম২) সরবরাহ ১ শতাংশ হ্রাস পাওয়ার প্রাক্কলন করেছে। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, সংকোচনশীল মুদ্রানীতিটি সরকারের প্রস্তাবিত সম্প্রসারণশীল রাজস্বনীতির সঙ্গে পরস্পর বিরোধী। প্রত্যাশা করা হচ্ছে, ২০০৯১০ অর্থ বছরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ১৮.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে, যা সম্প্রতি ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম। তিনি বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন, যা এমটিএমএফ অনুযায়ী ডলারের বিপরীতে ৭০.৭ টাকায় স্থির রাখার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

সরকারি আর্থিক কাঠামো

রাজস্ব আয়

রাজস্ব আহরণের বিষয়ে অধ্যাপক রহমান মন্তব্য করেন যে, ২০০৯১০ অর্থ বছরের জন্য রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৯,৪৬১ কোটি টাকা, যা ২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৪.৯ শতাংশ বেশি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৫.১ শতাংশ। আমদানি মূল্যের প্রত্যাশিত নিম্নমুখীতা সত্ত্বেও এ লক্ষ্যমাত্রাকে অধ্যাপক রহমান বাস্তবধর্মী বলে উলেখ করেন। তবে এনবিআরবহির্ভূত করের লক্ষ্যমাত্রা, অর্থাৎ ১৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি গত বছরের অর্জনের তুলনায় উচ্চাভিলাষী। একই সাথে করবহির্ভূত রাজস্বের ১৩.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা গত বছরের উচ্চ প্রবৃদ্ধির তুলনায় কিছুটা রক্ষণশীল বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

সরকারি ব্যয়

সরকারি ব্যয়ের বিষয়ে অধ্যাপক রহমান বলেন যে, ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে মোট সরকারি ব্যয় ধরা হয়েছে ১১৩,৮১৯ কোটি টাকা, যা ২০০৮০৯ অর্থ বছরের মূল ও সংশোধিত বাজেটের তুলনায় যথাক্রমে ১৩.৯ শতাংশ ও ২০.৯ শতাংশ বেশি। মূল্যস্ফীতির হার বিবেচনায় নিলে ২০০৮০৯ অর্থবছরের মূল বাজেটের তুলনায় প্রস্তাবিত বাজেট তেমন সম্প্রসারণশীল নয় বলে তিনি মনে করেন। রাজস্ব ব্যয়ের বিষয়ে তিনি উলেখ করেন যে, ২০০৯১০ অর্থ বছরের ব্যয় ২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ১০.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। রাজস্ব ব্যয়ের প্রধান তিনটি খাত, যথা -সুদ পরি শোধ, বেতনভাতাদি এবং ভর্তুকি ও চলতি হস্তান্তর বাবদ ব্যয় মোট রাজস্ব ব্যয়ের ৮০.২ শতাংশ হবে বলে ধরা হয়, যা ২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে এ তিন খাতের মোট খরচ ৮৩.৫ শতাংশের চেয়ে কম। প্রস্তাবিত বাজেটে সুদ পরিশোধ বাবদ ১৮.৭ শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধির যে প্রাক্কলন করা হয়েছে তা নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

উন্নয়ন বাজেটের বিষয়ে অধ্যাপক রহমান উলেখ করেন যে, ২০০৯১০ অর্থ বছরে এডিপি বাবদ বরাদ্দ ৩০,৫০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে, যা ২০০৮০৯ অর্থ বছরের মূল এডিপি ও সংশোধিত এডিপির তুলনায় যথাক্রমে ১৯.১ শতাংশ এবং ৩২.৬ শতাংশ বেশি। তার মতে, ২০০৮০৯ অর্থ বছরের এডিপির প্রকৃত বাস্তবায়ন হবে প্রায় ১৯,৫০০ কোটি টাকা এবং সে অনুযায়ী ২০০৯১০ অর্থ বছরের এডিপি গত বছরের তুলনায় ৫৫ শতাংশ বেশি। তিনি স্মরণ করেন যে, ২০০৯১০ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ অনুযায়ী পাঁচটি অগ্রাধিকার খাত হলো – পরিবহন, শিক্ষা ও ধর্ম, স্থানীয় সরকার, ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ। এ খাতগুলোর সাফল্যের ওপর সার্বিক অর্জন অনেকটা নির্ভর করবে। তিনি পূর্ববর্তী বছরে অসমাপ্ত প্রকল্পসমূহ চলতি অর্থবছরের এডিপিতে পুনরায় অন্তর্ভুক্তিকরণকে (নতুন এডিপির ১২ শতাংশ) এর আকার বড় হওয়ার কারণ হিসেবে উলেখ করেন। তার মতে এসব প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত না হলে নতুন এডিপির আকার দাঁড়াতো ২৬,৯৮৫ কোটি টাকা। ২০০৯১০ অর্থ বছরে মাত্র ৩৫টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এগুলোর জন্য মোট ৩৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে (মোট বরাদ্দের মাত্র ১.২ শতাংশ)।

বাজেট ঘাটতি এবং অর্থায়ন

২০০৯১০ অর্থ বছরে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩৪,৩৫৮ কোটি টাকা (জিডিপির ৫ শতাংশ) যা ২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ৩৭.৭ শতাংশ বেশি। উলেখ্য যে, সংশোধিত প্রাক্কলনে এডিপির বাস্তবায়ন ধরা হয়েছিল ২৩,০০০ কোটি টাকা। সিপিডির প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, ২০০৮০৯ অর্থ বছরে প্রকৃত বাজেট ঘাটতি হবে জিডিপির ৩.৫ শতাংশ। ফলে ২০০৯১০ অর্থবছরে প্রকৃত বাজেট ঘাটতি প্রায় ৬০ শতাংশ বেশি হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট অর্থায়নের ৫৯.৮ শতাংশ আসবে অভ্যন্তরীণ খাত থেকে। আবার অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের ৮১.৫ শতাংশ আসবে ব্যাংক ঋণ থেকে (২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে যা ছিল ৭৫.৩ শতাংশ)।

রাজস্ব পদক্ষেপসমূহের মূল্যায়ন

আয়কর

অধ্যাপক রহমান মন্তব্য করেন যে, রাজস্ব আদায়ে বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করের চেয়ে পরোক্ষ করের ওপর বেশি নির্ভরশীল। করমুক্ত আয়ের সীমা ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকায় স্থির রেখে আয়কর স্তরও আগের মতোই রাখা হয়েছে। বয়স্ক করদাতাদের সর্বনিম্ন বয়স সীমা ৭০ বছর থেকে কমিয়ে ৬৫ বছর করা একটি অভিনন্দনযোগ্য উদ্যোগ। বর্তমানে সরকারি কর্মচারীদের অবসরের বয়স ৫৭ বছর বিবেচনায় নিয়ে এটি করা হয়েছে। মহিলা এবং চাকরিজীবী বয়স্ক নাগরিকদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমাও ১ লাখ ৮০ হাজার টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

কুটির শিল্প

অধ্যাপক রহমানের মতে, কুটির শিল্পের উন্নয়নে সরকারের উদ্যোগসমূহ প্রশংসনীয়। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনী কর (ভ্যাট) অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য সম্পত্তির মূল্যস্তর ১৫ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ লাখ টাকায় নির্ধারণ করেছে। এছাড়াও সরকার এ শিল্পের বার্ষিক টার্নওভারের সীমা বিদ্যমান ২৪ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০ লাখ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে, যার ফলে কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদের করসং ক্রান্ত ব্যয় কম হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া, ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের উৎসাহ

প্রদানের জন্য সরকার ব্যাংক আমানতের ওপর আবগারি শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে অব্যাহতির সীমা ১০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০,০০০ টাকা নির্ধারণ করেছে।

কৃষি খাত

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়াতে সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং সার, বীজ ও খাদ্যশস্য আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শূন্য শুল্কহার অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করেছে। তবে অধ্যাপক রহমান ধান চাষীদের স্বার্থ রক্ষার্থে (চাল আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে) চাল আমদানির ওপর ১৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত সিপিডির সুপারিশ বাজেটে প্রতিফলিত না হওয়ায় সমালোচনা করেন। তবে তিনি কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১০,০০০ কোটি টাকায় (২০০৮০৯ অর্থবছরের তুলনায় ৬.৬২ শতাংশ বেশি) নির্ধারণ করাকে বাস্তবসম্মত বলে মত প্রকাশ করেন।

২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেটে স্থানীয় শিল্প রক্ষার্থে সরকার গুঁড়ো দুধ আমদানির ওপর ১২ শতাংশ শুল্ক হার আরোপের পাশাপাশি স্থানীয় উৎপাদনের ওপর ভ্যাট মওকুফের প্রস্তাব দিয়েছে। তাছাড়া বিকল্পভাবে তরল দুধকে গুঁড়ো দুধে রূপান্তর প্রক্রিয়ার ওপর প্রযোজ্য ২.৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারেরও প্রস্তাব করেছে। অধিকন্তু, বাজেটে প্রতি কেজি গুঁড়ো দুধের শুল্ক মূল্য ১০০ টাকা ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে প্রতি কেজি গুঁড়ো দুধে ভ্যাটের পরিমাণ ৫০ টাকার পরিবর্তে মাত্র ১৫ টাকা পড়বে বলে অধ্যাপক রহমান জানান।

শিল্প খাত

অধ্যাপক রহমান উলেখ করেন, উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং রপ্তানিকারকদের সহায়তার জন্য সরকার কাঁচামালের শুল্ক কাঠামো সংশোধন করেছে। আমদানি শুল্ক এবং সম্পূরক শুল্ক কাঠামোতে পরিবর্তন আনা সহ সরকার প্রথমবারের মতো বিভিন্ন শুল্কস্তরে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করেছে। ২৫ শতাংশ শুল্কস্তরে দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে সরকার শুধু বিলাসদ্রব্য এবং জনস্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্যে ৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করেছে। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, মোটর গাড়ি, টেলিভিশন, সিগারেট ইত্যাদি। বিলাসবহুল গাড়ির ক্ষেত্রে সরকার সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। কিন্তু শুল্কের পরিমাণ এখনও ঘোষণা করা হয়নি বলে তিনি জানান। পার্টিকেল বোর্ড, হার্ডবোর্ড, মধ্যম ঘনত্বের ফাইবার বোর্ড, পাইউড, চামড়াজাত দ্রব্য ইত্যাদি আমদানির ওপর সরকারের ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ; এবং ফুটওয়্যার, সিরামিক সামগ্রী, টেবিল সামগ্রী ও স্যানিটারি সামগ্রীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫ শতাংশ করার মাধ্যমে স্থানীয় শিল্প সুরক্ষার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এ উদ্যোগের ফলে স্থানীয় শিল্প বিদেশি প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা পাবে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। স্থানীয় তরল গ্লুকোজ ও ডেক্সট্রোজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান (২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ) এবং বিস্কুট কারখানাকে (সম্পূরক শুল্ক ৬০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০০ শতাংশ করা) সুরক্ষার জন্য একই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি উলেখ করেন যে, সমুদ্রগামী জাহাজ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে মন্দাবস্থা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে বর্তমান বাজেটে ৩,০০০ মেট্রিক টন অথবা তার অধিক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজের আমদানির ওপর থেকে বিদ্যমান ৭ শতাংশ আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

স্থানীয় শিল্প সুরক্ষার স্বার্থে স্থানীয় রেফ্রিজারেটর ও মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী শিল্পকে আগামী এক বছরের জন্য ভ্যাট থেকে অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। অধ্যাপক রহমানের মতে স্থানীয় শিল্পকে সহায়তার ক্ষেত্রে সরকারের এ সকল প্রস্তাবনাসমূহ প্রশংসার দাবি রাখে।

শুল্ক কাঠামোর পরিবর্তন

অধ্যাপক রহমান মনে করেন যে, স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষা এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। মৌলিক কাঁচামালের ওপর সম্পূরক শুল্ক ৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করার সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে সংশিষ্ট শিল্পের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে। ফলে এসব দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ওপর ভিত্তি করে আমদানি শুল্ক আদায়ে প্রভাব পড়বে এবং এতে প্রায় ৩৮৩ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, ভ্যাট এবং অগ্রিম বাণিজ্য ভ্যাটের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপের ফলে আমদানি কার্যক্রম থেকে উৎসরিত সরকারের রাজস্ব আয়ের ওপর উলেখযোগ্য প্রভাব পড়বে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী আমদানি শুল্ক কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে সরকার প্রায় ৯ শতাংশ বেশি রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম হবে (শুধু আমদানি শুল্ক থেকে)। সিপিডির এক গবেষণায় দেখা যায় যে, যদি আমদানি মূল্যের ক্ষেত্রে ২০০৭০৮ অর্থ বছরকে ভিত্তি বছর হিসেবে ধরা হয় এবং ২০০৯১০ অর্থবছরের শুল্ক কাঠামো আমদানি মূল্যের ওপর আরোপ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে সরকারের রাজস্ব আদায় হবে ১৯,৮১৮ কোটি টাকা, যা ২০০৭০৮ অর্থ বছরের তুলনায় ১,০৬০ কোটি টাকা (৫.৬৫ শতাংশ) বেশি।

অন্যদিকে, যদি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় ২০০৮০৯ অর্থ বছর ও ২০০৯১০ অর্থবছরের আমদানি প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় নেওয়া হয় (২০০৮০৯ এবং ২০০৯১০ উভয় অর্থ বছরে আমদানির প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৩ শতাংশ), তাহলে আমদানি খাত হতে মোট রাজস্ব আয় দাঁড়াবে ২৫,৩০৫ কোটি টাকা, যা ২০০৭০৮ অর্থ বছরের (২৭.৫ শতাংশ) ও ২০০৮০৯ অর্থ বছরের (১২.৩ শতাংশ) তুলনায় উলেখযোগ্য পরিমাণে বেশি। সিপিডির প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০০৮০৯ অর্থ বছরে আমদানি সংশিষ্ট রাজস্ব আয় হবে প্রায় ২১,১৯৬ কোটি টাকা। ২০০৯১০ অর্থ বছরের আমদানি সংশিষ্ট রাজস্ব আহরণের হার ২০০৮০৯ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত হারের তুলনায় ১৯.৪ শতাংশ বেশি হবে। তবে, এটা লক্ষণীয় যে, ২০০৯১০ অর্থ বছরের শুল্ক কাঠামো ২০০৮০৯ অর্থ বছরের আমদানি মূল্যের ওপর আরোপ করা হলে মোট আমদানি শুল্ক দাঁড়ায় ২২,৩৯৪ কোটি টাকা, যা ২০০৮০৯ অর্থ বছরের তুলনায় ১,১৯৮ কোটি টাকা বা ৫.৬৫ শতাংশ বেশি।

তথ্য-প্রযুক্তি ও যোগাযোগ (আইসিটি)

অধ্যাপক রহমান মনে করেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশিষ্ট বাজেট প্রস্তাবনাসমূহে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এ লক্ষ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি উলেখ করেন। তিনি আরও বলেন, সরকার মোবাইল ফোন সেটের ওপর সেট প্রতি ৩০০ টাকা হারে সুনির্দিষ্ট শুল্কের পরিবর্তে ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ এবং এর ওপর বিদ্যমান ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক এবং অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছে। ফলে স্বল্পমূল্যের মোবাইল সেটের ওপর কম শুল্ক এবং উচ্চ মূল্যের মোবাইল সেটের ওপর বেশি শুল্ক নির্ধারিত হবে। তবে এ সিদ্ধান্ত মোবাইল হ্যান্ডসেট চোরাচালান হওয়াকে উৎসাহিত করতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে সরকার রাজস্ব হারাতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তার মতে, শিক্ষামূলক সেবার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সেবা প্রদানে বিদ্যমান ভ্যাট প্রত্যাহারের প্রস্তাব একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের বরাদ্দের তুলনায় ২০০৯১০ অর্থবছরের বরাদ্দ ৪৮ শতাংশ বেশি। তবে, গুণগতমান সমুন্নত রেখে সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা

হবে এ খাতের গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। তিনি মনে করেন, দীর্ঘ দিন ধরে দাবিকৃত "ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট"এর ওপর নবায়ন ফি প্রত্যাহার একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। স্থানীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি/সংযোজিত জেনারেটরের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহার এবং সৌর প্যানেলের আমদানি, স্থানীয় উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে বিদ্যমান ৩ শতাংশ আমদানি শুল্ক এবং ভ্যাট প্রত্যাহারকে তিনি সাধুবাদ জানান।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)

অধ্যাপক রহমান মনে করেন, ভ্যাটের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) মূলধন সীমা ২৪ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০ লাখ টাকায় নির্ধারণ করা একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ, যা এ খাতে অধিকতর বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে। দেশের এসএমই খাত নানাবিধ সমস্যা মোকাবেলা করছে। তাই এসব সমস্যা সমাধানে তিনি সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণের পরামর্শ দেন।

অপ্রদর্শিত আয় বৈধকরণ

অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার বিষয়ে অধ্যাপক রহমান স্মরণ করেন যে, ২০০৮০৯ অর্থবছরে ১৪,২১৬ জন ব্যক্তি এ সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে ৭৮২ কোটি টাকা বৈধ করে এবং সরকার এসব আয়ের ওপর থেকে ১০৫ কোটি টাকা কর আদায় করে। তিনি আরও উলেখ করেন যে, সিপিডির প্রাকবাজেট প্রস্তাবনায় যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, অপ্রদর্শিত উৎস থেকে আয় (যে আয়ের ওপর পূর্বে কর দেওয়া হয়নি) বৈধ করার ক্ষেত্রে নিয়মিত আয়কর সহ প্রদেয় করের ওপর ৭ শতাংশ জরিমানা আরোপ করতে হবে। তাছাড়া সুপারিশ করা হয়েছিল যে, অপ্রদর্শিত/অবৈধ উৎস থেকে আয় বৈধ করার আর কোন সুযোগ যাতে না দেওয়া হয়। তিনি মনে করেন, এটি নিয়মিত করদাতাকে পুরস্কৃত করা, কর ফাঁকি দেওয়াকে নিরুৎসাহিত করা এবং অপ্রদর্শিত অর্থ অর্জনকারীকে দণ্ড দেওয়ার নীতিবিরুদ্ধ কাজ। তিনি মন্তব্য করেন যে, এ ব্যবস্থায় বৈধভাবে উপার্জিত অর্থ কিন্তু অপ্রদর্শিত, এবং অবৈধভাবে উপার্জিত ও অপ্রদর্শিত অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্যেরও অবকাশ রাখা হয়নি।

বাজেট বরাদ্দ: অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)

অধ্যাপক রহমান উলেখ করেন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)এর আওতাভুক্ত প্রকল্পগুলোর জন্য মোট ২,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা মোট বাজেটের ২.২ শতাংশ। পিপিপি উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে কয়েকটি খাত, যেমন -জ্বালানি, অবকাঠামো এবং সামাজিক সেবা (স্বাস্থ্য ও শিক্ষা) শুরু করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। তবে স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারবে কিনা এবং পিপিপি উদ্যোগ এডিপির ওপর চাপ কমাতে সাহায্য করে কিনা তা দেখার বিষয়। এক্ষেত্রে ত্বরিত ফলাফল পাওয়ার লক্ষ্যে তিনি যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় আইনকানুন তৈরি ও তা কার্যকর করার বিষয়ে জোর দেওয়ার সুপারিশ করেন। পিপিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনি কতিপয় চ্যালেঞ্জের কথাও উলেখ করেন। তার মতে, পিপিপি উদ্যোগকে সফল করতে হলে প্রশাসনিক দক্ষতা এবং দরকষাকষির ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি, দ্রুত তহবিল ব্যবহার (সময়মতো তহবিল ছাড়করণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে গুণগতমান রক্ষা) এবং প্রয়োজনীয় কার্য পরিচালনার জন্য শীঘ্রই পিপিপি সেল গঠন অত্যন্ত জরুরি।

কৃষি

অধ্যাপক রহমান বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০০৯১০ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত বরাদ্দ (৫,৯৬৫ কোটি টাকা) ২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের (৭,৬৪৩ কোটি টাকা) তুলনায় ২২ শতাংশ এবং ২০০৮০৯ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত মূল বাজেটে বরাদ্দের (৫,৫৬৬ কোটি টাকা) তুলনায় ৯.২ শতাংশ কম। অন্যদিকে, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২০০৯১০ অর্থ বছরের বরাদ্দ ২০০৮০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় যথাক্রমে ১১৪ কোটি টাকা (১৮.৯ শতাংশ), ২৮ কোটি টাকা (১১.২ শতাংশ) এবং ৭৫ কোটি টাকা (১৭.৩ শতাংশ) বেশি। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০০৯১০ অর্থ বছরের বরাদ্দ হলো ১,৪৮৩ কোটি টাকা। সিপিডি নির্বাহী পরিচালকের মতে, নতুন সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারে কৃষি খাতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এ খাতের উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

প্রণোদনা প্যাকেজ

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রথম পর্যায়ের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত বিশেষ সহায়তা ২০০৯১০ অর্থ বছরেও অব্যাহত থাকার প্রতিশ্রুতি বাজেটে করা হয়। এ লক্ষ্যে বাজেটে ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে প্রস্তাবিত তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের জন্য বাজেটে কোন বিস্তারিত বিভাজন দেওয়া হয়নি। মনে হচ্ছে যে, প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজে উলেখিত এ সংক্রান্ত নীতিমালা ২০০৯১০ অর্থ বছরের সহায়তার ক্ষেত্রেও অনুসৃত হবে। অধ্যাপক রহমান স্মরণ করেন যে, ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে সরকার ২০০৮০৯ অর্থ বছরের জন্য ৩,৪০২ কোটি টাকার বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। এ সহায়তার আওতায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, যেমন – পাটজাত দ্রব্য, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য ও চিংড়ি শিল্পকে অতিরিক্ত নগদ অর্থ সহায়তা (বিদ্যমান সহায়তার সঙ্গে অতিরিক্ত ২.৫ শতাংশ) প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়। যে সমস্ত খাত (যেমন – পশ্চাদসংযোগ বস্ত্র শিল্প, বাইসাইকেল, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প) ইতিমধ্যে নগদ সহায়তা গ্রহণ করছে, সেগুলোর সহায়তাও অব্যাহত থাকবে। অধিকন্তু, সরকার নগদ অর্থ সময়মতো বিতরণ, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় বরাদ্দ বৃদ্ধি, সকল খাতে হ্রাসকৃত সুদে (৭ শতাংশ হারে) রপ্তানি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রপ্তানিমুখী শিল্পকে নীতিসহায়তা প্রদান করার ঘোষণা দিয়েছে।

স্বাস্থ্য

দেশের অগ্রগতির লক্ষ্যে সকলের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ওপর অধ্যাপক রহমান গুরুত্বারোপ করেন। ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে প্রস্তাব করা হয় যে, সারাদেশে ১৩,৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হবে। তবে, এ সবগুলো ক্লিনিকই কি নতুন করে স্থাপিত হবে, নাকি ইতিমধ্যে চালু হওয়া ৮,৪৬৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে তিনি আশাবাদী এসব ক্লিনিক, যা সম্ভবত পিপিপি উদ্যোগের অংশ হবে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিশেষ করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, স্যানিটেশন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ডায়রিয়া প্রতিরোধ, পুষ্টি ও যৌন রোগ সংক্রান্ত সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাজেটে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলোর মধ্যে উলেখযোগ্য হল ১৩৪টি উপজেলায় জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৭৩ কোটি টাকার বরাদ্দ; ৪৫টি উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি সম্প্রসারণ (এ কর্মসূচির জন্য ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে); এবং উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল আধুনিকায়ন। অধ্যাপক রহমান মন্তব্য করেন যে, যদিও প্রস্তাবিত অধিকাংশ উদ্যোগ স্বাস্থ্য খাতের

উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হবে, তথাপি সরকারি সংস্থাসমূহের ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর এর সফলতা অনেকটাই নির্ভর করবে।

শিক্ষা

অধ্যাপক রহমান উলেখ করেন, শিক্ষা খাতের সাথে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের জন্য ২০০৯১০ অর্থবছরের এডিপিতে মোট ৩,৯১৪.৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৪০.৭ শতাংশ বেশি। এছাড়া, বাজেটে রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা সাপেক্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতনের সমপরিমাণ অনুদান প্রদান করার প্রস্তাবকে তিনি সাধুবাদ জানান। শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিতে এ উদ্যোগ সহায়ক হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পাশাপাশি প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষক নিয়োগ এবং ল্যাবরেটরি স্থাপনের উদ্যোগও প্রশংসনীয়। এ প্রেক্ষিতে তিনি জানান যে, প্রাকবা জেট সুপারিশমালায় সিপিডি এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিল।

২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে তিনটি নতুন কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। এগুলো হলো: (ক) পর্যায়ক্রমে ডিগ্রী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা; (খ) ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা; এবং (গ) মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন। তবে, এসব কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে কোন সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ বা নীতিমালার প্রস্তাব করা হয়নি বলে অধ্যাপক রহমান মন্তব্য করেন।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে অন্যতম প্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ লক্ষ্যে সরকার অধিকাংশ কর্মসূচিতে জনপ্রতি ভাতার পরিমাণ এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করেছে। অধ্যাপক রহমানের মতে, এটি একটি চলমান উদ্যোগ যা সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার জন্য সরকার ঘোষণা করেছে যে, বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ২০০ কোটি টাকা পলী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণ করবে। তবে প্রস্তাবিত ক্ষুদ্রঋণ নমনীয় হারে তফসীলিকরণ এবং সার্বিকভাবে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে শক্তিশালী করার জন্য বাজেটে সুনির্দিষ্ট কোন পদক্ষেপ নেই বলে তিনি উলেখ করেন। তার মতে সম্পদহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য এ সমস্ত পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দরিদ্র ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সরকার অনুন্নয়ন বাজেটে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভালনারেবেল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ), ভালনারেবেল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি), টেস্ট রিলিফ (টিআরখাদ য), গ্র্যাচুইশাস রিলিফ (জিআরখাদ য) এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা বাবদ ৫,৮৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে অধ্যাপক রহমান বাজেটে মনেটাইজড্ চ্যানেলের মাধ্যমে সরকারি খাদ্য বিতরণের জন্য আলাদা কোন বরাদ্দ না রাখার সমালোচনা করেন।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

অধ্যাপক রহমানের মতে, কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টি ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে যথাযথভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। সরকার ৭ লাখ বেকার যুবকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যা শ্রমবাজারে

প্রতি বছর নতুন আগমনকারী ১৮ লাখ লোকের প্রায় ৪০ শতাংশ। নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিনের সমালোচনা এড়াতে সরকার জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেইজ ব্যবহার করে একটি নতুন তালিকা প্রণয়নের প্রস্তাব করেছে। অধ্যাপক রহমান এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। এ বিষয়ে অধ্যাপক রহমান স্মরণ করেন যে, সিপিডি তার প্রাকবা জেট সুপারিশমালায় এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিল।

বর্তমান সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ১০০দি নের কর্মসৃজন কর্মসূচি সংশোধনের প্রস্তাব করেছে এবং এ কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায় স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন' শীর্ষক নতুন কর্মসূচির জন্য ১,১৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৪৯ লাখ জন-মাসের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হবে। তবে এ কর্মসূচির জন্য আঞ্চলিক লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে বাজেটে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি।

উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) অথবা এর সমপর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যুব সম্প্রদায়ের জন্য জাতীয় সেবা কর্মসূচি (ন্যাশনাল সার্ভিস) প্রবর্তন করার প্রস্তাব একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, কর্মসূচিটি পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে বরগুনা এবং কুড়িগ্রাম জেলায় শুরু হবে। এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের প্রথমে তিন মাস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং তারপর প্রশিক্ষণের সাথে সঙ্গতি রেখে দুই বছরের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

উলেখিত প্রস্তাবনাসমূহ ছাড়াও ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে গ্রামীণ এলাকার নারী শ্রমিকদের অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য আরও কিছু কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছে। অধ্যাপক রহমান আশা প্রকাশ করেন যে এসব উদ্যোগ উপকারভোগীদের দারিদ্র্য ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

অধ্যাপক রহমান বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহের একটি তালিকা উপস্থাপন করেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: উদ্বৃত্ত জাতীয় সঞ্চয়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা; ব্যাংকিং খাতের অতিরিক্ত তারল্য ও পাইপলাইনে পড়ে থাকা বৈদেশিক সহায়তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা; উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে সর্বোচ্চ ফলাফল পাওয়ার লক্ষ্যে সরকারি ব্যয়ের যথাযথ অনুক্রম তৈরি করা; সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতির পরিপূরকতা বজায় রাখা; সরকারি অর্থায়ন কাঠামো ঠিক রাখা ও রাজস্ব শৃঙ্খলা বজায় রাখা; মন্ত্রণালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নেতৃত্বে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়; স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা এবং এসব প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ; প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মাধ্যমে বেসরকারি খাতের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক জোরদার করা; সংস্কার কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া (উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ বেটার বিজনেস ফোরাম, রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন); এবং সামাজিক উদ্যোগ ও সামাজিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এনজিও ও অন্যান্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্ব সৃষ্টি। তার মতে, বর্তমান বাজেটের সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করবে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের যথাযথ দিকনির্দেশনা, উন্নয়ন প্রশাসনের দক্ষতা ও সক্ষমতার ওপর। পাশাপাশি মন্ত্রণালয়সমূহকে তাদের প্রকল্প তৈরি ও বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়নে যথাযথ সক্ষমতা দেখাতে হবে। বাজেট প্রক্রিয়ার সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে একটি তথ্যনির্ভর এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে এবং বাজেট বক্তৃতায় উলেখিত সংস্কার কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

মুক্ত আলোচনা

বাজেট বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বিনিয়োগে প্রাণসঞ্চার করা

সিপিডির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবং সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব এম সাইদুজ্জামান ২০০৯১০ অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ শতাংশ নির্ধারণ করার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, ২৪ শতাংশ বিনিয়োগের হার এবং ৩২ শতাংশ সঞ্চয়ের হারের প্রেক্ষিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৭ শতাংশ হওয়া উচিত। ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটের আকার জিডিপির মাত্র ১৬.৭ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। "রূপকল্প ২০২১"এর ল ক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন এবং নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা উলেখযোগ্য হারে বাড়ানো উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক ড. মোস্তফা কে মুজেরী বলেন যে, প্রস্তাবিত বাজেটে সরকারের মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি মনে করেন, আগামী অর্থবছরে অর্থনীতি যে নিম্নমুখী ঝুঁকির সম্মুখীন হবে তা বিবেচনায় নিয়ে ২০০৯১০ অর্থবছরের জিডিপির প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। তিনি উলেখ করেন যে, বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে বিনিয়োগকে বেগবান করা। কারণ, গত দুইতিন বছর থেকে জিডিপির শতাংশ হিসাবে বিনিয়োগে স্থবিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং আগামী অর্থবছরে তা আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের জন্য বিনিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পর্যাপ্ত সম্পদ আহরণ এবং প্রকল্প নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এডিপির সফল বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

জনাব সাইদুজ্জামান এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার উদ্বেগের কথা জানান। এডিপি বাস্তবায়নে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০০৯১০ অর্থ বছরে প্রকল্প সাহায্যের মাধ্যমে সম্পদ আহরণ সরকারের জন্য একটি বড় সমস্যা হবে। তিনি আরও বলেন, আগামী অর্থবছরে এডিপি যথাসময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারকে পর্যাপ্ত সম্পদ আহরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শেখ মনিরুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি সরকারি বিনিয়োগের সুফল এবং তা টার্গেট গ্রুপের নিকট পৌঁছেছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেন। তিনি প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন এবং প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তা বা ঠিকাদারদের দায়িত্বে অবহেলার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

সরকারি ক্রয় নীতি

মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হাফিজ চৌধুরী সরকারি ক্রয় নীতিমালায় প্রস্তাবিত পরিবর্তনের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বহুপাক্ষিক দাতাসংস্থা বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বলে তিনি উলেখ করেন। সরকার যদি ক্রয় নীতিমালায় প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ বাস্তবায়ন করে তাহলে প্রকল্পসমূহে বৈদেশিক সহায়তার অংশ প্রত্যাহার হতে পারে, এবং ফলশ্রুতিতে দেশের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

ঘাটতি অর্থায়ন: সরকারের জন্য একটি উদ্বেগের বিষয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবু আহমেদ মন্তব্য করেন যে, যদিও বাজেট ঘাটতি জিডিপির মাত্র ৫ শতাংশ, তথাপি অর্থায়নের পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি মনে করেন, আগামী বছরগুলোতে সুদ পরিশোধ সরকারের জন্য একটি বড় চাপ হবে। ক্রমবর্ধিষ্ণু সুদের দায় নিয়ন্ত্রণের জন্য অধ্যাপক আহমেদ সরকারি সংস্থাসমূহকে পুঁজিবাজারে শেয়ার ছাড়ার সুপারিশ করেন।

ঘাটতি অর্থায়ন সরকারের জন্য একটি বড় উদ্বেগের কারণ উলেখ করে জনাব হাফিজ চৌধুরী বলেন, ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের ফলে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালক বেসরকারি খাতে ঋণ সংকোচন প্রভাব (ক্রাউডিং আউট ইফেক্ট) পড়বে। বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে তিনি যুক্তি দেখান যে, সুদের দায় পরিশোধের বর্তমান পরিস্থিতিতে বাজেট ঘাটতি কম রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নীতি সমন্বয় হবে প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি

নীতি সমন্বয়কে প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে উলেখ করে ড. মুজেরী বলেন ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেট সম্প্রসারণশীল রাজস্বনীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছে। তার মতে, রাজস্বনীতির উদ্দেশ্য অর্জনে মুদ্রানীতিকে একমুখী প্রবণতায় রাখা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে বড় চ্যালেঞ্জ।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাত

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে জনাব এম ফজলুল আজীম, এমপি মন্তব্য করেন যে, যদিও সরকার বিশ্বমন্দার প্রভাব পরিবীক্ষণ এবং অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নীতিকার্যক্রমের সুপারিশ করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করেছে, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকৃত অগ্রগতি এখনও দেখা যাচ্ছে না। তিনি দ্রব্য ও সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে নিম্নমুখী প্রবণতার বিষয়ে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। অন্যান্য রপ্তানিমুখী খাতের ন্যায় তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানিও হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমান বাজেটে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ স্বচ্ছ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা উচিত। তিনি আরও উলেখ করেন যে, গত দুই বছরে রেকর্ড পরিমাণ বাংলাদেশী শ্রমিক (১.৭ মিলিয়ন) বিদেশে চাকরির উদ্দেশ্যে গিয়েছেন। বর্তমানে মোট প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৬.১ মিলিয়ন, যা দেশের মোট শ্রমশক্তির ১০ শতাংশ। ২০০৭০৮ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্রায় ৭.৯ বিলিয়ন ডলার অর্থ দেশে পাঠিয়েছে, যা মোট জিডিপির ১০ শতাংশ। তবে ২০০৯ সালে বিদেশে শ্রমিক যাওয়ার সংখ্যা উলেখযোগ্য পরিমাণে কম। বিশ্বমন্দার একটি অন্যতম অভিঘাত হচ্ছে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যার উলেখযোগ্য নিম্নগতি। ভবিষ্যতে প্রবৃদ্ধির মন্থরতার আশঙ্কা এবং নির্মাণ ও অন্যান্য সেবা খাতের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষাপটে ইতিমধ্যে প্রচলিত শ্রমবাজারের অনেক দেশ, যেমন -সংযু ক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর নতুন করে শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছে। জনাব আজীম বিদেশের শ্রমবাজারে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা এবং বিদেশের শ্রমবাজার বহুমুখীকরণের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করেন।

রপ্তানিমুখী শিল্প রক্ষায় যথাযথ নীতিমালা প্রয়োজন

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) প্রেসিডেন্ট এবং এনভয় গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আব্দুস সালাম মুর্শেদী সরকারকে বর্তমান তৈরি পোশাক রপ্তানির নেতিবাচক

প্রবৃদ্ধিকে বিবেচনায় নিয়ে এ শিল্পকে রক্ষার জন্য যথাযথ নীতিমালা ঘোষণা করার দাবি জানান। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহকে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে ক্রমাগত আরও বেশি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং পণ্যের দাম কমে যাওয়ায় তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ শতাংশ সুদে নমনীয় ঋণ, ইউটিলিটি বিলের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহার, কমপক্ষে ছয় মাসের জন্য ০.২৫ শতাংশ অগ্রিম উৎসে কর প্রত্যাহার, কমপক্ষে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কর অবকাশের মেয়াদ বৃদ্ধি, প্রতি লিটার ডিজেলে ১০ টাকা ভর্তুকি প্রদান, তৈরি পোশাক খাতে একই দিনে সাপ্তাহিক ছুটি নির্ধারণ যাতে তাদের পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কার্যক্রম (চেইন অ্যাকটিভিজ) ব্যাহত না হয়। এর পাশাপাশি দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

নতুন কর এবং শুল্ক প্রস্তাবসমূহ বিনিয়োগ-অনুকূল নয়

গ্রামীণফোন লি.এর সিইও ওডার হেজজেদাল মনে করেন যে, বাংলাদেশে বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহারের হার মাত্র ৩০ শতাংশ, যা প্রতিবেশী দেশসমূহের চেয়ে অনেক কম। তিনি জানান যে, বাংলাদেশে বর্তমান টেলিকম কোম্পানিসমূহ বিশেষ করে গ্রামীণফোন গত কয়েক বছরে গ্রামীণ এলাকায় উলেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে এবং তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে। তিনি মনে করেন, টেলিকম অপারেটররা গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নের নতুন সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করতে সমর্থ হবে, বিশেষ করে প্রবাসী আয় স্থানান্তর, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় প্রদেয় অর্থ প্রদান। তবে, কর্পোরেট করের উচ্চ হারের কারণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। গ্রামীণফোনের প্রাথমিক শেয়ার বাজারে ছাড়ার বিষয়ে তিনি জানান, কোম্পানিটি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে এবং ২০০৯ সালের শেষ দিকে কোম্পানিটি স্টক এক্সচেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট জনাব আনিসুল হক ২০০৯১০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে গাড়ির ওপর আরোপিত শুল্ক কাঠামো যৌক্তিকীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। এ প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, ১৮০০ সিসি অথবা ২০০০ সিসির গাড়ি বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিলাস সামগ্রী নয়। তিনি মনে করেন, মাননীয় অর্থমন্ত্রী গাড়ির ওপর প্রস্তাবিত শুল্ক কাঠামো পুনর্নির্ধারণের জন্য বিবেচনা করবেন।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. জায়েদি সাত্তার মন্তব্য করেন যে, বাজেটে প্রস্তাবিত নতুন কর ও শুল্ক কাঠামো বিনিয়োগঅনুকূল নয়। তিনি আশাহত হয়ে বলেন যে, বাজেট প্রক্রিয়ায় কোন ভোক্তা শ্রেণীর সম্পৃক্ততা ছিল না। কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজেটে এ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষারও প্রতিফলন থাকা উচিত। তাই ভোক্তার ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা (আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ইত্যাদি) চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এতে ভোক্তা থেকে উৎপাদকের নিকট উলেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ হস্তান্তরিত হয়।

অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ নিয়মিত করদাতাদেরকে শাস্তি দেওয়ার শামিল

অপ্রদর্শিত আয় আইনগত কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য জনাব আনিসুল হক সরকারকে সাধুবাদ জানান। এ প্রেক্ষিতে তিনি উলেখ করেন যে, অপ্রদর্শিত আয় শুধু কতিপয় নির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগের সংশোধিত প্রস্তাবের সাথে এফবিসিসিআই একমত পোষণ করে ।

এমসিসিআইএর প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হাফিজ চৌধুরী অবশ্য কালো টাকা বিনিয়োগ করার সুযোগ প্রদানের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এ প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবি জানান। তিনি বলেন যে, ১৯৭৬ সাল থেকে মাত্র ১৮,০০০ কোটি টাকা বৈধ করা হয়েছে, যা ব্যাপক অর্থে অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ সুযোগ সৎ ও নিয়মিত করদাতাগণকে নিরুৎসাহিত করবে।

জনাব হাফিজ মজুমদার, এমপি এ বিষয়ে বলেন, অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। অনেকে যুক্তি দেখান যে, এখন অবৈধভাবে অর্জিত অর্থও বৈধ করা যাবে। তিনি স্পষ্টভাবে উলেখ করেন যে, অবৈধ আয় থেকে কোন প্রকার বিনিয়োগ সরকার অনুমোদন করবে না।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) উদ্যোগ স্বচ্ছ হওয়া জরুরি

জনাব সাইদুজ্জামান পিপিপি কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার উদ্যোগের প্রশংসা করেন। বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশ অবকাঠামো ও সামাজিক খাতের প্রকল্প বাস্তবায়নে এ ধরনের উদ্যোগকে সফলভাবে কাজে লাগিয়েছে। তিনি আরও উলেখ করেন যে, প্রথাগতভাবে উন্নয়নশীল দেশের সরকারসমূহ এরূপ উদ্যোগের আওতায় ভৌতঅবকাঠা মো, যেমন - রেলওয়ে, সড়ক ও মহাসড়ক, বিমানবন্দর, বন্দর, সেচের যন্ত্রপাতি স্থাপন, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে, যেগুলো ছাড়া অধিকাংশ অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে যাবে। পিপিপি উদ্যোগ স্বচ্ছ হওয়া উচিত এবং এসব প্রকল্প থেকে উৎপাদিত সেবার যথাযথ মূল্য নির্ধারণে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার লক্ষ্যে পিপিপি-কে যথাযথ উদ্যোগ হিসেবে উলেখ করে জনাব আজিম বলেন, এ উদ্যোগের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য স্বচ্ছতা এবং মূল্য নির্ধারণে সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। পিপিপি মডেল ব্যবহার করে অনেক উন্নয়নশীল দেশ সফল হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকারেরও এ লক্ষ্যে গৃহীত কৌশল বাস্তবায়ন করা উচিত।

এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্টও পিপিপি উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং উলেখ করেন যে, এফবিসিসিআই পূর্বেই সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করেছে। তিনি বলেন যে, ঢাকাচ ট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং "এলিভেটেড এক্সপ্রেস হাইওয়ে" প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পিপিপি উদ্যোগের আওতায় বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশের বেসরকারি খাত পিপিপি প্রকল্পে অংশগ্রহণে খুব আগ্রহী হবে; তবে আইনগত কাঠামো এবং প্রকল্প পরিচালনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলো পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করতে হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিশ্চিত করা না গেলে শিল্পায়নের অগ্রগতি হবে না

জনাব হাফিজ চৌধুরী বলেন যে, দেশের শ্রমশক্তির এক বিরাট অংশ বেকার। বেকার যুবকের একটি অংশ বেআইনি কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে যা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতিরও একটি কারণ। তিনি আরও বলেন, ৪৮ শতাংশ শ্রমশক্তি কৃষি খাতে নিয়োজিত। এ খাতে শ্রমশক্তি নিয়োগের আর তেমন কোনো সুযোগ নেই। জনাব চৌধুরী বলেন, দেশে শিল্পায়ন খুবই জরুরি, তবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিশ্চিত করা না গেলে শিল্পায়নের অগ্রগতি হবে না। তিনি জ্বালানি খাতে মোট বাজেটের মাত্র ৩.৮ শতাংশ বরাদ্দ রাখায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পিপিপির আওতায় যেসব প্রকল্প জ্বালানি খাতের উন্নয়নের জন্য বিবেচিত হচ্ছে সেগুলো বাস্তবায়নে বেশ সময়ের প্রয়োজন। তবে পিপিপি বাস্তবায়নে যথাযথ পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় বিধিবিধান প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরি। দ্রুত শিল্পায়নের জন্য তিনি বর্ধিত বরাদ্দের পাশাপাশি বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর জোর দেওয়ার দাবি জানান।

গ্যাস সংকট সমাধানের কথা উলেখ করে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস সমিতির (বিটিএমএ) প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হাই সরকার উলেখ করেন যে, সরবরাহ ঘাটতির কারণে শিল্পসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, অনেক শিল্প উদ্যোক্তা তাদের প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন ব্যাংক ঋণ নিয়ে। কিন্তু, গ্যাস সংকটের কারণে তারা এখন সেই প্রতিষ্ঠানগুলো চালাতে পারছেন না।

সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান চৌধুরী জাতীয় কয়লা নীতি প্রণয়নের ধারণার সঙ্গে একমত পোষণ করেন এবং বলেন জ্বালানির প্রাপ্যতা ও পর্যাপ্ততা নিশ্চিতকল্পে জরুরি ভিত্তিতে এটি চূড়ান্ত করতে হবে।

স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদান করতে হবে

কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প কৃষি খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে উলেখ করে জনাব হাফিজ চৌধুরী কৃষি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে বিনিয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কৃষি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ১০ শতাংশের কম সুদে ঋণ প্রদানের জন্য তিনি সরকারকে সুপারিশ করেন। এ খাতের প্রবৃদ্ধির জন্য নমনীয় ঋণ প্রদানের ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) বাংলাদেশ প্রতিনিধি অ্যাড স্পাইকারস সিপিডির উপস্থাপনার প্রশংসা করেন এবং সামনের বছরগুলোতে কৃষির সাফল্য সুসংহত করার প্রস্তাবে জোর সমর্থন জানান। তিনি গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে উলেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে বলে মন্তব্য করেন। তিনি জানান যে, চীন, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার পর বাংলাদেশ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদন করে। তবে, এ রেকর্ড ধরে রাখা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি প্রয়োজন

জনাব তানভীর শাকিল জয়, এমপি ‘রূপকল্প ২০২১’ বাস্তবায়নের কথা উলেখ করে বলেন, এতে অন্যতম লক্ষ্য হল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া যা বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অর্জনে তিনি মনে করেন সরকারের প্রতিটি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। যেহেতু অনেক মানুষ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে, তাই জনাব শাকিল মোবাইল সিম কার্ডের ওপর থেকে ভ্যাট হ্রাসের দাবি জানান।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির প্রেসিডেন্ট জনাব মোস্তফা জব্বার তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ খাতে বাজেটে বরাদ্দ রাখার জন্য প্রশংসা করেন। তিনি অর্থমন্ত্রীকে অনতিবিলম্বে সিম কার্ডের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। আগামী অর্থবছর থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার কোর্স বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগকেও তিনি সাধুবাদ জানান। তিনি সুপারিশ করেন যে, কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য একটি ঘূর্ণায়মান তহবিল সৃষ্টি করতে পারে।

শিক্ষা খাতে নিম্ন বরাদ্দ উৎকণ্ঠার বিষয়

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সিনিয়র অ্যাডভাইজার ড. মনজুর আহমেদ মনে করেন, ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেটে সকল ক্ষেত্রে নির্বাচিত সরকারের ‘রূপকল্প ২০২১’এর প্রতিফলন থাকা উচিত। শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বাজেটের ১৩ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা

গত বছরের ১৩.৬ শতাংশের চেয়ে কম। তিনি বলেন, এ খাতের লক্ষ্য অর্জনে বরাদ্দকৃত অর্থের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে।

সুশাসনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে

জনাব আজিম আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি উলেখ করেন যে, সরকারি খাতের দুর্নীতি দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে, এবং ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে। দুর্নীতির কারণে অধিকাংশ বিনিয়োগকারী নিরুৎসাহিত হচ্ছে। তিনি সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের আইনপ্রণেতাগণকে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার অনুরোধ জানান।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা তহবিল প্রাপ্তির লক্ষ্যে কোপেনহেগেন সম্মেলনে জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে

জনাব স্পাইকারস সরকার কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং প্রস্তাবিত বরাদ্দ পুরোপুরি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কোপেনহেগেন সম্মেলনের সম্ভাব্য ফলাফলের অংশ হিসেবে গঠিতব্য জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা তহবিল থেকে সহায়তা পাওয়ার জন্য সরকারকে জোর প্রচেষ্টা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

পুরাতন সম্পত্তি বিক্রয়ে রেজিস্ট্রেশন ফি হ্রাসের সুপারিশ

অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসার সেকেন্ডারি বাজারের বিষয়ে রিহ্যাব প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী তানভীরুল হক প্রবাল উলেখ করেন যে, বাংলাদেশে এ খাতের ব্যবসায় কোন সেকেন্ডারি বাজার নেই। পুরোনো অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়বি ক্রয় ঝামেলার কাজ। একটি পুরোনো অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে ১৬.৫ শতাংশ ফি পুনরায় পরিশোধ করে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, যা প্রথম রেজিস্ট্রেশন ফিএর সমান। তিনি পু রোনো সম্পত্তির ক্ষেত্রে সরকারকে রেজিস্ট্রেশন ফি কমানোর অনুরোধ জানান।

পুঁজিবাজার

পুঁজিবাজার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে অধ্যাপক আবু আহমেদ উলেখ করেন যে, মোবাইল ফোন অপারেটররা যদি শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হয় তাহলে সরকার তাদের জন্য ১০ শতাংশ কর্পোরেট কর হ্রাস করবে। তালিকাবহির্ভূত কোম্পানিসমূহকে পুঁজিবাজারে প্রবেশে উৎসাহিত করার জন্য এসইসি-কে এর পদ্ধতিগত দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং তা সংশোধন করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এসব প্রণোদনা কোম্পানিসমূহকে শেয়ার বাজারে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে। তিনি বলেন, চূড়ান্ত পর্যায়ে এ বিপরীতমুখী উদ্যোগ (রাজস্ব ক্ষতি) অর্থনীতির নীট অর্জনকে বৃদ্ধি করবে।

জেন্ডার বৈষম্য

কর্মজীবী নারীর প্রেসিডেন্ট শিরিন আক্তার নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করার জন্য সরকারকে সাধুবাদ জানান। তবে বরাদ্দকৃত এ অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণে উপকারভোগীদের

চিহ্নিতকরণ এবং নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা জরুরি। এ লক্ষ্যে তিনি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

মূল্যস্ফীতি-সমন্বিত ন্যূনতম মজুরি প্রবর্তনের সুপারিশ

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ড. ওয়াজেদুল ইসলাম খান বলেন যে, উৎপাদনশীল খাতে নিয়োজিত অধিকাংশ শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি বহুদিন যাবৎ স্থির রয়েছে। শ্রমিকরা বিদ্যমান মজুরি যা পাচ্ছে তা খুবই কম এবং এ ন্যূনতম মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের অন্নসংস্থানে হিমশিম খেতে হচ্ছে। শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি ৫০ শতাংশের নিচে নেমে গিয়েছে। তিনি সরকারকে মূল্যস্ফীতিসমন্বিত মজুরি ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কর্মজীবী শ্রেণীর সাহায্যার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে মত দেন। অধিকাংশ পোশাক শ্রমিক ছোট্ট বস্তি ঘরে বসবাস করে যেখানে জীবনের ন্যূনতম সুযোগসুবিধা নেই। তিনি শ্রমিকদের জন্য মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে আবাসস্থল তৈরিরও সুপারিশ করেন।

বিশেষ অতিথির মন্তব্য

বর্তমান জাতীয় সংসদ সদস্য এবং সাবেক কৃষিমন্ত্রী জনাব এম কে আনোয়ার এ সংলাপ আয়োজনের জন্য সিপিডিকে এবং মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বাজেট উপস্থাপনের জন্য অর্থমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত বাজেট পূর্ববর্তী বাজেটের তুলনায় সরকারি ব্যয়, রাজস্ব আহরণ এবং বাজেট ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রার দিক থেকে বড়। এ প্রেক্ষাপটে পরবর্তী অর্থবছরে সম্পদ সমাবেশ সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

"রূপকল্প ২০২১"এর বিভিন্ন লক্ষ্যের বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে জনাব আনোয়ার বলেন, এতে বিধৃত সকল লক্ষ্যই দীর্ঘমেয়াদি। আগামী অর্থবছরের জন্য লক্ষ্যমাত্রা এবং অভীষ্ট সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত থাকা উচিত।

ব্যক্তিগত কর অব্যাহতির সীমার বিষয়ে জনাব আনোয়ার বলেন যে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রতিবেশী অনেক দেশ এ সীমা বৃদ্ধি করেছে। তিনি মন্তব্য করেন যে, আয়কর অব্যাহতির সীমা বৃদ্ধি করলে ভোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পেতো। জনাব আনোয়ার বলেন যে, ট্র্যাভেল এজেন্ট এবং জনশক্তি রপ্তানিকারকদের ওপর ভ্যাট আরোপের ফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। চলমান অর্থনৈতিক মন্দার কারণে একদিকে যখন নিম্ন হারে জনশক্তি রপ্তানি হচ্ছে ঠিক তখনই বাজেটে ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব করা হল। তিনি জনশক্তি রপ্তানিকারকদের ওপর ভ্যাট আরোপের প্রস্তাবটি পুনরায় বিবেচনা করার দাবি জানান।

ক্ষুদ্রঋণের উচ্চ সুদের হারের বিষয়ে জনাব আনোয়ার উল্লেখ করেন যে, এ হার ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ, যা এ সুযোগ ব্যবহারকারীদের জন্য অতিমাত্রায় বেশি। তিনি বলেন, এ উচ্চ সুদের হার দারিদ্র্য নিরসনে কোন ভূমিকা রাখে না এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী এরূপ ঋণ কর্মসূচি থেকে আর সুফল পাচ্ছে না।

জনাব আনোয়ার মন্তব্য করেন যে, বাজেটে প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা উচিত। যদিও অনেক কর্মসূচির বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে, কিন্তু এটি শুধু সাময়িক সমাধান, কারণ শুধু এসব কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদি কৌশল। তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা বেকার যুবকদের জন্য সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত

ন্যাশনাল সার্ভিস প্রোগ্রাম নামক নতুন কর্মসূচির প্রশংসা করেন। তবে এ কর্মসূচির জন্য সরকারকে প্রথমে বাস্তবায়ন পদ্ধতি চিহ্নিত এবং প্রণয়ন করতে হবে।

কালো টাকার বিষয়ে জনাব আনোয়ার উলেখ করেন যে, অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ নিয়মিত করদাতাদের নিরুৎসাহিত করবে কারণ তাদেরকে বেশি কর দিতে হবে। আর এ সুযোগ এমন এক সময়ে দেওয়া হলো যখন দেশকে দুর্নীতিগ্রস্ত অতীত থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন যে, এ সুযোগ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের পরিপন্থি, এবং তিনি অনতিবিলম্বে এ সুযোগ রহিত করার সুপারিশ করেন।

সম্মানিত অতিথির মন্তব্য

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম তার প্রতিক্রিয়ায় জানান যে, ২০০৯১০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট কিছুটা পূর্ববর্তী বাজেটের অনুরূপ। ব্যক্তিগত আয়কর অব্যাহতির ক্ষেত্রে তিনি উলেখ করেন যে, এর সীমা পরপর দুই বছর (অর্থবছর ২০০৭০৮ ও ২০০৮০৯) ব ৃদ্ধি করা হয়েছে। অতএব, ব্যক্তিগত আয়কর অব্যাহতির সীমা এ পর্যায়ে বৃদ্ধি করা ঠিক হবে না কারণ এ মুহূর্তে মূল্যস্ফীতির হার খুব বেশি নয়, বরং সাম্প্রতিক সময়ে তা কমে এসেছে।

অভ্যন্তরীণ সুদ পরিশোধ বৃদ্ধির বিষয়ে ড. ইসলাম যুক্তি দেখান যে, এটি জাতীয় অর্থনীতির জন্য কোন ক্ষতি নয়। সরকারি খাত থেকে বেসরকারি খাতে হস্তান্তর ব্যয় এবং বৈদেশিক সুদ পরিশোধের মতো এটি সামষ্টিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে অর্থের কোন নির্গমন নয়। তবে, বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধের দায় সরকারের রাজস্বের ওপর খুব সামান্যই চাপ সৃষ্টি করে।

ড. ইসলাম এডিপির আকার নিয়ে তার উদ্বেগের কথা জানান এবং মন্তব্য করেন যে, এটি শুধুমাত্র প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিবেচনা করলে চলবে না। এডিপি বাস্তবায়নের সক্ষমতা একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা, যা এ অর্থবছরের জন্যও প্রযোজ্য। সিপিডির প্রতিবেদনে চিহ্নিত বাস্তবায়ন সমস্যাগুলোর কথা উলেখ করে তিনি বলেন যে, এসবের সমাধানে মনোযোগী হতে হবে।

সাবেক উপদেষ্টা উলেখ করেন যে, কৃষি, জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ খাতের বরাদ্দ বর্তমান বাজেটে ২০০৮০৯ অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস করা হয়েছে। কৃষিতে এ হ্রাসের কারণ হল পূর্ববর্তী বাজেটে ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ৪,৫০০ কোটি টাকা; এ অর্থবছরে এর প্রয়োজনীয়তা কমে দাঁড়ায় ৩,৬০০ কোটি টাকা। তবে, বর্ধিত চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে পিপিপি উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়ন না করা গেলে জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ খাতের বরাদ্দ হ্রাস করার কোন যৌক্তিকতা নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রস্তাবিত প্রণোদনা প্যাকেজ সম্পর্কে ড. ইসলাম প্রশ্ন তোলেন যে, এ প্যাকেজ কি কর্মসংস্থানকে প্রতিরক্ষণের জন্য, না রপ্তানিমুখী শিল্পকে সহায়তা করার জন্য এ বিষয়টি স্পষ্ট করা দরকার।

পিপিপি উদ্যোগের ক্ষেত্রে ড. ইসলাম প্রকল্প ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব তুলে ধরেন। পিপিপি প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিসহ এসব প্রকল্পে সরকারের ভর্তুকির প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটিও উদ্বেগের বিষয় বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, সরকার যদি চায় যে বেসরকারি উৎপাদকগণ এ থেকে যুক্তিসঙ্গত লাভ করবে এবং একই সাথে সংশিষ্ট পরিসেবার দাম জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা হবে, তাহলে সরকারকে এক্ষেত্রে ভর্তুকি দিতে হবে। জেলাওয়ারী বাজেট তৈরির প্রস্তাবের বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে ড. ইসলাম মন্তব্য করেন যে, এটি বাস্তবায়নের পূর্বে সতর্কভাবে

যাচাইবাছাই য়ের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, একটি জেলার রাজস্বের উৎস চিহ্নিত করা যেমন কঠিন হবে, একই সাথে সরকারি ব্যয়ের সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করাও কষ্টসাধ্য হবে।

পুনর্গঠিত শুল্ক কাঠামোর বিষয়ে ড. ইসলাম বলেন যে, একজন বিনিয়োগকারীর নিকট সম্ভবত আর্থিক প্রণোদনার তুলনায় সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অবকাঠামোর উপস্থিতি, বিশেষ করে জ্বালানি ও বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, করের হার হ্রাস করলে তা বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে না, বরং এক্ষেত্রে সরকারের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ কমবে।

প্রধান অতিথির প্রতিক্রিয়া

সংলাপে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব এ এম এ মুহিত, এমপি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, ৫.৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা রক্ষণশীল। তবে তিনি ব্যাখ্যা দেন যে, প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃতপক্ষে ৫.৫ থেকে ৬.০ শতাংশের মধ্যে।

এডিপির আকার প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবিত ৩০,৫০০ কোটি টাকার এডিপির আকারের পক্ষে তার অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি স্বীকার করেন যে, এডিপির আকার তুলনামূলকভাবে বড় এবং এর বাস্তবায়ন করা হবে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। তবে, তিনি আশ্বস্ত করেন যে, সরকার এর পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করবে এবং এডিপি বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পদ্ধতিগত সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

কৃষিতে ভর্তুকির ক্ষেত্রে উদ্বেগের বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদিও সরকার সার ও ডিজেলের নিম্নমূল্য বিবেচনায় নিয়ে এ বরাদ্দের পরিমাণ প্রস্তাব করেছে, তথাপি, যখনই এগুলোর দাম বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে, বরাদ্দের পরিমাণও তখনই বৃদ্ধি করা হবে।

মোবাইল ফোন সেটের ওপর ২৫ শতাংশ সম্পূরক করের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন যে, প্রস্তাবটি এখনও বিবেচনাধীন রয়েছে এবং এ কর প্রত্যাহার করা হতে পারে।

কয়েকজন আলোচক কর্তৃক পিপিপির আওতাধীন প্রকল্পের বিষয়ে, বিশেষ করে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ এবং রাজস্ব ভাগাভাগির ক্ষেত্রে যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে মাননীয় মন্ত্রী একমত পোষণ করেন। সরকার দ্রুত একটি যথাযথ পিপিপি আইন প্রণয়ন করবে এবং এর পদ্ধতিগত দিক নির্ধারণ করবে বলে তিনি জানান। তিনি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণ এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে পিপিপি কার্যক্রম শুরু করার কথা জানান।

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ খাতের বরাদ্দের ক্ষেত্রে আশঙ্কা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করে তিনি মন্তব্য করেন যে, প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে তথ্য ও প্রযুক্তি উন্নয়নে নিজস্ব বরাদ্দ রয়েছে এবং এসব পৃথক পৃথক বরাদ্দ একত্রিত করা হলে এ খাতের তহবিলের পরিমাণ বেশ উলেখযোগ্য।

অর্থমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, প্রণোদনা প্যাকেজ শুধুমাত্র নগদ আর্থিক সহায়তা নয় বরং এতে নীতি-সহায়তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি অবহিত করেন যে, সরকার বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে অর্থনীতির বিভিন্ন পরিবর্তনকে নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করছে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সময়মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করবে।

জেলা বাজেট বাস্তবায়ন অসম্ভব – এ সম্পর্কিত মন্তব্যের সাথে অর্থমন্ত্রী দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, এক বছরের মধ্যে জেলাভিত্তিক বাজেট তৈরি করা সম্ভব নয়, তবে এটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, স্থানীয় সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করে বিকেন্দ্রীভূত বাজেট পদ্ধতির মাধ্যমে জেলা বাজেট তৃণমূল পর্যায়ে অবকাঠামো ও সামাজিক সেবা প্রদান কার্যক্রমকে উন্নত করবে।

অর্থমন্ত্রী এটিও স্পষ্ট করেন যে, অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগটি শুধু এক বছরের জন্যই দেওয়া হবে এবং তা ২০০৯১০ অর্থ বছরের অর্থ বিলের চূড়ান্ত দলিলে নির্দিষ্ট করা হবে।

সমাপনী মন্তব্যে অর্থমন্ত্রী অংশগ্রহণকারীগণকে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান এবং সিপিডিকে এ সংলাপ আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। বাজেটের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার অর্থনীতির পরিধি বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে অর্থমন্ত্রী তার বক্তব্য শেষ করেন।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্য

অধ্যাপক রেহমান সোবহান অর্থমন্ত্রীকে তার সমন্বিত, যুক্তিযুক্ত এবং খোলামেলাভাবে সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের সকল প্রশ্নোত্তরের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশের মত দেশে দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যাবলী এবং ন্যায়বিচারভিত্তিক সমতা নিশ্চিতকরণ যেকোন সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ দুটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল নীতি প্রণয়ন করা উচিত। তিনি মনে করেন, বাজেটসমূহ সাধারণত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেন্দ্রিক ব্যক্তিখাতের অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য খুব সামান্যই প্রণোদনা দিয়ে থাকে। তিনি বলেন, এ সম্ভাবনাময় সম্পদ ব্যবহারের লক্ষ্যে আমাদের মনোযোগকে এদের দিকে ফেরাতে হবে।

পিপিপি উদ্যোগের বিষয়ে অধ্যাপক সোবহান উৎপাদিত পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণের ইস্যু, ভর্তুকি এবং রাজস্ব আয় সংক্রান্ত বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে আইনগত কাঠামো চূড়ান্ত করার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, পিপিপি প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

সংলাপের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করে অধ্যাপক সোবহান সকল অংশগ্রহণকারী, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং সম্মানিত অতিথিকে সিপিডির সংলাপে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি মন্তব্য করেন যে, সংলাপ অনুষ্ঠান বেশ ফলপ্রসূ ও গঠনমূলক ছিল, এবং তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সংলাপে আলোচিত বিভিন্ন ইস্যু নীতিপ্রণেতাদের কাজে সহায়তা করবে, যেহেতু তারা বাজেট প্রস্তাবনাসমূহ পুনঃপরীক্ষা করবেন এবং সংশোধিত বাজেট তৈরি করবেন, যা পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

সংযোজনী

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

তাহমিনা আবেদিন
প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, ডি-নেট

শেখ আহাদুজ্জামান
প্রোগ্রাম অফিসার, এফএও

আবু আহমেদ
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আলী আহমেদ
অ্যাডভাইজর, কোটেকনা এবং
সাবেক সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ফারুক আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক, এমসিসিআই

মাহবুব আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ সরকার

মনজুর আহমেদ
সিনিয়র অ্যাডভাইজার, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

নাজনীন আহমেদ
রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস

সালাউদ্দিন আহমেদ
অধ্যাপক, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়

ফকরুল আহসান
বিভাগীয় প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

শিরিন আক্তার
প্রেসিডেন্ট, কর্মজীবী নারী

কাজী সাইয়েদুল আলম বাবুল
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট গুডস্ অ্যাসোসিয়েশন

এম কে আনোয়ার
সংসদ সদস্য

এম ফজলুল আজিম
সংসদ সদস্য

দিপাল চন্দ্র বড়ুয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রামীণ শক্তি

এম এ বাসেত
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিকেএমইএ

আনোয়ারা বেগম
রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস

মাহমুদা বেগম
পরিচালক, ইআরডি, অর্থ মন্ত্রণালয়

অরূপ কে বিশ্বাস
সিনিয়র অ্যাডভাইজার, নরওয়ে দূতাবাস

শিরীন শারমিন চৌধুরী
সংসদ সদস্য

আব্দুল হাফিজ চৌধুরী
প্রেসিডেন্ট, এমসিসিআই

সোহেল আহমেদ চৌধুরী
সাবেক সচিব এবং চেয়ারম্যান, জনতা ব্যাংক

তৌফিক আহমেদ চৌধুরী
অধ্যাপক এবং চেয়ারম্যান, বিআইবিএম

আহসান খান চৌধুরী
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প্রাণ গ্রুপ

এ মতিন চৌধুরী
সাবেক প্রেসিডেন্ট, বিটিএমএ

আব্দুল মুঈদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান, ব্র্যাক বিডি মেইল নেটওয়ার্ক লি.

আবুল হাসান চৌধুরী
সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

উমা চৌধুরী
পরিচালক, সুপ্রো

নবেন্দ্র দাহাল
চীফ, এডুকেশন ডিভিশন, ইউনিসেফ

মোঃ ইদ্রিস আলী দেওয়ান
সদস্য, এসইআই, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

অ্যারোমা দত্ত
নির্বাহী পরিচালক, পিআরআইপি ট্রাস্ট

নুরুল হক
সদস্য, সিপিডি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং
সাবেক সদস্য, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

কে আর হাসান
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিজেএমএ এবং
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, জেম জুট লি.

এম হাসানুল্লাহ
টিএমএস, বিএডিপি
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)

আবু মামুন হাসমী
হেড অব গভর্নমেন্ট, কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স
গ্রামীণফোন লি.

আরনি হাঘ
ডেপুটি হেড অব মিশন, নরওয়ে দূতাবাস

ওডার হেজজেদাল
সিইও, গ্রামীণফোন লি.

মোঃ ফজলুল হক
প্রেসিডেন্ট, বিকেএমইএ

সৈয়দ আমিনুল হক
প্রধান, গবেষণা ও উন্নয়ন, কোস্ট ট্রাস্ট
দেলওয়ার হোসেন
সহকারী প্রধান, এডিবি

জবদুল হক
ডিরেক্টর, সাবেক ডেপুটি জেনারেল, বিবিএস

মোঃ দেলওয়ার হোসাইন
প্রোগ্রাম ডিরেক্টর
সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপবাংলা দেশ

মোঃ মোফাজ্জল হোসাইন
ডিরেক্টর জেনারেল, আইএমইডি

আনিসুল হক
প্রেসিডেন্ট, এফবিসিসিআই

সাদাত হুসেন
চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন
এবং সাবেক সচিব, কেবিনেট ডিভিশন

টমকো ইনাজাকি
ইকনমিক রিসার্চার, জাপান দূতাবাস

এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

ইফতি ইসলাম
ম্যানেজিং পার্টনার
এশিয়ান টাইগার ক্যাপিটাল পার্টনার

মোঃ রফিকুল ইসলাম
ডেপুটি ইকনমিক অ্যাডভাইজার, অর্থ মন্ত্রণালয়

মেজর জেনারেল শেখ মনিরুল ইসলাম এনডিসি, পিএসসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিআইআইএসএস

মোস্তফা জব্বার
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি

তানভীর শাকিল জয়
সংসদ সদস্য

লায়লা রহমান কবির
সদস্য, সিপিডি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেদারপুর টি কোম্পানি লি. এবং সাবেক সভাপতি, এমসিসিআই

হাবিবুল্লাহ এন করিম
প্রেসিডেন্ট, টেকনোহেভেন গ্রুপ অব কোম্পানিজ এবং প্রেসিডেন্ট, বেসিস

মোস্তফা আবিদ খান
জয়েন্ট চীফ, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

ওয়াজেদুল ইসলাম খান
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

মোঃ জিয়াউল হক খন্দকার
চেয়ারম্যান, এসইসি

বরকাত ই খুদা
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জেন্নজ ্যাকুয়াস
কাউন্সিলর অ্যান্ড হেড অব সেকশন
ডেলিগেশন অব ইউরোপিয়ান কমিশন

বদরুল আলম মজুমদার
সদস্য সচিব, সুজন এবং
কান্ট্রি ডিরেক্টর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

হাবিবুল্লাহ মজুমদার
সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

হাফিজ মজুমদার
সংসদ সদস্য

মোহাম্মদ মেজবাউদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব২, ইআরডি, অর্থ মন্ত্রণালয়

মোঃ আব্দুল হামিদ মিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লি.

নাসরিন আউয়াল মিন্টু
সাবেক প্রেসিডেন্ট
উইমেন এন্টারপ্রেনিওরস্ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

জাবেতা মৌতাফিস
ফার্স্ট সেক্রেটারি, অসএইড

এ এম এ মুহিত, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়

মোস্তফা কে মুজেরী
ডিরেক্টর জেনারেল, বিআইডিএস

আব্দুস সালাম মুর্শেদী
প্রেসিডেন্ট, বিজিএমইএ এবং
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এনভয় গ্রুপ

শাহ্ মোহাম্মদ নাসিম
পরিচালক, এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো

মীরাজ আহমদ নাসির
ম্যানেজার, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং, এসিআই লি.

নারায়ণ চন্দ্র নাথ
রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস

দুর্গা পি পোদিয়াল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিরডাপ

তানভীরুল হক প্রবাল
প্রেসিডেন্ট, রিহ্যাব

মোস্তাফিজুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ

মোঃ রাকিবুর রহমান
প্রেসিডেন্ট, ঢাকা স্টক একচেঞ্জ

মোঃ শহিদুর রহমান
সিনিয়র ইনফরমেশন অফিসার
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সেলিম রায়হান
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এ এস এম রশিদ
অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের ব্যক্তিগত সচিব

মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ
প্রিন্সিপাল, সিভিল সার্ভিস কলেজ

বিমল কুমার সাহা
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস

মোঃ আব্দুস সালাম
জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লি.

আব্দুল হাই সরকার
প্রেসিডেন্ট, বিটিএমএ এবং
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
সোহাগপুর টেক্সটাইল মিলস লি.

জায়েদি সাত্তার
চেয়ারম্যান, পিআরআই বাংলাদেশ এবং
ভাইস চ্যান্সেলর, মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটি

রায়হান শামসী
ডিরেক্টর, গ্রামীণফোন লি.

ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী
সাবেক চেয়ারম্যান
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড একচেঞ্জ কমিশন

সুশীল সীংঘাল
ফার্স্ট সেক্রেটারি, ভারতীয় দূতাবাস

রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ

অ্যাড স্পাইকারস
এফএও রিপ্রেজেন্টেটিভ, বাংলাদেশ

এম সাইদুজ্জামান
সদস্য, সিপিডি বোর্ড অব ট্রাস্টি এবং
সাবেক অর্থমন্ত্রী

বে টিন টুস্সার
রাষ্ট্রদূত, নেদারল্যান্ডস দূতাবাস

মাহফুজ উল্লাহ
সেক্রেটারি জেনারেল, সিএফএসডি

হেথার সি ব্রিভা
চীফ ইকনমিক অ্যান্ড কমার্শিয়াল অফিসার
আমেরিকান দূতাবাস

কিল্যানি বেকারিং ভিনকার্স
ডেপুটি হাই কমিশনার, অস্ট্রেলিয়া দূতাবাস

সাংবাদিকদের তালিকা

মোঃ নাসির আহমেদ
স্টাফ ফটোগ্রাফার, বিডি নিউজ ২৪

রাজিব আহমেদ
রিপোর্টার, দৈনিক মানবজমিন

মোর্শেদ আলম
দিগন্ত টেলিভিশন

জুলফিকার আলী
বিশেষ প্রতিনিধি, এনটিভি

সালাউদ্দিন বাবলু
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক ইনকিলাব

রেজাউল করিম বায়রন
সিনিয়র রিপোর্টার, ডেইলি স্টার

হামিদুল হক
সিনিয়র রিপোর্টার, ইটিভি

রেজাউল করিম
স্টাফ রিপোর্টার, যায় যায় দিন

আবুল কাশেম
দৈনিক মানবজমিন

আবু কায়সার
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক সমকাল

নুরুল হাসান খান
রিপোর্টার, দৈনিক দিনকাল

সালাহউদ্দিন মাহমুদ
সিনিয়র রিপোর্টার, চ্যানেল ওয়ান

সুলতান মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি, ইসলামিক টেলিভিশন

নাজনীন মুন্নী
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক ভোরের ডাক

মানিক মুনতাসীর
ইকনমিক রিপোর্টার, দৈনিক ভোরের ডাক

রেজভী নেওয়াজ
স্টাফ করেস্পন্ডেন্ট, চ্যানেল ওয়ান

সাদেকুর রহমান
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সংগ্রাম

শরিফুউল্লরহমান
উপস্থাপক, বাংলাদেশ বেতার

শারমীন রিনভী
সিনিয়র রিপোর্টার, বাংলা ভিশন

গোলাম কাদির রবু
স্টাফ রিপোর্টার, আরটিভি

গোবিন্দু শীল
বার্তা সম্পাদক, এবিসি রেডিও এফএম ৮৯.২

খাজা মঈনউদ্দীন
সিনিয়র স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, নিউ এজ

শাহরিয়ার জামান
রিপোর্টার, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস

সংযুক্তি ২

বাজেট সংলাপ ২০০৯

চট্টগ্রাম[*]

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির (বিইএ) চট্টগ্রাম অধ্যায় যৌথভাবে "বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনা এবং ২০০৯১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট বিশেষণ" শীর্ষক একটি আঞ্চলিক সংলাপের আয়োজন করে। ২০০৯১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রস্তাবনার ওপর স্বার্থ সংশিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অভিমত জানতে চট্টগ্রামের হোটেল পেনিনসুলায় ১৬ জুন ২০০৯ তারিখে সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয়।

সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি এবং ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি। সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সম্মানিত অতিথি হিসেবে সংলাপে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির চট্টগ্রাম অধ্যায়ের সভাপতি অধ্যাপক এম সেকান্দার খান সংলাপ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির অতিরিক্ত পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারকবৃন্দ, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, শিক্ষার্থী এবং বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) প্রতিনিধিগণ সংলাপে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা এ প্রতিবেদনের শেষে সংযোজনীতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অধ্যাপক এম সেকান্দার খান বাজেট সম্পর্কিত এ সংলাপটির আয়োজক সহ উপস্থিত সকল অতিথি এবং শ্রোতা ও আলোচকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে এই সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তার এই বক্তব্যের পর সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান সংলাপের সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন।

সভাপতির সূচনা বক্তব্য

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান তার সূচনা বক্তব্যে উলেখ করেন যে জাতীয় বাজেট চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়ায় এ ধরনের অংশীদারিত্বমূলক আলোচনা স্বার্থ সংশিষ্ট সকল পক্ষের জন্যই বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং একান্তভাবে কাম্য। তিনি সংলাপে যোগ দেওয়ায় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সম্মানিত অতিথি এবং আমন্ত্রিত আলোচকবৃন্দ ও স্বার্থ সংশিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদেরকে

---

[*] সংলাপ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন সৌর দাশগুপ্ত, রিসার্চ ইন্টার্ন, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)।

স্বাগত জানান। সংলাপ আয়োজনে সহায়তা করার জন্য তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির চট্টগ্রাম অধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান। অধ্যাপক রহমান এ ধরনের আঞ্চলিক পর্যায়ের পরামর্শমূলক আলোচনার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এই সংলাপের মাধ্যমে মূল্যবান অভিমত পাওয়া যাবে যা জাতীয় সংসদে বাজেট আলোচনার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন যে সংলাপে যেসব মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণমূলক বক্তব্য উঠে আসবে, তা নীতিনির্ধারকদের নজর কাড়বে এবং বাজেট চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন সংলাপটি আয়োজনে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির চট্টগ্রাম অধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন শুরু করেন। বাজেটের বিশেষণ সম্পর্কিত প্রবন্ধটি তৈরিতে সহায়তা করায় তিনি সিপিডির সহকর্মীবৃন্দদের কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, এই সংলাপ সুশীল সমাজের সকল পক্ষের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর তাদের অভিমত ও পর্যবেক্ষণ জানানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

পরিবর্তনের মঞ্চ (প্ল্যাটফর্ম)

ড. খাতুন তার মূল প্রবন্ধে বলেন যে, অর্থমন্ত্রী ২০০৯১০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটকে ‘পরিবর্তনের একটি মঞ্চ বা প্ল্যাটফর্ম’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এবং এতে দুটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। প্রথমত, ‘রূপকল্প ২০২১’ বিবেচনায় রাখা ও জনগণের উচ্চমাত্রার প্রত্যাশা মেটানো। দ্বিতীয়ত, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা। ড. খাতুন জানান, ২০০৮০৯ অর্থবছরের বাজেটের ওপর দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় সিপিডি এ লক্ষ্যগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে কয়েকটি চ্যালেঞ্জের কথা উলেখ করেছিল। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিল – (১) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত করতে বিনিয়োগ বাড়ানো; (২) খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি খাতে জোর দেওয়া; (৩) বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার বিরূপ প্রভাব থেকে বৈদেশিক খাতকে রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ; (৪) প্রস্তাবিত বাজেটের ঘাটতি সংস্থানে সরকারি অর্থায়ন জোরদারকরণ; এবং (৫) পরিবর্তনের সনদ বাস্তবায়নে সরকারি প্রশাসনকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করা।

ড. খাতুন বলেন, উপুর্যপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অব্যাহত মন্দার পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ সন্তোষজনকভাবে গত ২০০৮০৯ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ৫.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের দাম হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির চাপ যেমন কমেছে, তেমন স্থানীয় টাকার বিনিময় হারও স্থিতিশীল অবস্থায় থেকেছে। তবে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিবেশ তেমন উপযুক্ত ছিল না এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার বিরূপ প্রভাব ভবিষ্যতে এ পরিস্থিতিকে আরও খারাপের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এক্ষেত্রে সিপিডির দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে ড. খাতুন বলেন, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে প্রস্তাবিত বাজেট যতটা সম্প্রসারণমূলক হওয়া দরকার ছিল, ঠিক ততটা কিন্তু হয়নি।

প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাস

ড. খাতুন যুক্তি দেখিয়ে বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে ২০০৯১০ অর্থবছরের জন্য জিডিপিতে ৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা কিছুটা রক্ষণশীল। কারণ এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সামষ্টিক অর্থনীতিতে ব্যতিক্রমধর্মী কোন দক্ষতার তেমন দরকার পড়ার কথা নয়। তবে কৃষি খাতে ২০০৮০৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জনে মোটামুটি তেজি ধারা দেখা গেলেও (কৃষি খাতে ৪.৭ শতাংশ এবং

শস্য খাতে ৫.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি) ২০০৯১০ অর্থবছরে এই খাতে উলেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করাটা হবে এক বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, ২০০৯১০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বিনিয়োগের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা জিডিপিতে বিনিয়োগের অবদান হার কমাবে বলেই মনে হচ্ছে। আলোচ্য অর্থবছরে মূলধনের উৎপাদনশীলতা আরও কমতে পারে এমন ইঙ্গিত দিয়ে বর্ধিত মূলধনউৎপাদন হারের (আইসিওআর বা আইকর) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪.৩ শতাংশ। ২০০৯১০ অর্থবছরে সরকারি বিনিয়োগ উলেখযোগ্য হারে বাড়ানোর কথা বলা হলেও এর সাথে সঙ্গতি রেখে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়ার পরিবর্তে কমার ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জিডিপিতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের হার ২০০৮০৯ অর্থবছরের ১৯.৬ শতাংশের চেয়ে কমতে পারে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

ড. খাতুন তার বক্তব্যে বাংলাদেশে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব কী হতে পারে তা উলেখ করেন। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলিত তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জানান, বিশ্ব অর্থনীতি ২০০৮০৯ অর্থবছরে ১.৩ থেকে ১.৭ শতাংশ সংকুচিত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ২০০৯১০ অর্থবছরে বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে এবং ২ শতাংশের কিছু কম-বেশি প্রবৃদ্ধি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব বাংলাদেশের বৈদেশিক খাতের ওপর মারাত্মকভাবে পড়তে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, উন্নত দেশগুলোতে চাহিদা না বাড়লে ২০০৯১০ অর্থবছরে বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তিনি বলেন, সরকার বাজেটে রপ্তানি ও আমদানি খাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১২.৫ শতাংশ ও ১৩ শতাংশ প্রাক্কলন করেছে। প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ১০.৬ শতাংশ। এক্ষেত্রে ড. খাতুন মনে করেন যে, বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব কতখানি পড়বে তার ওপরই নির্ভর করবে উলেখিত খাতগুলোতে কী হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

রাজস্ব আয়

ড. খাতুন বলেন, সরকার ২০০৯১০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৭৯,৪৬১ কোটি টাকা, যা ২০০৮০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ১০,২৮১ কোটি টাকা বা ১৪.৯ শতাংশ বেশি। সিপিডির প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৯১০ অর্থবছরের মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২০০৮০৯ অর্থবছরের মূল বাজেটের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, ২০০৯১০ অর্থবছরের রাজস্বজিডিপি অনুপাত এবং করজিডিপি অনু পাতের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে যথাক্রমে ১১.৬ শতাংশ ও ৯.৩ শতাংশ। তবে এ দুই অনুপাতের লক্ষ্যমাত্রা ২০০৮০৯ অ র্থবছরের সংশোধিত বাজেটের (১১.২ শতাংশ ও ৯ শতাংশ) প্রায় সমান বলে তিনি উলেখ করেন। এক্ষেত্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ড. খাতুন বলেন, আমদানিমূল্য কমায় ২০০৯১০ অ র্থবছরের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সেটাকে বাস্তবসম্মত বলা যায়। তবে পূর্ববর্তী অর্থবছরের উচ্চ সাফল্যের বিবেচনায় ২০০৯১০ অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলিত করবহির্ভূত রাজস্ব আয়ে ১৩.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাকে তিনি রক্ষণশীল বলে উলেখ করেন। বাজেটের প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৯১০ অর্থবছরের মোট রাজস্ব আয়ের ৭৬.৮ শতাংশ আদায়ের দায়িত্ব বর্তেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওপর। ২০০৮০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এই হার প্রাক্কলন করা হয় ৭৬.৬ শতাংশ।

সরকারি ব্যয়

ড. খাতুন জানান, ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেটে মোট সরকারি ব্যয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা ২০০৮০৯ অর্থবছরের মূল বাজেটের চেয়ে ১৩.৯ শতাংশ এবং সংশোধিত বাজেটের চেয়ে

২০.৯ শতাংশ বেশি। ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১১৩,৮১৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও এডিপিবহির্ভূত ব্যয় ধরা হয়েছে যথাক্রমে ২৬.৮ শতাংশ ও ৭৩.২ শতাংশ। রাজস্ব ব্যয়ের কাঠামো বিশেষণ করে তিনি জানান, সুদ পরিশোধ, বেতন ও ভাতা এবং ভর্তুকি ও বর্তমান হস্তান্তর – এই তিনটি খাত বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ২০০৮০৯ অর্থবছরের ৮৩.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০০৯১০ অর্থবছরে ৮২.২ শতাংশ করা হয়েছে। এর মধ্যে সুদ পরিশোধ এবং বেতন ও ভাতা খাতের ব্যয় যথাক্রমে ১৮.৭ শতাংশ ও ৫.৮ শতাংশ বাড়বে, এবং ভর্তুকি ও বর্তমান হস্তান্তর ব্যয় ০.৫ শতাংশ কমবে বলে ধারণা করা হয়। ড. খাতুন বলেন, সুদ পরিশোধের বিষয়টি নতুন অর্থবছরের জন্য উদ্বেগের কারণ হিসেবে দেখা দিতে পারে।

তিনি বলেন, ২০০৯১০ অর্থবছরের এডিপির আকার ২০০৮০৯ অর্থবছরের মূল এডিপির তুলনায় প্রায় দেড়গুণ বড় হয়ে যেতে পারে। ২০০৯১০ অর্থবছরের এডিপি নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০,৫০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য, তথা বৈদেশিক উৎস থেকে ৪২.১ শতাংশ অর্থায়নের কথা বলা হয়েছে, যা ২০০৮০৯ অর্থবছরের মূল এডিপিতে ছিল ৪৩.৯ শতাংশ। এডিপিতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৫৭.৯ শতাংশ সংস্থান করা হবে। ২০০৮০৯ অর্থবছরের মূল এডিপিতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়নের পরিমাণ ধরা হয় ৫৬.১ শতাংশ। ড. খাতুন ২০০৯১০ অর্থবছরের এডিপিকে দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত, কিন্তু বাস্তবায়নের সক্ষমতা বিবেচনায় খুবই বড় বলে মন্তব্য করেন।

বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন

ড. খাতুন উলেখ করেন যে ২০০৯১০ অর্থবছরে সার্বিক বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের কিছু কম-বেশি হবে। ২০০৮০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সার্বিক ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ২৪,৯৬০ কোটি টাকা যা জিডিপির ৪.১ শতাংশের সমান। নতুন বাজেটে ঘাটতি অর্থায়নে ৫৯.৫৮ শতাংশ অর্থ আসবে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। এর মধ্যে ১৬,৭৫৫ কোটি টাকা বা ৮১.৫ শতাংশ দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ হিসেবে এবং ৩,৮০০ কোটি টাকা ব্যাংকবহির্ভূত উৎস থেকে নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, নতুন বাজেটের ঘাটতি মেটাতে প্রায় ২০০ কোটি মার্কিন ডলার বা ১৩,৮০৩ কোটি টাকার মতো নীট বৈদেশিক সাহায্যের দরকার পড়বে, যা ২০০৮০৯ অর্থবছরের বাজেটের চেয়ে ২৮.৩ শতাংশ বেশি। বাজেট সহায়তা হিসেবে অর্থ না চাওয়া হলে মোট ২.৬ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়াটা কঠিন হয়ে পড়বে।

রাজস্ব পদক্ষেপসমূহ

দেশের আর্থিক খাতের সংস্কারের বিষয়ে ড. খাতুন বলেন, নতুন বাজেটে ব্যক্তিগত আয়ের সীমা পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব নেই। তবে করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ১ লাখ ৮০ হাজার টাকায় নির্ধারণের পাশাপাশি বয়স্ক নাগরিকদের জন্য করমুক্ত আয়ের ক্ষেত্রে তাদের বয়সসীমা বিদ্যমান ৭০ বছর থেকে কমিয়ে ৬৫ বছরে নামিয়ে আনা হয়েছে। ড. খাতুন বাজেটে কৃষি খাতের ক্ষেত্রে করযোগ্য আয়ের সীমা পুরুষদের জন্য ২ লাখ টাকা এবং নারীদের জন্য ২ লাখ ১৫ হাজার টাকায় অব্যাহত রাখায় সরকারের প্রশংসা করেন। তাছাড়া যেসব পেনশনভোগী পেনশনের অর্থ দিয়ে সঞ্চয়পত্র কিনেছেন তাদের আয় করমুক্ত ঘোষণা করায় সেটাকে তিনি সামাজিক ন্যায়বিচারের নিদর্শন বলে আখ্যায়িত করেন।

ড. খাতুন বলেন, বাজেটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) জন্য মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) অব্যাহতির সীমা ২৪ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে, যা এই খাতের উদ্যোগ বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করবে। তিনি জানান, অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বিশেষভাবেই

উলেখ করেছেন যে ট্যাক্স হলিডে বা কর অবকাশ সুবিধার মেয়াদ আগামী ২০১১১২ অর্থ বছরের পরে আর বাড়ানো হবে না।

ড. খাতুন বাজেটে গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ যেমন অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ, খাতভিত্তিক বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

উপসংহার

ড. খাতুন বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলোর ওপর জোর দিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা শেষ করেন। তিনি বলেন, ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান পাওয়াটা বড় চ্যালেঞ্জ নয়, বরং আহরিত সম্পদের সঠিক ব্যবহারই হবে বাজেটের বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে তিনি কতিপয় বিষয় উলেখ করেন:

- অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় উন্নয়নের সর্বোচ্চ সুফল পেতে আর্থিক ও রাজস্ব খাতের মাধ্যমে সঠিকভাবে সরকারি ব্যয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।
- রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতির মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, নতুন অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ উলেখযোগ্য হারে বেড়ে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে চাপের মুখে পড়তে হতে পারে।
- সরকারি আর্থিক কাঠামোর সম্পৃক্ততা জোরদারকরণের মাধ্যমে রাজস্ব খাতে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে হবে। এর অন্যথা হলে প্রস্তাবিত বাজেটে নেওয়া সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতিমালা বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে।
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নিয়োজিত প্রশাসনের সার্বিক দক্ষতা বাড়াতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পদক্ষেপ নিতে হবে।

উন্মুক্ত আলোচনা

একটি উচ্চাভিলাষী বাজেট

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানোর কারণে ২০০৯১০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার তথা মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১৩,৮১৯ কোটি টাকা। যে কারণে সিপিডি ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির চট্টগ্রাম অধ্যায়ের আয়োজিত এ সংলাপে যোগ দেওয়া আলোচকদের অনেকেই নতুন বাজেটকে উচ্চাভিলাষী বলে মন্তব্য করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম সিপিডির বিশেষণের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন যে, বাজেট খুব সম্প্রসারণমূলক নয়। তিনি নতুন সরকারের দেওয়া প্রস্তাবিত এ বাজেটের প্রশংসা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এই বাজেট দেশে আয়ের পুনর্বণ্টন নিশ্চিত করার মাধ্যমে আয় বৈষম্য দূর করতে সহায়ক হবে। তিনি আরও বলেন যে, এডিপির আকার যেহেতু জিডিপির মাত্র ৪ শতাংশের সমান সেহেতু বাজেটকে উচ্চাভিলাষী বলা যৌক্তিক নয়।

সংলাপের সম্মানিত অতিথি এবং সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বাজেটকে সম্প্রসারণমূলক আখ্যায়িত করে বলেন, জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ হতে হবে। প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়ন করাটা সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

বাজেট বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

সংলাপে অংশগ্রহণকারী আলোচকদের অনেকেই বলেন, সরকারের প্রশাসনযন্ত্র, অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদার ও স্বার্থ সংশিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বয় ও সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপরই মূলত নির্ভর করবে বাজেটের বাস্তবায়ন। অতীত অভিজ্ঞতায় সব সময়ই বাজেট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় দুর্বলতা লক্ষ করা গেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যোতি প্রকাশ দত্ত এডিপি বাস্তবায়ন ও বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সেজন্য তিনি শুরু থেকেই বাজেটে বরাদ্দ অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখার ওপর জোর দেন।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী সুলতান মাহমুদ বলেন, উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দক্ষতার সঙ্গে এডিপি বাস্তবায়ন করা জরুরি। তিনি আশা করেন যে সফলভাবে বাজেট বাস্তবায়নের জন্য গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত এই সরকার নীতিমালায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।

চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (সিসিসিআই) সাবেক সভাপতি প্রকৌশলী আলী আহমেদ এডিপি বাস্তবায়নে সচরাচর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব থাকায় আগামী অর্থবছরেও এ ব্যাপারে একই ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি প্রস্তাবিত সকল প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের একটি অংশ পরিকল্পনার জন্য রাখার পরামর্শ দেন।

সিসিসিআইএর অপর সা বেক সভাপতি সাবেক সভাপতি আবুল কালাম বিলম্ব না করে কীভাবে এডিপি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া উন্নত করা হবে সে ব্যাপারে সরকারকে পরিষ্কার বক্তব্য প্রদানের পরামর্শ দেন। এজন্য তিনি একটি নিবেদিতপ্রাণ ও আন্তরিক সংসদীয় কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাহরিন ফেরদৌসী এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ হওয়ার বিষয়ে জোর দেন। তিনি আরও বলেন, এডিপি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নমনীয় হওয়া উচিত যাতে মধ্যমেয়াদে সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায়।

জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা: মিশ্র প্রতিক্রিয়া

ঘোষিত বাজেটে প্রাথমিকভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ শতাংশে প্রাক্কলন করা হয়। পরবর্তীতে অর্থমন্ত্রী এ ব্যাপারে একটি ব্যাখ্যা দিয়ে জানান যে, প্রকৃতপক্ষে জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৫.৫ শতাংশ থেকে ৬.০ শতাংশ। সংলাপের আলোচকদের কেউ কেউ জিডিপি প্রবৃদ্ধির এ লক্ষ্যমাত্রাকে রক্ষণশীল বলে মন্তব্য করেন।

ড. মইনুল ইসলাম বলেন, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই জিডিপিতে সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধির নিম্ন হার ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতি শিগগিরই ঘুরে দাঁড়াবে এবং এর প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিও চাঙ্গা হয়ে উঠবে। ফলশ্রুতিতে, ২০০৯১০ অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বেশি হবে ।

অন্যদিকে, প্রকৌশলী আলী আহমেদ বলেন, জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ শতাংশে প্রাক্কলন করাটা বাস্তবসম্মত হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

অপর দিকে অধ্যাপক জ্যোতি প্রকাশ দত্ত আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, চলমান বৈশ্বিক মন্দার পরিস্থিতিতে জিডিপিতে ৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে। তিনি মনে করেন, স্বল্পমেয়াদে বৈশ্বিক অর্থনীতির মন্দা আরও খারাপের দিকে যেতে পারে, এবং যদি তা হয় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে যেহেতু এখনও অনিশ্চয়তা রয়ে গিয়েছে, সেহেতু নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

অপ্রদর্শিত আয় বৈধকরণ

২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে অপ্রদর্শিত আয় বৈধকরণের সুযোগ দেওয়ার বিরোধিতা করেন অনেকেই। তবে কেউ কেউ আবার এটি সমর্থন করেন। যে কারণে বিষয়টি নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। আলোচকদের অনেকেই বাজেটে দেওয়া এই সুযোগকে নিয়মিত করদাতাদের প্রতি অন্যায় এবং যারা কর ফাঁকি দেয় ও অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। সরকার অপ্রদর্শিত আয়ের বিভিন্ন উৎসকে আলাদাভাবে উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ হয়েছে বলে আলোচকদের অধিকাংশই ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ড. মইনুল ইসলাম বলেন, সব সরকারই এই পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে বর্তমান সরকারও একই পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তিনি হতাশা ব্যক্ত করেন। অপ্রদর্শিত আয়কে আবাসন খাতে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া উচিত নয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

প্রকৌশলী আলী আহমেদ বলেন, প্রায় সকলেরই কোন না কোনভাবে কিছু অপ্রদর্শিত আয় রয়েছে। সরকার রাজনৈতিক আপোষের কারণে এ সুযোগ দিয়ে থাকতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, অপ্রদর্শিত আয়ের উৎসগুলোর মধ্যে সরকারের পার্থক্য টানা উচিত ছিল। তিনি মনে করেন, ১০ শতাংশ জরিমানা দিয়ে অপ্রদর্শিত আয়কে বৈধ করার সুযোগ দেওয়া সৎ ও নিয়মিত করদাতাদের প্রতি সরকারের একটি অন্যায্য আচরণ। যারা অপ্রদর্শিত আয়ের মালিক তারা বাজেটে এহেন সুযোগ পাওয়ায় প্রথম দুই বছরে নিরুৎসাহিত হবেন এবং চূড়ান্ত বছরে গিয়ে অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করবেন বলে প্রকৌশলী আলী আহমেদ আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

আয়কর আইনজীবী জনাব জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরি আবাসন খাতে, বিশেষ করে গুলশান ও বনানীর মতো অভিজাত এলাকাগুলোর অ্যাপার্টমেন্ট কেনার ক্ষেত্রে অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়ার দ্বিমত পোষণ করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন বলেন, ১০ শতাংশ জরিমানা দিয়ে অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ মানুষের মধ্যে কর ফাঁকি দেওয়া এবং আইন লঙ্ঘন করার প্রবণতাকে উৎসাহিত করবে।

প্রকৌশলী সুলতান মাহমুদ অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তকে আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে সরকার নির্দিষ্ট কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর দাবীর কাছে আত্মসমর্পণ করলো। এ সুযোগ দেওয়ার পক্ষে যত যুক্তিই দেখানো হোক না কেন, এটি নিঃসন্দেহে হতাশাজনক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জনাব আবুল কালাম এ বিষয়ে বলেন, মাত্র এক বছরের জন্যই অপ্রদর্শিত আয় বৈধকরণ, এবং তা কেবলমাত্র বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতেই বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া উচিত।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী জানান, দেশে ১৯৭৬৭৭ অর্থ বছর থেকেই অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেই থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ২৪,০০০ কোটি টাকা বৈধ করা হয়েছে। সেজন্য এ সুযোগ আর দেওয়া উচিত নয় বলে তিনি পরামর্শ দেন।

সাবেক সাংসদ বেগম রোজী কবীর বলেন, অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ দেওয়ার কারণে দেশে ধনী ও গরিবের মধ্যকার পার্থক্য আরও বাড়বে। সরকার কোন এক আপোষের কারণে এমনটি করে থাকতে পারে বলে তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

তবে, সাবেক এমএলএ জনাব আবু সালেহ মনে করেন, অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ দেওয়ার ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে এবং এতে দেশে বিনিয়োগও বাড়তে পারে।

বিদ্যুৎ খাত শক্তিশালীকরণ

বিদ্যুৎ খাতকে বর্তমানে দেশের সবচেয়ে সমস্যাগ্রস্ত খাত বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। সরকার যদি এই খাতকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে দেশের উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। সেজন্য সংলাপে আলোচকরা সরকারকে দেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জনে দ্রুত বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় উন্নতি সাধনের আহ্বান জানান।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে জোর দিয়ে ড. ইসলাম বলেন, এ খাতকে সরকারের 'অগ্রাধিকারমূলক খাত' হিসেবে ঘোষণা করা উচিত ছিল। অর্থনীতিতে শিল্পায়ন জোরদার করতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তিনি বিদ্যুৎ খাতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) কাজ করার বাজেট প্রস্তাব সমর্থন করেন। তিনি বলেন, এর ফলে পুঁজিবাজারের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম মামুন বলেন, যেহেতু যেকোন উন্নয়নশীল দেশে শিল্পায়নে বিদ্যুতের ভূমিকা অপরিহার্য সেহেতু এই খাতের উন্নয়নে সম্ভাব্য সকল বিকল্প পদক্ষেপসমূহ বিবেচনা করা দরকার।

প্রকৌশলী এ বি এম বাসেত বলেন, দেশে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকারকে অবশ্যই আরও নীতি সহায়তা দিতে হবে। কারণ দেশের প্রায় অধিকাংশ শিল্পই বিদ্যুৎ ও গ্যাস সমস্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাজেটে বিদ্যুৎ খাতে বিদ্যমান ২২ শতাংশ সিস্টেম লস কমানোর ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ না থাকায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

জনাব বাসেত আরও বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির গুণগত মান কমেছে। এ খাতে দক্ষতা বাড়াতে সতর্কতার সঙ্গে তদারকি কার্যক্রম চালাতে হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস বাড়াতে পারলে তা বিদ্যুৎ সংকট লাঘবে সহায়ক হবে। সেজন্য বাজেটে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার প্রশংসা করেন আলোচকগণ।

ইন্টেগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (আইডিএফ) নির্বাহী পরিচালক জহিরুল আলম বলেন, বাজেট প্রস্তাবের সুবাদে সমাজের স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি সুবিধা পাওয়ার সুযোগ বাড়বে। এটি বিশেষ করে বর্তমানে জাতীয় গ্রিডের বাইরের এলাকাগুলোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ড. মইনুল ইসলাম সৌর বিদ্যুৎ প্যানেলের মতো এলপিজি সিলিন্ডার ও সিএনজি কিটস আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কহার হ্রাস কিংবা সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের সুপারিশ করে বলেন, এ ধরনের সুবিধা দেওয়া হলে তা দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াবে।

সর্বোচ্চ বরাদ্দ: স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত

দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে অগ্রাধিকারমূলক খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ রেখেছে। এ প্রসঙ্গে সংলাপের আলোচকেরা বলেন, এসব খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আবার খাতগুলোতে নেওয়া প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের গুণগতমান বজায় রাখাটাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক সিরাজুদ্দিন বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা যেমন সময়োপযোগী পদক্ষেপ তেমনি দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের জোর দেওয়া উচিত।

অধ্যাপক সিরাজুদ্দিনের বক্তব্য সমর্থন করে বেগম রোজী কবির শিক্ষা খাতে বরাদ্দ আরও বাড়ানোর জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হলে হাসপাতালকেন্দ্রিক সহায়তা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য কর্মসূচি উলেখযোগ্য হারে বাড়াতে হবে।

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মান বাড়াতে সরকারকে এ দুটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ খাতে আরও সম্পদ বরাদ্দের পরামর্শ দেন।

কর্মসংস্থান কর্মসূচি

সংলাপের আলোচকদের অনেকেই দেশে দারিদ্র্যের হার কমাতে কর্মসংস্থান কর্মসূচিকেই প্রধান চাবিকাঠি বলে উলেখ করেন। তাদের কেউ কেউ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নেওয়া কর্মসংস্থান সৃজনমূলক কিছু কর্মসূচিকে অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষী বলে আখ্যায়িত করেন। তবে অধিকাংশ আলোচকই এসব কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে, সরকার সফলভাবে এগুলো বাস্তবায়নে সক্ষম হবে।

জনাব আবু সালেহ কর্মসংস্থান সৃজনের ওপর গুরুত্বারোপ করে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোকে কোন রকম দেরি না করেই বাজেটে প্রস্তাবিত কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করার তাগিদ দেন। তিনি বলেন, সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে এসব কর্মসূচির বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক জ্যোতি প্রকাশ দত্ত বলেন, ২০০৯১০ অর্থবছরে দেশে সাত লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাটা হবে এক দুরূহ কাজ এবং এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে।

অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের নেওয়া নীতিমালার প্রশংসা করেন। তিনি জনপ্রশাসনকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত থেকে এই খাতের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

বাজেটে উলেখিত হয়েছে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলোতে কর্মরত জনবলের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান না করে এগুলোকে বেসরকারিকরণ করা হবে না। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে আলোচকেরা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোতে অতিরিক্ত দায় বাড়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন।

প্রকৌশলী আলী আহমেদ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর ভাগ্য কী হবে তা সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানান সরকারকে। তিনি বলেন, যদি কোন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করা হয় সেক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে সরকারি ব্যয়ের বোঝা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেজন্য তিনি সরকারকে আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেয়ে যৌক্তিক সমাধানের পথ খোঁজার পরামর্শ দেন।

তৈরি পোশাক খাত

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক সহসভাপতি নাসিরউদ্দীন চৌধুরী বলেন, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে দেশের তৈরি পোশাক খাতে মারাত্মক প্রভাব পড়লেও বাজেটে এই খাতে আলাদা করে সহায়তার জন্য কোন পদক্ষেপ নেই। তিনি বলেন, ভারত ও ভিয়েতনাম সহ বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলো পোশাক শিল্পে মন্দা মোকাবেলায় এ খাতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করছে। সরকার যদি এ ধরনের নীতিসহায়তা না দেয়, তাহলে দেশের তৈরি পোশাক শিল্প লোকসানের মুখে পড়বে বলে তিনি জানান।

কর ও ভ্যাট

জনাব জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, নতুন বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের ২৯.৪ শতাংশ আয়কর খাত থেকে আসবে বলে যে লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করা হয়েছে তা উৎসাহব্যঞ্জক। তিনি বলেন, জনগণের ওপর পরোক্ষ করের চেয়ে প্রত্যক্ষ করের প্রভাব কম পড়ে। জনাব চৌধুরী করভিত্তি ও করের আওতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রশংসা করেন। তবে এক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরগুলোর দিকে বেশি জোর দেওয়া উচিত বলে তিনি উলেখ করেন। গত অর্থবছরে নিবন্ধিত করদাতাদের মধ্যে মাত্র ২৫ শতাংশ আয়কর বিবরণী দাখিল করে। এ প্রসঙ্গে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, এই হার কীভাবে বাড়ানো যায় সরকারকে অবশ্যই সে উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্য

সংলাপের সম্মানিত অতিথি সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, প্রস্তাবিত বাজেট অতিমাত্রায় সম্প্রসারণমূলক নয়। এতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা ঐতিহাসিকভাবেই গত এক দশকে লক্ষ করা গেছে। সেজন্য বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ শতাংশে প্রাক্কলন করাটা এই সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার বড় কোন নজির নয়। তিনি বলেন, সরকার কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মসূচিগুলো বাড়ালেও ৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়টি বিবেচনা করলে এসব প্রকল্পগুলো থেকে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া কঠিন হবে।

জনাব খসরু চৌধুরী বাজেট বাস্তবায়নের বিষয়ে জোর দেন। তিনি বলেন, বাজেট বাস্তবায়ন করাটাই হবে সরকারের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ। বাজেট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ওপর নজরদারির জন্য তিনি পরিবীক্ষণ কমিটি হিসেবে একটি সংসদীয় কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন।

জনাব খসরু চৌধুরী বাজেটে কর অবকাশ সুবিধা সমর্থন করে বলেন, কালো টাকা বৈধ করার সুযোগ দেওয়ার চেয়ে কর অবকাশ সুবিধা অব্যাহত রাখা উচিত। কালো টাকা বৈধ করার সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাবটি দেশের সাধারণ জনগণ সমর্থন করবে না বলে তিনি উলেখ করেন। এছাড়াও তিনি বাজেটে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাবনা উলেখ না থাকায় হতাশা ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নশীল অর্থনীতির স্বার্থে একটি সমন্বিত শিল্পনীতি অপরিহার্য।

বিশেষ অতিথির মন্তব্য

সংলাপ অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি, ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি বলেন ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেটে প্রকৃতপক্ষে জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৫.৫ শতাংশ থেকে ৬.০ শতাংশ। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে চলমান মন্দার প্রভাব এবং দেশে বিনিয়োগে অনাস্থা বিবেচনায় নিয়ে তবেই সরকারকে জিডিপির একটি সীমা উলেখ করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হয়েছে।

জনাব মাহমুদ অর্থমন্ত্রীকে একটি সুপরিকল্পিত বাজেট দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এ বাজেটে রাজস্ব আহরণের যে লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করা হয়েছে তা খুব বেশি বড় নয়। এই লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জিত হলেও তা প্রাক্কলিত মোট রাজস্ব ব্যয়ের চেয়ে কম হবে এবং রাজস্ব বাজেটে ঘাটতি থাকবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্থায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ আহরণ ও ঋণগ্রহণ করার পাশাপাশি বিদেশি সাহায্য ও কারিগরি সহায়তা নিতে হবে।

দক্ষতার সঙ্গে বাজেট বাস্তবায়নের বিষয়ে সংসদীয় কমিটিগুলোর অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিত বলে মত দেন জনাব মাহমুদ। তিনি বাজেট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নিবিড় তদারকির ব্যবস্থা করা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের আহ্বান জানান।

রাজনৈতিক আপোষের কারণে অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে বলে সংলাপে যে মত উঠে এসেছে সেটির সঙ্গে জনাব মাহমুদ দ্বিমত পোষণ করেন। তবে তিনি বলেন, সরকারের এ সিদ্ধান্ত অপ্রদর্শিত আয় উপার্জনকারীদেরকে প্রথম দুই বছরে তা প্রদর্শন বা বৈধ না করার ব্যাপারেই উৎসাহিত করবে। সেজন্য মাত্র এক বছরের জন্য এই সুযোগ দেওয়া উচিত। একই সঙ্গে অপ্রদর্শিত আয় আবাসন খাতে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া উচিত নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

জনাব মাহমুদ বলেন, বিদেশ থেকে বাংলাদেশীদের পাঠানো প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাড়াতে আরও কিছু বৈধ চ্যানেল বা উপায় খুঁজে বের করা উচিত। এতে করে প্রবাসীদের অনির্ভরযোগ্য চ্যানেলে অর্থ পাঠানোর ঝুঁকিই কমাবে না, দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বাড়াবে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, বিদেশে কর্মরত শ্রমশক্তি বিপুল পরিমাণ প্রবাসী আয় পাঠিয়ে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখছে। সুতরাং তাদেরকে যথাযথ সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে সরকারের আরও আন্তরিক হওয়া উচিত।

জনাব মাহমুদ দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন করে সরকারের গ্যাস উত্তোলনের কাজ শুরু করা উচিত। অতীতে এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে তিনি জানান।

ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সাংসদদের ভূমিকা সংক্রান্ত চলমান বিতর্ক প্রসঙ্গে বলেন স্থানীয় সরকার কাঠামোতে সাংসদদেরকে উপদেষ্টা করা হলে তা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটাবে বলে যে মত রয়েছে, তা ঠিক নয়। তিনি বলেন, সংসদই হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক

ফোরাম। আর এই ফোরামের প্রতিনিধিরা তথা সংসদ সদস্যরা সাধারণত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের চেয়ে দ্রুত কাজ সম্পাদন করতে পারেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

প্রধান অতিথির ভাষণে শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া রাজধানী ঢাকার বাইরে এ ধরনের একটি সংলাপের আয়োজন করায় সিপিডি ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির চট্টগ্রাম অধ্যায়কে প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সংলাপে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধটি খুবই উচ্চমানের, যেখানে ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেটের প্রধান বিষয়গুলোর অন্তর্নিহিত দিকগুলো সবিস্তারে উঠে এসেছে। বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাবের ওপর মূল্যবান অভিমত দেওয়ার জন্য তিনি বিশেষ অতিথি, সম্মানিত অতিথি ও আলোচকবৃন্দদের ধন্যবাদ জানান।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, অর্থনীতি হচ্ছে সমাজের ভিত্তি ও বুনিয়াদ, যাতে জনকল্যাণের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সেজন্য সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সে লক্ষ্য অর্জনে প্রথম পদক্ষেপটি হলো ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেট।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটের রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে দেশে শিল্পায়নে সহায়তা প্রদান। সে অনুযায়ীই এ বাজেটে শিল্প খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে বেসরকারি খাতকে তাদের অবস্থান থেকে যথাযথ ভূমিকা পালন করে যেতে হবে। সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টায় শিল্পায়ন জোরদার হলে তাতে শ্রমশক্তিও উপকৃত হবে। এ লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ ও প্রণোদনা প্রয়োজন তা বাজেটের নীতিমালায় প্রতিফলিত হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বাজেট বাস্তবায়নে বর্তমান জনপ্রশাসনের সক্ষমতা নিয়ে সংলাপে আলোচকেরা যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সে ব্যাপারে শিল্পমন্ত্রী তার নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সরকার ইতিমধ্যে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বাড়াতে ও বাজেটের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সংস্কার পদক্ষেপ নিয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী বাজেটের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংলাপে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়নি বলে উলেখ করেন। তিনি বলেন, সরকার তথ্যপ্র যুক্তি ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়নে বাজেটে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা সহ বিভিন্ন নীতিসহায়তার পদ ক্ষেপ নিয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে; এ খাতে ভ্যাট অব্যাহতির সীমা বাড়ানো সহ প্রয়োজনীয় নীতি-সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, জাতির জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন বাজেটে প্রয়োজনীয় সব নীতি-সহায়তারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের উলেখযোগ্য নীতিগত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ভর্তুকি প্রদান করা সহ কৃষি খাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ রাখা। এসব পদক্ষেপের ফলে নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতির মন্দা চলতি বছরের পরেও অব্যাহত থাকবে। পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোতেই প্রধানত বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব পড়লেও, বাংলাদেশকে এর প্রভাব মোকাবেলা করতে হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। তিনি আস্থার সঙ্গেই বলেন যে, বাজেটে যেসব প্রণোদনা প্যাকেজ বা কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে সেগুলো দেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার এবং রপ্তানিকারকেরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেগুলো মোকাবেলায় সহায়ক হবে।

সবশেষে, শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া বাজেটের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে অধিকতর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সংশিষ্ট সকল পক্ষের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আলোচনায় মতামত দেওয়া সহ এ সংলাপের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্য

সংলাপের সঞ্চালক বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির চট্টগ্রাম অধ্যায়ের সভাপতি অধ্যাপক এম সেকান্দার খান তার সমাপনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়াকে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তার সুচিন্তিত মতামত পেশ করার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে তিনি সংলাপে যোগ দেওয়া বিশেষ অতিথি ও সম্মানিত অতিথি সহ সকল আলোচকবৃন্দদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক এম সেকান্দার আলোচনায় উঠে আসা উলেখযোগ্য বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যদি মূল্যস্ফীতির কথা বিবেচনা করা হয় তাহলে আকারের দিক থেকে ২০০৯১০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটকে উচ্চাভিলাষী বলা যাবে না। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন করা হয়েছে তা মোটামুটি রক্ষণশীলই বটে এবং এতে সরকারের রাজস্বনীতির প্রতিফলন ঘটেনি।

অধ্যাপক এম সেকান্দার সংলাপের আলোচকদের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন, সরকারের সামনে প্রস্তাবিত বাজেটের বাস্তবায়নটাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ বাজেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী অর্থবছরে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পেতে হলে শুরু থেকেই সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, দেশের সাধারণ জনগণের জন্য বাজেটের সুফল নিশ্চিত করতে বিরোধী দলও সরকারকে সহযোগিতা করবে।

অধ্যাপক খান বলেন, সাংসদদেরকে স্থানীয় সরকারের উপদেষ্টা করা হলে জনগণ উপকৃত হবে না। কারণ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরাই তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত যেতে পারেন, যা সাংসদদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে সম্পদ বা অর্থ বিতরণ ব্যবস্থা স্থানীয় সরকারের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে তিনি অভিমত দেন।

অধ্যাপক সেকান্দার খান বাজেটে কর অবকাশ সুবিধা আর না দেওয়াকে সরকারের একটি ভালো সিদ্ধান্ত আখ্যায়িত করে বলেন, ইতিমধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এ সুবিধা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তিনি সরকারের রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করভিত্তি সম্প্রসারণের সুপারিশ করেন।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের বিষয়ে জোর দিয়ে অধ্যাপক সেকান্দার বলেন, এটি সরকারের সদিচ্ছামূলক ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। তবে এরূপ কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে একটি আইনগত কাঠামোও অপরিহার্য বলে তিনি উলেখ করেন।

পরিশেষে, অধ্যাপক এম সেকান্দার খান আবারও প্রধান অতিথি সহ বিশেষ ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং আলোচকদেরকে সংলাপে যোগ দিয়ে তাদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, যেহেতু সিপিডি ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি অরাজ নৈতিক সংস্থা, সেহেতু বাজেট নিয়ে আলোচিত এ সংলাপকে অবশ্যই আন্তরিক ও নিরাবেগ প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সংলাপে উঠে আসা অভিমত ও সুপারিশগুলো নীতিনির্ধারকেরা মনোযোগ সহকারে আমলে নেবেন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিয়ে উপকৃত হবেন।

সংযোজনী

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

আলী আহমেদ
সাবেক প্রেসিডেন্ট
চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ফরিদউদ্দিন আহমেদ
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম

মোদাব্বের আহমেদ
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

তাহের আহমেদ
উপাধ্যক্ষ
সাতকানিয়া সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম

জহিরুল আলম
নির্বাহী পরিচালক
ইন্টেগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (আইডিএফ)

মোরশেদ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিএডিসি, চট্টগ্রাম

মোঃ রেফায়েত আলম
সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এ এফ এম আওরঙ্গজেব
অধ্যাপক, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বিধান বড়ুয়া
ভাইস প্রেসিডেন্ট, পরিকল্পিত চট্টগ্রাম ফোরাম

দিলীপ বড়ুয়া
মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়

দিলীপ বড়ুয়া
অধ্যক্ষ, আইজিএমআইএস, চট্টগ্রাম

পুলক কান্তি বড়ুয়া
মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর একান্ত সহকারী সচিব

সুভাস চন্দ্র বড়ুয়া
সদস্য, পরিকল্পিত চট্টগ্রাম ফোরাম

এ বি এম এ বাসেত
পরিকল্পিত চট্টগ্রাম ফোরাম

আতাউল করিম চৌধুরী
পোর্ট অপারেশন স্পেশালিস্ট
চট্টগ্রাম বন্দর

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী
সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী এবং
চেয়ারম্যান, সারিনা গ্রুপ

হাসানুজ্জামান চৌধুরী
অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী
আয়কর আইনজীবী

এম আব্দুল মান্নান চৌধুরী
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মাজহারুল হক শাহ্ চৌধুরী
সাবেক সংসদ সদস্য

মনজুর আলম চৌধুরী
ভাইস প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিকেলস্ ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড
ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন

মনসুর এম ওয়াই চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার

নাসিরউদ্দীন চৌধুরী
প্রথম সহসভাপতি, বিজিএমইএ, এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইস্টার্ন অ্যাপারেলস্ লি.

সুস্মিতা চৌধুরী
প্রোগ্রাম অফিসার, ইপসা

সুকুমার দত্ত
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
সরকারি হাজী মুহাম্মদ মুহসীন কলেজ, চট্টগ্রাম

সুজিত কুমার দত্ত
সদস্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার

মৃদুল দে
নির্বাহী সদস্য, বিটিটিএলএমইএ

জ্যোতি প্রকাশ দত্ত
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শাহরীন ফেরদৌসী
সদস্য, ইয়াং ইকোনোমিস্ট সোসাইটি (ইয়েস)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আহমেদ ইউসুফ হারুন
কোঅর্ডিনেটর, আইডিএফ

মোঃ মোস্তাকিম হোসেন
সাধারণ সম্পাদক, ইয়েস
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মোশাররফ হোসেন
সংসদ সদস্য

মোঃ জাকের হোসাইন
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ
কর্ণফুলী কলেজ

আমিরুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মইনুল ইসলাম
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আনোয়ারুল ইসলাম
আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

জামাল নজরুল ইসলাম
এমিরিটাস প্রফেসর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ নুরুল ইসলাম
অনারারি কনসাল জেনারেল অব জাপান

সুরাইয়া ইসলাম
ভিজিটিং স্কলার, আইইউবি

এ কে এম ইসমাইল
যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার এবং
সহকারী অধ্যাপক, ফতেয়াবাদ কলেজ

আফতাবুর রহমান জাফরি
নির্বাহী পরিচালক
ঘাসফুল, চট্টগ্রাম

মোহাম্মাদ সালেহ জহুর
অধ্যাপক, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বেগম রোজী কবির
সাবেক সংসদ সদস্য

এস এম আবুল কালাম
সাবেক সভাপতি
চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

এ টি এম কামরুদ্দিন
এভিপিএস ম্যানেজার
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.

ইরশাদ কামাল খান
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

নূরজাহান খান
মানবাধিকার কর্মী

এম সেকান্দার খান
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, চট্টগ্রাম

দিলরুবা খানম
সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ফাহমিদা খাতুন
অতিরিক্ত পরিচালক, সিপিডি

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি
সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শাশা ডেনিমস লি.

শাকিল মাহমুদ
সভাপতি, ইয়েস
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সুলতান মাহমুদ
সাবেক প্রধান প্রকৌশলী
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

এম মামুন
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ ইলিয়াস মিয়া
সদস্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার

মোহাম্মদ মহসীন
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

গোলাম মাওলা
সভাপতি, কর আইনজীবী সমিতি

শাহ কামাল মোস্তাফা
সদস্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার

অমল বি নাগ
অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ নাসির
প্রোপ্রাইটর, পিয়ারলেস প্লাস্টিক

বেনজির চৌধুরি নিশান
পরিচালক, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড
ইন্ডাস্ট্রি এবং সিওও, গোল্ডেন কন্টেইনারস লি.

মোঃ নূর নবী
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববদ্যালয়

শওকত ওসমান
চেয়ারম্যান
চট্টগ্রাম এ্যাফেয়ার্স, বিকেএমইএ

জেসমিন সুলতানা পারু
প্রধান নির্বাহী, ইলমা

খোরশেদুল আলম কাদেরী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার

আবু মোঃ আতিকুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

লুৎফুর রহমান
সহকারী কমিশনার এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
ডেপুটি কমিশনার অফিস, চট্টগ্রাম

মাহবুব রানা
সভাপতি, চট্টগ্রাম শাকসবজি রপ্তানিকারক সমিতি

আবু সালেহ
সাবেক এমএলএ এবং গণপরিষদ সদস্য

রাজীব সেন
প্রজেক্ট অফিসার, ওয়েভ

আসমা সিরাজুদ্দীন
অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এ এম সিরাজুদ্দিন
সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

কাজী সামসুদ তৌহিদ
সাধারণ সম্পাদক ও ভাইস প্রেসিডেন্ট
পরিকল্পিত চট্টগ্রাম ফোরাম

কাজী শাকিলা ইয়াসমীন
কোষাধ্যক্ষ, ইয়েস
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এস এম আবু জাকের
ভাইস প্রেসিডেন্ট, এক্সিম ব্যাংক

সাংবাদিকদের তালিকা

সুমন বাবু
ফটোগ্রাফার, দৈনিক সংবাদ

রাজেশ চক্রবর্তী
ফটোগ্রাফার, দৈনিক যুগান্তর

আনিসুজ্জামান দুলাল
ফটোসাংবাদিক
দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ

আলী হায়দার
ডেপুটি চীফ রিপোর্টার
দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ

শামিম হামিদ
স্টাফ রিপোর্টার, যায় যায় দিন

আবুল হাসনাত
স্টাফ রিপোর্টার, এটিএন বাংলা

জামাল হাওলাদার
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সংগ্রাম

হাফিজ ইমাম ইনাম
ব্যুরো চীফ, বাংলাদেশ অবজারভার

মোহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম
ব্যুরো চীফ, ডেইলি স্টার, চট্টগ্রাম

রুবেল খান
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সমকাল

মাহমুদ মনি
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক আজাদি

মিয়া মুস্তাফিজ
রিপোর্টার, চ্যানেল আই, চট্টগ্রাম

গোলাম মাওলা মুরাদ
সিনিয়র রিপোর্টার, দিগন্ত টেলিভিশন

মোঃ মিজানুর রহমান
রিপোর্টার, বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

রুহুল আমিন রানা
স্টাফ রিপোর্টার, বিডি নিউজ ২৪

এস এ সজীব
ক্যামেরাম্যান, চ্যানেল আই

আরিস আহমেদ শাহ
স্টাফ রিপোর্টার, এনটিভি, চট্টগ্রাম

কিরণ শর্মা
ব্যুরো চীফ, দৈনিক ভোরের ডাক, চট্টগ্রাম

হাজেরা শিউলী
স্টাফ রিপোর্টার, রেডিও টুডে

আসিফ সিরাজ
সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক পূর্বকোণ

নাসির উদ্দিন
সিনিয়র রিপোর্টার, বাংলা ভিশন

সৈয়দ আব্দুল ওয়াজেদ
স্টাফ রিপোর্টার
দৈনিক ইত্তেফাক, চট্টগ্রাম অফিস

সংযুক্তি ৩

*সংলাপ প্রতিবেদন**

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

সূচনা

চলতি ২০০৯১০ অর্থ বছরে প্রণীত বাজেট নিয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) গত ১২ আগস্ট ২০০৯ তারিখে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে একটি বিশেষণধর্মী সংলাপের আয়োজন করে। এতে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ; সংলাপ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সুশীল সমাজ সহ সংশিষ্টদের পরামর্শ ও মন্তব্যের ভিত্তিতে ২০০৯১০ অর্থ বছরের বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সরকারকে একটি সার্বিক দিক নির্দেশনা দেওয়া। সংলাপে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধটি প্রস্তুত করেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, ডিষ্টিংগুইস্ড্ ফেলো, সিপিডি; জনাব মোঃ আশিক ইকবাল, সিনিয়র গবেষণা সহযোগী, সিপিডি; এবং জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান, সিনিয়র গবেষণা সহযোগী, সিপিডি।

সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে এবং সঞ্চালনে অনুষ্ঠিত এ সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব এ এম এ মুহিত, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির ডিষ্টিংগুইস্ড্ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর অংশগ্রহণকারীদের মতামত প্রকাশের জন্য আলোচনা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারক, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট নাগরিক, রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিরা। সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা এ প্রতিবেদনের শেষে সংযোজনীতে দেওয়া হলো।

সভাপতির সূচনা বক্তব্য

অধ্যাপক রেহমান সোবহান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বাজেটে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বাজেট বাস্তবায়ন। ২০০৯১০ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটকে উচ্চাভিলাষী অভিহিত করে তিনি বলেন, বাজেটে যেসব বিষয় অর্জন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে, সেগুলো, বিশেষ করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন সহজ হবে না।

---

* সংলাপ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন মোঃ তারিকুর রহমান, গবেষণা সহযোগী, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের সক্ষমতা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, পরিকল্পিত বাজেটের সফলতা অর্জনে সরকারকে যেসব বিষয় মোকাবেলা করতে হবে সিপিডি সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের মূল্যবান আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো বের হয়ে আসবে তার মাধ্যমে সরকার উপকৃত হবে। এরপর তিনি ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে তার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

বক্তব্যের শুরুতে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আজকের সংলাপ আয়োজন সিপিডির জাতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বাজেট বিশেষণ সংক্রান্ত ধারাবাহিক কর্মসূচির একটি অংশ। বাজেট বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং সেগুলোতে সফলতা অর্জনে চলমান প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা করাই এই সংলাপের উদ্দেশ্য। "বাজেট বাস্তবায়নই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ" – বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রীর এ উদ্ধৃতি স্মরণ করে ড. ভট্টাচার্য বলেন, সরকারের বাজেট বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণে সহায়তা করতে সিপিডি বরাবরের মতোই তার যথাযথ ভূমিকা রাখবে। এরই প্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এ সংলাপের আয়োজন বাজেট বাস্তবায়ন নিয়ে নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের মতামত প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

ড. ভট্টাচার্য তার উপস্থাপনায় বাজেট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মূল বিষয়গুলো ধাপে ধাপে বিভক্ত করেন। যেমন -ল ক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, ঘাটতি অর্থায়ন, ফলপ্রসূ সরকারি ব্যয় বণ্টন এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)।

প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ও বাজেট বাস্তবায়ন

ড. ভট্টাচার্য বলেন, ২০০৯১০ অর্থ ́বছরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার প্রথমে ৫.৫ শতাংশ ধার্য্য করা হয়েছিল, পরবর্তীতে তা ৫.৫ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংক তার মুদ্রানীতিতে উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির কথা প্রকাশ করেছে। এক্ষেত্রে তিনি চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেন। তবে কৃষি খাতে বিগত দুই অর্থবছরে যে উচ্চ সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার ভিত্তিতে চলতি অর্থবছরের সাফল্য অর্জন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। সেবা ও শিল্প খাতে অতীত প্রবৃদ্ধির হারের প্রবণতা তুলে ধরে তিনি যুক্তি দেন যে, ২০০৯১০ অর্থ ́বছরে প্রবৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে তা অর্জন অনেকাংশে নির্ভর করবে অধুনাতন খাতের সফলতার ওপর। এজন্য তিনি শিল্পোৎপাদন (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতে সফলতা নিশ্চিত করার দিকে অধিক নজর দেওয়া উচিত বলে মনে করেন। মধ্যবর্তী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে (এমটিএমএফ) স্বল্প বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রার কথাও তিনি উলেখ করেন। তিনি আরও বলেন বর্তমান বিনিয়োগ পরিস্থিতিতে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে বর্ধিত মূলধনউৎপাদন অনুপাতের (আইসিওআর বা আইকর) উন্নতি প্রয়োজন এবং মূলধন উৎপাদনশীলতায় প্রবৃদ্ধির অনুপস্থিতিতে বিনিয়োগ হার বাড়ানো দরকার। পাশাপাশি ২০০৯১০ অর্থ ́বছরে এডিপিতে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়ন ঘটাতে হবে, যা ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

ড. ভট্টাচার্য উলেখ করেন যে, অভ্যন্তরীণ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বিবেচনা করে আর্থগাণিতিক বিশেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান রাজস্ব নির্ধারকের প্রভাব সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশেষণে দেখা যায় যে, মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে রাজস্ব আদায়ের ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যউপা ত্ত থেকে তিনি এ উপসংহারে আসেন যে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি অন্যতম প্রভাবশালী নিয়ামক। অন্যদিকে, জিডিপি প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ মাত্রা একটি অন্যতম নির্ধারক। তাই রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর জন্য বিনিয়োগ প্রবাহ অবশ্যই গতিশীল করতে হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো কর রাজস্ব আদায়ে সরকারি খাতে বিনিয়োগের প্রভাব। এজন্য এডিপির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও জিডিপিতে আধুনিক খাত ও কর রাজস্ব আদায়ের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পাওয়া যায়নি, তথাপি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, যেমন -মূল্ য সংযোজন করের (ভ্যাট) আওতা বৃদ্ধি এবং বৃহৎ করদাতা ইউনিটের প্রবর্তন রাজস্ব আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে প্রতীয়মান হয়।

অভ্যন্তরীণ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

২০০৯১০ অর্থ বছরে ধার্য্যকৃত ১৫.৭ শতাংশ রাজস্ব প্রবৃদ্ধির বিষয়ে ড. ভট্টাচার্য বলেন প্রশাসনিক সংস্কার ব্যতীত এ ধরনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিয়ে সংশয় রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আয়কর ব্যবস্থাপনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা উলেখ করে তিনি বলেন, সরকার কর্তৃক ধার্য্যকৃত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ সংস্থাকে মোট লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭৯ শতাংশ যোগান দিতে হবে। তাই রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অনেকটাই নির্ভর করবে রাজস্ব বোর্ডের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর। তিনি বলেন, এমনকি লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও তাতে করে বাংলাদেশের জিডিপিতে করের অবদান ৯.৩ শতাংশে উন্নীত হবে। জিডিপিতে করের অবদানের এই হার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশ, যেমন -শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের তুলনায় কম। আয়কর আদায়ের প্রচেষ্টা গতিশীল করার জন্য তিনি নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো তুলে ধরেন:

১) যেহেতু বর্তমানে ২২ লাখ করদাতা সনাক্তকরণ নম্বরধারীর (টিআইএন) মধ্যে মাত্র ৭.৫ লাখ করদাতা কর বিবরণী দাখিল করেন, তাই আয়করের আওতার সম্প্রসারণ ঘটানো দরকার।

২) সরকার তার সর্বশেষ কর জরিপে ২০০৯১০ অর্থ বছরে অন্ততপক্ষে ৪ লাখ নতুন করদাতা সংযোজনের ঘোষণা দিয়েছে। এজন্য সরকারকে কর ফাঁকি প্রতিরোধের বিষয়টি যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

৩) চলতি অর্থবছর থেকে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রদত্ত আয়কর প্রত্যার্পণ না করার সিদ্ধান্তও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। উলেখ্য যে, বর্তমানে ৭.৫ লাখ করদাতার মধ্যে ১.৫ লাখ সরকারি কর্মকর্তা।

৪) বৃহৎ করদাতা ইউনিট সম্প্রসারণের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

ড. ভট্টাচার্য বলেন, রাজস্ব আদায়ে প্রাতিষ্ঠানিক, বিশেষ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য কর হার হ্রাসের প্রভাব এবং দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদে খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। তবে এর তাৎক্ষণিক প্রভাবে সরকারের রাজস্ব আদায়ে হ্রাস ঘটতে পারে। প্রতিষ্ঠানের জন্য কর হার হ্রাস প্রস্তাবনা নিয়ে সিপিডির একটি বিশেষণের ফলাফল উলেখ করে তিনি বলেন, এতে প্রাথমিকভাবে রাজস্ব আদায়ে সরকারের প্রায় ৫৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে, তবে দেশে বিনিয়োগ উদ্দীপ্তকরণে সরকারের এ প্রচেষ্টা ২০০৯১০ অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

ড. ভট্টাচার্য তার উপস্থাপনায় ভ্যাটের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করেন। বৈশ্বিক মন্দার কারণে আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট আদায় উলেখযোগ্য হারে কমে যাওয়ায় তিনি অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ভ্যাট আদায় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আহ্বান জানান। প্রস্তাবিত শুল্ক কাঠামোকে স্বাগত

জানিয়ে তিনি বলেন, সরকারের এই সিদ্ধান্ত দেশীয় শিল্পের বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। নতুন শুল্ক কাঠামো ২০০৮০৯ অর্থবছরের আমদানি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হলে ২০০৯১০ অর্থবছরে আমদানি পর্যায়ে কোন প্রবৃদ্ধি ছাড়াই অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় আনুমানিক ৫.৬৫ শতাংশ বাড়বে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন যে অনুকূল শুল্ক কাঠামো অনুযায়ী আমদানি সম্পর্কিত শুল্ক বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। তবে এটি নির্ভর করবে আমদানি প্রবৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পণ্য মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির ওপর।

অপ্রদর্শিত আয় বৈধকরণ প্রসঙ্গে ড. ভট্টাচার্য তিনভাবে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেন:

১) বৈধ ও অবৈধ আয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য তৈরি করা হয়নি।
২) অবৈধ আয়ের করদাতাদের ক্ষেত্রে জরিমানা হার মাত্র ১০ শতাংশ, যা বৈধ করদাতাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ, এমনকি সর্বনিম্নও ১৫ শতাংশ।
৩) অ্যাপার্টমেন্ট অথবা গৃহায়ণে বিনিয়োগ হলে কার্যকর কর হার ১ শতাংশের কম হতে পারে।

ড. ভট্টাচার্য সংশয় প্রকাশ করে বলেন যে সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগ অথবা উচ্চ রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যম হিসেবে অপ্রদর্শিত আয় যথেষ্ট অবদান নাও রাখতে পারে। এরপর তিনি কিছু প্রশাসনিক বিষয়ে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

১) জনশক্তি: আইনি জটিলতার কারণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১৯৮০র দশ কের মাঝামাঝি থেকে তার জনবল বৃদ্ধি করতে পারছে না।
২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্প্রসারণ: সম্ভাব্য রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে উপশহর এবং গ্রামীণ এলাকায় বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ে কার্যকারিতা সম্প্রসারণ প্রয়োজন।
৩) কর আইন যুগোপযোগী ও সহজীকরণ: কর আইন অধ্যাদেশ সর্বশেষ ১৯৮৪ সালে সংশোধিত হয়েছিল। এই আইনে অভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর নির্ভরতার প্রতিফলন থাকা উচিত।
৪) মধ্যস্থতাকারী প্রথা অবলুপ্তিকরণ: স্বনির্ধারণী পদ্ধতিকে অনুপ্রাণিত করা উচিত। পাশাপাশি মধ্যস্থতাকারীদের সহায়তা ছাড়াই করদাতাদের রাজস্ব প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যোগাযোগ আওতায় নিয়ে আসা উচিত।
৫) হিসাব পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ: কম মূল্য প্রদর্শনের প্রবণতা বিশেষভাবে প্রতিহত করার জন্য কালো টাকা সাদা করার বিষয়টি সামনে রেখে গৃহায়ণ খাতে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।
৬) আধুনিকীকরণ: আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কর প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা আবশ্যকীয়। সকল বন্দর পর্যায়ে আমদানির প্তানি শুল্ক সুবিধার আধুনিকায়ন, করের আওতা সম্প্রসারণে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভাণ্ডারকে ব্যবহার করা এবং অনলাইনে কর রিটার্ন দাখিলের সম্ভাব্যতা যাচাই করা প্রয়োজন।

বিদেশী সম্পদ ব্যবহার

বৈদেশিক অর্থায়ন বিষয়ে ড. ভট্টাচার্য উলেখ করেন, ২০০৯১০ অর্থবছরে মোট ঘাটতির প্রায় ৪০ ভাগের সমপরিমাণ বৈদেশিক সহায়তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে তা হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে বৈদেশিক সহায়তার সর্বোচ্চ প্রবাহ। ২০০৯১০ অর্থবছরে এই বৈদেশিক সহায়তার বড় অংশই আসবে (৭২ শতাংশ) ঋণ থেকে, এবং অনুদান হিসেবে পাওয়া যাবে মাত্র ২৮ শতাংশ। অংশগ্রহণকারীদেরকে তিনি জানান, বাজেট ঘাটতি মোকাবেলায় সহায়তা দেওয়া এবং বড় বড় কিছু প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক দাতাদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এতে সাড়া

দিয়ে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) যথাক্রমে ২০ শতাংশ ও ৩৩ শতাংশ সহায়তা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন (এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ নেওয়া হয়েছে 'লাইবরের' (লন্ডন আন্তঃব্যাংক হারের) অধিক সুদ হারে এবং চীন থেকে পাওয়া ৪.৭ বিলিয়ন ডলার হচ্ছে সরবরাহকারীর ঋণ)। ড. ভট্টাচার্য বলেন, অনুদান আকারে অধিক বৈদেশিক সহায়তা পাওয়ার জন্য সরকারকে আরও বেশি সচেষ্ট হতে হবে। বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের প্রেক্ষিতে সরকারকে অর্থায়নের নতুন উপায় ও উৎস খোঁজার পরামর্শও দেন তিনি।

ব্যয় সংক্রান্ত কিছু নির্বাচিত ইস্যু

নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন

ড. ভট্টাচার্য বলেন, প্রস্তাবিত নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নে ২০০৯১০ অর্থ বছরে ৩,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে। সম্পদের প্রাপ্যতা ছাড়াও এই বেতন কাঠামোর কারণে সম্ভাব্য মূল্যস্ফীতিজনিত প্রভাব এবং তার ব্যবস্থাপনার বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি খাতের বাইরে অবস্থান করা বেসরকারি খাতের মধ্যআ য়ের বেতনভোগী চাকরিজীবীদের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন সরকারি খাতের পাশাপাশি যদি বেসরকারি খাতে নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করা না হয় তাহলে তা ওই খাতের চাকরিজীবীদের জীবনে আর্থিক টানাপোড়ন আরও বাড়াবে। তিনি সরকারি প্রশাসনের উন্নয়নে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটির (১৯৯৬) সুপারিশমালা বাস্তবায়নের তাগিদ জানান।

সুদ পরিশোধ ও ঋণ পরিস্থিতি

ড. ভট্টাচার্য উলেখ করেন, জিডিপির অংশ হিসেবে সরকারের মোট ঋণ (অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক) ১৯৯৩৯৪ অর্থ বছর থেকে নিম্নমুখী। মূলত বৈদেশিক ঋণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ার কারণেই সরকারের মোট ঋণের প্রবাহ কমছে। ২০০৭০৮ অর্থ বছরে দেশে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল জিডিপির ২৭.২ শতাংশ, যা পরবর্তী অর্থবছরে (২০০৮০৯ অর্থ বছর) ২৪.৪ শতাংশে নেমে আসে। ১৯৯৯০০ অর্থবছরে ঋণ দায় ছিল বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ১০.৭ শতাংশ, যা ২০০৭০৮ অর্থ বছরে ৫.৫ শতাংশে নেমে আসে। এর বিপরীত ঘটনা ঘটে অভ্যন্তরীণ ঋণ স্থিতির ক্ষেত্রে। ১৯৯৩৯৪ অর্থ বছরে যেখানে অভ্যন্তরীণ ঋণের স্থিতি ছিল ৭.৮ শতাংশ, ২০০৮০৯ অর্থ বছরে এসে তা ১৮.৮ শতাংশে উন্নীত হয়। তিনি আরও যোগ করেন, যদিও মোট সুদ পরিশোধের পরিমাণ বেড়ে চলেছে, তবে ২০০৯১০ অর্থ বছরে বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ কমবে বলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে, জিডিপি অনুপাতে বাজেট ঘাটতি সাম্প্রতিক সময়ে বাড়ছে, এবং সেই সাথে ঋণ পরিস্থিতির ভারসাম্য বজায় রাখা দুরূহ হয়ে পড়ছে।

ভর্তুকি পরিশোধ

বিগত বছরগুলোতে ভর্তুকি খাতে বাজেটে প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। ২০০৭০৮ অর্থ বছরে প্রকৃত ভর্তুকি চাহিদা দাঁড়ায় বাজেটের মূল বরাদ্দের চেয়ে ৯৪.৫ শতাংশ বেশি। ২০০৮০৯ অর্থ বছরের বাজেটে ভর্তুকি খাতে ১৩,৬৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল, তবে প্রকৃত ব্যয়ের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। ড. ভট্টাচার্য মনে করেন, খাদ্য সহ জ্বালানি ও সারের মূল্য হ্রাসের কারণে ২০০৯১০ অর্থ বছরে প্রকৃত ভর্তুকি পরিশোধের পরিমাণ তুলনামূলক কম হতে পারে। বাজেট প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করার কৌশল উদ্ভাবন এবং তার আর্থিক ফলাফল তদারকির ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন ভর্তুকি খাতে বরাদ্দ এবং তা বিতরণের সব তথ্য নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা দরকার।

অনিশ্চিত দায়

ড. ভট্টাচার্য অনিশ্চিত দায়ের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয়ের হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তি কঠিন বলে উলেখ করেন। এটি সরকারের স্থিতিপত্র বা ব্যালেন্স শীট সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্তির বিষয়কে জটিল ও দুরূহ করে তুলেছে। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে এই খাতের ভর্তুকি সরকারের জন্য একটি বিরাট বোঝায় পরিণত হতে পারে। সরকারের মোট অনিশ্চিত ব্যয় যাই হোক না কেন, আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য তা জনগণের কাছে প্রকাশ করা উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত বাস্তবায়নের অবনতিশীল প্রবণতার বিষয়ে সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ড. ভট্টাচার্য বলেন, দেশের চাহিদা পূরণের দিক থেকে সরকারি বিনিয়োগ এখনও অপর্যাপ্ত। সম্পদের অপ্রতুলতা, অবাস্তব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন সক্ষমতার অভাব – এই তিনটি প্রধান বিষয় এডিপির নিম্নমানের বাস্তবায়নের পেছনে সমানভাবে দায়ী। এডিপির সফল বাস্তবায়নে বাধাসমূহ উত্তরণে তিনি নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ তুলে ধরেন:

১. প্রকল্পভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা উচিত। তাছাড়া প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়, দ্রুত অর্থ ছাড় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে।
২. সার্বক্ষণিক ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দিতে হবে।
৩. অর্থ ছাড়ের অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকরণ এবং বাধাগুলো দ্রুততার সঙ্গে নিরসন করতে হবে, যত দ্রুত সম্ভব অনুমোদিত তহবিল ছাড় করতে হবে।
৪. প্রকল্প অন্তর্ভুক্তি চাহিদার নিরিখে করতে হবে; জ্বালানি খাতে বিনিয়োগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৫. ক্রয় নীতিমালাকে আরও সহজ করতে হবে। জমি অধিগ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যার কার্যকর সমাধান বের করতে হবে।
৬. প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা আরও জোরদার হবে।
৭. গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়নে সহায়তার জন্য ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণের মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

বাজেটারি কাঠামোতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রবর্তন

ড. ভট্টাচার্য মনে করেন, যদিও বাজেটে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের বিষয়টি একটি নতুন উদ্যোগ, তবে এর অধীনে পরিচালিত অবকাঠামো, বিশেষ করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারদের (আইপিপি) মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি বেশ কিছু দিন আগে থেকেই বিদ্যমান। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি -উভয় বি চেনায় একটি অংশীদারিত্বমূলক কাঠামো প্রতিষ্ঠা ২০০৯১০ অর্থবছরের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন, এ ধরনের প্রকল্পের আর্থিক বিষয়গুলো (বিনিয়োগ ও প্রাপ্তি) দরকষাকষির মাধ্যমে ঠিক করা যেতে পারে।

বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন

ঋণ অর্থায়ন ইস্যুতে প্রবন্ধ উপস্থাপক বলেন, সরকারের ঋণ অর্থায়নের বড় অংশই বৈদেশিক উৎস থেকে আসবে বলে সরকারি ঋণের কারণে বেসরকারি খাতে কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না।

গ্রহণযোগ্য বাজেট ঘাটতি বিষয়ে আধুনিক অর্থনীতিবিদদের কিছু অভিমত তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশের বাজেট ঘাটতির যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা সন্তোষজনকভাবে কম। তবে তিনি ঘাটতি অর্থায়নের বহিঃস্থ উপাদানগুলোর বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন, যার জন্য ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন।

সমাপনী মন্তব্য

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ২০০৯১০ অর্থ ́বছরের বাজেট বাস্তবায়নে সরকারকে আশু বিবেচনার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেনঃ

১. একটি কার্যকর ও সক্ষম উন্নয়ন প্রশাসন, যা যেকোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত থাকবে।
২. উদ্বুদ্ধ নেতৃত্ব এবং অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের যথাযথ নির্দেশনা।
৩. সংশিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচির নকশা, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থা ও পরিবীক্ষণে নিযুক্ত মন্ত্রণালয়গুলোর পর্যাপ্ত সক্ষমতা নিশ্চিত করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে যুক্ত মন্ত্রণালয়গুলোর মাত্রাতিরিক্ত কেন্দ্রীভবন পরিহার।
৪. বাজেট প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৫. বেসরকারি খাতের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা, বিশেষত সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে।
৬. সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় সঠিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে বেসরকারি সংস্থাসমূহের (এনজিও) অংশীদারিত্ব সহজতর করা।
৭. প্রকৃতসময় উপা ত্তের ওপর ভিত্তি করে একটি তথ্যবহুল তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এর ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা, যা বিদ্যমান তথ্য ঘাটতি পূরণে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।
৮. বাজেটে উলেখিত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

সংশিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে এডিপি সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য প্রাপ্তির আশাবাদ ব্যক্ত করে ড. ভট্টাচার্য তার বক্তব্যের উপসংহারে বলেন, বাজেটের কার্যকর ও সফল বাস্তবায়নের ওপর দেশের সার্বিক শাসন পরিস্থিতির উন্নয়ন অনেকখানি নির্ভর করছে।

মুক্ত আলোচনা

সম্পদ আহরণ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বিনিয়োগ ও রাজস্ব আহরণের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করেন। তিনি বলেন, রাজস্ব আহরণের জন্য এডিপির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হতে হবে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন আগামী দিনগুলোতে আমদানির পরিমাণ কমে গেলে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত নাও হতে পারে। তিনি সরকারকে রাজস্ব আদায় প্রচেষ্টা জোরদার করার এবং বিশেষত এনবিআরের নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত জটিলতা আশু দূরীকরণের আহ্বান জানান।

অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরি মূল প্রবন্ধে উপস্থাপিত বাহ্যিক সম্পদ আহরণের উচ্চ মূল্যের বিষয়টির সাথে একমত পোষণ করেন।

ঘাটতি অর্থায়ন

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) অতিরিক্ত সচিব ফেরদৌস আরা বেগম বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধকতা ও বিনিয়োগ পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্ক তুলে ধরে বলেন, বেসরকারি খাতের জন্য আরও বিনিয়োগ অনুকূল পরিস্থিতি তৈরির সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকিং উৎস থেকে সরকারের ঋণ সংগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায়, তা বেসরকারি খাতের ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বাস্তবায়নের বাধাসমূহ

জনাব চৌধুরির মতে, চলতি বাজেটে রাজস্ব আহরণের চেয়ে এডিপির বাস্তবায়নই বড় বাধা। তিনি বাজেটের সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতিপয় বাধা, যেমন – মালিকানাবোধের অভাব, ক্রয়নীতি, কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ফলপ্রসূ পরিবীক্ষণ পদ্ধতির অবর্তমানতাকে উলেখ করেন। এজন্য তিনি বিদ্যমান প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়ন, দ্রুত ক্রয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রকল্প পরিচালকের সার্বক্ষণিক উপস্থিতির ওপর জোর দেন। এছাড়া, প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, নকশা তৈরি, স্থানীয় সরকারের প্রকল্প প্রণয়নে অংশগ্রহণ, প্রকল্প ব্যয় ও বাজেট বিশেষণ, সঠিক নিয়োগ প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তাছাড়া প্রকল্পের কার্যকারিতা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পাশাপাশি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক বিভাগীয় প্রধান জনাব আমির আলী খান মজলিশের মতে, প্রকল্প দলিলের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অনিশ্চয়তাগুলো বিবেচনায় না নেওয়ায় এডিপির নিম্ন বাস্তবায়ন একটি সহজাত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া অনেক সময় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) কর্তৃক গৃহীত এডিপি প্রকল্পের সিদ্ধান্ত সময়োচিত হয় না। প্রকল্পের সার্বিক গুণগত কাঠামো নিশ্চিতকরণ ছাড়া বাস্তবায়নের এরূপ দুর্বলতা থেকেই যাবে।

বাংলাদেশে সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক ড. এ আতিক রহমান বলেন, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের অদক্ষতা বাজেটের কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা। তিনি সরকারের তহবিল ছাড় ও সম্পদের দ্রুত ব্যবহার নিশ্চিত করার তাগিদ দেন। অন্যদিকে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. বর্ষা ক্ষৈত্রী জোর দেন দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সাহায্যের জন্য গঠিত তহবিলের স্থানীয়করণ প্রয়োজনের ওপর।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শারমিন্দ নীলোর্মি সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল ও প্রতিবন্ধী কল্যাণ তহবিল গঠন প্রস্তাবের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি আরও কার্যকরভাবে সম্প্রসারণে সরকারি বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকেই অধিক ভূমিকা পালন করতে হবে।

সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী সাংসদ ড. এম আমানুলাহ্, এমপি বলেন, যেভাবে বাজেট ও এডিপি বাস্তবায়নের তদারকি করা হয় তা দীর্ঘমেয়াদে ফলপ্রসূ ফলাফল বয়ে আনার পক্ষে সহায়ক নয়। তার মতে, বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি করার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল থাকা উচিত। আইএফসি ও বিআইএফসির সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. সৈয়দ আখতার মাহমুদও একই ধরনের মত প্রকাশ করেন।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব

ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) উপ দেষ্টা জনাব মনজুর আহমেদ বলেন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পগুলোর জন্য অর্থায়নে বড় ধরনের ক্ষেত্র সহ খাতওয়ারি বরাদ্দ থাকা উচিত। তার মতে, বিভিন্ন খাতের অগ্রগতির জন্য নগদ ভর্তুকির পরিবর্তে সরকারের উচিত সুদের হারে ভর্তুকি দেওয়া।

এ বিষয়ে ড. মাহমুদ বলেন, এরূপ প্রকল্পগুলোর সাথে সংশিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের প্রত্যাশা আগে থেকেই পরিষ্কার করা উচিত। এক্ষেত্রে বেসরকারি পক্ষের নিজস্ব শর্ত প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকা আবশ্যক। একই সঙ্গে প্রত্যাশা পূরণে নিশ্চয়তার জন্য কার্যকর তদারকি ব্যবস্থাও থাকতে হবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচির ধারণাটি বর্তমানে এদেশের জন্য নতুন হওয়ায় একে সফল করার দায়িত্ব সরকারের ওপরেই বেশি অংশে বর্তায়।

জলবায়ু পরিবর্তন

বিসিএসির ড. রহমান জলবায়ুর পরিবর্তনের অভিঘাত নিরসনে ‘জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল’ গঠনের মতো পদক্ষেপ নেওয়ায় সরকারের প্রশংসা করেন। তবে এক্ষেত্রে তহবিল ব্যবহারের দক্ষতা নিয়ে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে তহবিল বণ্টনের প্রসঙ্গ তুলে ড. রহমান প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর এর সুফল সম্পর্কে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শারমিন্দ নীলোর্মি বলেন, গত অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলায় বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকা ব্যবহৃত হয়নি। তিনি এ ক্ষেত্রে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণে মনোযোগ দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিদ্যুৎ ঘাটতি প্রসঙ্গে এফবিসিসিআইএর জনাব আহ মেদ বলেন, বর্তমান বিদ্যুৎ পরিস্থিতিতে সত্যিকারের চ্যালেঞ্জটি হলো উৎপাদন খাতে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা। বিদ্যুতের সরবরাহ বাড়াতে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে সরকারকে সুপারিশ করেন তিনি। অন্যদিকে, ডিসিসিআইএর ফেরদৌস আরা বেগম বিদ্যুতের অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০১৩ সালের মধ্যে ৫,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

ফেরদৌস আরা বেগম নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, বাজেটে এ প্রসঙ্গে জোরালো কোন প্রস্তাবনা নেই।

অর্থ সচিবের বক্তব্য

অর্থ সচিব ড. মোহাম্মদ তারেক সংলাপ অনুষ্ঠানের সভাপতি ও মূল প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং পরবর্তীতে বাজেট বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কিছু বিষয়ের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অগ্রসর হন।

বাজেট ও রাজস্ব

অর্থ সচিবের মতে বাজেট কেবল অর্থবিষয়ক দলিল নয়, বরং এটি সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য অনুমিত খরচের একটি দলিল। তিনি বলেন, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে উন্নীত করার জন্য জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। নিকট ভবিষ্যতে দেশের জন্য সম্পদ আহরণের ঝুঁকির দিকটি অভ্যন্তরীণ বিষয়ের চেয়ে বাহ্যিক বিষয়ের সঙ্গে বেশি সম্পর্কিত হয়ে পড়বে। চলমান বিশ্বমন্দার প্রতিকূল প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে, তিনি বলেন ভবিষ্যতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আয়ের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করছে।

বিনিয়োগ

বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কার বিষয়টি প্রত্যাখান করে অর্থ সচিব বলেন, সরকার বড় অংকের বাজেট সহায়তার প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের চাপ খুব বেশি থাকবে না। অর্থনীতির অগ্রগতির জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তার কথা সমর্থন করে তিনি বলেন, সরকারের একার পক্ষে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন সরকার এ বিষয়ে দ্রুত একটি নীতি গ্রহণ করবে যাতে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারাও বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহে ভূমিকা রাখতে পারে।

ভর্তুকি ও স্থানান্তর

ভর্তুকির আকার ও বাজেট দলিলে উলেখিত স্থানান্তর দেয় প্রদানের অস্পষ্টতার কথা উলেখ করে ড. তারেক বলেন, সরকারের উচিত রাজস্ব বাজেটের অংশ হিসেবে মূলধন খরচের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা। এটি এ ধরনের খরচের বিষয়কে আরও স্বচ্ছ করবে। তিনি বলেন, সরকার বাণিজ্যিকভাবে টিকে থাকতে সক্ষম প্রতিষ্ঠানকে ভর্তুকি দেয় না, বরং ঋণ বা মূলধন আকারে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব

অর্থ সচিব সংলাপে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদেরকে জানান যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ বিভিন্ন দেশের সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক অনুশীলনগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করছে। এছাড়া মন্ত্রণালয় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য একটি জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনা করছে। তিনি বলেন, যে কাঠামোর অধীনে অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পের অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন হবে তা মূলত নির্ভর করবে সংশিষ্ট খাতের ধরনের ওপর, যা এরূপ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

এডিপি বাস্তবায়নের ব্যাপারে অর্থ সচিব বলেন, সরকার বর্তমানে বাজেট সমন্বিত করার প্রচেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, শিক্ষকদের বেতন না দিয়ে বিদ্যালয়ের জন্য আরও বেশি ভবন নির্মাণ হবে অর্থহীন বিনিয়োগ। তিনি রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটকে আলাদা করাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মত প্রকাশ করেন।

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো

অর্থ সচিব বলেন যে, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো বরাদ্দকৃত সম্পদের সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা। তিনি জানান, বর্তমানে ২০টি মন্ত্রণালয় এ কাঠামোর অন্তর্গত রয়েছে। আগামী অর্থবছরে আরও ১৩টি মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করার কথা ভাবা হচ্ছে। সভাপতির এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা কিছুটা মিশ্র। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মালিকানাবোধ তৈরি হওয়া, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা, এবং এ প্রক্রিয়াটিকে নির্দেশনা দেওয়ার মতো উদ্বুদ্ধ নেতৃত্ব থাকা। এ প্রসঙ্গে ড. তারেক মনে করেন, এ ধরনের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নতুন প্রক্রিয়া শুরু করার ক্ষেত্রে সাফল্য অনেকখানিই নির্ভর করছে সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহারের ওপর।

সবশেষে অর্থ সচিব বলেন, কোন কোন মন্ত্রণালয়ের এডিপিতে অংশ তাদের মোট বাজেটের তুলনায় খুবই নগণ্য। তাই অর্থ মন্ত্রণালয় শুধু এডিপি নয়, পূর্ণাঙ্গ বাজেট পর্যালোচনার করার জন্য মাসিক সভার আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

সংলাপের বিশেষ অতিথি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম বিস্তারিত একটি প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য মূল প্রবন্ধকার ও তার সহযোগীদের ধন্যবাদ জানিয়ে উলেখ করেন, বাজেট বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

১) পরিমাণগত মাত্রা -যা প্ৰকৃত অর্থে খরচ হয়।

২) গুণগত মাত্রা -প্ৰকল্প থেকে প্রাপ্তির মান।

৩) উদ্দিষ্ট উপকারভোগীরা প্রকৃত অর্থে প্রত্যাশিত উপকার পায় কিনা।

রাজস্ব আহরণ

ড. ইসলাম উলেখ করেন যে, ২০০১০২ অর্থ বছর থেকে ২০০৬০৭ অর্থ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশে গড়ে জিডিপির ১০ শতাংশের কাছাকাছি হারে রাজস্ব আদায় হয়েছে। ২০০৭০৮ অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এ হারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল (জিডিপির ১১.৩ শতাংশ)। তিনি বলেন, ২০০৯১০ অর্থ বছরে এ হারকে ১১.৬ শতাংশে উন্নীত করতে হলে রাজস্ব ব্যবস্থায় উলেখযোগ্য উন্নতি সাধন করতে হবে।

ড. ইসলামের মতে, বাজেটে প্রস্তাবিত রাজস্ব সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহ, যেমন -কাঁচামাল আমদানির ওপর শুল্ক হার হ্রাস, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর কর্পোরেট কর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ওপর ভ্যাট কমানো, এবং বিলাসবহুল দ্রব্যাদি বা অন্যান্য তৈরিকৃত দ্রব্যের ওপর আমদানি শুল্ক বাড়ানোর পরও ২০০৯১০ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব না হতে পারে। অবশ্য তিনি এসব পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথাও স্বীকার করেন। এদিক থেকে ভ্যাটের আওতা ও পরিধি বাড়ানো এবং কর প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রস্তাবকে তিনি স্বাগত জানান।

বাজেট বাস্তবায়ন

২০০৮০৯ অর্থ বছরে ১৯,৬৪৬ কোটি টাকার এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছিল উলেখ করে ড. ইসলাম বলেন, ২০০৯১০ অর্থ বছরে ৩০,৫০০ কোটি টাকার এডিপির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন যথেষ্ট কঠিন হবে।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা উলেখ করে সাবেক অর্থ উপদেষ্টা জোর দিয়ে বলেন, দুর্বল বাস্তবায়নের দায় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের, একথা সবসময় সত্য নয়। তিনি বলেন, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংশিষ্ট ব্যক্তিদের আরও বেশি দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করা উচিত। সরকারি ক্রয়ে অতিরিক্ত দেরি হওয়ার পাশাপাশি সংশিষ্ট কর্মকর্তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে কিনা তাও তদন্ত করা দরকার। তাছাড়া ভবিষ্যতে নীতি প্রণয়নের সঙ্গে জড়িতরা তাদের নৈতিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কঠোরভাবে তিরস্কৃত করতে হবে।

সাবেক অর্থ উপদেষ্টা এডিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার কম হওয়ার তিনটি কারণ তুলে ধরেন। প্রথমত, ভুলভাবে প্রকল্পের কাগজপত্র প্রস্তুতি। দ্বিতীয়ত, এসব কাগজপত্র সংশোধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন ধাপে দৌড়াদৌড়ি। এবং, তৃতীয় কারণটি হলো দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের আগাম প্রস্তুতি গ্রহণের অভাবে ভূমি অধিগ্রহণে দেরি হওয়া।

ড. ইসলাম আরও যুক্তি দেখান যে, রাজস্ব আহরণ এবং এডিপি বাস্তবায়ন পরস্পর সম্পর্কিত নয়। তিনি এক্ষেত্রে সিপিডির বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন, বাংলাদেশের সম্পদ আহরণের চেয়ে ব্যয় করা বেশি কঠিন।

অভ্যন্তরীণ ব্যাংক খাত থেকে সরকারি ঋণ গ্রহণের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা তাত্ত্বিক যুক্তির সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। তিনি বলেন, এদেশে সাধারণত সরকারি ও বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি সমমুখী হয়। তবে বর্তমান প্রেক্ষিতে সমস্যা চাহিদার দিক থেকে সৃষ্টি হবে, কেননা ব্যাংকসমূহের কাছে প্রচুর অব্যবহৃত উদ্বৃত্ত তারল্য রয়ে গিয়েছে।

ড. ইসলাম বলেন যে, বাংলাদেশে বিনিয়োগ কমে যাওয়ার বিষয়টি চলমান মন্দার সঙ্গে সম্পর্কিত। একই সঙ্গে দেশের ভেতরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অস্থিতিশীলতা এ জন্য দায়ী। এছাড়া, বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতি ঘটাতে বিদ্যুৎ ঘাটতির বিষয়টি অবশ্যই দ্রুততার সাথে সমাধান করতে হবে।

ড. ইসলাম বলেন, অসম্পূর্ণ প্রকল্প চালিয়ে নেওয়া প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা। যা এডিপির প্রকৃত আকারকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এর পেছনে বড় কারণ হলো সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো পুরোনো প্রকল্পের চেয়ে নতুন প্রকল্পের দিকে বেশি আগ্রহী থাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি ২০০৯১০ অর্থবছরের কথা উলেখ করে বলেন, বিগত অর্থবছরের চেয়ে নতুন অর্থবছরে এডিপির আকার ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব আহরণে সরকারের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার মধ্যে এরূপ সিদ্ধান্ত মোটেও ঠিক হয়নি। এছাড়া সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে যাচাইবাছাই প্ক্রিয়া ঠিকমতো কাজ না করায় এডিপিতে অনেক প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ফলে এডিপির বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে এবং বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সরকারি নীতির ধারাবাহিকতা

বর্তমান সরকারের '১০০দি নের কর্মসৃজন প্রকল্প' বন্ধ করে দেওয়ায় সাবেক অর্থ উপদেষ্টা হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, কোন ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়াই সরকার কর্মসূচিটি বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি বলেন, এ কর্মসূচির নির্দেশনাবলী চূড়ান্ত করার জন্য সংশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে ব্যাপক পরামর্শ করা হয়েছিল। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এ কর্মসূচি সম্পর্কে ইতিবাচক মূল্যায়নের প্রসঙ্গটি তুলে ড. ইসলাম আশা প্রকাশ করেন যে নতুন প্রস্তাবিত কর্মসূচি 'এমপয়মেন্ট জেনারেশন ফর দা হার্ডকোর পুওর'এর ক্ষেত্রে নীতি পর্যায় সহ অন্যান্য সব ধরনের দুর্বলতা প্রস্তুতিকালেই সনাক্তীকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে।

ড. ইসলাম বলেন, বাজেটের কিছু উদ্যোগের ব্যাপারে তিনি একমত নন, বিশেষ করে যেসব বিষয়গুলোতে নির্ধারিত উপকারভোগীদের লাভবান হওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। 'একটি বাড়িএকটি খামার' কর্মসূচির কথা উলেখ তিনি বলেন, সুবিধাভোগীদের চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। 'ন্যাশনাল সার্ভিস প্রোগ্রাম'এর ব্ যাপারেও তিনি একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ড. ইসলাম সুপারিশ করেন যে বাস্তবায়ন পর্যায়ে তৃণমূলের দিকে নজর দেওয়া উচিত। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, বেশির ভাগ সময় প্রকল্পের প্রশাসকই সর্বোচ্চ প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখেন। তাই তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। জনপ্রশাসনের সেবার মান উন্নয়নে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উলেখ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

বক্তব্যের শুরুতেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব এ এম এ মুহিত, এমপি সময়োপযোগী একটি সংলাপ আয়োজনের জন্য সিপিডিকে ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় করার জন্য। বাজেট বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বেশ কিছু জটিল বিষয় পর্যালোচনা করায় তিনি প্রবন্ধকারদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জনাব মুহিত মনে করেন, প্রবন্ধকারের বক্তব্য থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপিত হয়েছে যা এডিপি বাস্তবায়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন বিদেশি সম্পদ ব্যবহার ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উদ্যোগের ব্যাপারে। তিনি চলমান বাজেট বাস্তবায়নের ব্যাপারে তার কিছু পরিকল্পনা তুলে ধরেন। মন্ত্রী জানান যে, অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। তারা ইতিমধ্যে ২০টি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিলে বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। এর মধ্যে ১০টি মন্ত্রণালয় চিহ্নিত করা হয়েছে যারা বাজেটের মোট বরাদ্দের প্রায় ৮০ শতাংশ পাবে। এসব মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।

অর্থমন্ত্রীর মতে, পিপিপির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রকল্পের অর্থায়ন। এক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দ্বিতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) চূড়ান্তকরণের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রস্তুতির কথা জানান।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ১৩টি রপ্তানিমুখী শিল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণার পরিকল্পনার কথা উলেখ করে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে লক্ষ্য ঠিক করতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে ব্যাংক ও সরকার গঠিত টাস্কফোর্সের মধ্যে আলোচনা চলছে। মন্ত্রী আরও জানান, সরকার বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় কঠিন শর্তে কিছু পরিমাণ ঋণ গ্রহণের পরিকল্পনা করেছে। তিনি আশ্বস্ত করেন যে, ভবিষ্যতে এটি কোন জটিলতা বয়ে আনবে না।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, এ মুহূর্তে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিনিয়োগ কমে যাওয়া, বিশ্বমন্দার অনিশ্চয়তা এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি। প্রকল্প বাস্তবায়নের বকেয়া কাজ অনেকখানি শেষ করে আনা হয়েছে এবং কিছু প্রকল্পের অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান বাধাবিপত্তি দূর করে তা ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনার কথাও তিনি উলেখ করেন।

জনাব মুহিত আরও বলেন, সরকার ছয় মাস অন্তর অর্থনীতি পর্যালোচনার পরিকল্পনা করছে। একই সাথে বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতিও কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে পর্যালোচনা করা হবে, যাতে প্রকল্পের প্রয়োজন অনুসারে সম্পদ বরাদ্দে পরিবর্তন করা যাবে।

অর্থমন্ত্রী তার বক্তব্যের উপসংহারে বলেন, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব কিছুদিন পরপর পর্যালোচনা করা উচিত যাতে অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্য

অধ্যাপক রেহমান সোবহান তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ওপর নজরদারির ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। তিনি যেসব মন্ত্রণালয় ও সাংসদ এডিপি বাস্তবায়নে ভালো কাজ করছে তাদেরকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থার ভিত্তিতে এরূপ মূল্যায়ন করা যাবে।

অধ্যাপক সোবহান সব অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি মূল্যবান সময় ব্যয় করে আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। সবশেষে তিনি অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, অধিবেশনে আলোচিত পরামর্শগুলো বাজেট বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

সংযোজনী

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

কাজি সালেহ আহমেদ
সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং
সভাপতি, ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ অন এডুকেশন প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এফআরইপিডি)

মনজুর আহমেদ
উপদেষ্টা, এফবিসিসিআই এবং
স্বত্বাধিকারী, মেসার্স ফেয়ার ট্রেড সেন্টার

আহমদ আহসান
লীড ইকনমিস্ট
বিশ্বব্যাংক, ওয়াশিংটন

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
ভিজিটিং প্রফেসর
অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

শেখ মাকসুদ আলী
সাবেক সচিব এবং
সাবেক সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন

সৈয়দ মোঃ হায়দার আলী
মহাপরিচালক, আইএমইডি
পরিকল্পনা কমিশন

অধ্যাপক আলতাফুন্নেছা
কোঅর্ডি´নেটর
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র

এম আমানউল্লাহ, এমপি
সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

অধ্যাপক আলী আশরাফ, এমপি
সাবেক ডেপুটি স্পিকার

মোঃ আশরাফুজ্জামান
প্রোগ্রাম অফিসার, ডেনমার্ক দূতাবাস

রবার্ট বিডল
কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এবং
হেড অব ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন (সিডা)
কানাডিয়ান হাই কমিশন

ফেরদৌস আরা বেগম
অতিরিক্ত সচিব, ডিসিসিআই

রোকেয়া বেগম
যুগ্ম প্রধান
সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
ডিষ্টিংগুইস্ড ফেলো, সিপিডি

সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরি
চেয়ারম্যান, অগ্রণী ব্যাংক এবং
সাবেক সচিব, অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

কে এ এস দয়ানন্দ
পরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ, সিরডাপ

মোঃ আলতাফ হোসেন
যুগ্ম প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন

জাহিদ হোসেন
সিনিয়র ইকনমিস্ট, বিশ্বব্যাংক

আনোয়ার ইসলাম
ডীন ও পরিচালক
জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেল্থ
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

ইফতি ইসলাম
ম্যানেজিং পার্টনার
এশিয়ান টাইগার ক্যাপিটাল পার্টনারস

সাবরিনা ইসলাম
ইকনমিক সেকশন অফিসার
জাপান দূতাবাস

এডাম জ্যাকসন
ইকনমিস্ট, ডিএফআইডি

এম এ খান
ইন্টান্যাশনার টিম লিডার/অ্যাডভাইজার
প্রোমোটিং ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর পোভার্টি রিডাকশন প্রোগ্রাম, ডিএফআইডি

ওমর ফারুক খান
সিনিয়র ডেভেলপমেন্ট অ্যাডভাইজার, সিডা
কানাডিয়ান হাই কমিশন

জব্বার খান
সাবেক উপপ্রধান, প্রোগ্রামিং ডিভিশন
পরিকল্পনা কমিশন

বর্ষা ক্ষৈত্রী
ইকনমিক অ্যাডভাইজার, ইউএনডিপি

সৈয়দ আখতার মাহমুদ
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার
আইএফসিবিআইসিএফ

আমির আলী খান মজলিশ
সাবেক বিভাগীয় প্রধান
পরিকল্পনা কমিশন

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
সচিব, বাংলাদেশ সরকার এবং
সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

জাবেতা মৌতাফিজ
ফার্স্ট সেক্রেটারি, অস্ট্রেলীয় দূতাবাস

এ এম এ মুহিত
মাননীয় অর্থমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খন্দকার আশরাফুল মুনিম
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

গোলাম মুর্তজা
কনসালটেন্ট, ডিসিসিআই

শারমিন্দ নীলোর্মি
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কারিন ওহম্যান
কাউন্সিলর, সুইডেন দূতাবাস

এ আতিক রহমান
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ

কামরান টি রহমান
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পূবালী জুট মিলস লিঃ
সাবেক সভাপতি, বিইএফ এবং
সাবেক চেয়ারম্যান, বিজেএমএ

এ এস এম রাশেদ
মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সহকারী ব্যক্তিগত সচিব

বিখু রঞ্জন সরকার
কনসালটেন্ট, স্টেপ্স টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট

রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান, সিপিডি

মোহাম্মদ তারেক
সচিব, অর্থনীতি বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

সাইয়েদা তৌহিদ
ইকনমিক অ্যাডভাইজার
ডিএফআইডি

ডরিশ ওয়ং
সহকারী পরিচালক (অপারেশন), সিডা
কানাডিয়ান হাই কমিশন

সাংবাদিকদের তালিকা

সঞ্জিব বসাক
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সমকাল

আশিক চৌধুরি
সিনিয়র রিপোর্টার, বিএসএস

মিজান চৌধুরি
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক জনকণ্ঠ

বিশ্বজিৎ দত্ত
চীফ রিপোর্টার
দৈনিক আমাদের সময়

সানাউল হক
সিনিয়র রিপোর্টার, এটিএন বাংলা

কাজি সায়মুল হক
স্টাফ রিপোর্টার, দেশ টিভি

নাজমুল হক
ইকনমিক রিপোর্টার, দৈনিক যুগান্তর

শাওন হাসনাত
রিপোর্টার, বাংলাদেশ টেলিভিশন

জিমি হোসেন
রিপোর্টার, চ্যানেল ওয়ান

ইমরান হোসেন
স্টাফ ফটোগ্রাফার, দ্য ডেইলি স্টার

ইলিয়াস হোসেন
স্টাফ রিপোর্টার, দিগন্ত টেলিভিশন

শরিফুল ইসলাম
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক নয়া দিগন্ত

মুহাম্মদ জুবায়ের
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক মানব জমিন

আবু কাওসার
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক সমকাল

গোলাম কিবরিয়া
স্টাফ রিপোর্টার, বাংলাদেশ টেলিভিশন

হানিফ মাহমুদ
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক প্রথম আলো

সুলতান মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি, ইসলামিক টেলিভিশন

খাজা মাইনুদ্দিন
বিশেষ প্রতিনিধি, দ্য নিউ এজ

এইচ মামুন
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক দিনের শেষে

ফারুক মেহেদী
সিনিয়র রিপোর্টার, আরটিভি

মাসুদ পারভেজ মিলন
রিপোর্টার, দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস

মানিক মুনতাসির
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ভোরের ডাক

শ্যামল কান্তি নাগ
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ডেসটিনি

রিজভি নেওয়াজ
স্টাফ রিপোর্টার, চ্যানেল আই

মোর্শেদ নোমান
স্টাফ রিপোর্টার, এবিসি রেডিও এফএম ৮৯.২

সোহেল পারভেজ
স্টাফ রিপোর্টার, দ্য ডেইলি স্টার

গোলাম কাদির রাবু
স্টাফ রিপোর্টার, বৈশাখী মিডিয়া লিমিটেড

রেজাউর রহিম
স্টাফ রিপোর্টার, বাংলাদেশ সময়

মাহবুবুর রহমান
স্টাফ রিপোর্টার, মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমা

ইউনুস রাজু
স্টাফ রিপোর্টার, রেডিও টুডে

মাসুদ রানা
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক নওরোজ

রুহুল আমিন রাসেল
স্টাফ রিপোর্টার, টেলিপ্রেস

শারমিন রিনভি
সিনিয়র রিপোর্টার, বাংলা ভিশন

এ সালাম
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক পূর্বাঞ্চল

মোঃ শাহিন
স্টাফ রিপোর্টার, আরটিভি

সুশান্ত সিন্হা
রিপোর্টার, ইটিভি (একুশে টেলিভিশন)

সংযুক্তি ৪

গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ঘটনাপঞ্জি

জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০০৯

জানুয়ারি ১

- বাংলাদেশ রেলওয়ের আধুনিকায়নে ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্থায়ন করতে সম্মত হয় বিশ্বব্যাংক।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ছয়টি সিটি কর্পোরেশনে বড় ও মাঝারি আকারের দোকানে বাধ্যতামূলকভাবে ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্ট্রার ব্যবহারের কার্যক্রম শুরু করে।

জানুয়ারি ৩

- কুয়েত পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে বন্ড নিয়ে অস্পষ্টতার কারণে বাংলাদেশ মালয়েশিয়া থেকে সর্বাধিক পরিমাণ পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করার সিদ্ধান্ত নেয়।
- রুমানিয়ার নিয়োগকর্তারা অভিযোগ করেন যে, ধর্মঘটরত বাংলাদেশি পুরুষ শ্রমিকেরা চুক্তি ভঙ্গ করে চাকরি ছেড়েছেন। তবে, তারা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত থেকে দক্ষ নারী শ্রমিক নিয়োগেরও আগ্রহ দেখান।

জানুয়ারি ৪

- বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০৮ সালে প্রবাসী আয় প্রবাহ ৮ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে নতুন রেকর্ড গড়ে। ২০০৮ সালে প্রবাসী আয় এসেছে ৮.২২ বিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২৫.৩৬ শতাংশ বেশি।

জানুয়ারি ৬

- আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জানুয়ারি ৭

- নতুন সরকারের এজেন্ডার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করতে সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

জানুয়ারি ৯

- তারল্য সংকট মেটাতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো রেপোর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এবং তলবী অর্থের (কলমানি) বাজার থেকে ৫,০০০ কোটি টাকা ধার করে।

জানুয়ারি ১০	•	যথাযথ রাজস্ব নীতি ও নিবিড় তদারকির মাধ্যমে সরকার লোকসানী রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনরুদ্ধার করার উদ্যোগ নেয়।
জানুয়ারি ১২	•	বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ (এডিবি) দাতাদের কাছে বার্ষিক ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সহায়তার একটি প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ।
	•	সুতা উৎপাদনকারীরা বিশ্ব আর্থিক সংকট মোকাবেলায় সরকারের কাছে একটি প্রণোদনা প্যাকেজের প্রস্তাব করে।
জানুয়ারি ১৩	•	ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করতে বাংলাদেশ ব্যাংক আমানতের বিপরীতে নগদ জমার হারের (সিআরআর) ভিত্তি ৫০ পয়েন্ট বাড়ায়।
জানুয়ারি ১৪	•	মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি ৬.৪৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কমিয়ে ১৮.৫ শতাংশ ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।
জানুয়ারি ১৫	•	দেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি বিশেষ সেল গঠন করেন।
	•	সরকার সৌরশক্তির যন্ত্রপাতি আমদানির ওপর থেকে সকল প্রকার শুল্ক প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয়।
জানুয়ারি ১৮	•	বাংলাদেশ ব্যাংক বোরো মৌসুমে কৃষকদের পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ দিতে সকল ব্যাংককে নির্দেশনা দেয়।
	•	জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা সহ নানা সহায়তার সুপারিশ করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নরের নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়।
	•	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশে অধিকতর মার্কিন বিনিয়োগের আহ্বান জানান এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর অনুরোধ করেন।
জানুয়ারি ২১	•	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট জিয়াও ঝাঁও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (এমডিজি) অর্জনকে সামনে রেখে টেকসই অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশকে সহযোগিতা করার ঘোষণা দেন।
জানুয়ারি ২২	•	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে উন্নয়ন সহযোগিতা বাড়াতে এবং এদেশ থেকে আরও বেশি জনশক্তি আমদানির জন্য সৌদি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
জানুয়ারি ২৬	•	দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি উন্নয়ন সহায়তা এবং তাদের দেশে অধিকতর বাজার সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।
	•	বেসরকারি কোম্পানিসহ ৪০টির বেশি প্রতিষ্ঠান তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব কার্যক্রম জোরদার করতে বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘ গ্লোবাল কমপ্যাক্ট লোকাল নেটওয়ার্কের সঙ্গে চুক্তি করে।

জানুয়ারি ২৭

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জানায় যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাবে গত ডিসেম্বরে আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আদায় ১৪ শতাংশ কম হয়েছে।
- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেয়।

জানুয়ারি ২৮

- চলমান বিশ্বমন্দার প্রেক্ষিতে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারকেরা এ খাতে তারল্য সংকট মেটাতে 'সমন্বয়যোগ্য ব্যাংক হিসাব' থেকে ঋণ পাওয়ার দাবি করেন।

জানুয়ারি ২৯

- পদ্মা সেতুর নকশা তৈরির জন্য সরকার নিউজল্যান্ড ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মনসেল একম (Maunsell AECOM) এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারকে অতিরিক্ত ব্যাংক ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে এবং রাজস্ব চাপ কমাতে তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেয়। এগুলো হলো – বিলাস পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়ানো, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানো এবং আর্থিক শূন্যতা (ফিস্কাল স্পেস) পূরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা হাতে নেওয়া।

ফেব্রুয়ারি ১

- সন্দেহজনক লেনদেনের ব্যাপারে অবহিত না করায় পাঁচটি ব্যাংককে কারণ দর্শাও নোটিশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

ফেব্রুয়ারি ২

- জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কৌশল প্রণয়ন ও ৩০০ কোটি টাকার তহবিল ব্যবহারে সরকার দুটি পৃথক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে।
- ভারতে বার্ষিক রপ্তানি বর্তমানের ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করতে অর্থমন্ত্রীর কাছে সাত দফা সুপারিশ পেশ করে ভারতবাংলা দেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (আইবিসিসিআই)।

ফেব্রুয়ারি ৩

- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানির (বাপেক্স) তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এবং আগামী দুই বছরের মধ্যে চট্টগ্রামে বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানির গ্যাস সরবরাহ বাড়াতে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) ৩৪০ কোটি টাকা ব্যয় সংবলিত একটি প্রকল্প অনুমোদন করে।
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে আগের বছরের একই মাসের তুলনায় রপ্তানি আয় ১০.০৭ শতাংশ কমে গেছে।

ফেব্রুয়ারি ৪

- দরিদ্র জনসাধারণের জন্য খাদ্য সহায়তা বাড়িয়ে এবং খাদ্য মজুদ ও সরবরাহের জন্য সঠিক কৌশল প্রণয়ন করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডবিউএফপি)।

ফেব্রুয়ারি ৫

- সরকার ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তের আওতায় মালামাল পরিবহনের জন্য উভয় দেশ একে অন্যের জলপথ, সড়কপথ এবং রেলপথ ব্যবহার করবে।

- ভারত ও মায়ানমারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ভারতের সঙ্গে ৪০টি নদীর পানি বন্টনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে উপায় ও পদ্ধতি খুঁজে বের করতে সরকার দুটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে।

ফেব্রুয়ারি ৬
- ট্রান্সএশিয়ান রেলওয়ে সংক্রান্ত কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ৮১,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রস্তাবিত রেলপথ ইউরোপ থেকে পূর্ব এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

ফেব্রুয়ারি ৯
- বাংলাদেশ ও ভারত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত দুটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি দুটি হচ্ছে: দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি এবং ১৯৮০ সালের বাণিজ্য চুক্তি নবায়ন।
- মহিলা উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন ও বিধিমালা সঠিকভাবে পালন করতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ প্রদান করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর।

ফেব্রুয়ারি ১১
- বৈধ চ্যানেলে প্রবাসী আয় প্রেরণ বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংক গোটা বিশ্বকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সর্বোচ্চ আয় প্রেরককে ৩০ লাখ টাকা পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়।
- বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় সার্ক দেশগুলো সচিব পর্যায়ের এক বৈঠকে নিজেদের মধ্যে বাজার আরও উদারীকরণের ব্যাপারে সম্মত হয়।

ফেব্রুয়ারি ১৪
- ভারত জকিগঞ্জে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ শুরু করে। এটি সম্পন্ন হলে বাংলাদেশের সুরমা ও কুশিয়ারা নদী নাব্যতা হারিয়ে শুষ্ক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ১৬
- ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর খেলাপি ঋণ তাদের মোট ঋণের ১০ শতাংশ অতিক্রম করায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে তা দ্রুত কমিয়ে আনার নির্দেশনা দেয়।

ফেব্রুয়ারি ১৯
- "কনস্ট্রাকশন অব সার্ভার সিস্টেম ফর দা ইলেক্টোরাল ডাটাবেইজ" শীর্ষক একটি নতুন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে।

ফেব্রুয়ারি ২১
- ১২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি স্পেনে অনুষ্ঠিত মাদ্রিদ ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাশন ফেয়ারে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ৩৮৫,০০০ মার্কিন ডলারের স্পট অর্ডার লাভ করে।

ফেব্রুয়ারি ২২
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় টেস্ট রিলিফ (টিআর) ও গ্রাম এলাকায় 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচি বিস্তৃত করতে এবং জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুধুমাত্র লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে খোলা বাজারে (ওএমএস) চাল বিক্রি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

ফেব্রুয়ারি ২৩	• "বাংলাদেশ: টেকসই প্রবৃদ্ধির কৌশল" শীর্ষক বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশ যদি প্রতি বছর ৭.৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে তাহলে ২০১৬ সাল নাগাদ দেশটি একটি মধ্যআ য়ের দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
ফেব্রুয়ারি ২৪	• চলমান বিশ্বমন্দার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার একটি উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করে।
ফেব্রুয়ারি ২৫	• লাভ ও লোকসান ভাগাভাগির ভিত্তিতে মার্চেন্ট ব্যাংকার ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের যৌথ বিনিয়োগের অনুমতি দেয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)।
ফেব্রুয়ারি ২৬	• সরকার বেনাপোল বন্দর দিয়ে সুতা আমদানির ব্যাপারে প্রক্রিয়াগত বিধি-নিষেধ পুনরায় আরোপ করে।
মার্চ ৩	• থাইল্যান্ডের অন্যতম হোটেল ও চেইন স্টোর গ্রুপ সেনটারা হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টস বাংলাদেশের আতিথেয়তা ও খুচরা ব্যবসায় ৩,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে। • এসএমই তহবিলের অন্তত ১০ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদেরকে প্রদান করতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ প্রদান করে বাংলাদেশ ব্যাংক।
মার্চ ৫	• পুঁজিবাজারে অধিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে আইপিওএর মূল ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বুক বিল্ডিং পদ্ধতি অনুমোদন করে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।
মার্চ ৭	• রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পকে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব থেকে বাঁচাতে জরুরি ভিত্তিতে এ খাতের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)।
মার্চ ৮	• বিশ্বমন্দার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান সফররত বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট।
মার্চ ৯	• বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব মোকাবেলা করতে মুদ্রা, রাজস্ব ও খাতভিত্তিক একটি সমন্বিত প্রণোদনা প্যাকেজ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি সুপারিশ করে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)।
মার্চ ১০	• বিশ্বমন্দার কারণে মালয়েশিয়া তার শিল্পোৎপাদন (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতে বাংলাদেশের ৫৫ সহস্রাধিক চাকরিপ্রার্থীর ভিসা বাতিল করে। • তৈরি পোশাক খাতের জন্য একটি বেইল আউট প্ল্যান ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।

মার্চ ১২
- পুঁজিবাজারে মূলধন প্রবাহ বাড়াতে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে – গ্রাহকদের জন্য ব্রোকারদের প্রান্তঋণ অনুপাত বৃদ্ধি, ব্রোকারদের জন্য ঋণ প্রদানে ব্যাংক ও অব ্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিঘ্রই মার্চেন্ট ব্যাংকিংয়ের জন্য আরও লাইসেন্স প্রদান।
- ৬০ মিলিয়ন পাউন্ড (৫৬০ কোটি টাকারও বেশি) ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সমন্বিত উন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় যুক্তরাজ্য।

মার্চ ১৫
- বিশ্বমন্দা মোকাবেলায় ৬,০০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণার অনুরোধ জানায় ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)।

মার্চ ১৭
- নয়াদিলীতে সামুদ্রিক সীমারেখা সংক্রান্ত বাংলাদেশভারত আ লোচনা শুরু হয়।

মার্চ ১৮
- সরকার গ্যাসচালিত পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা ও ঘোড়াশাল সার কারখানা দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে।
- মন্দা মোকাবেলার প্রণোদনা প্যাকেজে সরাসরি নগদ সহায়তা দেওয়ার পরিবর্তে সহায়ক মুদ্রানীতি ও শুল্ককর পদ্ধতির মাধ্যমে সহায়তা প্রদানের সুপারিশ করে এমসিসিআই।

মার্চ ২০
- তুরস্কে পঞ্চম বিশ্ব পানি ফোরামের বৈঠকে স্যানিটেশনে বাংলাদেশের অগ্রগতি সকলের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়। সুইজারল্যান্ড সহ দাতাগোষ্ঠীর অনেকে বিশ্বের অন্য দেশগুলোকেও বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণের পরামর্শ দেন।

মার্চ ২৩
- চলমান বিশ্বমন্দার তাৎক্ষণিক প্রভাব মোকাবেলা করতে সহায়ক ব্যবসা পরিবেশের স্বার্থে কর হার হ্রাসের প্রস্তাব দেয় এফবিসিসিআই।

মার্চ ২৯
- ১০০দি নের কর্মসৃজন কর্মসূচিতে নগদ টাকার পরিবর্তে চাল প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

এপ্রিল ১
- বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ২০০৯ শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৪.৫ শতাংশ, যা সরকারের প্রক্ষেপণের চেয়ে অনেক কম। বিশ্বব্যাংক আশঙ্কা করে পরবর্তী অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি আরও কমে ৪ শতাংশে নেমে আসতে পারে।
- একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, উন্নয়ন কর্মসূচিতে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) আর থাকবে না; এর পরিবর্তে ২০১১ সাল থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে।
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বিনিয়োগের কাজে ব্যবহার করার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানায় বাংলাদেশ ব্যাংক।

এপ্রিল ৫
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) ৪০০টি সিএনজি চালিত বাস কেনার উদ্যোগ নেয়। এর মধ্যে নরডিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (এনডিএফ) সহযোগিতায় কেনা হবে ১০০টি সিএনজি বাস।

	• বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা প্রদান করবে বলে জানানো হয়।
এপ্রিল ৬	• বাংলাদেশে অধিক বিনিয়োগ ও প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য ব্যবধান কমিয়ে আনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এবং কলকাতার পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল। • অর্থমন্ত্রী জানান, সরকারের মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থাগুলো প্রকল্পের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারায় মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।
এপ্রিল ৯	• ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ডিএফআইডি) আগামী পাঁচ বছর বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ২৫ মিলিয়ন পাউন্ড সহায়তার ঘোষণা দেয়।
এপ্রিল ১২	• ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) মাধ্যমে চিনি ও ডাল আমদানি করতে শিল্প মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। • পরিবেশ দূষণ কমাতে সরকার আগামী ৩০ জুনের মধ্যে বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (ইটিপি) স্থাপনের জন্য শিল্প মালিকদের নির্দেশ দেয়। • সরকার খোলা বাজারে বিক্রি হওয়া চালের দাম ১৮ টাকা থেকে কমিয়ে ১৬ টাকায় নির্ধারণ করে।
এপ্রিল ১৫	• চেক প্রদানের মাধ্যমে কম সুদে ঋণ প্রদানের একটি পাইলট প্রকল্পের উদ্বোধন করেন শিল্পমন্ত্রী। সেই সঙ্গে তিনি জানান যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এখন থেকে আগামী দুই বছর একক সংখ্যার সুদে (৯ শতাংশ) ৫০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন।
এপ্রিল ১৬	• খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী বলেন, সরকার ১০০দি নের কর্মসৃজন কর্মসূচির দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে এটি পুনর্বিন্যাস করছে। • মন্ত্রী পরিষদ নতুন তথ্যপ্র যুক্তি ও যোগাযোগ আইন প্রণয়ন এবং ইসলামী দেশগুলোর সংস্থার (ওআইসি) নতুন সনদ অনুমোদন করে।
এপ্রিল ১৯	• হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও পাটজাত পণ্যসহ মন্দার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানি খাতে কোন নগদ প্রদান ছাড়াই ঋণ পুনঃতফসিলীকরণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। • চলমান বিশ্বমন্দার তাৎক্ষণিক অভিঘাত থেকে দেশের কৃষি, বিদ্যুৎ ও রপ্তানি খাতকে রক্ষা করতে অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক ও নীতি সহায়তার ঘোষণা দেন অর্থমন্ত্রী।
এপ্রিল ২০	• অভ্যন্তরীণ বাজারকে স্থিতিশীল রাখতে সরকার মিলগেটে প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দাম ৭৩ টাকা এবং পাম তেলের দাম ৫৯ টাকা নির্ধারণ করে দেয়।
এপ্রিল ২২	• প্রাইমারি ডিলার ব্যাংকসমূহ ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তারল্য সহায়তা সংক্রান্ত সংশোধিত নীতিমালা মেনে চলার নির্দেশ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

	• ভূমি রেজিস্ট্রেশন ফি কমানো এবং পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসনের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।
এপ্রিল ২৩	• ত্রিপুরা ও তৎসংলগ্ন ভারতীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রত্যাশা নিয়ে কুমিলা সীমান্তে নবনির্মিত বিবিরবাজার স্থলবন্দরের উদ্বোধন করা হয়।
এপ্রিল ২৪	• আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এবং বিশ্বব্যাংক সতর্ক করে দিয়ে বলে যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ২০১৫ সাল নাগাদ নির্ধারিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
এপ্রিল ২৫	• শিল্পমন্ত্রী জানান যে, আর কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ হবে না। কারণ যে ধরনের প্রতিজ্ঞা করে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়েছিল, সেটা তারা পূরণ করছেন না।
এপ্রিল ২৬	• বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে তীব্র গ্যাস সংকটের মুখে এবং বিদ্যমান গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে সরকার অস্থায়ীভাবে ও অনির্দিষ্টকালের জন্য চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। • কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রতি কেজি বোরো ধানের ক্রয়মূল্য ১৪ টাকা ও চালের ক্রয়মূল্য ২২ টাকা নির্ধারণ করে সরকার।
এপ্রিল ২৮	• জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে ১,৬৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে জাপান ঋণ বাতিল তহবিলের (জেডিসিএফ) ২২৯ কোটি টাকার প্রকল্প।
মে ৩	• সংযুক্ত আরব আমিরাত জানায় যে, সেদেশে ছাঁটাই করা বিদেশী শ্রমিকরা সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত থাকতে পারবে। এতে সেখানে অবস্থানরত প্রায় এক মিলিয়ন বাংলাদেশী শ্রমিক উপকৃত হবেন। • জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দারিদ্র্যের অবস্থার ওপর বাংলাদেশের একটি দারিদ্র্য মানচিত্রের উদ্বোধন করেন পরিকল্পনামন্ত্রী। এই মানচিত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো – সরকার ও নীতিনির্ধারকগণ দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করতে পারবেন ও সেই অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থ বরাদ্দ করতে পারবেন।
মে ৫	• জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি ক্লিন এয়ার ও সাসটেইনেবল এনভায়রনমেন্ট প্রজেক্টসহ চারটি প্রকল্প অনুমোদন করে। এগুলোর মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৭৮৮ কোটি টাকা। • বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত এক হিসাবে দেখা যায়, বর্তমান অর্থবছরে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ৬৯০ মার্কিন ডলার যা গত অর্থবছরে ছিল ৬০৮ মার্কিন ডলার।
মে ৬	• দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ চলাচল স্থগিত থাকার পর তা পুনরায় শুরু হয়।

মে ৭

- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী জানান যে, মালয়েশিয়া ছাঁটাইকৃত ৫৫ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিককে পর্যায়ক্রমে নিয়োগ করবে।
- পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজের জন্য মাদারীপুরে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ১৩৫ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করেন যোগাযোগমন্ত্রী।

মে ৮

- বিশ্বমন্দা মোকাবেলায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক তার নবগঠিত মন্দা তহবিল থেকে বর্তমান বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাংলাদেশকে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দেয়।

মে ১০

- একটি রেলওয়ে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকাচ উগ্রাম রেলপথের উন্নতির জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে কানাডার কানারেল কনসালটেন্সির সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যের তালিকায় চিনিকে অন্তর্ভুক্ত করে তা আমদানির জন্য ঋণের সর্বোচ্চ সুদের হার ১৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২ শতাংশে পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

মে ১৩

- অর্থমন্ত্রী জানান, রাজস্ব আদায়ে শথগতি থাকলেও সরকার বাজেট ঘাটতি ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখবে।
- বাজেট বিষয়ক জাতীয় পরামর্শক কমিটির সভায় অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ প্রদান সহ ৪০০ দফা বাজেট সুপারিশমালা পেশ করে এফবিসিসিআই।

মে ১৫

- এফবিসিসিআই ১৯৯১ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সরকারের চিহ্নিত করা রুগ্ন শিল্পসমূহের একটি তালিকা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়।
- রপ্তানি বাড়াতে নতুন কিছু সুপারিশ সহ ২০০৯২০১২ সা লের জন্য একটি খসড়া রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

মে ১৬

- রাজস্ব আয় বাড়াতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের সকল উপজেলায় কর জরিপ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

মে ১৭

- আগামী বাজেটের জন্য জরুরি বিবেচনায় আইনজীবী, অর্থনীতিবিদ ও বিভিন্ন সংগঠনের সুপারিশ থেকে ২৮টি কর ও রাজস্ব সংক্রান্ত প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে অর্থ মন্ত্রণালয়।
- পুঁজিবাজারের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে অর্থ মন্ত্রণালয় একটি পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে।
- সরকার ট্রেজারি বিলের মাধ্যমে ৮২৫ কোটি টাকা ঋণ নেয়।
- অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, বর্তমানে করমুক্ত ব্যক্তি আয়ের যে সীমা রয়েছে (১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা) তা আগামী বাজেটে আর বাড়নো হচ্ছে না।

মে ১৯

- যে সমস্ত বেসরকারি ব্যাংক কৃষি ও মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বড় অঙ্কের ঋণ দেবে, তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানায় বাংলাদেশ ব্যাংক।

	• জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৪২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে চারটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়।
মে ২০	• স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক নাইট্রোফুরান পাওয়ায় ৫০টিরও বেশি কনসাইনমেন্টে বাতিল হওয়ার পর বাংলাদেশ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বিশুদ্ধ পানির চিংড়ি রপ্তানি পরবর্তী ছয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ হয়।
মে ২১	• আগামী অর্থবছরের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৬০,০০০ কোটি টাকায় নির্ধারিত হয়।
মে ২৪	• ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ কমিটি কুয়েত থেকে আগামী ২১ মাসের মধ্যে ১৭.৪৫ লাখ মেট্রিক টন পেট্রোলিয়াম আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন করে।
মে ২৫	• সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) আওতায় জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য ছয়টি প্রকল্প নির্বাচন করে সরকার। • বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালুর জন্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ তাদের সিনিয়র কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠন করে। • দেশের সর্বশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর এমসিসিআইএর প্‌ তিবেদনে বলা হয়, চলতি অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারিমার্চ) অর্থনৈতিক কার্যক্রমে শথগতি পরিলক্ষিত হয়। ওই প্রান্তিকে অর্থনীতির প্রধান প্রধান সূচকে স্পষ্টভাবেই দুর্বল অবস্থান দেখা গেছে।
মে ২৬	• শীর্ষ ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতে এক পরামর্শ সভায় শিল্পমন্ত্রী খসড়া শিল্পনীতি উপস্থাপন করেন। • কৃষি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে প্রাধান্য দিয়ে সরকার ২০০৯১০ অর্থবছরের জন্য ৩০,৫০০ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) চূড়ান্ত করে। • বিশ্বব্যাংক বর্তমান সরকারের প্রথম পাঁচ মাসে সংস্থার তহবিল খরচের অগ্রগতি বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে। দেশের দ্রুত আর্থসামাজিক উন্‌ য়নে সহায়তা বৃদ্ধিরও প্রতিশ্রুতি দেয় বিশ্বব্যাংক।
মে ২৭	• বর্তমান বছরের মধ্যে ব্যাংকবহির্ভ্‌ ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মূলধন দ্বিগুণ করার পরামর্শ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।
মে ২৯	• কৃষি মন্ত্রণালয় আগামী বাজেটের জন্য ২,৬৯৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকা ব্যয়ের প্রাক্কলিত হিসাব প্রকাশ করে, যা অর্থ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত বাজেটের চেয়ে অনেক বেশি।
মে ৩০	• বেশ কয়েক বছর বিরতির পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করদাতাদের সম্পর্কে অডিট কার্যক্রম শুরু করে। • ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং কৃষি খাতের মতো উৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকারের কথা ঘোষণা করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

জুন ১	• আগামী এক বছরের মধ্যে জেলা পর্যায়ে খাদ্য আদালত স্থাপনের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।
জুন ২	• ৯৬৯ কোটি টাকা ব্যয় সংবলিত ছয়টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করে জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের নির্বাহী কমিটি, যার মধ্যে ৫৬০ কোটি টাকার প্রকল্প সাহায্য রয়েছে। • রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আইলা দুর্গত এলাকায় আগামী এক বছরের জন্য ঋণ আদায় না করার অনুরোধ জানিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এছাড়া সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সর্বোচ্চ ১৩ শতাংশ হারে ঋণ প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
জুন ৪	• গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী জানান যে, প্রবল আবাসিক সমস্যা নিরসনকল্পে সরকার ঢাকার চারদিকে চারটি স্যাটেলাইট টাউন স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।
জুন ৬	• ব্যবসায়িক ঝুঁকি কমাতে প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পৃথক "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট" স্থাপনের সুপারিশ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর।
জুন ৭	• জনশক্তি ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী সংসদে জানান যে, সরকার আফ্রিকার দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানি বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে।
জুন ৯	• সার্বিক আমদানি অর্ডার কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয়।
জুন ১১	• ২০০৯১০ অর্থবছরের জন্য ১১৩,৮১৯ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী।
জুন ১৪	• জনবল ও আঞ্চলিক ভাগ বাড়িয়ে এবং নয়টি কাস্টমস হাউসকে (স্থল) বিভাগীয় অফিসে রূপান্তর করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তিনটি শাখার (আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক) কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। • নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য অর্থ বরাদ্দ এবং সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নে সরকার ১০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে।
জুন ১৫	• মন্ত্রীপরিষদ এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অনুমোদন করে।
জুন ১৬	• ১,৪৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্প জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে অনুমোদন করা হয়। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য হিসেবে রয়েছে ৮৫০ কোটি টাকা এবং জাপান ঋণ বাতিল তহবিলের ৬৫ কোটি টাকা।

জুন ১৭	• জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের নির্বাহী কমিটি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে যানজট কমাতে পিপিপির আওতায় রাজধানীতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ শুরু করার নির্দেশ দেয়। • বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) প্রতিটি ১২.৫ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৮৫০ টাকা থেকে কমিয়ে ৭০০ টাকায় নির্ধারণ করে।
জুন ১৯	• দিনের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য বাংলাদেশে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে আনা হয়।
জুন ২০	• আইলা দুর্গত ১০টি উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৭৫,৪৯৬টি পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য ১.১৬ কোটি টাকার গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান ও ০.৮৬ মিলিয়ন টন চাল ত্রাণ হিসেবে বিতরণের প্রস্তাব অনুমোদন করে সরকার। • সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় ৪০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস (এমএমসিএফডি) বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে সরবরাহের জন্য যমুনা সার কারখানা কোম্পানি লিমিটেড বন্ধ ঘোষণা করে।
জুন ২৪	• মার্কিন তেল কোম্পানি শেভরন মৌলভীবাজারে গ্যাসের রিজার্ভ পরিমাপের জন্য ত্রিমা ত্রিক ভূতা ত্ত্বিক জরিপের কাজ সম্পন্ন করে।
জুন ২৫	• দেশের আর্থিক অবস্থা বিশেষণ ও ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বিষয়ে রেটিং করতে সরকার বিশ্বের শীর্ষ দুই রেটিং এজেন্সি – মুডি'স ও স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর'সএর স ঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে।
জুন ২৯	• সরকার অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সময়সীমা তিন বছর থেকে কমিয়ে এক বছরের মধ্যে নির্ধারণ করে দেয়।
জুন ৩০	• সংসদে এপ্রোপ্রিয়েশন বিল ২০০৯ অনুমোদনের মাধ্যমে ২০০৯১০ অর্থবছরের বাজেট পাশ হয়। • রপ্তানিকারকদের পরিবহন ব্যয় কমাতে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল টার্মস (ইনকোটার্মস) প্রচলনের নির্দেশ দেয়। • দুটি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিকে নয়টি অফশোর গ্যাস বক প্রদান সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে পাঠানোর জন্য জ্বালানি বিভাগকে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। • বেসরকারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোর (আইপিপি) বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে ভর্তুকি বাবদ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে (পিডিবি) সরকার ২০০ কোটি টাকা প্রদান করে।
জুলাই ১	• বাংলাদেশ ব্যাংক ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন সেবা বাবদ মূল্যতালিকা তাদের প্রধান কার্যালয় এবং শাখাগুলোতে দৃশ্যমান স্থানে টানানোর নির্দেশ দেয়।

- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) দেশব্যাপী সমান রেট চালু করতে লোকাল কল রেট ৩০০ শতাংশ বাড়ায়।
- জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর এক সাময়িক রিপোর্টে উলেখ করা হয় যে, আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় জুনে জনশক্তি রপ্তানি ৬০ শতাংশ কমেছে।
- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৯০টি 'জেড' শ্রেণীভুক্ত কোম্পানির মধ্যে ২৮টি কোম্পানির শেয়ার লেনদেন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখতে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন লিখিতভাবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জকে নির্দেশ দেয়।
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯এর আওতায় সরকার তিন সদ স্যের একটি তথ্য কমিশন গঠন করে।

জুলাই ২
- গ্রামীণফোন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কাছ থেকে বাজারে শেয়ার ছাড়ার অনুমোদন পায়।

জুলাই ৩
- দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেরকে আমন মৌসুমে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। সরকার আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি জেলার ৭৫টি উপজেলায় প্রায় ১ লাখ ৭৬ হাজার কৃষকের মাঝে কৃষি সাহায্য বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়।

জুলাই ৪
- ইন্ডিয়ান ম্যারিকো লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি ম্যারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড (এমবিএল) বাংলাদেশের পুঁজিবাজার হতে ১৩.৪২ কোটি টাকার বেশি অর্থ উত্তোলনে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদন পায়।
- বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের হিসাবে জানানো হয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন সন্তোষজনক পর্যায়ে বাড়াতে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দরকার।

জুলাই ৫
- খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, সরকার চলতি অর্থবছরে ২৮ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে যার মধ্যে ২৬.৭৫ লাখ মেট্রিক টন সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (পিএফডিএস) আওতায় বিতরণ করা হবে। উলেখিত ২৮ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের মধ্যে ১৬ লাখ মেট্রিক টন কেনা হবে স্থানীয় বাজার থেকে, খাদ্য সাহায্য হিসাবে ১.৫ লাখ মেট্রিক টন প্রত্যাশা করা হয়েছে এবং ১০.৫ লাখ মেট্রিক টন আমদানি করা হবে।

জুলাই ৮
- সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন তিনটি কোম্পানির লেনদেনের ওপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে। কোম্পানি তিনটি হলো – মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজ, মেঘনা পিইটি ইন্ডাস্ট্রিজ এবং চিটাগাং ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ।

জুলাই ৯
- বাংলাদেশ ব্যাংক তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অংশীদারিত্বের বিস্তারিত তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়।

জুলাই ১০	• সরকার দেশে স্বাস্থ্যসেবায় জনবল সংকট নিরসনে সরকারি হাসপাতালগুলোতে ৬,০০০ চিকিৎসক এবং ৩,০০০ নার্স নিয়োগের ঘোষণা দেয়।
জুলাই ১১	• অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) বিশ্ব আর্থিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে হতাশাব্যঞ্জক প্রক্ষেপণের মুখে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কাছে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজেট সহায়তা হিসেবে ঋণের আবেদন করে।
জুলাই ১২	• বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংককে পুঁজিবাজারে তাদের বিনিয়োগের ওপর মাসিক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেয়। ব্যাংকগুলোকে এখন থেকে ক্রয়, বন্ধক, আমানত হিসেবে তাদের শেয়ার পোর্টফোলিওর যাবতীয় তথ্য অবশ্যই দাখিল করতে হবে। • আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর পরিশোধ থেকে ২১৫টি পণ্যকে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যাপারে একটি এসআরও জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। • জাপান আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থার প্রস্তাব মেনে নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় ইয়েন স্থানান্তরের জন্য একটি জাপানি ব্যাংককে ৩ শতাংশ কমিশন পরিশোধের সিদ্ধান্ত নেয়।
জুলাই ১৩	• বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে নিয়মানুবর্তিতা ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধনের চেষ্টা করছে।
জুলাই ১৪	• রূপান্তরযোগ্য নতুন শেয়ার অথবা তালিকাভুক্ত কোম্পানির ওয়ারেন্টের বিপরীতে শেয়ার বিক্রির ওপর সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন লকইন (lock-in) সময়সীমা আরোপ করে। • রমজান মাসকে সামনে রেখে স্থানীয় বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের মাধ্যমে ২৫,০০০ মেট্রিক টন ভোজ্য তেল ক্রয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করে। • কৃষি উৎপাদন ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম চাঙ্গা করা এবং বেসরকারি ব্যাংকের ঋণ বিতরণে তদারকি জোরদারের পদক্ষেপ সংবলিত কৃষি ঋণ নীতিমালা ঘোষণা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর। • বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয় ও বিক্রির মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে আনতে পিডিবি বিদ্যুতের দাম ২৪.৩১ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়।
জুলাই ১৫	• যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বড় বড় আমদানিকারকদের নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সরকার চিংড়ি রপ্তানিতে নাইট্রোফুরান সনাক্তকরণে একটি কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করে। • বিশ্বমন্দার প্রভাবের কথা উলেখ করে মরিশাস কর্তৃপক্ষ ৬ মাসে ৬,০০০ বাংলাদেশি শ্রমিককে দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। • সরকারের একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে তিনটি পর্যায়ে ৬০,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প বাস্তবায়নে পরামর্শ দেওয়া হয়।
জুলাই ১৬	• বিশ্বমন্দার প্রেক্ষিতে যেকোন বৈরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও বেসরকারি ব্যাংককে স্বতন্ত্র ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠনের নির্দেশ দেন।

- চার দিনব্যাপী টেক্সটেক ২০০৯ এবং এর অধিভুক্ত প্রদর্শনী বাংলাদেশচীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হয়।

জুলাই ১৮
- অর্থ মন্ত্রণালয় প্রকল্প বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতির শর্তে মাসিক ভিত্তিতে উন্নয়ন তহবিল ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

জুলাই ১৯
- বাংলাদেশ ব্যাংক জুলাইডি সেম্বর ২০০৯ মেয়াদের জন্য মুদ্রানীতির বিবৃতি ঘোষণা করে।
- সরকার দীর্ঘমেয়াদে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব মোকাবেলায় বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জেলাসমূহের জন্য ১,১৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আন্তর্জাতিক সহায়তা কামনা করে।

জুলাই ২২
- সরকার বাংলাদেশ সচিবালয়ে বৈঠকের সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং সপ্তাহে দুদিন দর্শনার্থীমুক্ত দিন ঘোষণা করে।

জুলাই ২৩
- বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে দেশে অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাংলাদেশ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কাছে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত সহায়তা চায়।

জুলাই ২৪
- ঢাকা পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা) ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল মেয়াদে ২,৮০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পাগলা ও কেরানীগঞ্জে আরও দুটি পানি শোধনাগার প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা শুরু করে।

জুলাই ২৫
- কলম্বোতে সার্ক পরিবহনমন্ত্রীরা নেপাল ও ভুটানকে সেবা দিতে এবং এই অঞ্চলের মধ্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে মংলা বন্দরকে আঞ্চলিক বন্দরে পরিণত করতে ঢাকার একটি প্রস্তাবে সম্মত হয়।

জুলাই ২৭
- রমজান মাসকে সামনে রেখে সরকার ৬৫,০০০ মেট্রিক টন ভোজ্য তেল, চিনি, ডাল, পেঁয়াজ ও আদা কেনার সিদ্ধান্ত নেয়।

জুলাই ২৮
- মাদারীপুরের আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর ৭ম বাংলাদেশচীন মৈত্রী সেতু নির্মাণে সফররত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে চীন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

জুলাই ৩০
- সরকার দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পরবর্তী চার বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৭,০০০ মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।

আগস্ট ১
- সরকার সিএনজি স্টেশন ছাড়া সকল ভোক্তার জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম গড়ে ১১.২২ শতাংশ বাড়ায় যা ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হয়।

আগস্ট ৩
- বাংলাদেশ ব্যাংক তার ২০০ কোটি টাকা ঘুর্ণায়মান তহবিল থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট স্থাপনে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাদেশ ব্যাংক তার

পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় উলেখিত খাতে ঋণ দিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর উদ্দেশ্যে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে।

আগস্ট ৪

- জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের নির্বাহী কমিটি প্রায় ১,৫৩৭ কোটি টাকা ব্যয় সংবলিত চারটি প্রকল্প অনুমোদন করে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে -শহর এলাকায় কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) (সংশোধিত); তিনটি (চুয়াডাঙ্গা, ঠাকুরগাঁও ও খাগড়াছড়ি) ৫০ শয্যা বিশিষ্ট বিডিআর হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প; শেরেবাংলা নগ রে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন সচিবালয় কমপেক্স নির্মাণ (দ্বিতীয় পর্যায়); এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প২ (সং শোধিত)।

আগস্ট ৫

- বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের ঝুঁকি মোকাবেলায় গঠিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি কারিগরি কমিটির প্রথম বৈঠকে চলতি অর্থবছরে দেশের অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।
- বিশ্বব্যাংক সরকারকে জানায় যে, যদি শিল্প ইউনিটগুলোতে অতিরিক্ত জনবল সংকুচিত করা না যায় তাহলে সংস্থাটি স্বেচ্ছায় অবসর স্কীম থেকে অর্থ বরাদ্দ স্থগিত করবে।

আগস্ট ৬

- বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বর্গাচাষীদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার একটি তহবিল অনুমোদন করে।

আগস্ট ৮

- পিপিপি স্কীমের জন্য একটি নীতিমালা তৈরি এবং একটি পিপিপি সেল গঠন করতে অর্থ মন্ত্রণালয় অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে সাত দিনের মধ্যে তাদের পরামর্শ পাঠানোর অনুরোধ জানায়।
- পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে পাঁচটি কোম্পানি তাদের আইপিও ইস্যু (৫৮.৫ কোটি টাকা মূল্যের) অনুমোদনের জন্য আবেদন করে।

আগস্ট ৯

- সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এক বৈঠকে ৫০ কোটি টাকার নিচে কোন মিউচুয়াল তহবিল অনুমোদন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

আগস্ট ১০

- সরকার রমজানে বাজার তদারকি শুরু করে এবং চিনির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের জন্য পাইকারি বিক্রেতাদেরকে চিনি মজুদ রাখার সময়সীমা ১৫ দিনে বেঁধে দেয়।

আগস্ট ১৩

- ঢাকা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দ্বিতীয় এশিয়ান আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রদর্শনী ২০০৯ শুরু হয়।

আগস্ট ১৬

- বাংলাদেশ ব্যাংক সরকার ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে এ মর্মে সতর্ক করে যে, শেয়ার বাজারে ও উৎপাদনশীল খাতে বার বার অঘোষিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ দিলে তা দেশের আর্থিক শৃঙ্খলা নষ্ট করতে পারে।

আগস্ট ১৭

- রমজানে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ কেজি প্রতি চিনির দাম ৪০ টাকা, আদা ৫০ টাকা, লিটার প্রতি পাম অয়েল ৫৮ টাকা, খোলা সয়াবিন ৭০ টাকা এবং বোতলজাত সয়াবিন তেল ৭৬ টাকায় বিক্রির জন্য দাম নির্ধারণ করে।

আগস্ট ১৯
- পিডিবি ১,৩০০ মেগাওয়াট যৌথ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ ব্যয়ের রেন্টাল ও পিকিং পাওয়ার প্যান্ট স্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে ২০টি স্থান চিহ্নিত করে।
- আঙ্কটাডএর স্বল্পোন্নত দেশসমুহের প্রতিবেদন ২০০৯ অনুসারে এ বছর উলেখযোগ্য খাদ্য সহায়তার দরকার হবে এমন ৩১টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশ স্থান পায়।
- সরকার ২০০৯১০ অর্থ বছরে মঙ্গা কবলিত এলাকাসহ দেশের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে ২৬ লাখ টন চাল বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়।

আগস্ট ২০
- সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এক বৈঠকে আইপিও ইস্যুর জন্য প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স ও ঢাকা ইন্স্যুরেন্সের আবেদন অনুমোদন করে। এ দুটি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি প্রতিটিই পুঁজিবাজার থেকে নয় কোটি টাকা উত্তোলন করবে।
- সরকার রমজান মাসের জন্য কোল্ড স্টোরেজ গেটে আলুর পাইকারি দর প্রতি কেজি ২২২৩ টাকা, পেঁয়াজ ১৬১৯ টাকা, এবং রসুন ও আদার পাইকারি দর ৫৫৬০ টাকায় নির্ধারণ করে।

আগস্ট ২১
- চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান কন্টেইনার নির্ভর বাণিজ্যের কারণে সরকার "কর্ণফুলী কন্টেইনার টার্মিনাল" নামে তৃতীয় কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং সুবিধার প্রাকবা স্তবায়ন প্রক্রিয়া জোরদারের সিদ্ধান্ত নেয়।
- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশকে ৭০০ মিলিয়ন ডলারের সহজ শর্তের ঋণ সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

আগস্ট ২২
- নিটওয়্যার উৎপাদনকারীরা তাদের শ্রমিকদের জন্য কম দামে চাল সরবরাহে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। নিট কারখানার শ্রমিকরা সপ্তাহে পাঁচ কেজি করে মাসে মোট ২০ কেজি চাল ১৬ টাকা দরে কিনতে পারবে।

আগস্ট ২৪
- তরল আকারে প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির জন্য উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তির শর্ত বজায় রেখে জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের নির্বাহী কমিটি দুটি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির কাছে তিনটি অফশোর বক দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করে।

আগস্ট ২৫
- জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের নির্বাহী কমিটি বাংলাদেশে ২০১১ সালে আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠানের জন্য ১৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে তিনটি স্টেডিয়াম উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়।

আগস্ট ২৬
- বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশে জীবন ও জীবিকার ওপর বৈশ্বিক উষ্ণতার ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় মন্ত্রীসভা কমিটি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল চূড়ান্ত করে।

আগস্ট ২৯
- ঢাকা পরিবহন সমন্বয় বোর্ড যানজট কমিয়ে আনার অংশ হিসেবে অক্টোবরের শেষ দিকের মধ্যে স্কুলগামী শিশুদের জন্য বিশেষ বাস সার্ভিস চালুর সিদ্ধান্ত নেয়।

আগস্ট ৩০	•	বাংলাদেশ ব্যাংক এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের আমদানির বিপরীতে অগ্রিম পরিশোধের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের নিয়মকানুন শিথিল করে।
	•	ব্যাংক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্য কমাতে ৩০ দিন মেয়াদি "বাংলাদেশ ব্যাংক বিল"এর মাধ ্যমে ৮৩০ কোটি টাকার বেশি তুলে নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।
সেপ্টেম্বর ১	•	জমির মূল্য, ফি এবং করের নতুন হার কার্যকর শুরু হয়।
	•	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডবিউটিও) নিজের অভিন্ন দাবি তুলে ধরতে অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছাতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রের প্রতিনিধি সমন্বয়ে সরকার আট সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে।
	•	দেশে প্রি-পেইড ক্যাশ কার্ড চালু করতে একটি বেসরকারি ব্যাংকের প্রস্তাব অনুমোদনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাশ ডিজিটালাইজেশনের প্রক্রিয়া শুরু করে।
সেপ্টেম্বর ২	•	বর্গাচাষীদেরকে কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।
	•	প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বর্ধিত করার সুপারিশসহ জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটি সরকারের কাছে শিক্ষানীতি পেশ করে।
	•	গ্রামীণ এলাকায় সাধ্যের মধ্যে সোলার হোম পদ্ধতি স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা বাড়াতে সরকার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (আইডিএ) সঙ্গে ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন।
সেপ্টেম্বর ৩	•	দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ সুপার রিফাইনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে প্রতি কেজি ৩৯ টাকা দরে ১,০০০ টন চিনি ক্রয় শুরু করে।
সেপ্টেম্বর ৪	•	অর্থমন্ত্রী জানান যে, ঈদউলফিতর কে সামনে রেখে শ্রমিকদের বেতন ও ভাতা পরিশোধে সরকারের কাছে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের ৩,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের দাবি 'অগ্রহণযোগ্য'।
সেপ্টেম্বর ৭	•	পুরাতন (Junk) শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে পৃথক লেনদেন ব্যবস্থা, তথা ওভারদিকাউ ন্টার (ওটিসি) মার্কেট চালু করে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।
সেপ্টেম্বর ৮	•	বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডবিউইএফ) সহযোগী সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) কর্তৃক প্রকাশিত ডবিউইএফএর বার্ষিক প্রকাশনা গে¬াবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্টে বলা হয় যে, গত বছরে জরিপকৃত ১৩৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২২তম।
সেপ্টেম্বর ১০	•	চার দিনব্যাপী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ও ভারত নেপাল-বাংলাদেশ এবং ভুটানবাংলা দেশ আন্তঃসংযোগ চুক্তি প্রস্তাবে একমত হয়।

- সরকার ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িঘর মেরামতে খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার চারটি উপজেলায় ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। পাশাপাশি উপকূলীয় জেলাগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলায় আরও চার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।
- বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ১০টি ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং ১২টি সিএনজি স্টেশনের লাইসেন্স দেয়।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র পর্যায়ের পানি ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যা গ্রামীণ দারিদ্র্য কমাতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সহায়তা করবে।

সেপ্টেম্বর ১৩
- বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড মোট ৮২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১০টি সরকারি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য দরপত্র আহ্বান করে।

সেপ্টেম্বর ১৫
- সরকার সংশোধিত দলিলে উলেখিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে সম্ভাব্য ৩,১০৮ কোটি টাকা ব্যয় সংবলিত দ্বিতীয় পিআরএসপির সংশোধিত খসড়া সংসদে উপস্থাপন করে।

সেপ্টেম্বর ২২
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ২০০৯১০ অর্থ বছরের জন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫.২ শতাংশ প্রক্ষেপণ করে যা আগের অর্থবছরে অর্জিত ৫.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় কিছুটা কম।

সেপ্টেম্বর ২৩
- বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলোর কাছে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতিপূরণ দাবি করে।

সেপ্টেম্বর ২৪
- দাতা দেশগুলো আশ্বাস দেয় যে, তারা বাংলাদেশের সংশোধিত পিআরএসপি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

সেপ্টেম্বর ২৭
- বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর সংজ্ঞা ভুল ব্যাখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে উচ্চ হারে সুদ আরোপের বিষয়ে সতর্ক করে।
- জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের নির্বাহী কমিটি তিন বছর মেয়াদি আমদানি এবং রপ্তানি নীতি (২০০৯২০১২) অনু মোদন করে।

সেপ্টেম্বর ২৯
- রমজানের সময় চিনির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে দুটি কমিটি গঠিত হয়।

সেপ্টেম্বর ৩০
- সরকার পরবর্তী পাঁচ বছরে ৭,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে অর্থায়নের জন্য ৫-১০ বিলিয়ন ডলার অর্থ উত্তোলনে দ্রুত কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করে।

অক্টোবর ১
- সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এক বৈঠকে মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ ফার্মগুলোকে 'জেড' শ্রেণীভুক্ত শেয়ার কিনতে তাদের গ্রাহকদের প্রান্তঋণ দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নেয়।

- বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ণ ঋণের সুদের হার ১৩ শতাংশে রাখতে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে তার নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণের জন্য এক প্রজ্ঞাপন জারি করে।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী জানান যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশ গত আট মাসে ৬.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।

অক্টোবর ২
- পাঁচ মাস উৎপাদন স্থগিত থাকার পর চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা পুনরায় উৎপাদন শুরু করে।

অক্টোবর ৩
- ডিএফআইডি বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে আগামী ছয় বছরে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

অক্টোবর ৪
- গ্রামীণফোনের আইপিওর কার ণে অর্থ প্রদান শুরু হয়। দেশের বৃহত্তম এই মোবাইল ফোন অপারেটর জনসাধারণের কাছ থেকে প্রায় ৪৮৬ কোটি টাকা উত্তোলন করতে ৬,৯৪,৩৯,৪০০টি সাধারণ শেয়ার ছাড়বে।
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ নিম্নমানের 'জেড' শ্রেণীভুক্ত ৫১টি কোম্পানিকে তালিকাচ্যুত করে এবং তাদেরকে ওভারদিকাউ ন্টার মার্কেটে তালিকাভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানায়।

অক্টোবর ৫
- মন্ত্রীসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে যুব সম্প্রদায়ের জন্য একটি অস্থায়ী কর্মসংস্থান নীতি অনুমোদিত হয়। নারী ও পুরুষ যাদের এইচএসসি এবং সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে তাদের "জাতি সংগঠন কার্যক্রমে" নিযুক্ত করার কথা এই নীতিতে বলা হয়।
- মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৯এ বলা হয় যে, বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন সূচকে (এইচডিআই) ১৮২টি দেশের মধ্যে দুই ধাপ এগিয়ে ১৪৬তম অবস্থানে রয়েছে; তবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বশেষ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

অক্টোবর ৬
- শস্য, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উপখা তের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৬২২ কোটি টাকার একটি কৃষি প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে সরকার।

অক্টোবর ৭
- কুয়েত, সৌদি আরব, ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো বিদ্যমান উৎসের পাশাপাশি বাংলাদেশ ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়া থেকে তার অতিরিক্ত জ্বালানি তেলের চাহিদা মেটানোর সিদ্ধান্ত নেয়।
- মিল মালিক, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় চিনির দর বাড়িয়ে পুনর্নির্ধারণ করে।

অক্টোবর ৮
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের ট্রাইব্যুনালে সমুদ্রসীমা সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তি করতে ভারত ও মিয়ানমারকে লিগ্যাল নোটিশ দেয়, কেননা বাংলাদেশ সমুদ্র আইনের ওপর জাতিসংঘ কনভেনশনের আওতায় বাধ্যতামুলক আরবিট্রেশন ইস্যুতে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়।

	•	পেট্রোবাংলা ও মার্কিন কোম্পানি কনকো ফিলিপস প্রথম দফা আলোচনা শেষে দুটি ব্লকের জন্য মডেল উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তিতে একটি ধারা সংযোজনের ব্যাপারে একমত হয়। ধারাটি হলো -আ গে অনুসন্ধান করা হয়েছে এমন এলাকায় কোন অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানো হবে না।
অক্টোবর ৯	•	অর্থমন্ত্রী জানান যে, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে তার অব্যবহৃত ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল শর্ত সাপেক্ষে যেকোন প্রকল্পে খরচের অনুমতি দেবে।
অক্টোবর ১০	•	জাতিসংঘে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত দাবির পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য সঠিক তথ্য পেতে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে একটি ভূতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করতে অর্থ মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৫০ কোটি টাকার বেশি তহবিল অবমুক্ত করে।
অক্টোবর ১২	•	শহরের বাইরে এসএমই সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশকে ৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সহজ শর্তের ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
	•	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বিদ্যুৎ সংকট মেটাতে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে রাশিয়ার সঙ্গে চলমান আলোচনা ত্বরান্বিত করতে বিদ্যুৎ এবং তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন।
	•	দিনের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার নতুন সময়সূচী অনুমোদন করে।
	•	ব্যাংকিং খাতে অতিরিক্ত তারল্য তুলে নিতে বাংলাদেশ ব্যাংক রিভার্স রেপো কার্যক্রম শুরু করে।
অক্টোবর ১৩	•	বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশের জন্য ৭৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ অনুমোদন করে।
	•	পরবর্তী বোরো মৌসুমে পর্যাপ্ত সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি ২ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন করে।
অক্টোবর ১৪	•	আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইএফপিআরআই) গোবাল হাঙ্গার সূচক প্রকাশ করে যেখানে বলা হয় যে, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে উলেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে ক্ষুধা পরিস্থিতি ১৯৯০ সাল থেকে উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৪টি দেশের মধ্যে ৬৭তম।
	•	বাংলাদেশ ব্যাংক এক প্রজ্ঞাপনে যেকোন মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলাদা সহায়ক প্রতিষ্ঠান গঠনের নির্দেশ দেয়।
অক্টোবর ১৫	•	সংকটের সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে ২০০৯১০ অর্থ বছরের জন্য সরকার ৩ কোটি ৩০ লাখ টন খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।
	•	দেশে ১২,০০০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক তিন স্তর বিশিষ্ট পরিবীক্ষণ পদ্ধতির প্রবর্তন করে।

- বিশ্ব আর্থিক মন্দার প্রভাব থেকে দেশের বস্ত্র খাত রক্ষায় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে।

অক্টোবর ১৮
- শুধুমাত্র রাইট ও বোনাস শেয়ার ইস্যুর পরিবর্তে ঋণ হাতিয়ারের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে মূলধন বাড়ানোর অনুমতি দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

অক্টোবর ১৯
- সরকার দেশের মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাকর্মচারীদের চাকরির বয়স ৫৭ বছর থেকে দুই বছর বাড়িয়ে ৫৯ বছর নির্ধারণ করে। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রীসভা 'পাবলিক সার্ভিস (অবসর) (সংশোধন) বিল ২০০৯' অনুমোদন করে।

অক্টোবর ২১
- সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ২৮টি দক্ষ কোম্পানির শেয়ারের বিপরীতে প্রান্তঋণ স্থগিত করতে মার্চেন্ট ব্যাংক, ব্রোকার ও ডিলারদের নির্দেশ দেয়, কেননা এসব শেয়ারের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করে বিনিয়োগ করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

অক্টোবর ২৫
- জাহাজ নির্মাণ, প্রকৌশল এবং জ্বালানি খাতের প্রতিনিধি সহ ২০ সদস্যের একটি জার্মান ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্ট খাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হতে ঢাকায় এসে পৌঁছায়। জার্মান জাহাজ নির্মাতাদের এটাই প্রথম বাংলাদেশ সফর।

অক্টোবর ২৬
- বাংলাদেশ বিশ্বমন্দার প্রভাব মোকাবেলায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কাছ থেকে ৭৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত একটি চুক্তি দুই পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।
- পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সকল মার্চেন্ট ব্যাংক, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপক, ব্রোকার ও ডিলারদের প্রান্তঋণ প্রদান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।
- ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সিম্পোজিয়ামে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য আরও বড় আঙ্গিকে কৃষকদের সহায়তা দিতে সমন্বিত উদ্যোগের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছান দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের গভর্নরগণ।

অক্টোবর ২৯
- এদেশে প্রথমবারের মতো সরকার ও ইউএনডিপির যৌথ উদ্যোগে ৫.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়।

নভেম্বর ১
- শ্রমিক অসন্তোষ এড়াতে তৈরি পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়ন চালু করতে সরকার, কারখানা মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়।

নভেম্বর ২
- বাংলাদেশ ব্যাংক ইন্টারনেটের মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তর ও ইউটিলিটি বিল পরিশোধের সুযোগ দিয়ে অনলাইন পরিশোধ পদ্ধতি চালু করে।
- বোরো ধান ও শীতকালীন ফসলের চাষ উৎসাহিত করতে সরকার ননইউরিয়া সা রের স্থানীয় দর ৩৬ শতাংশ কমায়।

	• মন্ত্রীসভা "অর্পিত সম্পত্তি (প্রত্যার্পন) (সংশোধিত) বিল ২০০৯" অনুমোদন করে। এতে এ ধরনের সম্পত্তি মালিক অথবা উত্তরাধিকারদের কাছে প্রত্যার্পণের জন্য তালিকাসহ ২১০ দিনের মধ্যে একটি গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশের ধারা সংযুক্ত হয়।
নভেম্বর ৫	• সরকারের কোষাগার থেকে মোট ২,৯৭৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন সংশেষ রয়েছে এমন সাতটি প্রকল্প জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের নির্বাহী কমিটি অনুমোদন করে।
নভেম্বর ৯	• বাংলাদেশ ও ভুটান দুদেশের মধ্যে আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ সম্প্রসারণে সড়ক পরিবহন সুবিধা স্থাপনে একমত হয়। • সমুদ্রসীমার ওপর মিয়ানমারের দাবির বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর তিন মাস পর বঙ্গোপসাগরের কিছু এলাকার ওপর ভারতের দাবির ব্যাপারে জাতিসংঘে আপত্তি জানায় বাংলাদেশ।
নভেম্বর ১০	• "সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬" বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ সরকারকে তাদের অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পের সকল স্থানীয় ক্রয় কার্যক্রম স্থগিত করার আহ্বান জানায়। • প্রান্তিক কৃষকদের জন্য আরও বেশি তহবিল যোগানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করে।
নভেম্বর ১১	• গড়ে ৫২ শতাংশ মূল বেতন বাড়িয়ে সরকার ৭ম জাতীয় বেতন কাঠামো ঘোষণা করে এবং সর্বোচ্চ বেতন ৪০,০০০ টাকা ও সর্বনিম্ন বেতন ৪,১০০ টাকা নির্ধারণ করে। • তেজি প্রবাসী আয় প্রবাহ, পরিমিত রপ্তানি এবং আমদানি ব্যয় কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে।
নভেম্বর ১২	• পরবর্তী আমন মৌসুমে ৩ লাখ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে সরকার কেজি প্রতি ধান ও চালের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে যথাক্রমে ১৪ টাকা ও ২২ টাকা।
নভেম্বর ১৬	• ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং দরিদ্রদের জন্য খাদ্য সহজলভ্য করার মাধ্যমে দেশকে ক্ষুধামুক্ত করতে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তার ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি দেয়।
নভেম্বর ১৭	• ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) প্রকাশিত বার্ষিক দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) প্রকাশনায় বাংলাদেশ গত বছরের তুলনায় তিন ধাপ এগিয়ে নিচ থেকে ১৩তম স্থান অর্জন করে।
নভেম্বর ২৫	• বিশ্বমন্দার নেতিবাচক প্রভাব থেকে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি রক্ষায় সরকার দ্বিতীয় দফায় ১,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে।

	• সরকার আগামী বোরো মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন সেচ কার্যক্রম নিশ্চিত করতে প্রাত্যহিক ১,৬৬৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেয়।
নভেম্বর ২৬	• জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এক এসআরওর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক শিল্পের কাঁচামালের ওপর থেকে কর হ্রাস করে। এর মধ্যে রয়েছে ঢেউটিন, কোল্ড রোল্ড কয়েল এবং দস্তার প্রলেপযুক্ত পাত। স্থানীয় উৎপাদন শিল্প ও গৃহনির্মাণ খাতকে সহায়তা করতে নতুন শুল্ক কাঠামোর অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। • আগামী কৃষি উৎপাদন মৌসুমে উচ্চ চাহিদা মেটাতে একটি চুক্তির মাধ্যমে চীন থেকে ২ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার আমদানির জন্য ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি ৪৩০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করে।
নভেম্বর ৩০	• সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রীপর্যায়ের সপ্তম সম্মেলন শুরু হয়।
ডিসেম্বর ২	• সরকার সংশোধিত দ্বিতীয় পিআরএসপি চূড়ান্ত করে। • সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের আওতায় প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত মংলা বন্দরের উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একটি বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে সরকার।
ডিসেম্বর ৩	• বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, নভেম্বর মাসে প্রবাসী আয় ১০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।
ডিসেম্বর ৪	• ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১.৪২ কোটি ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে কৃষি উপকরণ, ঋণ ও অন্যান্য ভর্তুকি স্বচ্ছতার সঙ্গে বিতরণ করার জন্য কৃষি উপকরণ কার্ড ইস্যু করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। • বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সুগন্ধী চালসহ সব ধরনের চাল রপ্তানির ওপর ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অভ্যন্তরীণ বাজারে চালের মূল্য স্থিতিশীল রাখা ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সরকার এ সিদ্ধান্ত নেয়।
ডিসেম্বর ৭	• ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি তিন দরদাতাকে ঢাকাচট্টগ্রাম মহাসড়ককে দুই লেন থেকে চার লেনে রূপান্তরের জন্য ১,৬৫৫ কোটি টাকা ব্যয় সংবলিত কাজ প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন করে। • পর্যটনের উন্নয়ন ও পদ্মা সেতুর নকশা চূড়ান্ত করতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি সহজ শর্তের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। • সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক মিঠা পানির চিংড়ি রপ্তানি পুনরায় শুরু হয়।
ডিসেম্বর ৮	• স্থানীয় কারখানাগুলোতে প্রাকৃতিক তন্তু সরবরাহ বাড়ানোর জন্য সরকার কাঁচাপাট রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের মূল্য ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় কারখানাগুলো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল।

ডিসেম্বর ৯	•	বাংলাদেশচীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণসহ ৪৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ের পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করে জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের নির্বাহী কমিটি।
ডিসেম্বর ১১	•	মায়ানমারের নতুন রাজধানী নেপিতো'-তে অনুষ্ঠিত বিমসটেকের ১২তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে সাতটি সদস্য দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ "আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠিত অপরাধ এবং অবৈধ মাদক পাচার মোকাবেলা" সংক্রান্ত কনভেনশনে স্বাক্ষর করে।
	•	কম্প্রিহেনসিভ ডিজাজটার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) আরও পাঁচ বছরের জন্য বর্ধিত করতে বাংলাদেশ ও ইউএনডিপি ৫০.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।
ডিসেম্বর ১৭	•	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের এক প্রক্ষেপণে বলা হয়, ২০০৯১০ অর্থ ́বছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৫.২ শতাংশ।
ডিসেম্বর ২১	•	ব্রোকারেজ ও ডিলারের কাজ পরিচালনার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আলাদা সহায়ক প্রতিষ্ঠান গঠনের নির্দেশ দেয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।
ডিসেম্বর ২২	•	আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে ঋণপত্র ও সঞ্চয়ী আমানত সহ ২০ ধরনের সেবার জন্য ফি নির্ধারণ করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।
ডিসেম্বর ২৩	•	ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি মোট ৩৩০ মেগাওয়াটের পাঁচটি ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের দরপত্র অনুমোদন করে।
	•	স্থানীয় মুরগীর বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে একদিনের মুরগীর বাচ্চা আমদানির ওপর ১৭ বছরের পুরোনো নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়।
ডিসেম্বর ২৭	•	বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহঋণে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ৫০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করে। কম সুদের জনপ্রিয় এই ঋণ সুবিধার বর্ধিত চাহিদা মেটাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
ডিসেম্বর ২৮	•	ঢাকাচ উগ্রাম মহাসড়ক প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়িয়ে ২,৩৮২ কোটি টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব অনুমোদন করে জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের নির্বাহী কমিটি।
	•	২০০৯১১ পর ́ন্ত তিন অর্থবছরের জন্য ৩৪৫,৭০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের সংশোধিত দ্বিতীয় পিআরএসপি অনুমোদন করে জাতীয় অর্থনীতি পরিষদ।
ডিসেম্বর ৩০	•	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভা কমিটি ভারতের সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাত থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের সুযোগ রেখে ওপেন এন্ডেড আমদানি ও রপ্তানির ইচ্ছা প্রকাশ করে দিলীর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারকের ব্যাপারে নীতিগত অনুমোদন দেয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি

খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য নীতিমালা সংশোধনের আরেকটি প্রস্তাবও ওই বৈঠকে অনুমোদন করা হয়।

ডিসেম্বর ৩১

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি পৃথক এসএমই বিভাগ চালু করে।
- সরকার সুগন্ধি চাল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও ছয় মাস বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়।
- সরকার জিএমটি+৬ ঘণ্টায় সময় পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে দিনের আলো সংরক্ষণ সময় পুনরায় সমন্বয় করে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা (আইআরবিডি) সিরিজ

- State of the Bangladesh Economy in FY2008-09 and Outlook for FY2009-10
- Development of Bangladesh with Equity and Justice: Immediate Tasks for the New Government
- Bangladesh Economy in FY2008-09: An Interim Review of Macroeconomic Performance
- বাংলাদেশের অর্থনীতি: বিশ্লেষণ ২০০৭-০৮ এবং অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা ২০০৮-০৯
- State of the Bangladesh Economy in FY2007-08 and Outlook for FY2008-09
- Recent Inflation in Bangladesh: Trends, Determinants and Impact on Poverty
- Emerging Issues in Bangladesh Economy: A Review of Bangladesh's Development 2005-06
- Bangladesh Economy in FY2007-08: An Interim Review of Macroeconomic Performance
- বাংলাদেশের অর্থনীতি পর্যালোচনা ২০০৭-০৮
- State of the Bangladesh Economy in FY2006-07 and Outlook for FY2007-08
- State of the Bangladesh Economy in FY2005-06 and Outlook for FY2006-07
- State of the Bangladesh Economy in FY2004-05 and Outlook for FY2005-06
- Regional Cooperation in South Asia: A Review of Bangladesh's Development 2004
- Revisiting Foreign Aid: A Review of Bangladesh's Development 2003
- Employment and Labour Market Dynamics: A Review of Bangladesh's Development 2002
- Bangladesh Facing the Challenges of Globalisation: A Review of Bangladesh's Development 2001
- Changes and Challenges: A Review of Bangladesh's Development 2000
- Trends in the Post-Flood Economy: A Review of Bangladesh's Development 1998-99
- অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সংকট: বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা ১৯৯৭
- Crisis in Governance: A Review of Bangladesh’s Development 1997
- প্রবৃদ্ধি না স্থবিরতা?: বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা ১৯৯৬

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০সি, সড়ক ১১, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮ ০২) ৮১২৪৭৭০, ৯১৪১৭০৩, ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪৫০৯০
ফ্যাক্স: (৮৮ ০২) ৮১৩০৯৫১ ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd
http://www.cpd.org.bd/Blog/

ISBN 978-984-8946-04-6
9 789848 946046
90000>